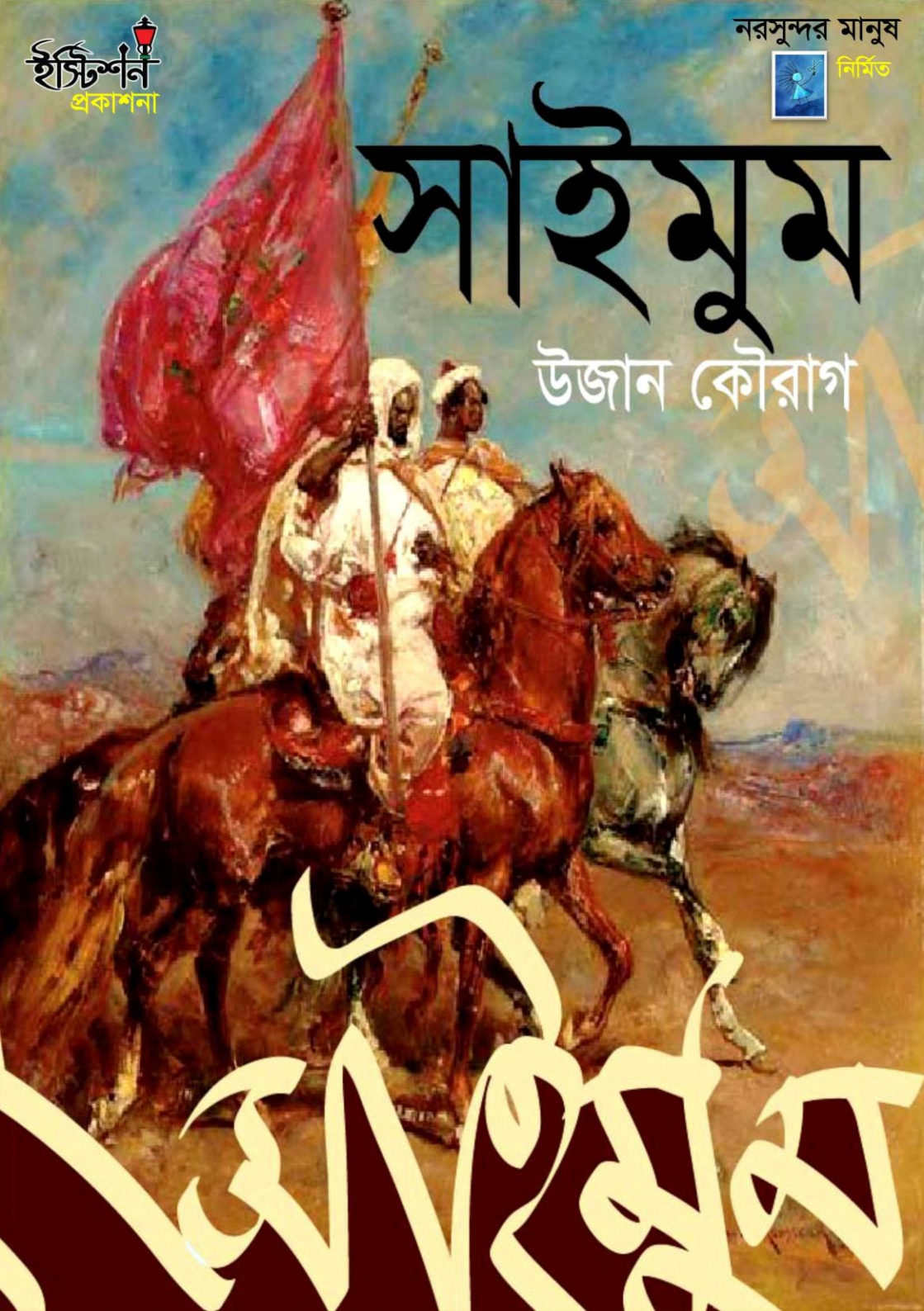
ইস্টিশন
প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

# সাইমুম

উজান কৌরাগ



# সাইমুম

উজান কৌরাগ

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

# সাইমুম

উজান কৌরাগ

© উজান কৌরাগ
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

**ইস্টিশন ইবুক**

**প্রকাশক**

**ইস্টিশন**
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

**প্রচ্ছদ:**
**কবি**

**অলংকরণ:**
**উজান কৌরাগ**

**ইবুক তৈরি:**
**নরসুন্দর মানুষ**

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

---

Saimum. by Ujan Kourag

Istishon eBook
First eBook Published in **September, 2017**

**Created by: NoroSundor Manush**

# উ ৎ স র্গ

মুক্তমনা অগ্রজ এবং অনুজপ্রতিম কলমযোদ্ধাদেরকে– যারা সত্য প্রকাশের জন্য, মানুষকে যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমুখী করার জন্য, সমাজের ধর্মীয় কু-সংস্কার দূর ক'রে এক মানববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কলমযুদ্ধ চালানোর কারণে কেউ রাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশে নির্বাসিত হয়েছেন, কেউ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, কেউ ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন–

কবি দাউদ হায়দার
তসলিমা নাসরিন
সামসুজ্জোহা মানিক
অভিজিৎ রায়
অনন্ত বিজয় দাস
রাজিব হায়দার
নিলয় নীল
ওয়াশিকুর রহমান বাবু
জুলহাস মান্নান
এবং
মাহবুব তনয়

# সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}


শোক। ০৬

নিবেদন। ০৮

অধ্যায় এক। ১০

জন্মান্তরঃ পর্ব-এক । ৩৫

অধ্যায় দুই। ৪২

অধ্যায় তিন। ৬৫

জন্মান্তরঃ পর্ব-দুই। ৮২

অধ্যায় চার। ৯৬

অধ্যায় পাঁচ। ১৪৩

জন্মান্তরঃ পর্ব-তিন। ১৫৬

অধ্যায় ছয়। ১৬৪

অধ্যায় সাত। ১৭৫

অধ্যায় আট। ২০২

অধ্যায় নয়। ২২১

অধ্যায় দশ। ২২৯

জন্মান্তরঃ শেষ পর্ব। ২৩৩

অধ্যায় এগারো। ২৫০

অধ্যায় বারো। ২৭০

শেষ অধ্যায়। ২৭৬

শেষ পৃষ্ঠা। ২৮২

# শোক

ধর্মীয় উন্মাদনা-হানাহানির এই যুগে মুক্তচিন্তায়-বিজ্ঞানে-যুক্তিতে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে আলোর পথ দেখানো এবং মুক্তচিন্তার প্রসারের জন্য ধর্মগ্রন্থের মিথ্যা কল্পকাহিনীতে ভরা অন্ধকার দিকগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে উন্মোচন করা যেমনি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এসব লেখালেখি প্রচারের মাধ্যমেরও। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলা ভাষায় তেমন মাধ্যম খুবই কম। এর কারণ এই যে অধিকাংশ মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ পথে হাঁটতে চায় না, মানুষ সমাজের বাঁধা রাস্তায় নিরাপদে পথ চলতে চায়।

আবার অনেক নাস্তিক আছেন যারা অ্যাসাইলাম নিয়ে বিদেশে গেছেন, সেখানে গিয়ে নানান আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন, নিজের নামে ব্লগ খুলে আত্মপ্রচারে মেতেছেন, অন্য মুক্তমনাদের প্রতি ঈর্ষাবাণ ছুড়ছেন। নিজেদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলে ভাবছেন, 'মুই কী হনুরে'! আমাকে দেখ, আমাকে জানো, আমার লেখা পড়, মুক্তচিন্তায় আমি-ই এগিয়ে; এই হামবড়া ভাবটি যে ঈর্ষাকাতর-আত্মলোভী ধার্মিক মন আর উদার-উন্মুক্ত নাস্তিক মনের ব্যবধান অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছে সেই ব্যাপারে তারা অসচেতন। মোট জনসংখ্যার বিচারে এমনিতেই মুক্তমনা নাস্তিকদের সংখ্যা কম, সুতরাং এখন বিভেদের সময় নয়, নয় আত্মম্ভরিতার সময়; এখন সময় সকল মুক্তমনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার, অন্ধকারে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে আলোর পথ দেখানোর, তাদের অন্তরে বিজ্ঞান-চেতনা ঢুকিয়ে দেবার। আফসোস, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে না; অধিকাংশ বাঙালি মুক্তমনা নাস্তিক হলেও, এমনকি প্রবাসে গেলেও সে তার ফেলে যাওয়া সমাজের প্রথাগত চিন্তার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারছে না।

এই জায়গায় ব্যতিক্রম ছিলেন মাহমুদুন নবী। প্রবাসে বসেও নিজে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ধর্মকারীর মতো একটি মুক্তচিন্তার প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, কোনো আত্মরম্ভিতা তার মধ্যে ছিল না। চাইলে ফেলে যাওয়া বাংলাদেশ-সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে নিয়ে না ভেবে আর পাঁচজন প্রবাসীর মতো আরামে-সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন পার করতে পারতেন। কিন্তু তা চান নি তিনি। প্রবাসে বসেই তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেয়েছিলেন নিজ জন্মভূমির মানুষকে আলোকিত করতে, বিশ্ববীক্ষা-মানবিক দীক্ষা দিতে। বাঙালিদের মধ্যে তথাকথিত জনপ্রিয় বা বিখ্যাত মানুষ অনেক জন্মে, যারা অন্ধকারের সাথে পা মিলিয়ে পথ চলে; কিন্তু অন্ধকার তাড়ানোর মতো মানুষ খুব বেশি জন্মে না। অন্ধকার তাড়িয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষেই বিদেশে থেকেও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি একাই চালাতেন ধর্মকারী ব্লগ, যা সারা বিশ্বের বাঙালি মুক্তমনা নাস্তিকদের জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম। দূর্ভাগ্য আমাদের, গত ১৯ মে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

আমার কাছে তিনি মাহমুদুন নবী আর ধর্ম পচারক নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনো জানতে চান নি যে উজান কৌরাগ নামের আড়ালের মানুষটি কে, তেমনি আমিও জানতে চাই নি তার আসল পরিচয়। শুধু জানতাম তিনি ইয়োরোপ প্রবাসী। এভাবেই আমাদের কথা হয়েছে অনেকদিন। মনের মধ্যে অস্পষ্ট হলেও তার একটা অবয়ব কল্পনা করে নিয়েছিলাম। বয়স ভেবেছিলাম চল্লিশ, তার চলে যাবার পর অন্যদের কাছ থেকে জানতে পারি পঞ্চান্ন'র ওপরে বয়স হয়েছিল। কী-ই বা এমন বয়স!

'সাইমুম' নিয়ে তিনি খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন, প্রত্যেকটা পর্ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তেন, বানান সংশোধন করতেন, তথ্যগত কোনো ভুল বা অসংঙ্গতি থাকলে ঠিক করে নিতেন। লেখালেখির ক্ষেত্রে আমি খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের, বারবার ঘষামাজা করার পরও মনে হয়, আরেকবার ঘষামাজা করা উচিত। এপ্রিল মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সাইমুম'র পাণ্ডুলিপি নবী ভাইকে দেবার কথা ছিল ই-বুক প্রকাশ করার জন্য, দিতে পারি নি। আরো একবার সম্পাদনা করার জন্য বলেছিলাম মে মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেব, তাও দিইনি। কিছু জায়গায় পুনরায় চোখ বুলানোর জন্য আরো দিন দশেক সময় চেয়েছিলাম। ভাই বললেন, 'কোনো তাড়া নেই। আপনি সময় নিন, কাজটা যথাসম্ভব নিঁখুত হওয়া দরকার।'

শেষ পর্যন্ত যখন পাণ্ডুলিপি পাঠাই, তখন আর তার কোনো সাড়া নেই। তিনি সাড়া দেবেন না আর কোনোদিন!

যতোদিন বেঁচে থাকবো একটা আফসোস আর যন্ত্রণা আমার থেকে যাবে যে সম্পাদনা করার পর সাইমুম কেমন দাঁড়ালো তা তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

এমন তো কথা ছিল না নবী ভাই, আমি না হয় কথা রাখতে পারি নি, বারবার সময় নিয়েছি, তাই বলে আপনিও কথা না রেখে এভাবে চলে যাবেন! আপনার উৎসাহেই সাইমুম যা হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অধিক হয়েছে, আর আপনি সেটা প্রকাশ না করেই চলে গেলেন! চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে ভাই, অথচ অনেক আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদও আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ঝরাতে পারে নি! রক্তের সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি না। অথচ না দেখেও আপনাকে আমার পরমাত্মীয় মনে হতো, এমন আরো অনেককেই আত্মীয় মনে হয়, যাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমি সমৃদ্ধ হই, যারা অনেকে হয়তো আমাকে চেনেনও না।

নবী ভাই, কয়েকজন উদ্যোমী সত্যিকারের মুক্তমনা বন্ধু আপনার সন্তানসম প্রিয় ধর্মকারী ব্লগ আবার চালু করেছে। ধর্মকারীর মধ্যেই আপনি বেঁচে থাকবেন, বেঁচে থাকবেন আমার মাঝে, আমার মতো আরো অনেকের মাঝে। লিখতে বসলেই আপনার অনুপ্রেরণা মশাল হয়ে জ্বলবে আমার ভেতরে। যতোদিন বেঁচে আছি আপনাকে হারিয়ে যেতে দেব না, ভাই।

**উজান কৌরাগ**
সেপ্টেম্বর, ২০১৭

# নিবেদন

সাইমুম'র মতো একটি উপন্যাস লেখা কেবল আমার জন্যই নয়, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো ভাষার লেখকের জন্যই একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কেননা পৃথিবীতে এখন প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান, এদের অস্তিত্ব এবং প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইসলামের আবির্ভাব, দর্শন, বিশ্বব্যাপী বিস্তার; সর্বোপরি ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে গেলে, এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত লাগবেই। কিন্তু একথাও সত্য যে কেউ আঘাত পাবে ব'লে ইতিহাস তো আর বদলানো সম্ভব নয়, আবার প্রকৃত ইতিহাস ধামাচাপা দেওয়াটাও অনুচিত। যদিও সর্বকালেই ইতিহাস বদলে অন্যায়কে ন্যায়ের আসনে প্রতিষ্ঠা করার একটা মরিয়া প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত বাঙালী সমাজে।

মুসলমানরা যেখানে তাদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনাই সহ্য করতে পারে না, সেখানে রূঢ়-কঠিন সত্য যে তারা সহ্য করবে না সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ব'সে যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে সত্য কথা লিখলে তার প্রাপ্তির ঝুড়িতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের ঘৃণা জুটবে, মানসিক নিপীড়ন সইতে হবে, এমনকি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত বা খুন হবার হবার সম্ভবনাও প্রবল। আর অতীত অভিজ্ঞতায় জানি যে বাংলাদেশে ব'সে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা আর বিষাক্ত কিং কোবরা নিয়ে খেলা করা একই কথা!

তারপরও আমি সাইমুম কেন লিখলাম? লিখলাম বিবেকের তাড়নায়; গত চৌদ্দশো বছর ধ'রে আল্লাহ্ ও ইসলামের নামে মানবজাতির ওপর মুসলমানদের অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। জানি এতে ক'রে নিজের জীবনে সংকট এবং সংঘাত ডেকে আনলাম, জীবন বিপন্ন করলাম; কিন্তু সাইমুম লিখতে পেরে আমি দারুণ মানসিক শান্তি পাচ্ছি। একদা বর্বর মুসলমানরা ভারতবর্ষ তছনছ ক'রে ফেলেছিল; খুন-ধর্ষণ তো বটেই ধ্বংস করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্পকলা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। যারা মুসলমানদের এই নির্মম বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন তারা আমাদেরই পূর্বসুরি। পূর্বসুরির ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তো উত্তরসুরির দায়িত্ব, খুব সামান্য হলেও আমি সেই দায়িত্বটি পালন করতে চেয়েছি। তাছাড়া এই বর্বর ধর্মটি (আসলে এটি ধর্ম নয়, সন্ত্রাসী মতবাদ) যেভাবে মানবসভ্যতার ক্ষতি করেছে এবং এখনো করছে, যেভাবে মানুষের জীবনযাপনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে; তা থেকে পরিত্রানের উপায় ধর্মটিকে নির্বাসনে পাঠানো। আর তার জন্য প্রয়োজন মানুষকে সচেতন করা, খুঁচিয়ে মানুষের ঘুমন্ত বোধকে জাগানো; আমি সেই কাজটিই করতে চেয়েছি। আর কাজটি শেষ করতে পেরে সত্যিই আমি

দারুণ শান্তি পাচ্ছি।

একজন লেখকের জীবনে অগনিত পাঠকের গালভরা প্রশংসা, তুমুল জনপ্রিয়তা, লক্ষ লক্ষ টাকা রয়্যালিটি, দেশি-বিদেশী রাশভারী পদক; এসবের চেয়ে এই মানসিক শান্তিটুকুর মূল্য অনেক বেশি এবং প্রয়োজনীয়; লেখক হিসেবে আমি অন্তত তাই মনে করি। সত্যকে পাশ কাটিয়ে, সমাজের নানান জাতি-গোষ্ঠী এবং শ্রেণির অন্ধ বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে, তাদের মন যুগিয়ে লিখে লেখক হিসেবে যেমনি দ্রুত নাম করা যায়, তেমনি প্রচলিত স্রোতে জীবনটা ভাসিয়ে সবরকম ভাবে উপভোগও করা যায়; চাইলে হয়তো আমিও তা পারতাম, কিন্তু তাহলে নিজের কাছে আমি কোনোদিনই মানুষ হয়ে উঠতাম না। এখন হয়তো অনেকেই আমাকে ঘৃণা করবে, গালমন্দ করবে, কেউ কেউ অমানুষও বলতে পারে; তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, কেননা আমি তো নিজের কাছে মানুষ হতে পেরেছি, অকপটভাবে সত্য বলার জন্য নিজেকে ভালবাসতে পেরেছি। নিজের কাছে নিজে মানুষ হওয়া এবং নিজেকে নিজে ভালবাসতে পারাই এই মানবজীবনে আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনটুকু সারাজীবন ধ'রে রাখতে চাই, এই অর্জনটুকু নিয়েই বাকি জীবন বাঁচতে চাই। গত ছয় মাস যাবৎ ধর্মকারী ব্লগে 'সাইমুম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় যে-সকল পাঠক আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মুক্তচিন্তার জয় হোক, মানবতার জয় হোক।

**উজান কৌরাগ**
সেপ্টেম্বর, ২০১৭



ঘর-বাড়ি এবং গাছপালা মাথায় সাদা পাগড়ি প'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ভিন্ন ভিন্ন বয়সের কয়েকজন মানুষ মাথায় সাদা পাগড়ি প'রে হাঁটছে; একটা গাধা আর দুটো রোমশ ভেড়ার পিঠে সাদা কাপড় আর মাথায় সাদা টুপি, সবুজ ঘাস খুঁজছে ওরা, কিন্তু ঘাস পাবার উপায় নেই, তাবৎ ঘাস যে সাদা চাদরাবৃত! আসলে পাগড়ি, টুপি, কাপড় কিংবা চাদর নয়; ধবধবে সাদা তুষাররাশি! পাহাড়, গাছপালা, পাহাড়ের কোলঘেঁষা ঘর-বাড়ি, মানুষ, গাধা এবং ভেড়া সকলের ওপরই নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে মিহি দানার সাদা তুষার; আর তুষারাবৃত পথে হাঁটছি আমি, আমার গায়ে-মাথায়ও তুষার পড়ছে, ঠান্ডায় নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে, কিন্তু দারুণ উপভোগ করছি এই শুভ্র-শীতল পরিবেশ। পাহাড় বেয়ে, রাশি রাশি তুষার মাড়িয়ে আমি ক্রমশ ওপর দিকে উঠছি; যতো ওপরে উঠছি ততো ঠান্ডা উপভোগ করছি। চারিদিকে সুনসান নীরবতা, উত্তরে হাওয়ায় ভেসে নিঃশব্দ আদরের মতো ঝ'রে পড়ছে তুষার। আর তারই মধ্যে বেজে ওঠে বেতাল-বেমানান দড়াম দড়াম শব্দ! প্রথমে দড়াম দড়াম, তারপর সাথে সঙ্গত দেয় পোঁ পোঁ, এরপর টুং টাং।

অচৈতন্যকাল পেরোলেও আমার অর্ধচৈতন্যজুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত জনপদ। শব্দ ক্রমশ কাছে আসতে থাকে, টুংটাং শব্দটা আর নেই, শ্রবণেন্দ্রিয়ে শুধু দড়াম দড়াম আর পোঁ পোঁ শব্দ। কিন্তু জোরালো শব্দের দাপটে অধচৈতন্য থেকেও আমার পতন হয় চৈতন্যে, তুষারাবৃত পাহাড়ী জনপদ থেকে আমি ধপাস ক'রে গড়িয়ে পড়ি সমতলে; তাও কোনো সবুজ জনপদের খোলা প্রান্তরে নয়, কংক্রিটের আবর্জনাময় ঢাকা শহরে, অনুভব করি যে আমি শুয়ে আছি বাঁ-দিকে কাত হয়ে আমার রোজকার বিছানায় কোলবালিশ জড়িয়ে ধ'রে; আর চোখ খুলে দেখি পর্দার ফাঁক গ'লে রাস্তার লাইটের সরু একফালি আলো অন্ধকার ঠেলে রেখার মতো আমার গায়ের ওপর দিয়ে মশারি ফুঁড়ে বুকশেলফে পড়েছে! কোথায় সেই মিহি

দানার শুভ্র-শীতল তুষার, কোথায় তুষারাবৃত ঘর-বাড়ি আর কোথায়ই-বা শরীর কাঁপানো উত্তরে শীতল বাতাস? মশারির মধ্যে তীব্র গরমে আমার গায়ের পাতলা গেঞ্জি ভিজে লেপটে রয়েছে শরীরের সাথে, মাথার বাঁ-দিকের চুল ভেজা, গলা-ঘাড়ে প্যাচপেচে ঘাম, কপালে-মুখে ঘাম, ঘামে বালিশ ভিজে চপচপ করছে; অথচ একটু আগেই আমি কিনা তীব্র শীত উপভোগ করতে করতে সাদা তুষাররাশির ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম! স্বপ্নের কী ছিরিছাঁদ!

অবশ্য স্বপ্নের আর কী দোষ, দোষ তো আমার মনের, আমার অদ্ভুতুরে কল্পনাশক্তির! অতিরিক্ত গরম পড়লে মশারির কুঠুরির মধ্যে শোবার পর এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মনটাকে সরানোর জন্য ঘামতে ঘামতে কল্পনা করতে থাকি যে আমি আদতেও এই গরম সমতলে নেই, আমি আছি হিমালয়ের পাদদেশের কোনো পাহাড়ি জনপদে, যেখানে–অবিরাম তুষার পড়ে, ঠান্ডা বাতাস হাড় কাঁপায়, আর আপনা-আপনিই পাওয়া যায় মেঘের নিবিড় স্পর্শ! এমন অবাস্তব কল্পনা করতে করতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ি আমি, তীব্র গরমে আমার ঘুমানোর এ এক মস্ত মহৌষুধ! গ্রীষ্ম কি ভাদ্রের অসহনীয় গরমের দুপুরেও আমি ইউটিউবে বৃষ্টির শব্দ ছেড়ে দিয়ে অনবরত ঘামতে ঘামতে পড়ি কিংবা কাজকর্ম করি আর ভাবি- আহা, কী বৃষ্টি, কী শীতল বৃষ্টি!

জেগে জেগে অমন অতি কাল্পনিক স্বপ্ন দেখছিলাম বলেই হয়তো সেই শান্তিময় টুকরো টুকরো ছবিগুলো ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন হয়ে এসেছে!

স্বপ্নটা অলীক হলেও শব্দটা কিন্তু বাস্তব সত্য, যেন শান্তিময় সমতল কিংবা পাহাড়ি প্রকৃতিতে হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া কালবৈশাখী! না, এ কালবৈশাখী নয়; সাইমুম, মরুভূমির সাইমুম ঢুকে পড়েছে জল-জঙ্গলের দেশে! বালিশে কান পাতলে শব্দটা আরো তীব্রভাবে আঘাত করে শ্রবণেন্দ্রিয়ে; বীভৎস দড়াম দড়াম, পোঁ পোঁ আর টুংটাং শব্দের সঙ্গে মানুষের চিৎকারও স্পষ্ট কানে আসে। শব্দের উৎস এবং উপলক্ষ্য আমার কাছে পরিষ্কার। ভীষণ বিরক্তিকর আর আপত্তিকর হলেও শান্তিময় ঘুমের মাঝে এই শব্দের সাইমুম বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয় আমাকে, আমার মতো আরো অনেককে। অন্ধকারে হাতরে মোবাইলটা হাতে নিয়ে সুইচ অন ক'রে দেখি আড়াইটা বাজে। গরম আর শব্দের তীব্রতায় বিছানায় উঠে বসি। ফ্যানের বাতাস অর্ধেকটাই আটকে দেয় মশারি। মশারি খুলে রাখলে গায়ে বেশ বাতাস লাগে, এমন চটচটে ঘাম হয় না শরীরে। কিন্তু সে উপায় নেই; মা-মেয়ে, খালা-ফুফু, দাদী-নানী, নাতি-নাতনি ইত্যাদি নিয়ে শরীরে হামলে পড়ে লেডি মশার দল। লেডি না ছাই, হতচ্ছাড়ীর দল! হতচ্ছাড়ীর ঝাড় তোদের ডিম নিষেক, বংশগতি ঠিক রাখার জন্য থ্রিওনিন নামক অ্যামাইনো এসিড দরকার যা স্তন্যপায়ী প্রাণির রক্তে বিদ্যমান; বেশ ভাল কথা, তা ব'লে তোরা রাতের বেলা জোট পাকিয়ে কামড়াতে আসবি, মানুষকে ঘুমোতে দিবি নে! হতচ্ছাড়ীর ঝাড় তোদের তো সকাল আটটায় ক্লাস ধরতে হয় না, তোরা কী ক'রে বুঝবি গরমে সারারাত না ঘুমিয়ে সকাল আটটায় ক্লাসে যাওয়ার কষ্ট! ওরাতে গরমে ঘুমাতে পারি না, এরাতে যাও-বা একটু ঘুমাই আজ থেকে তারও পোয়া বারো; শুরু হলো মাঝরাত্তিরে শব্দ

দূষণ! মশারিটা উচু ক'রে চটজলদি বিছানা থেকে নিচে নামি। চটজলদি না নেমে কী উপায় আছে? হতচ্ছাড়ীর দল পররাষ্ট্রনীতিতে তুখোর, আমেরিকার সম পর্যায়ের, মুহূর্তেই মশারির ভেতরে সেঁধিয়ে পড়তে পারে!

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। উহ, সাইমুম, সাইমুম! বাপরে বাপ, কী শব্দ! কী বাজায় ওরা? তিনতলার বারান্দা থেকে গলিতে তাকাতেই মূর্তিমান ছয়জন শব্দদৈত্যগুলোকে দেখতে পাই রাস্তার লাইটের আলোয়; যারা বংশপরম্পরায় মস্তিষ্কের কোষে বহন করছে সাইমুম, বুকে ধারণ ও লালন করছে সাইমুম! দু'জনের হাতে দুটো জলের জার, তারা বাঁ-হাতে জারের গলার কাছটায় ধ'রে ডানহাতের চ্যালাকাঠ দিয়ে দুদ্দাড় পেটাচ্ছে; দু'জনের হাতে দুটো ছোট ভুভুজেলা, অল্প বিরতি দিয়ে তারা বাজাচ্ছে; বাকি দু'জনের মধ্যে যার হাতে সরু লাঠি সে লাইটপোস্টে বারি মারছে, অন্যজন শুধু সাথে গলা মিলাচ্ছে, 'সেহেরি খাওনের সময় অইচে, উইঠ্যা পড়েন'! ছয়জনের মধ্যে চারজন আমার মুখচেনা; আমাদের ব্লকের নয়, ডি ব্লকে কয়েকটা টিনশেড বাড়ি আছে, ওখানেই থাকে ওরা। তিনজনের উদোম শরীর, পরনে লুঙ্গি; দু'জনের গায়ে জামা, পরনে হাফপ্যান্ট; একজনের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে হাফপ্যান্ট। ওরা অনর্গল শব্দ আর চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যায় গলির আরেক মাথার দিকে, তীরের ফলার মতো শব্দ আঘাত হানে আমার মস্তিষ্কে। শব্দের সাইমুমে আমার শ্রবণানুভূতি আহত, আমি বিরক্ত-ক্ষুব্ধ; আমার দৃষ্টি শরের মতো বিদ্ধ হয় জাগনদার দলের পিঠে, আচমকাই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, 'অসভ্য বর্বরের দল!'

রাত আড়াইটা বাজে; এটা মধ্যযুগ নয়, ঊনবিংশ কিংবা বিংশ শতাব্দীও নয় যে এমন বীভৎস শব্দ সৃষ্টি ক'রে সেহেরি খাওয়ার জন্য মানুষকে জাগিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়িতে ঘড়ি-মোবাইল আছে; তাতে এলার্ম দিয়ে রাখা যায়। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে 'জাগনদার' শব্দটা বড্ড সেকেলে; জাগনদারদের কাজটা অনেকের কাছে ভীষণ বিরক্তিকর আর অভদ্রচিতও বটে। যখন বাড়িতে বাড়িতে ঘড়ি-মোবাইল ছিল না, তখন হয়তো ধার্মিক মুসলমানদের এর প্রয়োজন ছিল। তখন জীবনও আজকের মতো এতোটা গতিময় এবং জটিল ছিল না; সকাল পাঁচটা-ছয়টায় ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে মানুষকে ছুটতে হতো না যানজট পাড়ি দিয়ে অফিস কিংবা ক্লাসের উদ্দেশ্যে।

এই রাত আড়াইটার সময় সবার ঘুম ভাঙানোর কোনো মানে হয় না, কেননা সবাই রোজা থাকে না। শিশুরা রোজা থাকে না, বেশিরভাগ বাল্য-কৈশোরের ছেলেমেয়েরা রোজা থাকে না, অনেক অতিবৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ মানুষও রোজা থাকে না, অনেকে এমনিতেই রোজা থাকে না, এছাড়া অন্যান্য ধর্মের কিংবা ভিন্ন মতাদর্শের মানুষও রোজা থাকে না। অবশ্য অন্যান্য ধর্মের কিংবা ভিন্ন মতাদর্শের মানুষকে এদেশের অধিকাংশ সংখ্যাগুরু মুসলমান গণনার মধ্যেই ধরে না; তাদেরকে দয়া-দাক্ষিণ্য আর করুণার পাত্র ভাবে! সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অথবা আলাদা মতাদর্শী মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে পীড়ন না ক'রে কিংবা তাদেরকে বিরক্ত না ক'রে কীভাবে একসাথে পাশাপাশি চলতে হয় তা এদেশের

অধিকাংশ সংখ্যাগুরু মুসলমানই জানে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষের আচরণে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তাদের সংকট কিংবা অসুবিধার জায়গা চিহ্নিত এবং তার সমাধান যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই করা উচিত সেই সহবত এদেশের বেশিরভাগ মুসলমানের নেই। এরা পথে-ঘাটে হাঁটে-চলে, অফিস-আদালত করে, খেলাধুলা-শরীরচর্চা করে, শরীয়ত বিরোধী হলেও অনেকে গান-বাজনা করে, সাহিত্যচর্চা করে; কিন্তু অধিকাংশেরই বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ থাকে সাইমুম, যা এদের কথাবার্তা, আচার-আচরণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতাদর্শী মানুষের ওপর প্রায়শই আছড়ে পড়ে। তাতে সংখ্যালঘু বা ভিন্ন মতাদর্শী মানুষের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে তারা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করলেও বেশিরভাগ মুসলমান-ই কেউ প্রকাশ্যে কেউবা নীরবে বিপুল আনন্দ অনুভব করে!

জাগনদার দল আমাদের গলি থেকে অন্য গলিতে প্রবেশ করায় শব্দের দাপট কিছুটা কমে। বাথরুমে গিয়ে প্রসাব সেরে গায়ের ভেজা গেঞ্জিটা খুলে ফেলি, ট্যাপ ছেড়ে হাত-মুখ, গলা-ঘাড়-বুক ধুয়ে ফ্যানের নিচে এসে দাঁড়াই, গামছা দিয়ে মুছতে থাকি গা-মুখের জল। খাটের পায়ার কাছে রাখা ওয়াটার্ পট হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক জল পান করি আর সঙ্গে সঙ্গেই নৈঃশব্দে শব্দচাপাতির আঘাত হানে মসজিদের মাইক-'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সম্মানিত রোজাদার ভাই ও বোনেরা, এখন রাত দুইটা বেজে চল্লিশ মিনিট, এখন রাত দুইটা বেজে চল্লিশ মিনিট, সেহেরি খাওয়ার শেষ সময় তিনটা আটত্রিশ মিনিট, সেহেরি খাওয়ার শেষ সময় তিনটা আটত্রিশ মিনিট। সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে, সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে, আপনারা উঠুন, সেহেরি খেয়ে নিন।'

সালাম বাদে বাকিটুকু এভাবে আরো দু'বার বলার পর কিছু দোয়া-দরুদ পড়ে, অতি আবেগে আল্লাহ্ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে একটা ইসলামী গানও গায়, তারপর শব্দচাপাতি শান্ত হয়। হাতের গামছাখানা বারান্দার তারে মেলে দিয়ে আমি পুনরায় ঘরে এসে ফ্যানের নিচে দাঁড়াই; মশারির বাইরে বেশ বাতাস লাগে গায়ে, কিন্তু হতচ্ছাড়ী মশাগুলোর জন্য এই বাতাসটুকু উপভোগ করার উপায় নেই। এরই মধ্যে পায়ে দু-বার হুল ফুটিয়েছে। আমার আবার অ্যালার্জির সমস্যা আছে, মশার কামড়ে খুব চুলকায় আর চুলকালে সে জায়গাটা লালচে চাকাকৃতি হয়ে যায়। মানুষ নাকি আশরাফুল মাকলুকাত, আল্লাহ্'র সৃষ্টির সেরা জীব; তো সেই সৃষ্টির সেরা জীবকে সৃষ্টির নগন্য এক জীব দ্বারা কামড় খাওয়ানোর কোনো মানে হয়! আল্লাহ্ নাকি খুব দয়ালু, তাহলে তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মশার কামড়ের কষ্ট না দিয়ে স্ত্রী মশার ডিম নিষেকের জন্য রক্তের বদলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করতে পারতেন না! না, বাইরে থাকলে আরো কামড়াবে, আমি আবার মশারির ভেতর প্রবেশ করি। বালিশের ঘামে ভেজা পাশটা উল্টে দিয়ে মাথা রাখি। ম্যাজিক মশারি নামে এক প্রকার পাতলা মশারি বেরিয়েছে, ফ্যানের বাতাস নাকি আটকায় না, একটা কিনতে হবে দেখছি।

দরজার নিচ দিয়ে ডাইনিংয়ের আলো দেখতে পাই, রান্নাঘর থেকেও শব্দ ভেসে আসে কানে; তার মানে মা উঠে সেহেরি রান্নায় করছেন। আর কিছুক্ষণ পরই উঠবে অন্যরা;

মানে-বাবা, দাদী আর ছোট আপু। দোতলা থেকে আসবে চাচা-চাচী আর দুই চাচাতো বোন; বাড়িতে থাকলে চাচাতো ভাইও আসতো, কিন্তু সে বাড়িতে নেই, দিন পনের আগে চিল্লায় গেছে। চারতলা থেকে আসবে মেজো ফুফু-ফুফা, ফুফাতো বোন; ফুফাতো ভাইটা আবার কানাডায় থাকে। রোজার প্রথম দিন সবার জন্য সেহেরি এবং ইফতারের বিশেষ আয়োজন আমাদের বাসাতেই করা হয়, এটা আমার বাবার নির্দেশ। অবশ্য সকলের প্রতি নির্দেশ হলেও চাচার প্রতি বাবার অনুরোধ বা আবদার বলাই ভাল। কারণ বয়সে দশ বছরের বড় হলেও বাবা চাচাকে নির্দেশ দিতে পারেন না, বরং চাচাই বাবাকে নির্দেশ দেন। সবার সঙ্গে বাবা কঠোর এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ করেন, এমনকি মেজো ফুফাকেও ধমকান; কিন্তু এই বাবাই আবার চাচার সামনে কেমন যেন অপরাধী বালকের মতো আচরণ করেন। সেই হিসেবে বলা যায় দাদীর পরে চাচাই আমাদের বাড়ির অভিভাবক, সবাই তাকে মান্য করে, ভয় করে; কেবল আমি ছাড়া। চাচার ভাষায় আমি কুলাঙ্গার নাস্তিক, বংশের কলঙ্ক, বেতমিজ, গুনাহগার।

আবার শব্দচাপাতি আঘাত হানে শ্রবণেন্দ্রিয়ে, 'সেহেরির আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি আছে, সেহেরির আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি আছে, আপনারা উঠুন, সেহেরি খেয়ে নিন। সেহেরির আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি আছে, সেহেরির আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি আছে, আপনারা উঠুন, সেহেরি খেয়ে নিন।'

এরই মধ্যে আবার আমার গলা ঘেমে গেছে। কী অসহনীয় গরম! এই গরমে ঘুম ভাঙলে আমার আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। অনেকে এই ভীষণ গরমেও শোয়া মাত্রই ঘুমাতে পারে, আমি পারি না। আমার বন্ধু জাহিদের কথাই বলি, ওকে বোধহয় আটত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রোদে ফেলে রাখলেও শোয়া মাত্রই ঘুমাতে পারবে; তাবৎ মশার গুষ্টি ওকে ঘিরে কীর্তন কিংবা সাম্বা ডান্স করলেও ওর ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না! আমি ওভাবে ঘুমাতে পারি না, ভাল ঘুমের জন্য একটু আরামদায়ক পরিবেশ দরকার হয় আমার।

এবছর মার্চ আর এপ্রিলের শুরুর দিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ঢাকাসহ সারাদেশে। তারপর থেকে চলছে খরা। ঢাকা শহর যেন জ্বলছে, বাতাসে আগুনের আঁচ! ঢাকার আকাশের ওপর দিয়ে লোভ দেখাতে দেখাতে মেঘ ভেসে যায় উত্তর-পূর্বদিকে; সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হয়; দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতেও ঝড়-বৃষ্টি হয়; সারাদেশে বজ্রপাতে প্রায় একশো মানুষ মারা গেছে। অথচ ঢাকায় ঝড়-বৃষ্টি তো দূরের কথা, বাতাসে গাছের পাতাটাও যেন নড়ে না! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গরমে সিদ্ধ হচ্ছে মানুষ। আমার চাচীর বড়বোন থাকেন সিলেটে, গতকাল বিকেলেও নাকি তিনি ফোন ক'রে চাচীকে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ শুনিয়ে বলেছেন, 'ঢাকা হলো দোজখখানা, গুনাহগারে ভরে গেছে ঢাকা শহর, এই জন্যই আল্লাহ্ বৃষ্টি দেয় না, গরমে কষ্ট দেয় ঢাকার মানুষরে!'

এই কথাগুলো সন্ধ্যায় চাচী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাকে বলছিলেন, অর্থাৎ আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমিও একজন গুনাহগার এবং এই অনাবৃষ্টির জন্য আমিও দায়ী। আমি শুধু চাচীকে বলি, 'চাচী এই যে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুরসহ নানা জেলায় বজ্রপাতে মানুষ মারা গেছে, এর জন্য দায়ী কে?'

'কে আবার, তারা নিজেরাই দায়ী; নিশ্চয় তারা গুনাহগার! আল্লাহ্ বজ্রপাতের মাধ্যমে গুণাহগারকে শাস্তি দেন।'

'তাইলে তো তিনি এই শাস্তি ঢাকার গুনাহগারদের ওপরও দিতে পারেন!'

এই যে আমার চাচী বললেন যে 'আল্লাহ্ বজ্রপাতের মাধ্যমে গুণাহগারকে শাস্তি দেন'; এ কিন্তু তার নিজের ভাষ্য নয়, কোরান-হাদিসের ভাষ্য। কোরানে আল্লাহ্ বলেছে–'বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেশতারা সভয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করে। আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তা দিয়ে আঘাত করেন। তবু তারা আল্লাহ্'র সম্বন্ধে তর্ক করে! আর তিনি তো মহাশক্তিশালী।' (আল কোরান; সুরা-রা'দ, আয়াত-১৩)।

অথচ কী আশ্চর্য! আমাদের ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবছর বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে! এতো রীতিমতো খোদার ওপর খোদগারি, কোরান অবমাননা!

মনে পড়ে স্কুলের কথা, বৈশাখের এক দুপুরে ধর্ম ক্লাসের সময় প্রচণ্ড বজ্রপাত আর বৃষ্টি শুরু হ'লে হুজুর স্যার বজ্রপাত সম্পর্কে কোরানের এই কথাগুলোই বলেছিলেন। অথচ তার আগেই বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম যে মেঘের উপরিভাগে থাকে ধনাত্মক আয়ন আর নিম্নভাগে থাকে ঋনাত্মক আয়ন। এই ধনাত্মক আয়ন এবং ঋনাত্মক আয়ন একে অপরকে আকর্ষন করে, যখনই একে অপরের সংস্পর্শে আসে তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। আবার নানা পদার্থ থেকে ভূ-পৃষ্ঠেও সৃষ্টি হয় ধনাত্মক আয়ন। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অনেকটা কাছাকাছি চ'লে এলে মেঘের নিম্নভাগের ঋনাত্মক আয়ন আর ভূ-পৃষ্ঠের ধনাত্মক আয়ন একে অপরকে আকর্ষন করে, আর যখন সংস্পর্শে আসে তখন মেঘের ইলেকট্রনগুলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়, ইলেকট্রনগুলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার সময় প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই শক্তিরই কিছু অংশ আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; যাকে আমরা বজ্রপাত বলি।

বিজ্ঞান ক্লাসে বিজ্ঞান স্যারের কথা আর ধর্ম ক্লাসে হুজুর স্যারের কথা শুনে আমি তো রীতিমতো ধন্দে প'ড়ে গিয়েছিলাম। বাসায় এসে চাচার কাছে জিজ্ঞেস করলে চাচা বলেছিলেন–'হুজুর যেটা বলেছে সেটাই সঠিক। হুজুরের কথা মন থেকে বিশ্বাস করবা। আর বিজ্ঞান স্যার যা বলেছে তা মুখস্ত ক'রে পরীক্ষার খাতায় লিখবা, কিন্তু বিশ্বাস করবা না।' আমিও এমন বেকুব যে দীর্ঘদিন তাই-ই বিশ্বাস করেছি!

আমাদের স্কুল-কলেজে এই বিপরীতমুখী দ্বৈতশিক্ষাই দেওয়া হয়। যেমন আরেকটি বিষয়-চারুকলা; ইসলামে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, কিন্তু ইসলাম অবমাননা ক'রে চারুকলাকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিছুদিন আগে এক মজার ঘটনা ঘটেছে, আমাদের পরিবারে তো মজার ঘটনার কোনো অন্ত নেই! আমার চাচাতো বোন ছোটটা হিজাব প'রে একটা আর্টস্কুলে আর্ট শিখতে যায়, বাধ্য হয়ে যায় স্কুলের পরীক্ষায় ভাল ফল পাবার জন্য। তো চাচী ওকে শিখিয়ে দেয় স্যারকে বলতে যে স্যার যেন ওকে মানুষের মুখ আঁকা না শেখায়। আমার নাবালিকা বোনটি স্যারকে এই কথা বলার পর স্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ও জানায় যে, 'মানুষের মুখ আঁকা হারাম!' শুনে স্যার ওকে বলে, 'তাহলে তোমার ছবি আঁকা শেখার দরকার নেই, লেখাপড়াও শেখার দরকার নেই। তুমি বাড়িতে ব'সে সংসারের কাজকর্ম শেখো।' বন্ধুদের সামনে স্যার এই কথা বলায় আমার ক্লাস সিঙ পড়ুয়া বোনটি অপমানিত বোধ ক'রে মনে কষ্ট পেয়ে বাড়িতে এসে কান্না জুড়ে দেয়।

স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ধর্ম শিক্ষার কী প্রয়োজন? কোনো প্রয়োজন নেই, ধর্ম শিক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং শিক্ষার্থীদেরকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তি নিয়েই শিক্ষার্থীরা বড় হয়। যে কারণে অধিকাংশ লোকই বাকি জীবনে আর এই বিভ্রান্তির জাল থেকে বেরোতে পারে না; ফলে এরা ধর্ম পালন করে, আবার বেশরিয়তি কাজও করে।

ঘুমের রেশ কেটে যাওয়ায় আমার আর ঘুম আসে না। তবে স্বস্তি এই যে কাল ক্লাস নেই, একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেও কোনো অসুবিধা হবে না। বাবার গলা শুনতে পাই ডাইনিংয়ে, মায়ের উদ্দেশে কিছু একটা বলেন। মুহূর্ত কয়েক নীরবতার পরই আঙুলের টোকা পড়ে আমার রুমের দরজায়। আমি জানি শব্দ হবে, এবং শব্দটা কে করছে তাও জানি- বাবা। আমি মশারি থেকে বেরিয়ে লাইট জ্বালি চোখে আলোটা সওয়ানোর জন্য, নইলে অন্ধকারে দরজা খুলে দিতেই ডাইনিংয়ের লাইটের আলোর প্রভাবে আমার চোখ-মুখ কুঁচকে যাবে, আর কুঁচকানো চোখ-মুখ দেখে বাবা হয়তো ভাববেন যে আমাকে ঘুম থেকে ডাকার জন্যই আমি বিরক্ত হয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু আমি চাই না বাবা এই ভুলটা বুঝুন, তাই লাইট জ্বালিয়ে চোখে আলো সইয়ে তারপর আমি দরজা খুলি। দরজার সামনে দাঁড়ানো বাবা; মাথায় সাদা টুপি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে সাদা-কালো চেক লুঙ্গি। একটু কোনাকুনিভাবে দাঁড়ানোয় বাবার বামগালের কাঁচা-পাকা দাড়িতে, অনাবৃত ত্বকে, এবং কপালের বামদিকে চকচক করে লাইটের আলো; ঘুম থেকে সদ্য জেগে মুখ ধোয়ার কারণে বেশ সজীব লাগে বাবাকে। এমনিতেও বাবা সুদর্শন, পাঁচফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, এখনো মাথাভরা কাঁচা-পাকা চুল। সুদর্শন বলেই নাকি মায়ের চেয়ে তেরো বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও মা বাবাকে পছন্দ করেন, বিয়েতে রাজি হন।

বাবা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমাদের সঙ্গে সেহেরি খাও; এবার থেকে রোজা রাখো, আল্লাহ্'র পথে এসো।'

আগে বাবা আমাকে তুই ক'রে বলতেন, আমিও বাবাকে আব্বা আর মাকে আম্মা ব'লে ডাকতাম। গত চার বছর ধ'রে তাদেরকে বাবা-মা ব'লে ডাকি। আমি জানি বাবা শব্দটি ফারসি; বরং আব্বা শব্দটিই আরবি বা ফারসি নয়, আরামাইক শব্দ। ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচী, নানা-নানি, পানি ইত্যাদি শব্দগুলো শেখানো হয়। বাবা-মা, কাকা-কাকি, জ্যাঠা-জেঠিমা, দিদি, জল এসব নাকি হিন্দুয়ানী শব্দ; এসব শব্দ মুখে বলা বা লেখা নাকি গুনাহ! শব্দের প্রতি তাদের ঘৃণা দেখে আমি ইচ্ছে করেই বাবা, মা, জল এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে শুরু করি। পুরো পরিবারের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের শুরুও তখন থেকেই। তখন থেকেই বাবা-মা'র সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বেড়ে যায়, আর বাবা আমাকে তুই'র পরিবর্তে তুমি ক'রে বলতে শুরু করেন। মা অবশ্য এখনো আমার সঙ্গে তুই করেই কথা বলেন। বাবার আর আমার মাঝখানে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে; ধর্মের প্রাচীর, বিশ্বাসের প্রাচীর। আমার চাচা নিপুণ হাতে আমাদের পিতা-পুত্রের মাঝখানের এই প্রাচীরটা আরো উঁচু করেছেন, প্রাচীরের ওপরে কাঁটাতার স্থাপন করেছেন এবং এখন তা যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তিনি।

আমি বাবার আলো-ছায়াময় মুখের দিকে তাকাই। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে কোনো একটা খাবারের বাটি রেখে বাবার মাথার পাশ দিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে পুনরায় রান্নাঘরে চ'লে গেলে বাবা মমতা মাখানো কণ্ঠে আবার বলেন, 'যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমার কথাটা রাখো।'

বাবার এই মমতা মাখানো শব্দগুলোর যে অন্তর্গত দ্যোতনা আমার কানে বাজে তা ব্যথা হয়ে আছড়ে পড়ে আমার হৃদয়ে, অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিই বাবার চোখ থেকে, যদিও জানি আমি অপরাধী নই। আমাকে একইভাবে নিরুত্তর দেখে এবার বাবা আমার ডান হাতটা তার দুই হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেন, 'বাবা হিসেবে সবসময় আমি তোমার ভাল চাই, আমার অনুরোধটা রাখো, আমাকে একটু শান্তি দাও।'

বাবার মুখনিশ্রিত প্রতিটি শব্দের গায়ে জড়ানো অনুরোধ, আকুতি, আবদার আর অসহায়ত্ব! বাবা কখনোই এভাবে কথা বলেন না আমার সঙ্গে, এমন কি দাদী এবং চাচার সামনেও তাকে এতোটা অসহায় অবস্থায় দেখি নি কখনো; বাবা যেন অসহায়ত্বের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছেন! বাবার কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুক ভেঙে যায়, আমি কি কেঁদে ফেলবো! আমি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বাঁ হাত তার ডান হাতের ওপর রাখি, 'তোমাকে আর মাকে শান্তি দিতে পারলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না বাবা।'

'শুধু আমার এই অনুরোধটা রাখো, তাহলেই তোমার মা আর আমি শান্তি পাব।'

আমাদের চার হাত এক জায়গায়, আমি আমার দুই হাতের মধ্যে বাবার ডান হাতটা আরেকটু শক্ত ক'রে ধ'রে বলি, 'আমাকে ক্ষমা করো বাবা। তুমি আমাকে বাড়ি

থেকে তাড়িয়ে দাও, তোমাদের সম্মান বাঁচাতে আমাকে মেরে ফেলো, আমি হাসিমুখে সব মেনে নেব, তবু এই অনুরোধটি আমাকে ক'রো না। আমি তোমাদের জন্য আমার জীবন দিতেও রাজি আছি, কিন্তু ধর্মের জন্য আমি আমার শিক্ষা এবং জ্ঞান অস্বীকার করতে পারবো না, আমার সত্তাকে অপমান করতে পারবো না। আমি হয়তো তোমাদের যোগ্য সন্তান নই, কোনোদিন হতেও পারবো না; কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসার কোনো কমতি নেই, কোনোদিন কমবেও না।'

বাবার পিছনে এসে দাঁড়ান মা, মায়ের চোখ ছলছল করে। বাবা সহজে কাঁদেন না, কিন্তু আমি জানি তার হৃদয় কাঁদে আমার মতো একটা গুনাহগার জন্ম দেবার অপরাধে, পরকালে আমার দোজখ গমনের কথা চিন্তা ক'রে।

বাবা তার অসহায় দুটো চোখ আমার চোখ থেকে নামিয়ে নেন, আমি তার হাতের শিথিলতা অনুভব ক'রে বুঝতে পারি তিনি আমার সামনে থেকে স'রে পড়তে চান। অথচ তার হাত ছাড়তে ইচ্ছে করে না আমার, অনেকদিন বাবার এমন নিবিড় স্পর্শ আমি পাই নি; ইচ্ছে করে বাবাকে জড়িয়ে ধরি! কিন্তু বাবা তার বাঁ হাত সরিয়ে নেন, আমার হাতের মধ্যে তার শিথিল ডান হাত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আমার হাত শিথিল করি, বাবা তার ডান হাতটিও সরিয়ে নেন। আমি তাকিয়ে থাকি তার অসহায় মুখের দিকে, বাবা তার চোখ-মুখের এই অসহায়ত্ব কিছুক্ষণ পরই লুকোতে চাইবেন, অন্যরা আসার আগে হয়তো লুকিয়েও ফেলবেন, কিন্তু আমি জানি তার ভেতরটা বেশ কয়েকদিন যন্ত্রণায় কাতরাবে। কতোবার বলেছি যে, 'বাবা, পৃথিবীটা মায়ার সংসার, কিন্তু মায়া-মমতারও তো একটা সীমা থাকা দরকার, আমার ইহকালের সুখশান্তি নিয়ে তোমরা চিন্তা করো ঠিক আছে, তা ব'লে আমার পরকাল নিয়েও তোমরা দুঃশ্চিন্তা করবে! আমার পরকালের ভাবনাটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

কিন্তু লাভ হয় নি কোনো। বাবা-মা আমাকে এতোটাই ভালবাসেন যে তারা আমার পরকাল নিয়েও সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকেন।

মা আবার রান্নাঘরে ঢোকেন। বাবা আমার সামনে থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হতেই বলি, 'বাবা, আমি জানি আমার জন্য তোমরা ভীষণ অসুখী; কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই যদি যার যার বিশ্বাসের জায়গাটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই সুন্দর হবে। আমরা সবাই সুখী হবো।'

বাবা কিছুই বলেন না, আমার দিকে তাকানও না। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। কয়েক পা পথ মাত্র, অথচ আমার মনে হয় এই কয়েক পা পথ অতিক্রম করতেই তিনি ভীষণ ক্লান্ত। বারো বছর আগে বাবার বয়স ছিল আটচল্লিশ বছর, কিন্তু তখন তাকে দেখলে মনে হতো সবে চল্লিশে পা দিয়েছেন; তারপর চাচার প্ররোচনায় যখন থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেন

তখন এক ঝটকায় বাবার বয়স যেন বেড়ে যায় দশ বছরেও বেশি! হঠাৎ করেই বাবা যেন বুড়ো হয়ে যান! বাবার বয়স এখন ষাট, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বাবা যেন আরো বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি এই দাড়িটাই বাবার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। দাড়িটা কেটে ফেললেই বাবার বয়স আরো দশ বছর কম মনে হবে, গোঁফহীন দাড়ি বাবার মুখের সঙ্গে একদম মানায় নি। আমার মায়ের থেকে বাবা এমনিতেই তেরো বছরের বড়, দাড়ি রাখার কারণে দু'জনের বয়সের ব্যবধান যেন আরো বেড়ে গেছে। মায়ের সঙ্গে বাবাকে এখন একদমই মানায় না! আমি তো জানি যে ধর্মীয় কারণে বাবা দাড়ি রেখেছেন এবং তা যতো না নিজের ইচ্ছায় তার চেয়েও বেশি চাচার ইচ্ছায়।

আমার দাদাবাড়ির লোকজন মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করার পর নানা নাকি বলেছিলেন, 'ছেলের পরিবার স্বচ্ছল, দেখতে-শুনতে ভাল, সরকারি চাকরি করে; পাত্র হিসেবে উত্তম, তবে ছেলে-মেয়ের বয়সের ব্যবধান তো বেশি, এজন্য কুসুমের মত নেওয়া দরকার, কুসুম রাজি হ'লে আমার কোনো আপত্তি নেই।' কুসুম আমার মায়ের ডাকনাম, কাগুজে নাম জাহানারা খাতুন। তো কুসুম তার চেয়ে তেরো বছরের বড় পাত্রের রূপ-বর্ণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়েতে রাজি হয়। পনের বছরের কিশোরী কুসুমের সেই প্রিয় পুরুষের রূপের অনেকটাই এখন দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা। অবশ্য কুসুমও আর সেই কুসুম নেই, বাবার বাড়ির উদার-সাংস্কৃতিক পরিবেশে খেলাধুলা-ছুটোছুটি ক'রে বড় হওয়া কুসুম শ্বশুরবাড়ির ধর্মান্ধ পরিবেশের সাথে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে; মাঝের তেত্রিশ বছরে চারটে সন্তানের জন্ম দিলেও টিকে আছে তিনটে, তার নামাজ কখনো কাজা হয় না, বোরকা ছাড়া সে কখনো বাইরে যায় না, ভূমিকম্প হলেও সে বোরকা গায়ে চাপিয়ে তবেই নিচে নামে; এমনকি কুসুম এখন তার বাবার ভুল নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, হিন্দু বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশার কারণে তার বাবার আচার-আচরণে নাকি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ছিল, ছেলেমেয়েদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষায় মানুষ করেন নি, ছোটবেলায় আরবি শিক্ষার পরিবর্তে গানের স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন!

আমার মায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস যে তিনি আরবি ভাষায় কোরান শরীফ পড়তে পারেন না এবং এর জন্য তিনি দায়ী করেন আমার নানাকে। মা কথায় কথায় নানাকে দোষ দিয়ে আমার উদ্দেশে বলেন আমি নাকি নানার স্বভাব পেয়েছি। যদিও নানা আমার মতো নাস্তিক ছিলেন না, আবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়তেন না।

আমি নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসি। ডাইনিংয়ের আলো শুয়ে আছে আমার ঘরের মেঝেতে। ছোট আপু আর মা ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানোয় ব্যস্ত। দাদি উঠে এসেছেন ডাইনিং রুমে, মায়ের উদ্দেশে বলেন, 'ওরা দেরি করতাছে ক্যান? টের পাইছে তো?'

'হ, পাইছে। আইবো অহনই, আপনার পোলায় ফোন দিছিলো।'

'ছোডবউ তো এট্টু আগে আইয়া তোমাগো লগে হাত লাগাইতে পারে, হ্যায় কি সৌদি বাদশার বিবি নি!'

'আমরাই পারবো আম্মা, আপনি বসেন।'

'তোমরা পারবা তা তো জানি, কিন্তু হেতে আইয়া এট্টু হাত লাগাইলে তার হাত ক্ষয় অইবো নি!'

একটু বিরতি দিয়ে দাদি আবার বলেন, 'অয় কী রোজা রাখবো?'

অয়, মানে আমি। কিছুক্ষণ নীরবতা, শুধু টেবিল আর প্লেটের ঠোকাঠুকির শব্দ। দাদি আবার বলেন, 'কি কইলাম হুনো নাই, অয় কী রোজা রাখবো?'

'না।'

'প্যাটে পোলা এট্টা ধরছো, গুষ্টির মুহে চুলকালি মাখতে, দাদা-পরদাদারে দোজখে টানতে এমন এট্টা পোলাই যথেষ্ট!'

মা নিরুত্তর। এই শুরু হলো গঞ্জনা, সারাবছরই কমবেশি বাবা-মাকে এসব শুনতে হয় বাড়ির মানুষ কিংবা আত্মীয়স্বজনদের কাছে; কিন্তু রোজার মাসে তা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সদর দরজা খোলাই ছিল; ফুফু, ফুফা আর ফুফাতো বোন এসে পড়েছে; চাচা-চাচী আর চাচাতো বোনও হয়তো এখনই এসে পড়বে। আমি উঠে গিয়ে আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে আবার শুয়ে পড়ি, এই ভোরবেলায় আমি আমার বাবা-মাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ফেলতে চাই না। কেননা চাচা যদি আমাকে নিয়ে কোনো কথা বলে তা আমার সহ্য হবে না। আমি প্রতিবাদ করবো, আর চাচাও তার জায়গায় অনড় থাকবে এবং পরিস্থিতি আমার বাবা-মায়ের জন্য মোটেও সুখকর হবে না।

চাচার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। পরপর চেয়ার এবং মেঝের সংঘর্ষের শব্দ হয়। আমি নিশ্চিত কয়েক জোড়া বিরক্তিমাখা চোখের দৃষ্টি এখন আমার ঘরের দরজার ওপর ঘুরছে। চাচা, চাচী কিংবা ফুফু আমার সম্পর্কে খোঁচা মেরে কিছু হয়তো বলতে পারে। ওদের বলায় আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু আমার খারাপ লাগে বাবা-মায়ের জন্য। ওদের প্রতিটি কথা নিশ্চয় তীরের মতো বিদ্ধ করে বাবা-মায়ের বুক। আমি চাই না ওদের কোনো কথা এখন আমার কানে আসুক, তাই মোবাইলে ওস্তাদ রশিদ খানের রাগ বাগেশ্রী চালিয়ে কানে ইয়ারফোন লাগাই। রশিদ খানের কণ্ঠ ছাপিয়ে কানে আসে মাইকের আপডেট- 'সেহেরির আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে, সেহেরির আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে, আপনারা উঠুন, সেহেরি খেয়ে নিন। সেহেরির আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে, সেহেরির আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে, আপনারা উঠুন, সেহেরি খেয়ে নিন।'

সত্যিই বাবার জন্য এখন আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার হাতের ভেতর বাবার আশাহত শিথিল হাতদুটোর স্পর্শ আমি অনুভব করতে পারছি, আমার চোখের সামনে

ভাসছে সামনের দিকে ঝুঁকে বাবার নিজের রুমে ফিরে যাবার দৃশ্য। আমি মাঝে মাঝেই ভাবি, বাবা যদি আমার মতো একটা ছেলের বাবা না হয়ে আমার চাচাতো ভাই ফাহাদ অর্থাৎ মোহাম্মদ আবরার ফাহাদের মতো একটা ছেলের বাবা হতেন, তাহলে কি সুখেরই না হতো তার জীবন! আমার জন্য বাবাকে কম অপদস্থ হতে হয় না; বাসায় আত্মীয়স্বজন এলে তারা বাবাকে উপদেশ এবং পরামর্শ দেয় কি উপায়ে আমাকে পথে ফিরিয়ে আনা যায়; পথ মানে ইসলামের পথ, আল্লাহ্'র পথ; তারা বাবার সামনে ফাহাদের প্রশংসা করে, আমাদের অন্যান্য আত্মীয়ের ছেলেদের প্রশংসা করে; তারপর তারা বাবার মুখের সামনে বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কি আর করবেন, সবই আল্লাহ্'র ইচ্ছা, কপালের দোষ।' বাড়িতে কাছাকাছি বয়সের দুটো ছেলে থাকার এই এক বিপদ, উঠতে-বসতে একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা চলে। তার ওপর একজন যদি আমার মতো নাস্তিক হয়, তাহলে তো কথাই নেই; এরা পরকালের দোজখ ইহকালেই দেখিয়ে ছাড়ে, যেমন দেখায় আমাকে!

বাবা মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেও শান্তি নেই, সেখানেও তাকে খুব ভদ্র-মোলায়েম ভাষায় পরিচিতজনদের দ্বারা অপমানিত হতে হয়। আমাদের বাসার পাশেই আলিশান মসজিদ। জুম্মাবারে বাবা, চাচা আর ফাহাদ একসঙ্গে নামাজ পড়তে যায় মসজিদে। যেহেতু বাবা-চাচা বাড়িওয়ালা, তাই মহল্লার অন্যান্য বাড়িওয়ালারাও তাদের চেনে। আর এইসব বাড়িওয়ালারা ভেতরে ভেতরে একজন আরেকজনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কার ছেলে-মেয়ে কি করে, তাদের আচার-আচরণ কেমন, ধর্মে-কর্মে মতি আছে কিনা, এসব ব্যাপারে জানার অদম্য কৌতুহল তাদের। নামাজ পড়া শেষে মসজিদের সামনে কিছুক্ষণের জন্য ছোট ছোট জটলা হয়, সেসব জটলায় এই সমস্ত পারিবারিক আলোচনাই হয় বেশি। বাবা আজকাল এসব জটলা এড়িয়ে চলেন, তবু চেনাজানা কেউ যখন সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে কথা বলতে শুরু করেন তখন তো আর তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বাবার হাত ধ'রে চাচা আর ফাহাদের সামনেই অনেকে বলেন, 'আপনার ছেলেকে তো মসজিদে দেখি না?' মহল্লায় আমার দু-একজন স্কুলের সহপাঠী আছে, ওরা কেউ কেউ আমার নাস্তিকতা সম্পর্কে জানে। ওদের মাধ্যমে জেনেছে ওদের বাড়ির মানুষ। তারপর নামাজের পরের জটলায় তা আরো ছড়িয়েছে।

আমাদের পাশের বাসার ইব্রাহিম চাচা কয়েক সপ্তাহ আগে জুম্মার নামাজের পর বাবাকে বলেছেন, 'আজাদ সাহেব, শুনলাম আপনার পোলা নাকি নামাজ-কালাম পড়ে না, ধর্ম-টর্ম মানে না; এসব তো ভাল কতা না। অয় মনে অয় নাস্তিক বোলোগারগো পাল্লায় পড়ছে, দ্যাহেন ওরে পথে ফিরাইয়া আনতে পারেন কিনা।'

আমি নিশ্চিত জানি ইব্রাহিম চাচা কোনোদিন ব্লগে ঢোকেন নি, তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানেন না। এমনকি মোবাইলে তিনি কল ধরা আর কল করা ছাড়া আর কিছু জানেন বলেও মনে হয় না। অথচ তিনি জানেন যে ব্লগার মানেই নাস্তিক! কতো ধার্মিক,

কতো ধর্মান্ধ, কতো মাদ্রাসা পড়ুয়া, কতো ইসলামী জঙ্গি যে ব্লগ ব্যবহার ক'রে তাদের উগ্র আদর্শ প্রচার করে তার কোনো খবরই এরা জানেন না, কেবল জানেন ব্লগার মানেই নাস্তিক!

আমাদের সামনের বাড়ির রহমান চাচা একদিন বাবাকে বলেছেন, 'একটা মাত্র ছেলে আপনার, অথচ ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলেন না আজাদ ভাই। ফাহাদ কতো ভাল ছেলে, নামাজ-কালাম পড়ে, আদব-কায়দা জানে; আপনার ছেলে রাস্তায় দেখা হ'লে সালাম-আদাবও দেয় না। অথচ দুইজন একই বাড়ির ছেলে।'

সেদিনও চাচা আর ফাহাদ বাবার সঙ্গে ছিল। আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি আমার বাবার সেই অসহায়-করুণ মুখ। আমি অনুভব করতে পারি বাবার বুকের ব্যথা। আবার চাচার গর্বিত মুখও আমার অকল্পনীয় নয়। বাবা এখন নামাজ পড়ার পর পারলে যেন পালিয়ে আসেন! আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও বাবা আজকাল যান না। আর আমি তো সেই কবে থেকেই এসব অনুষ্ঠান বর্জন করেছি। এখন সকল প্রকার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন মা আর ছোট আপু। আমি জানি যে বাবার এইসব অনুষ্ঠান উপেক্ষা করার কারণ আমি; আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতজনরা আমার বিষয়ে বাবাকে বিব্রত প্রশ্ন, পরামর্শ, সহমর্মিতা প্রকাশ করবে তাই বাবা এসব অনুষ্ঠান উপেক্ষা করেন। মাকেও এসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু কেউ না গেলে আত্মীয়তা রক্ষা হয় না, তাই বাধ্য হয়েই মাকে যেতে হয়। বাবা-মাকে এই সংকট থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমার ধার্মিক হওয়া এবং নামাজ-রোজা রাখা; কিন্তু আমার পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। তাই এই সংকটের সমাধান বাবা-মাকেই করতে হবে। এই সংকটের একমাত্র সমাধান প্রতিবাদ করে মানুষের মুখ বন্ধ করা, কিন্তু বাবা-মা কখনোই তা করেন না, কোনোদিন করবেনও না; কারণ মানুষের এইসব অন্যায় আচরণই তাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। ফলে বাবা-মাকে বারবার মাথা নিচু ক'রে মানুষের অপমান হজম করতে হয়।

পরিবারের সঙ্গে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই মতপার্থক্য নয় আমার, মতপার্থক্য আরো অনেক বিষয়ে। বীজগণিতের সূত্রের মতো আমাদের দেশে বিশ্বাসেরও কিছু সুত্র আছে, বিপুল সংখ্যক মানুষের সেই সূত্র মুখস্থ-আত্মস্থ; তাদের ধারণা এটাই নির্ভুল সূত্র এবং একমাত্র এই সূত্র দিয়েই জীবনের অংকের উত্তর সঠিকভাবে মেলানো সম্ভব, সহি মুসলমান হওয়া সম্ভব। হাজার যুক্তি-প্রমাণ দিয়েও তাদেরকে বোঝানো যায় না যে এই সূত্রের চেয়েও নির্ভুল সূত্র আছে! আমি বাদে আমাদের পরিবারের সকল সদস্যেরই এই সূত্র মুখস্থ এবং আত্মস্থ। আমাদের পরিবারে নতুন কোনো সদস্যের জন্ম হ'লে ছোট থেকেই বারবার শুনতে শুনতে সূত্রগুলো তাদের মগজে গেঁথে যায়, তারপর আত্মস্থ ক'রে ফেলে। সূত্রগুলো হচ্ছে-

আওয়ামীলীগ+বামপন্থী বিরোধী= বিএনপি+জামায়াত প্রেমী
বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষী=জিয়া প্রেমী

সর্বক্ষেত্রে ভারত বিদ্বেষী (গঠনমুলক সমালোচক নয়)=সর্বক্ষেত্রে পাকিস্থানপ্রেমী
বিধর্মী বিদ্বেষী=মুসলমানপ্রেমী

খুব ছোটবেলাতেই এই সূত্র আমার মুখস্থ হয়ে যায়, তারপর একসময় আমি নিজে নিজেই আত্মস্থ ক'রে ফেলি। জীবনের আঠারোটি বছর আমি এই সূত্র মেনেই চলেছি। ভারত-পাকিস্থান ক্রিকেট ম্যাচ হ'লে মনে হতো নিজের দেশের বিরুদ্ধে খেলছে ভারত। আমি দু-বার মাঠে ব'সে ভারত-পাকিস্থান ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছি। পাকিস্থানের জার্সি-টুপি প'রে, গালে পাকিস্থানের পতাকা এঁকে, গ্যালারীতে ব'সে পাকিস্থানের পতাকা উড়িয়েছি আর পাকিস্থান পাকিস্থান ব'লে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে মুখে ফেনা তুলেছি। পাকিস্থানী ক্রিকেটারদেরকে মনে হতো আপনজন, মনে হতো তারা তো আমাদের ভাই। আর ভারতীয় ক্রিকেটারদেরকে মনে হতো আমাদের পরম শত্রু। মনে হতো ওরা কারবালায় আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এ লড়াই মালাউনদের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ্'র লড়াই! তাই ভাইদেরকে আমরা উৎসাহ দিতাম আর ভারতীয় ক্রিকেটারদের দিতাম গালি। মালাউন, মালু, চাড়াল, হনু, রেন্ডিয়া ইত্যাদি ব'লে গালি দিয়ে ভীষণ আমোদ পেতাম; বাংলাদেশের ভারতীয় সমর্থকদের মনে করতাম ভারতীয় দালাল, তাদেরকে বলতাম, 'রেন্ডিয়ার দালাল'! বাংলাদেশ-পাকিস্থান ম্যাচ হলেও বাল্যকালে চাচাকে দেখে পাকিস্থানকেই সমর্থন করতাম। পরের দিকে পড়েছিলাম দোটানায়, শেষ পর্যন্ত দুধভাত সমর্থক হয়ে গিয়েছিলাম, মনে হতো যে জেতে জিতুক; বাংলাদেশ জিতলেও উল্লাস করতাম না আবার হারলেও মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকতাম না! কেবল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেই দেশপ্রেম চাগাড় দিয়ে উঠতো, আর ভারত-পাকিস্থান ম্যাচে তো রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতো! তখন স্টেডিয়াম কিংবা টেলিভিশনের সামনে নয়, মনে হতো কারবালায় আছি!

তখন তো আমি বুঝি নি যে আমরা পাকিস্থানের পতাকা বাংলার মাটিতে আর উড়াবো না বলেই আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, ত্রিশ লক্ষ মানুষ তাদের বুকের রক্ত দিয়েছেন, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। আর ভারতীয়রা? পাকিস্থানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারাও তো ছিল আমাদের সহযোদ্ধা, সেই দুঃসময়ে এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তারা খাইয়েছে-পরিয়েছে, তাদের সৈন্যরা জীবন দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। অথচ কি কুৎসিৎ ভাষায় তাদেরকে আমি গালি দিয়েছি, শত্রু ভেবেছি! এসব করেছি শৈশবে শেখা ভুল সূত্রের ফলে।

এই সূত্রের কারণেই স্কুল-কলেজে যে অল্প ক'জন হিন্দু সহপাঠী ছিল তাদেরকে নানাভাবে নানাকথা ব'লে উত্যক্ত করেছি। 'মালাউন' শব্দটিকে সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে 'মালু' ব'লে ওদেরকে গালি দিয়েছি হরহামেশা। স্কুলে আমাদের হুজুর স্যার যখন ধর্ম ক্লাস নিতো, তখন হিন্দু সহপাঠীরাও ক্লাসে থাকতো। হুজুর স্যার প্রায়ই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং ইহুদী ধর্মের সমালোচনা করতো; শুধু সমালোচনা করতো না, কথার ছুরি চালাতো। বিশেষ ক'রে

হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে হুজুর স্যার মজার মজার কথা বললে আমরা খুব আনন্দ পেতাম আর আমাদের হিন্দু সহপাঠী তপন, সুকান্ত, অলক, মহাদেবের দিকে তাকাতাম। হুজুর স্যার বলতো, 'হেন্দুরা শঙ্খ বাজায় ক্যান কও তো?'

হুজুর স্যার 'হিন্দু' শব্দের উচ্চারণ করতো 'হেন্দু'। চার হিন্দু সহপাঠী বাদে আমরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করতাম, 'ক্যান হুজুর?'
'মহাদেবের নাম শুনছো তোমরা?'
আমরা আমাদের সহপাঠী মহাদেবের দিকে আঙুল তুলে বলতাম, 'হুজুর, অই যে মহাদেব।'
'আরে এই মহাদেব না, হেন্দুগো দেবতা মহাদেব।' ব'লে স্যার দাঁত বের ক'রে হাসতো।

আমাদের মধ্যে যাদের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ছিল, হিন্দুদের কিছু কিছু পূজা-পার্বণের সঙ্গে পরিচিত তারা 'হ্যাঁ' বলতাম; আর যাদের গ্রামের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক ছিল না, তারা 'না' বলতো।

হুজুর স্যার বলতো, 'অই যে, হেন্দুরা যে কালীমূর্তি পূজা করে, তার পায়ের নিচে বাঘের ছাল পইরা জটা মাথার যে লোকটা শুইয়া থাকে, তার নাম মহাদেব। মহাদেবের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না, অসুরদের মা-বোনদের ওপর অত্যাচার চালাইতো। একবার সকল অসুর একত্র হইয়া মহাদেবরে দাবড়ানি দিছিল, দাবড় খাইয়া মহাদেব দৌড়াইতে দৌড়াইতে সমুদ্রে যাইয়া পালাইছিল শঙ্খের ভিতর। অসুররা অনেক খুঁজাখুঁজি কইরাও তারে আর পায় নাই। সে যাত্রায় রক্ষা পাইছিল মহাদেব, আর মহাদেবরে শঙ্খ রক্ষা করছিল বইলাই হেন্দুরা কৃতজ্ঞতাবশত পূজায় শঙ্খ বাজায়।'

আমরা এইসব গল্প শুনে হাসতাম আর মহাদেব এবং অন্য হিন্দু সহপাঠীদের দিকে তাকাতাম। ওরা যতো বিপন্ন আর অসহায়বোধ করতো আমরা ততো বন্য আনন্দ পেতাম; আর মহাদেবকে তো ক্ষ্যাপাতাম-ই! তখন বুঝতে পারতাম না যে এতে ওদের বাল্য-কৈশোরের মন কতোটা ক্ষতবিক্ষত হতো।

আমাদের সহপাঠী সুকান্ত'র পদবী গঙ্গোপাধ্যায়। সুকান্ত'র নামের পদবী নিয়ে কৌতুক ক'রে হুজুর স্যার একদিন বলেছিল, 'তোগো হেন্দুগো যে কি নাম; মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়! মানে অইলো গিয়া কেউ মুখ খুইলা পাদ দেয়, কেউ মুখ বন্ধ কইরা পাদ দেয়, কেউ চট কইরা পাদ দেয়, আবার কেউ গন্ধ কইরা পাদ দেয়; হা হা হা...!'

হাসি সংক্রামিত হয়েছিল পুরো ক্লাস জুড়ে। লাল হ'য়ে উঠেছিল সুকান্ত'র মুখ, পুরো ক্লাস মাথা নিচু ক'রে ছিল বাষ্পাকুল চোখে। অন্য হিন্দু সহপাঠীদের মুখেও হাসি ছিল না, ওরাও

মাথা নিচু ক'রে ছিল। ওদের ওই নিচু মাথা, বাষ্পাকুল চোখ, থমথমে মুখের অর্থ বোঝার মতো বয়স তখন আমাদের হলেও পারিবারিক শিক্ষা ছিল না ব'লে ব্যথিত হবার বদলে বুনো উল্লাসে ফেটে পড়তাম!

এরপর থেকে আমরা সুকান্তকে ক্ষ্যাপাতাম, 'সুকান্ত তুই গন্ধ কইরা পাদ দিবি না কিন্তু, বন্ধ কইরা দিবি!'

সুকান্ত'র বুকের রক্তক্ষরণ আমরা কখনোই টের পাই নি। হঠাৎ একদিন স্কুলে আসা বন্ধ ক'রে দেয় ও। পরে একদিন তপনের মুখে শুনি যে ও ভারতে চ'লে গেছে।

আসলে সূত্রগুলো বর্জন ক'রে অন্য সূত্র গ্রহণ ক'রে জীবনের অংক কষা ভীষণ কঠিন, তবে চেষ্টা করলে একেবারে অসম্ভব নয়। ইন্টারমিডিয়েটে আমার একজন শিক্ষক ছিলেন, কবিরুল ইসলাম, আমরা তাকে 'কবির স্যার' ব'লে ডাকতাম। তিনি বয়সে তরুণ কিন্তু নানা বিষয়ে তার জ্ঞান, ব্যাপক তার পড়াশোনা। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে অন্যান্য বই পড়ার পরামর্শ দিতেন, অনেক বইয়ের নাম বলতেন। কবির স্যার ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং সংস্কৃতমনা; ইতিহাস এবং ঐতিহ্য নিয়ে অনেক কথা বলতেন। তার বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন এবং ভারতপ্রেম দেখে অন্য অনেকের মতো আড়ালে আমিও তাকে আওয়ামীলীগ এবং ভারতের দালাল বলেছি। কিন্তু অন্যদের মতো স্যারকে আমি পুরোপুরি নাকচ ক'রে দিতে পারি নি তার সততা, স্পষ্টবাদিতা এবং চিন্তার প্রখরতার কারণে। অন্য অনেক স্যারদের চরিত্রে অনেক বৈপরীত্য থাকলেও তার কথা এবং কাজে কখনো অমিল দেখি নি, ফলে আমি তাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। স্যারের কথা মন দিয়ে শুনতাম, তার কথা শুনেই নানা বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় এবং সেসব বিষয়ে কিছু কিছু পড়াশোনাও শুরু করি। তারপর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর উনিশে পা দিয়ে যখন বিভিন্ন বিষয়ে আরো বেশি বেশি পড়াশোনা শুরু করি, ইতিহাসটা জানা এবং বোঝার চেষ্টা করি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সন্ধান এবং নিজের বোধ দিয়ে তা বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করি, যুক্তির বিপরীত যুক্তিও মন দিয়ে শুনি, তখনই একটু একটু ক'রে নিজের ভুলগুলো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে বোধের আয়নায়। বুঝতে পারি যে ভুল পরিবারে জন্ম নিয়ে ভুল শিক্ষায় বড় হয়েছি, এই ভুল শোধরাতে হবে আমাকেই। আঠারো বছরের আমজাদ উসামার ভুল শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং সকল প্রকার সংকীর্ণ চিন্তার মৃত্যু ঘটিয়ে আমি নিজ হাতে তা সমাধিস্থ করেছি মানবতার উদার জমিনে। আমি হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নই, জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতারণার একটি বুদ্ধিদীপ্ত পন্থামাত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একই দেহে মানুষের বারবার জন্ম হয়, চৈত্তিক জন্ম। আমারও তাই হয়েছে। এখন আমি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ছাদের নিচ থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছি মানববাদের উদার আকাশের নিচে, মুসলিম উম্মাহ্'র সংকীর্ণ শিক্ষার জাল কেটে বেরিয়ে বাইরে এসে নিয়েছি বিশ্ববীক্ষার পাঠ, জাতীয়তাবাদের

সংকীর্ণ শিক্ষা ঝেড়ে ফেলে অনুভব করেছি আমি বিশ্ব নাগরিক, মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত! হয়ে উঠেছি এক নতুন মানুষ–সবুজ সমতল।

আমাকে ক্ষমা করুন কবির স্যার, আপনি যে জ্ঞানসুধা ঢেলেছিলেন আমার কৈশোরের চেতনায়, তাৎক্ষণিক আমি তার রসাস্বাদন করতে পারি নি। আপনার অর্পিত জ্ঞানসুধার বিপরীতে আমি আপনার অলক্ষ্যে আপনার দিকে ছুড়ে দিয়েছিলাম পচা কাদার মতো বাক্য! তবে সঙ্গে সঙ্গে না হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কেননা আপনিই আমার ভেতরে এই নতুন মানুষের বীজ বপন করেছিলেন, যে মানুষের শিকড় এখন বাংলাদেশে কিন্তু চেতনার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত সারা পৃথিবীতে, পৃথিবী ছাড়িয়ে অসীম মহাবিশ্বে। কবির স্যার, আপনার মতো শিক্ষকই পারেন সমাজকে বদলে দিতে।

একটি ধর্মান্ধ পরিবারের আঙিনা সবুজ সমতলের জন্য ভীষণ রুক্ষ, একটি ধর্মান্ধ দেশে সবুজ সমতলের পথটি ভীষণ অসমতল; তবু পথ চলছি। ধর্মান্ধতার ছাতার নিচ থেকে মানবতার উন্মুক্ত উদার আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করেছি নতুন চিন্তার নির্যাস, নতুন আদর্শ। এখন আর বুকে বয়ে বেড়াই না সাইমুম, এখন বুকের ভেতর নদী, ঝর্ণা, জল, সমুদ্র, ফুল-ফল, পাখি, ঘাস-লতা, শিশির, মিষ্টি বাতাস, মেঘ এবং আরো কতো কিছুর বসবাস! অতীতের কু-শিক্ষা ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, তবু একটা ব্যাপারে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না–সুকান্ত'র ভারতে চ'লে যাওয়া। বছর দুয়েক আগে তপনের কাছ থেকে জেনেছি, হুজুর স্যার সুকান্ত'র পদবী নিয়ে উপহাস করার পর ও নাকি কাঁদতে কাঁদতে তপনকে বলেছিল, 'আমি আর এই দেশেই থাকবো না।' আর তার কিছুদিন পরই সুকান্তরা সপরিবারে ভারতে চ'লে যায়।

অনেকদিন সুকান্ত'র কথা ভুলে ছিলাম। কিন্তু তপনের মুখে এই কথা শোনার পর থেকে বারবার সুকান্তকে মনে পড়ে। হুজুর স্যারের ক্লাসে সুকান্ত'র মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকার দৃশ্যটি পাথরের মতো আঘাত করে বুকে। মনে হয় কেবল হুজুর স্যার নয়, আমার কারণেও সুকান্তরা ওদের পৈত্রিক ভিটেমাটি-দেশ ছেড়ে চ'লে গেছে, এর জন্য আমিও দায়ী। আজ কেবলই মনে হয় শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়ে মানুষকে কেন নিজের দেশ ছেড়ে আরেক যেতে হবে! সুকান্তদের পরিচয় এখন উদ্বাস্তু! অনেক বড় পৃথিবী, যার যখন খুশি যেখানে যাবে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘর বেঁধে থাকবে, সেটা তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার; পাসপোর্ট, ভিসা, কাঁটাতার এসব মানুষকে শোষণ এবং নির্যাতনের হাতিয়ার। আজ যারা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে, বাংলাদেশ-পাকিস্থান থেকে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে, এদের অধিকার আছে স্বেচ্ছায় পৃথিবীর যে কোনো ভূ-খণ্ডে গিয়ে বসবাস করার। কিন্তু জোর ক'রে এদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে, নির্যাতন ক'রে এদেরকে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আর পৃথিবীর এই হাজার হাজার নির্যাতনকারীর অলিখিত তালিকায় একেবারে

নিচের দিকে হলেও আমার নামটি আছে; শারীরিকভাবে না হোক মানসিকভাবে তো আমি সুকান্ত, তপন, অলক, মহাদেবকে নির্যাতন করেছি; এটা ভাবলেই আমি স্থির থাকতে পারি না, দেয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে! তপন, অলক আর মহাদেব বাংলাদেশেই আছে; তপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অলক রাজশাহী আর মহাদেব খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে; প্রথম বর্ষে ভর্তির কিছুদিন পর অলক আর মহাদেব যখন ঢাকায় আসে, তখন একদিন আমি ওদের তিনজনকে ডেকে ক্ষমা চেয়েছিলাম আমার অতীত কৃতকর্মের জন্য। আমাকে ক্ষমা চাইতে দেখে ওরা প্রথমে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, তারপর তপন বলে, 'ক্ষমা চেয়ে কেন আমাদের বিব্রত করছিস? ক্ষমা চাইতে হবে না।'

আমি বলি, 'ক্ষমা আমাকে চাইতেই হবে বন্ধু, আমি তো জানি যে আমি তোদেরকে কতো কষ্ট দিয়েছি।'

মহাদেব বলে, 'জানিস, ছোটবেলা থেকেই আমরা ওসব কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত, এখনো শুনতে হয় কি ব্যক্তিজীবনে কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে জন্মানোর কারণে আমাদেরকে এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর দিয়েই যেতে হবে। ছোট থাকতে এসব কথা শুনে কষ্ট পেতাম, এখন এক কান দিয়ে শুনি আরেক কান দিয়ে বের ক'রে দিই। তবু একটা কষ্ট আমাদের বুকে বাজে। আমাদের ব্যথাটা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ কখনোই সেভাবে অনুভব করতে পারে না, তুই যে এতোদিন পর পেরেছিস, এজন্য তোকে ধন্যবাদ।'

আমি মহাদেবের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর চোখের ভেতর জল টলমল করছে। তপন আর অলকের দিকে তাকিয়েও একই চিত্র দেখতে পাই। তিনজনের চোখেই একই রকম জল, মুখে একই রকম অভিব্যক্তি; হয়তো তিনজনের বুকে একই রকম ব্যথা তাই! ওদের চোখের জল আমার চোখেও সংক্রামিত হয়, আমি ওদের তিনজনকে জাপটে ধ'রে কেঁদে ফেলি।

ওরা তিনজন আমাকে ক্ষমা করেছে, কিন্তু সুকান্ত'র কাছে আমি আজও ক্ষমা চাইতে পারি নি। ফেসবুকে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখে কতোবার সার্চ দিয়েছি, কতো সুকান্ত'র দেখা পেয়েছি, কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বন্ধু সুকান্তকে খুঁজে পাই নি। তবে আমার বিশ্বাস ওর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। যাবার আগে ও তপনকে বলেছিল যে ওরা উত্তর চব্বিশপরগণার দত্তপুকুরে চ'লে যাচ্ছে। আমি একদিন দত্তপুকুরে যাবই সুকান্তকে খুঁজতে, এ আমার আবেগের কথা নয়, আমি যাবই ওর কাছে ক্ষমা চাইতে; নইলে সারাজীবন যতোবার স্কুলের স্মৃতি ওর মনে পড়বে ততোবার অন্যদের মতো ও আমাকেও ঘৃণা করবে।

কোনো মানুষের বাল্য-কৈশোরের মানসিক বিকাশকালে তাকে ভুল সূত্র দ্বারা পরিচালিত করলে কিংবা যে কোনোভাবেই হোক তার মস্তিষ্কের উর্বর জমিনে ভুল বীজমন্ত্র প্রোথিত হ'লে

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে, এমনকি তার মানসিকতা বর্বরতা-হিংস্রতার পথেও ধাবিত হয়। কবির স্যারের মতো শিক্ষক পেয়েছিলাম বলেই হয়তো আমি রক্ষা পেয়েছি, আমার ভেতরে সাম্প্রদায়িকতা বা বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা মেলে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। এর পিছনে কবির স্যারের যেমনি ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে আমার নিজের দৃঢ় প্রচেষ্টাও। কবির স্যার আমাকে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সুবর্ণখনির পথ দেখিয়েছিলেন, আমি তার দেখানো পথ ধ'রে এগোতে এগোতে একসময় সন্ধান পেয়ে যাই সেই সুবর্ণখনির। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে আমি সেই সুবর্ণখনির মূল্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছি বলেই দমন করতে পেরেছি বিদ্বেষের বিষবৃক্ষকে। উপলব্ধি করেছি যে মানুষের জীবনে পারিবারিক পরিবেশ এবং বন্ধুমহল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি হয়তো সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে নিজের এবং পরিবারের সঙ্গে লড়াই ক'রে আমার মানসিক অন্ধত্ব দূর করেছি, কিন্তু সবার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

উপরেল্লিখিত সূত্রগুলোর সঙ্গে কয়েক বছর আগে আরো দুটি নতুন সূত্র যোগ হয়েছে-
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধী–নাস্তিক ব্লগারদের বিচার প্রার্থী
গণজাগরণ মঞ্চ বিরোধী-হেফাজতে ইসলাম প্রেমী

আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ সমাবেশে গিয়েছি, এটা নিয়েও পরিবারের সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হয়েছে, এখনও করতে হয়। আমাদের পরিবারের কেউ-ই যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চায় না। বলে, 'এতোদিন পর এই বুড়ো মানুষগুলোকে শাস্তি দেবার কি দরকার! দেশে কতো অন্যায়-দুর্নীতি হচ্ছে তার তো বিচার হচ্ছে না, নবীজিকে নিয়ে নাস্তিক ব্লগাররা কতো খারাপ খারাপ কথা লিখছে তার তো বিচার করছে না সরকার। এটা একটা রাজনৈতিক চাল।'

আমার দাদীর বড়ভাই একাত্তরে একজন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বাঙালি হলেও তিনি নাকি পারতপক্ষে বাংলায় কথা বলতেন না, অফিসে-বাড়িতে সব জায়গায় উর্দুতে কথা বলতেন। অন্যদেরকেও উর্দু ভাষায় কথা বলার পরামর্শ দিতেন। বাংলা ভাষাকে তিনি কাফের হিন্দুদের ভাষা মনে ক'রে ঘৃণা করতেন! বিয়ে করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্থানে কর্মরত একজন পশ্চিম পাকিস্থানী সরকারী কর্মকর্তার মেয়েকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিরলসভাবে পাকিস্থানের পক্ষে কাজ করেছেন; এমনকি নিরপরাধ মানুষ হত্যায় নেতৃত্বও দিয়েছেন। একাত্তরের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের বিজয় যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তখন নিজের বিপদ আঁচ করতে পেরে তিনি তার পরিবার নিয়ে পালিয়ে পাকিস্থানে চ'লে যান। যাবার আগে নাকি ব'লে যান যে এই দেশের মুসলমানরা কাফের হয়ে গেছে, কাফেরদের এই নাপাক ভূমিতে তিনি আর কখনোই ফিরবেন না। ফেরেনওনি, আশি সালে করাচীর রাস্তায় এক বোমা বিস্ফোরণে মারা যান তিনি! তার স্ত্রী-সন্তান ওখানেই স্থায়ী হয়েছে। দাদীর ভাই মারা যাবার সংবাদটা জানানোর পর থেকে তারা আর বাংলাদেশে কারো সঙ্গে যোগাযোগ

করে নি। আমার দাদী তার ভাইকে এতো বছর বাদেও ভুলতে পারেন নি, তার ভাইয়ের মতো ধর্মপ্রাণ মুসলমান নাকি তিনি জীবনেও দেখেন নি। ভাইয়ের কথা উঠলে আজও তিনি চোখের জল ফেলেন আর ভারতকে গালমন্দ করেন, ইন্দিরা গান্ধীর চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করেন! দাদীর বিশ্বাস, ভারত অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর চক্রান্তেই পাকিস্থান থেকে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। দেশটা যদি আজও পাকিস্থান থাকতো তাহলে তার ভাইকে করাচীর রাস্তায় অকালে প্রাণ হারাতে হতো না। যে ভাই গাছ থেকে আম-আমড়া পেড়ে আদর ক'রে বোনকে খাইয়েছে, সেই ভাইয়ের কবরটাও তিনি দেখতে পেলেন না! এই নিয়ে দাদীর বড় আক্ষেপ; আরো একটি আক্ষেপ এই যে কতোকাল তিনি তার ভাইপুত-ভাইঝিদের মুখে ফুফু ডাকটাও শুনতে পান না, আজ তার সংসার ফুলে-ফেঁপে উঠলেও তাদেরকে নিজ হাতে রান্না ক'রে ভাল কিছু খাওয়াতে পারেন না! ভাই বিষয়ে দাদীর সর্বশেষ আক্ষেপ হলো–একাত্তরের পরে করাচীতে জন্ম নেওয়া ভাইয়ের শেষ দুটো ছেলেমেয়ে কোনোদিন বাপ-দাদার ভিটেটাও দেখতে পায় নি আর তাদের চাঁদমুখ না দেখেই তাকে মরতে হবে!

যে কারণে আমাদের পরিবারের হিন্দু বিরোধীতা, বাংলাদেশ বিরোধীতা, ভারত বিরোধীতা, আওয়ামীলীগ বিরোধীতা কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধীতার শিকড় চেতনার খুব গভীরে প্রোথিত। যেদিন জামায়াতে ইসলামীর নেতা-একাত্তরের কুখ্যাত খুনি রাজাকার দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির রায় হয়, সেদিন সংবাদ দেখার সময় চাচা রিমোর্ট ছুড়ে মারেন টেলিভিশনের পর্দায়। রিমোর্ট ভেঙে চুরমার হয়, টেলিভিশনের পর্দায় চিড় ধরে। চাচা সাঈদীর ওয়াজের খুব ভক্ত, তাই সংবাদটা শুনে তিনি সহ্য করতে না পেরে অমন কাণ্ড করেন। পরে যখন আদালত আপিলের রায়ে ফাঁসির বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়, তখন তিনি খানিকটা স্বস্তি বোধ করেন।

চাচা শুরুতে আইএস এর ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে একমাত্র আইএস-ই পারবে সারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামী কওমের ছাতার নিচে এনে সত্যিকারের দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। এমন স্বপ্ন তিনি আগেও দেখেছিলেন তালেবান আর আল-কায়েদাকে নিয়ে। লাদেন বাহিনী যখন আমেরিকার টুইনটাওয়ারে হামলা চালায় তখন আমি বেশ ছোট হলেও চাচার সেই বুনো উল্লাসের কথা আমার আজও মনে আছে। আফগানিস্থানে তালেবানরা যখন বড় বড় বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙছিল তখনও চাচাকে উৎফুল্ল দেখেছি। কিন্তু তালেবান আর কায়েদায় চাচার স্বপ্নভঙ্গ হয় তারা আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে না পারায়। তাই চাচা সর্বশেষ স্বপ্ন বোনেন আইএসকে ঘিরে। কিন্তু যখন শোনেন যে আইএস কাবা শরীফেও আক্রমণ করতে চায়, তারা হজ কিংবা ঈদের জামায়াত বন্ধ করতে চায়, তখন চাচার সেই উৎসাহের মহীরুহে যেন বাজ পড়ে! চাচা হয়ে যান আইএস বিরোধী এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আইএস ইসলামের শত্রু ইসরাইলের সৃষ্টি, ইসলাম ধ্বংস করাই আইএসের একমাত্র উদ্দেশ্য, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত! তার বিশ্বাস পরে সংক্রামিত হয়েছে বাবার মধ্যেও। তবে বাবা চাচার চেয়ে খানিকটা উদারপন্থী। এই যে

আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হয়, গলা কেটে হত্যা করা হয়, তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া হয়, বাবা এসবের পক্ষে নন। বাবা চান সংখ্যালঘুরা থাকুক ওদের মতো, ওরা তো আমাদের পায়ের নিচেই আছে, খুনোখুনি করার তো কোনো দরকার নেই। যদিও বাবার সাম্প্রতিক ধারণা অনির্বাচিত আওয়ামীলীগ সরকার এখন ক্ষমতায় টিকে থাকতে তাদের বিশ্বাসভাজন সংখ্যালঘুদেরকে বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে, প্রশাসনসহ সব সেক্টরে বড় বড় পোস্টে হিন্দুদের চাকরি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে ড্রয়িংরুমে ব'সে বাবা আর চাচা এসব নিয়েই আলাপ করছিলেন। রান্নাঘরে নিজের জন্য চা বানাতে বানাতে আমি তাদের কথা শুনছিলাম। এক পর্যায়ে সদ্য বানানো ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগটা ডাইনিং টেবিলে রেখে ঢুকে পড়ি তাদের কথার মধ্যে, 'জামায়ত-বিএনপি ক্ষতায় থাকাকালীন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের চাকরি দেয় নি বললেই চলে। ইন্টারভিউ বোর্ডে আগেই জানিয়ে দেওয়া হতো হিন্দুদের নিয়োগ না দেবার জন্য। আওয়ামীলীগ সরকার সেই নীতি গ্রহণ করছে না, এজন্য আওয়ামীলীগের ধন্যবাদ প্রাপ্য।'

'অল্প কিছু নিয়োগ দিলে বিষয়টা মানা যেতো, তাই ব'লে প্রশাসনের বড় পোস্টে এতো হিন্দু কমকর্তা!' বাবা বলেন।

চাচা ফোঁস ক'রে ওঠেন, 'ইন্ডিয়ার ইশারায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আওয়ামীলীগ এসব করছে। গোপালগঞ্জ থেকে সব নমো-চাঁড়ালগুলোকে ধ'রে এনে চেয়ারে বসিয়েছে।'

আমি চাচার চোখে চোখ রাখি, 'চাচা, আমাদের পূর্ব পুরুষও যে নমো-চাঁড়াল ছিল না, নিশ্চয় এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত নন; বরং ইতিহাস বলে সেই সম্ভাবনাই বেশি। তাই এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করলে নিজেদের গায়েই থুথু ছিটানো হয়। আর আওয়ামীলীগ হিন্দুদের বড় বড় পোস্টে নিয়োগ দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করছে। জামায়াতের টাকা খেয়ে মুসলমানদের দেশের সঙ্গে বেঈমানী করার সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু হিন্দুদের সেই সম্ভবনা নেই বললেই চলে।' চাচা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ছাত্র শিবির করতেন, এখন রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও জামায়াতে ইসলামীর কট্টর সমর্থক এবং চাকরি করেন ইসলামী ব্যাংকে। সবসময় নিজের যুক্তিতে অটল থাকলেও সেদিন আর এ বিষয়ে কথা বাড়াননি।

চাচা ক্লাস এইট পর্যন্ত গ্রামে লেখাপড়া করেন, তারপরই পুরো পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে আসেন দাদা। ঢাকায় নিয়ে এলেও প্রতি ঈদেই গ্রামে যেতেন ঈদ করতে। ছেলেবেলায় আমি, আমার দুই আপু আর ফুফাতো ভাই-বোনেরা চাচার কাছে তার ছেলেবেলার ঈদের গল্প শুনতে চাইলে চাচা তাদের ছেলেবেলার আনন্দ-উৎসবের অনেক গল্পের মধ্যে একটি গল্প বলতে যেমনি পুলকবোধ করতেন, তেমনি আমরাও মজা পেয়ে হাসতে হাসতে কেউ তার গায়ে কেউবা সোফায় গড়িয়ে পড়তাম। চাচার মুখে শোনা সেই অতি মজার গল্পটা হচ্ছে– কোরবানী ঈদের সকালে গরু কোরবানীর পর চাচা এবং তার বন্ধুরা গরুর হাড় আর নাড়ি

লুকিয়ে রেখে দিতেন। তারপর রাত্রিবেলা সেই হাড় আর নাড়ি নিয়ে যেতেন হিন্দুপাড়ায়, হিন্দুপাড়ার যেসব ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা বা অন্য কোনো কারণে তাদের বিরোধ থাকতো সেইসব ছেলেদের বাড়ির উঠোন-বারান্দায় গরুর হাড় আর নাড়ি রেখে আসতেন, গাছের ডালে গিঁট দিয়ে ঝুলিয়ে কিংবা টিউবয়েলের গায়ে নাড়ি পেঁচিয়ে রাখতেন।

গল্পটা চাচা এমন রসিয়ে রসিয়ে বলতেন যে মনে হতো আমরা চোখের সামনে সেই মজার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি! দাদার মুখে নবীজীর মক্কা বিজয়ের গল্প শুনে যে আনন্দ পেতাম, তার চেয়েও বেশি আনন্দ পেতাম চাচার মুখে এই গল্পটা শুনে!

রশিদ খানের বাগেশ্রী শেষ হতেই মেঝের সাথে চেয়ারের পায়ার ঘর্ষণের শব্দ শুনতে পাই। বোধ হয় চেয়ার ছেড়ে উঠছে সবাই, হয়তো সেহেরি খাওয়া শেষ। অল্পক্ষণ পরই মসজিদের মাইক আবার হেঁকে ওঠে, 'সম্মানিত রোজাদার ভাই ও বোনেরা, সেহেরি খাওয়ার সময় শেষ হয়েছে, সেহেরি খাওয়ার সময় শেষ হয়েছে, সেহেরি খাওয়ার সময় শেষ হয়েছে।'

ঘুম আসছে না ব'লে মোবাইলে ইয়োগা মিউজিক ছেড়ে ফেসবুকে ঢুকি। উহ! সেহেরি খাওয়ার ছবিতে ফেসবুকের ওয়াল সয়লাব, বাহারি খাবারের সঙ্গে সেলফি! বাস্তব জগতের সঙ্গে ভার্চুয়াল জগতের নির্যাতনও শুরু হলো! রমজান মাসে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান সকাল-সন্ধ্যায় সেহেরি এবং ইফতারের সময় সাজগোজ ক'রে বাসার কিংবা ইফতার পার্টির নানা পদের খাবারসহ, নিজের, বন্ধুদের এবং পরিবারের লোকজনের ছবি তোলে আর মাসব্যাপী ফেসবুক-টুইটারে পোস্ট করে। ছবির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপশন জুড়ে দেয়; যেমন- 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আরও একটি রোজা পার করলাম', 'বন্ধুর বাসায় ইফতার পার্টিতে', 'শূটিংয়ে ইফতার পার্টিতে', মদিনা সাংস্কৃতিক জোটের ইফতার পার্টিতে আমরা কজন', বখতিয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানীর ইফতার পার্টিতে আমি, 'আবাবিল থিয়েটারের ইফতার পার্টি', 'দুলদুল নৃত্য গোষ্ঠীর ইফতার পার্টি শেষে আমরা' ইত্যাদি। গত কয়েক বছর ধ'রে চালু হয়েছে সেহেরির নতুন সংস্করণ- সেহেরি পার্টি। অনেকেই ইফতারের পর বন্ধু-বান্ধবের বাসায় যায়, সারারাত আড্ডা দেয়, তারপর ভোর বেলা উদ্‌যাপন করে সেহেরি পার্টি। সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে কোনো কোনো রেস্টুরেন্ট; তারা সেহেরির খাবারের আয়োজন করে আর মানুষ বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে মাঝরাতে ঝলমলে পোশাক প'রে, ভারী মেকআপ নিয়ে পিকনিক মুডে যোগ দেয় সেহেরি পার্টিতে। আজ প্রথম রোজা ব'লে সেহেরি পার্টির কোনো ছবি ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি না, প্রথম সেহেরি হয়তো সবাই পরিবারের সাথেই খেতে চায়; তবে দু-চার দিনের মধ্যেই সেহেরি পার্টির ছবি রোশনাই ছড়াবে ফেসবুকে, আর ইফতার পার্টি তো আছেই! মাত্র কয়েক বছর যাবৎ চালু হয়েছে সেহেরি পার্টি, অথচ এরই মধ্যে নাকি এটা সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে! আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে মূল সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এই সব ভুঁইফোঁড় অপসংস্কৃতি!

ব্যক্তিগতভাবে আমি কেবল সেহেরি বা ইফতারি নয়, ফেসবুক-টুইটারে যে কোনো খাবারের ছবি প্রদর্শন করা ভীষণ অপছন্দ করি; এটা আমার কাছে অসভ্যতা মনে হয়। আমার টাকা আছে, আমি বাসায় কিংবা কোনো ভাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভাল খাবার খেতেই পারি, কিন্তু তা মানুষকে দেখাতে হবে কেন! আমি কি খাব সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, দশজনের সামনে জাহির করার বিষয় নয়, যেখানে আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো ভাতই খেতে পায় না! আমার সমাজের কোনো পড়শি হয়তো ভাল খেতে পায় না, আমি কি তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব যে দ্যাখো আমি ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি! ফেসবুকও তো একটি সমাজ। কিন্তু হায় এই স্বাভাবিক শিক্ষা-সহবতটুকু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের নেই, অথচ এরা ধার্মিক!

একজন নায়িকা সেহেরির সেলফি তুলে পোস্ট দিয়েছে, সঙ্গে ক্যাপশন-'সবগুলো রোজা রাখবো ইনশাল্লাহ, আপনারাও রোজা রাখুন'। ভোরবেলাতেও তার মুখে হালকা মেকআপ, ঠোঁটে লিপস্টিক, প্লাক করা চিকন ভ্রু, খোলা চুল বেশ কায়দা ক'রে আঁচড়ানো। যদিও ইসলামে মুখে রঙ মাখা, ভ্রু চাঁছা, পরপুরুষকে চুল দেখানো হারাম! নায়িকা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে নেই, আমার ফ্রেন্ড লিস্টের একজন ধার্মিক পোস্টটায় কমেন্ট করায় পোস্টটা আমার ওয়ালে এসেছে। পেশায় অভিনয়শিল্পী, সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পরপুরুষের সঙ্গে অভিনয় করে, স্বল্পবসন প'রে পরপুরুষের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে রোমশ বক্ষে নিজের স্ফীত স্তন ঠেকিয়ে মুখে যৌন আবেদন ফুটিয়ে নৃত্য-গীত করে, যা সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া বিরোধী কাজ; অথচ সুযোগে সেও মানুষকে রোজা রাখার পরামর্শ দেয় আর মানুষও গদগদ হয়ে তার পোস্টে লাইক-কমেন্ট ক'রে তাকে প্রশংসার বন্যায় ভাসায়! অথচ এখনই কেউ মওলানা আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ অথবা যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর ওয়াজ মাহফিলের স্টিল ফটোগ্রাফির ওপর হাদিস থেকে ক্যাপশন লিখুক-'পানি যেরূপ জমিনে ঘাস উৎপন্ন করে গান-বাজনা তদ্রুপ অন্তরে মুনাফেকী পয়দা করে' অথবা লিখুক-'গান-বাজনা শ্রবণ করা, গান-বাজনার মজলিশে বসা, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো, নর্তন-কুর্দ্দন করা সবই হারাম, যে ব্যক্তি এগুলোকে হালাল মনে করবে সে ব্যক্তি কাফির'; লিখে পোস্ট দিক ফেসবুকে, এখন যারা নায়িকার ছবিতে লাইক-কমেন্ট করেছে তাদের অনেকেই নেকি হাসিলের জন্য রাজ্জাক কিংবা সাঈদীর ছবিতে লাইক-কমেন্ট ক'রে সহি মুসলমানিত্ব ঝালাই ক'রে নেবে! এই দ্বিচারিতা অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের চরিত্রে প্রকট।

রমজান মাস এলেই এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য প্রকট হ'য়ে ওঠে এবং তা রীতিমতো বিরক্তির পর্যায়ে চ'লে যায়। দেশের কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক, সংগীতশিল্পী, চিত্রকর, নারী নেত্রী, খেলোয়াড়, সরকারি-বেসরকারী কর্মজীবি নারী-পুরুষ, রাজনীতিক, ঘুষখোর পুলিশ-র‍্যাব-মিলিটারি, মুদি দোকানদার, রিক্সওয়ালা, মদ্যপ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, মজুতদার, ধর্ষক ইত্যাদিসহ কে নেই এই দলে! আর এখন এদের ধর্মপরায়ণতা জাহির করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক-টুইটার। যে কোনোদিন কোরান-হাদিস পড়ে নি,

সারাবছর বেশরিয়তী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, পুরো রমজানে দুটো-তিনটে রোজা রাখে কি না রাখে, এই ফেসবুকের যুগে সেও সেহেরি, ইফতার, ঈদের জামায়তে সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট ক'রে তার সহি মুসলমানিত্ব জাহির করে সমাজের মানুষের কাছে! আর কোরবানী ঈদে তো আরো এক ধাপ এগিয়ে, গরু-ছাগলের সঙ্গে সেলফি তুলে ফেসবুক-টুইটারে পোস্ট করার হিড়িক প'ড়ে যায়! নানান ভঙ্গিমার বাহারি সে-সব ছবি; কেউ গরু-ছাগলের পিঠে হাত বুলাচ্ছে, কেউ ঘাস কিংবা খড় খাওয়াচ্ছে ইত্যাদি। দেখে মনে হয় যেন, আহা, পশুর প্রতি এদের কতো প্রেম! অথচ ঈদের দিন সকালবেলার বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে পশুর পীড়িত আর্তনাদে, অবলা পশুর রক্তে ভেসে যায় অলি-গলি। আর ধার্মিকেরা সেই রক্তমাখা বীভৎস ছবি পুনরায় পোস্ট করে ফেসবুক-টুইটারে।

সেলফি তুলে এবেলা-ওবেলা ফেসবুক-টুইটারে পোস্ট করা মুমিন মুসলমানের একটা বড় অংশ জানেও না যে ছবি আঁকা-ছবি তোলা ইসলামে হারাম, আবার অনেকে জেনেও অমান্য করে। অনেক ধার্মিক চিত্রকরকেও ফেসবুক-টুইটারে তার ধর্মপরাণতার বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যায়। অথচ হাদিসে বলা আছে- '(কিয়মতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি বানায়।" [সহীহ বুখারী, নবম খণ্ড, হাদিস নং ৫৫২৬-ইফা]

আরো বলা আছে- 'হাশরের দিন সর্বাধিক আজাবে আক্রান্ত হবে তারাই, যারা কোনো প্রাণির ছবি তোলে অথবা আঁকে।' (সহীহ বুখারী: ৫/২২২২)

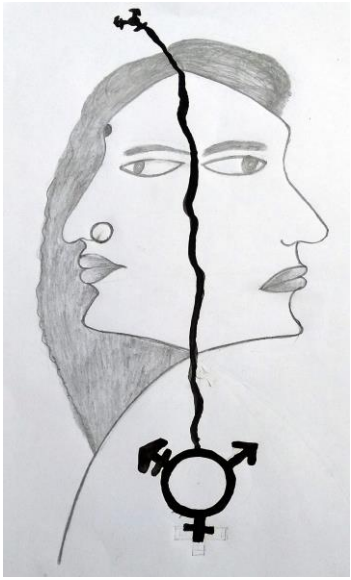
আসলে ইসলাম এতোটাই অকার্যকর, অবৈজ্ঞানিক এবং অশৈল্পিক ধর্ম যে কোরান-হাদিসের কথা মেনে জীবনযাপন করা অসম্ভব, কোরান-হাদিস অনুসরণ ক'রে জীবন-যাপন করতে গেলে হয় মরুভূমিতে ঘর বেঁধে থাকতে হবে নয়তো বনে বাস করতে হবে। এটা বুঝেই আধুনিক কালের মওলানা কিংবা মুফতিরা কোরান-হাদিসের কোনো কোনো আয়াতের নতুন ব্যাখ্যা এবং ফতোয়া দেয়। যেমন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান আল্লামা মুফতি আবুল কাসেম নোমানী তার ফতোয়া দেন, 'পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরির মতো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ইসলামে ছবি তোলা হারাম।'

তারপরও মুমিন মুসলমানদেরকে আমরা এই হারাম কাজটি হরহামেশা-ই করতে দেখি! 'নাস্তিক ব্লগাররা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে লেখালেখি করে' 'মুক্তমনারা ইসলামকে অবমাননা করে'; এসব ব'লে ব'লে মুমিন মুসলমানরা মুখে ফেনা তুলে ফেলে, অথচ যাপিত জীবনে প্রতিদিন-প্রতিমুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ইসলাম অবমাননা করে এইসব মুমিন মুসলমানরই! বস্তুত আজকের দিনে জঙ্গিরা ব্যতিত কেউ-ই প্রকৃত মুসলমান নয়। এমনকি ইমাম-খতিব-মওলানারাও নয়, কেননা এদেরকেও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে আপোস ক'রে চলতে হয়।

স্ক্রল ক'রে নিচে নামতে নামতে শাশ্বতীদির একটা পোস্ট চোখে পড়ে, শাশ্বতীদি তার ব্লগের পোস্ট শেয়ার দিয়েছে। কমেন্ট বক্সে কেউ কেউ শাশ্বতীদির লেখার প্রশংসা করেছে, আর যথারীতি আছে কিছু মুমিন বান্দার অশ্লীল গালিগালাজ। এই মুমিন বান্দারা যুক্তির ধারে-কাছেও নেই, কিন্তু গালাগালিতে তুখোর! মুমিনরা বোধ হয় সারাক্ষণ মগজের কোষে লিঙ্গ ব'য়ে বেড়ায়, কেননা তাদের অধিকাংশ গালাগালি-ই লিঙ্গ সম্পর্কিত; বিরোধী মতাদর্শের সব নারীদেরকে হয়তোবা ওরা গণিমতের মাল ভাবে! শাশ্বতীদির অতি নিরীহ পোস্টেও মুমিনদের গালি থাকে, কে জানে মুমিনরা গালি দিয়ে কী সুখ পায়! নাকি ভিন্নমতাদর্শীদের গালিগালাজ করাতেও সোয়াব আছে, কী জানি!

শাশ্বতীদি মুক্ত চিন্তক, পরিচ্ছন্ন চিন্তার মানুষ; তার লেখার মুগ্ধ পাঠক আমি। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের মতো সমাজের কাছে ভাল থাকার জন্য নিজের বিশ্বাসকে বোরকাবৃত ক'রে রাখে না সে। যা বিশ্বাস করে, অকপটে তা-ই বলে; কালোকে কালো, ভালকে ভাল বলে। আমার মতোই তারও বিশ্বাস, শরীরে বোরকা পরা মানুষের চেয়ে নিজের বিশ্বাসে বোরকা পরানো মানুষগুলোও প্রগতির জন্য কম ক্ষতিকর নয়; কারণ শরীরে বোরকা পরা মানুষ দেখলেই আমরা তার বিশ্বাস-দর্শন সম্পর্কে একটা ধারণা পাই, সব জায়গায় তারা একই রকম; কিন্তু বিশ্বাসে বোরকা পরানো মানুষের তল খুঁজে পাওয়া কঠিন, তারা একেক জায়গায় একেক রকম!

সংগ্রামে ভরা জীবন শাশ্বতীদির। সত্য এবং নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে সমাজ আর পরিবারের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ানোর এক আদর্শ চরিত্র। ঘুম যেহেতু আসছেই না, লেখাটা পড়েই ফেলি। ক্লিক ক'রে ওর ব্লগে ঢুকে পড়তে শুরু করি।



# জন্মান্তরঃ পর্ব-এক

রতিক্লান্ত দেহে আমার বর এখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে তার ভাঁজ করা ডান হাত আমার বুকের ওপর দিয়ে বাঁ-কাঁধের কাছে আর দ আকৃতির ডান পা দুই ঊরু ও তলপেটের ওপর রেখে; তার নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গলার ডানদিকে, ডান গালেও। আমরা দু'জনই নগ্ন! এই যে আমার বর নগ্ন হয়ে তার ডান হাত আর ডান পায়ের ভর রেখেছে আমার শরীরের ওপর, আমার শরীরের সাথে লেপটে সে দিব্যি ঘুমোচ্ছে, এই অভিজ্ঞতা আমার আজই প্রথম নয়; অনেক রাত আমরা এভাবে পার করেছি। তবু আমার মনে হচ্ছে আজই প্রথম, আজই প্রথম আমি বরের স্পর্শ সুখ পাচ্ছি; আজই প্রথম আমার জীবন পূর্ণতা পেয়েছে, নারী জীবন! কি যে সুখ অনুভূত হচ্ছে, কি যে ভাল লাগছে, কি যে আনন্দের হড়কা বান বইছে আমার হৃদ চরাচরে, সেই অনুভূতি কখনোই আমি শব্দে শব্দে লিখে বা মুখে ব'লে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারবো না কারো কাছে; এমনকি আমার বরের কাছেও নয়। এই সুখ, ভাললাগা, আনন্দের অনুভূতি অব্যক্ত; সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবার পরও হৃদয়ের কোটরে কিছু গোপন থেকেই যায় যা কারো কাছে ব্যক্ত করা যায় না, এই অনুভূতির কোনো শরিক হয় না। কোনো শব্দেই গাঁথা যায় না এই সুখানুভূতির মালা, কোনো উপমাতেই স্পর্শ করা যায় না এই সুখানুভূতির নিগূঢ় নিগদ, কোনো ভাষায়ই অনুবাদ করা যায় না এই সুখানুভূতির পংক্তিমালা; এ এক অপার সুখের অলিখিত বিমূর্ত সুখকাব্য, যার রসাস্বাদন কেবল নিজেই করা যায়, তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যায়! এই অতুল আনন্দে, বিপুল সুখে ঘুম আসছে না আমার। এখন রাত কতো? দুটো তো হবেই। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামছে, আষাঢ়ে বৃষ্টি।

মহল্লায় কোনো সাড়াশব্দ নেই, সারা মহল্লার মানুষ এখন হয়তো ঘুমোচ্ছে; আমি-ই কেবল জেগে জেগে হাবুডুবু খাচ্ছি অথৈ সুখের ভাবালুতায়। মনে হচ্ছে রাত দীর্ঘ হোক, এমনি ক'রে অঝোর ধারায় কামুক বৃষ্টি নেমে ভেজাক মাটির জরায়ু, যাতে আমি দীর্ঘ সময়ব্যাপী একা একা এই সুখ উদযাপন করতে পারি!

আজ আমার কতো কিছু মনে পড়ছে; শৈশব-বাল্য-কৈশোরের কথা, বাবা-মায়ের কথা, স্কুলের বন্ধুদের কথা, পাড়া-পড়শি এবং আত্মীয়-স্বজনের কথা। মনে পড়ছে সেইসব অপমান, অবহেলা, দুঃখগাঁথা দিনগুলোর কথা। আজকের এমন সুখের রাতে সেইসব কথা মনে করতে চাইনে যা আমার জন্য মোটেও সুখকর নয়, তবু মনে পড়ছে। তা ব'লে সেইসব দুঃখগাঁথা দিনের কথা মনে ক'রে আমি আজকের এই সুখের রাতে এই ভেবে কাঁদতে বসবো না যে আহা, কতো অশ্রু দিয়েই না আমি কিনেছি এই সুখ; সেইসব দিনের কথা স্মৃতিতে উথলে উঠবে আর আমি আনন্দ অশ্রু বিসর্জন ক'রে বুক ভাসাবো, বালিশ ভেজাবো, বরের গা ভেজাবো; অমন মেয়েই আমি নই। কান্নার দিন আমি অনেক পিছনে ফেলে এসেছি, এখন কেবল হাসবো। হাসবো আর তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবো জীবন, আহা নারী জীবন!

আমি জানি যে আমার এই সুখের জীবন আরো সুখের হতে পারে যদি সমাজের মানুষের হাতে হাত ধ'রে, পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলতে পারি। কিন্তু সেই সৌভাগ্য কি এই পোড়া দেশে আমার হবে! সমাজের কেউ কেউ কাঁকর বিছিয়ে রাখবে আমার পথে, এখন যেমন রাখে; বাক্যবাণ নিক্ষেপ ক'রে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইবে, এখন যেমন করে। তবু এই বিরূপ সমাজের ভেতর থেকেই যে অল্প ক'জনকে সঙ্গে পাব তাদের হাত ধরেই আমি এগিয়ে যাব ভবিষ্যতের পথে। যাত্রাপথে কিছু লোক গায়ে হুল ফুটালে, পায়ে কামড় দিলে তা আমি আমলে নেব না। এরা মহাকালের কাঁকড়া-বিছা জাতীয়; অতীতে ছিল, এখনো আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের জন্য মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা কোনোকালে থেমে থাকেনি, ভবিষ্যতেও থেমে থাকবে না।

আজ আমার মনে পড়ছে তুলিভাবীর কথা। বেচারি তুলিভাবী! অমন ভরপুর যৌবন, কিন্তু বর ইংল্যান্ডে থাকায় তার যৌবন গুমরে কাঁদতো দেহের অন্দরে একলা ঘরে। বাড়িতে ছিল কেবল শাশুড়ি আর শ্বশুর। আমাদের বাড়ি আর ভাবীদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি; ফরিদপুর শহরের শেষ প্রান্তের দিকে, যেখান থেকে শুরু ফসলের উন্মুক্ত মাঠ আর মাঠের পরে গ্রাম। যার ফলে আমরা গ্রাম আর শহরের মিশ্র স্বাদ পেতাম। আজ থেকে পনের বছর আগের কথা, আধুনিকতার ছোঁয়ায় এতোদিনে নিশ্চয় আমাদের পাড়াটা বদলে গেছে; হয়তো বদলে গেছে মানুষও। তখন আমাদের পাড়ায় তো আমরা সবাই সবাইকে চিনতাম, এমনকি ভাড়াটিয়াদেরকেও।

ভাবী তখন বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী, তার শরীরে উছলে পড়া যৌবন; যৌবন ভরা শরীরে নতুন স্বাদ আর লোভ জাগিয়ে তার বর ইকবাল ভাই ফিরে গেছেন ইংল্যান্ডে, এদিকে সে তো যৌবন যাতনায় অধীর চঞ্চল! ভাবীর শ্বশুরের নাম সিরাজুল ইসলাম, আমরা সিরাজ চাচা ব'লে ডাকতাম। সিরাজ চাচা, চাচী আর ভাবীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। এ-বাড়ির ভাত-তরকারি ও-বাড়িতে যেতো, ও-বাড়ির ভাত-তরকারি এ-বাড়িতে আসতো। যেহেতু ইকবাল ভাই থাকতো বিদেশে, আর সিরাজ চাচা এবং চাচী খুব বৃদ্ধ নয় ব'লে তাদের সেবাযত্নেও অতিরিক্ত সময় ব্যয় হতো না, ফলে সংসারের টুকিটাকি কাজ সামলেও অনেক অবসর পেতো ভাবী। তাই যখন-তখন আমাদের বাসায় আসতো সে, মা এবং আমার বড় দুই আপুর সঙ্গে গল্প ক'রে আর লুডু খেলে সময় কাটাতো। আমি তখন আঠারোয় পা দিয়েছি, মাঝে মধ্যে আমিও লুডু খেলতাম তাদের সঙ্গে। এই তুলিভাবীর সঙ্গেই আমার প্রথম যৌন সম্পর্ক!

মহাভারতে একটা গল্প আছে। ওই যে যুদ্ধ শেষের কুরুক্ষেত্রে ওঘবতী নদীর তীরে পিতামহ ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পিতামহ, স্ত্রী-পুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শসুখ অধিক হয়?'

এই প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন–

'ভঙ্গাস্বন নামে একজন ধার্মিক রাজর্ষি পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ ক'রে শতপুত্র লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিরই স্তুতি করা হতো, এজন্য বরাবরের ঈর্ষাকাতর ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজর্ষির অনিষ্ট করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। একদিন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গেলে ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে তাকে বিমোহিত করলেন। ভঙ্গাস্বন দিগ্‌ভ্রান্ত, শ্রান্ত এবং পিপাসার্ত হ'য়ে অরণ্যে ঘুরতে লাগলেন, ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে তিনি প্রথমে তার অশ্বকে জল পান করালেন। তারপর নিজে সরোবরে অবগাহন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-রূপ পেলেন। নিজের এই আকর্ষিক রূপান্তর দেখে বিস্মিত, লজ্জিত ও চিন্তিত ভঙ্গাস্বন তখনই অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহন ক'রে রাজপুরীতে ফিরলেন। তাকে দেখে তার পত্নী-পুত্রগণ এবং রাজপুরীর অন্যান্যরা চিনতে না পারলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সকল বৃত্তান্ত সবাইকে জানালেন। এরপর তিনি তার পুত্রদেরকে ডেকে বললেন, "আমি বনে চ'লে যাব, তোমরা সকলে একত্র থেকে সৎভাবে রাজ্য ভোগ করো।"

পুত্রদের হাতে রাজ্য সমর্পন ক'রে স্ত্রী-রূপী ভঙ্গাস্বন রাজ্য ত্যাগ ক'রে অরণ্যে গিয়ে এক তপস্বীর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কালক্রমে সেই তপস্বীর ঔরসে ভঙ্গাস্বনের গর্ভে একশ পুত্রের জন্ম হলো। একদিন তিনি তার এই শতপুত্রকে নিয়ে রাজপুরীতে গিয়ে পূর্বজাত শতপুত্রকে বললেন, "তোমরা আমার পুরুষ অবস্থার ঔরসজাত পুত্র, আর এরা আমার নারী অবস্থার গর্ভজাত পুত্র। তোমরা তোমাদের এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রাজ্যভোগ করো।"

ভঙ্গাস্বনের আদেশ অনুসারে তার দুইশত পুত্র একত্রে মহানন্দে রাজ্য ভোগ করতে লাগলো। তাদের সুখ-শান্তি দুষ্ট ইন্দ্রের সহ্য হলো না; ইন্দ্র ভাবলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাসনের

অপকার করতে গিয়ে উল্টো উপকারই করেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ ক'রে রাজপুরীতে গিয়ে ভঙ্গাসনের ঔরসজাত পুত্রদের বললেন, "যারা এক পিতার পুত্র তাদের মধ্যেও সৌভ্রাত্র থাকে না; কশ্যপের পুত্র সুর এবং অসুরগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তোমরা রাজর্ষি ভঙ্গাসনের ঔরসজাত পুত্র আর ওরা একজন অরণ্যচারী তপস্বীর ঔরসজাত পুত্র; এই পৈত্রিক রাজ্য ভোগ করার অধিকার কেবল তোমাদের, ওরা তোমাদের পৈত্রিক রাজ্য ভোগ করছে কেন?"

ইন্দ্র কু-বুদ্ধি দেবার পর ভঙ্গাসনের উভয় পক্ষের পুত্রদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো, তারা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনষ্ট করলো। পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন মুষড়ে পড়লেন। তখন ইন্দ্র তার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে আহ্বান না ক'রে অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করেছিলে, সেজন্য আমি রুষ্ট হ'য়ে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি।"

ভঙ্গাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ইন্দ্র প্রসন্ন হলেন। বললেন, "আমি তুষ্ট হয়েছি; বলো, তুমি তোমার কোন পুত্রদের পুনর্জীবন চাও-তোমার ঔরসজাত পুত্রদের, না গর্ভজাত পুত্রদের?"

তপস্বিনীবেশী ভঙ্গাস্বন তখন কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বললেন, "আমি আমার স্ত্রী অবস্থার গর্ভজাত সন্তানদের পুনর্জীবন চাই।"

ইন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে বললেন, "তোমার গর্ভজাত পুত্ররা ঔরসজাত পুত্রদের চেয়ে বেশি প্রিয় হলো কেন?"

ভঙ্গাস্বন বললেন, "দেবরাজ, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক স্নেহময়ী, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর স্নেহ-ই প্রবল।"

ইন্দ্র প্রীত হ'য়ে বললেন, "সত্যবাদিনী, আমার বরে তোমার সকল পুত্রই জীবিত হোক। এখন তুমি বলো, পুরুষত্ব না স্ত্রীত্ব চাও তুমি?"

ভগ্নাস্বন বললেন, "আমি স্ত্রী-রূপেই থাকতে চাই।"

ইন্দ্র আরো বিস্মিত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "দেবরাজ, স্ত্রী-পুরুষের মিলনকালে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর-ই অধিক সুখলাভ হয়, আমি স্ত্রী-রূপেই তুষ্ট আছি।"

ইন্দ্র তার ইচ্ছাপূরণ ক'রে বিদায় নিলেন।'

আমি একালের ভঙ্গাস্বন। তবে দুষ্টু দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা অন্য কোনো দেবতা আমার রূপান্তর ঘটায়নি; প্রকৃতিই আমার ভেতরে বপন ক'রে রেখেছিল নারীত্বের বীজ, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। প্রকৃতিই আমার মনের ভেতরে নারীত্বের বিস্তার ঘটিয়েছে, আর আমার শরীরের রূপান্তর ঘটিয়েছে শল্য চিকিৎসক। আমার লিঙ্গ রূপান্তরের কথা শুনে কেউ কেউ আমাকে শয়তান কিংবা ডাইনি বলতে শুরু করেছে, কেউ বলছে এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, পুরুষমানুষ আবার নারী হয় নাকি? এদেরকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে হয়, পুরুষ নারী আর নারীও পুরুষ হয়, যদি প্রকৃতি পুরুষের ভেতর

নারীত্বের আর নারীর ভেতর পুরুষত্বের বীজ বপন ক'রে রাখে; যেমনি আমার ভেতরে বপন করা ছিল নারীত্বের বীজ।

শুধু কি মানুষ, প্রাণিজগতের আর কোনো প্রাণির মধ্যে এমন রূপান্তর ঘটে না? নিশ্চয় ঘটে, প্রাণিজগতের আরো অনেক প্রাণির মধ্যে নিশ্চয় এমন রূপান্তরের ঘটনা ঘটে। এতোবড় পৃথিবীতে অগণিত প্রাণির বাস; নিশ্চয় প্রতি মুহূর্তে বিবর্তন ঘটছে, প্রতি মুহূর্তে বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে এই পৃথিবী; আমরা তার কতোটুকুই বা জানতে পারি! তবু বিজ্ঞানের কল্যাণে, বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে মাঝে মাঝেই আমরা এমন কিছু ঘটনা জানতে পারি, যে ঘটনার কথা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করি নি, যে ঘটনা আমাদের পরিচিত প্রাণিদের মধ্যে আমরা কখনো ঘটতে দেখি নি। ফলে এই অদেখা-অজানা ব্যাপারটা কারো কারো কাছে অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ মনে হলেও আদতে তা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। উত্তর আমেরিকার ক্লিনার ফিশের কথাই ধরা যাক, এই মাছের মধ্যে রূপান্তরকামীতার প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম খধনড়ৎরফবং উরসরফরধঃং. এই প্রজাতির পুরুষ মাছ একসঙ্গে পাঁচ থেকে দশটা স্ত্রী মাছের সঙ্গে থাকে এবং যৌনাচার করে। এটা কিন্তু মানুষের মতোই স্বাভাবিক। আমরা জানি যে শ্রীকৃষ্ণের একাধিক স্ত্রী এবং অসংখ্য সখি ছিল; হযরত মুহাম্মদের তেরো স্ত্রী এবং গণিমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত একাধিক যৌনদাসী ছিল; আগের দিনের রাজা-বাদশাহ এবং পুরোহিতগণ ডজন ডজন স্ত্রী এবং যৌনদাসী রাখতেন; এখনো সৌদি আরবের বাদশাহ এবং বনেদীদের বিবির বহরের কথা আমরা জানি; আর আজকাল আমাদের দেশের অনেক সামর্থবান মানুষও সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা ক'রে ঘরে এক পত্নী রাখলেও অন্যত্র একাধিক গোপন উপপত্নী রাখেন!

ক্লিনার ফিশ প্রজাতিতে একই সঙ্গে পাঁচ থেকে দশটা স্ত্রী মাছের মধ্যমণি হয়ে থাকা পুরুষ মাছটির হঠাৎ মৃত্যু হ'লে স্ত্রী মাছগুলোর ভেতর থেকে যেকোনো একটা মাছ বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হোক অথবা প্রভাব খাটিয়েই হোক দলের অন্য স্ত্রী মাছগুলোর দায়িত্ব নেয়। আর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ক্রমে ক্রমে ওই স্ত্রী মাছটির দৈহিক পরিবর্তন হতে থাকে; মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যেই তার গর্ভাশয়ে ডিম্বানু উৎপন্ন বন্ধ হয় এবং নতুন পুরুষাঙ্গ গজিয়ে সে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে যায়।

রূপান্তরের উদাহরণ আরো আছে। উত্তর আমেরিকার সমুদ্র উপকূলে অঃষধহঃরপ ঝষরঢ়ঢ়বৎ ঝযবষষ নামে এক প্রজাতির ক্ষুদ্র প্রাণির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা; যার বৈজ্ঞানিক নাম Crepidula Formicata। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়, ঘুরতে ঘুরতে কোনো স্ত্রীর সংস্পর্শে এলে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়; যৌন সঙ্গমের পর পরই পুরুষটির পুরুষাঙ্গ খসে পড়ে এবং সে স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়, রূপান্তরের পর এরা আর একা একা ঘুরে বেড়ায় না, স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে।

এই যে দুটি প্রজাতির একটির স্ত্রী পুরুষে এবং অপরটির পুরুষ স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়, এটা কী প্রকৃতিবিরুদ্ধ? এই দুই প্রজাতির স্ত্রী বা পুরুষের তো এই রূপান্তরে কোনো হাত নেই, প্রকৃতির নিয়মে আপনা-আপনিই এরা রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীতে নিশ্চয় এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে যা এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। তার মানে রূপান্তরকামিতা প্রকৃতির স্বাভাবিক একটি ঘটনা।

অথচ মোল্লা-পুরোহিতরা তো বটেই, সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ থেকে শুরু ক'রে আজকের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষিত প্রজন্মের বেশিরভাগ মানুষই রূপান্তরকামিতাকে আখ্যা দেয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং দৈহিক বিকৃতি ব'লে। প্রকৃতিতে উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও এরা বলে, 'ওসব তো আল্লাহ বা ভগবানের ইচ্ছায় এমনিতেই হয়েছে। আর মানুষ তো শল্য চিকিৎসা করিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের শরীরের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। আল্লাহ যেভাবে পাঠিয়েছে সেভাবেই থাকা উচিত; খোদার ওপর খোদগারি করার দরকার কী!'

কী আশ্চর্য! শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে রূপান্তরকামিতা যদি খোদার ওপর খোদগারি হয়, তবে তো খৎনা করাও খোদার ওপর খোদগারি! আল্লাহ-ই যদি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকবে তো তিনি নিশ্চয় মানুষকে অপূর্ণাঙ্গভাবে পাঠান নি, যার যেখানে যতোটুকু প্রয়োজন নিশ্চয় ততোটুকু দিয়েই তিনি পাঠিয়েছেন। সেই হিসেবে পুরুষ এবং নারীর যৌনাঙ্গ সৃষ্টিতেও তিনি কোনো অপূর্ণতা রাখেন নি। তাহলে ইহুদিদের রীতি গ্রহণ ক'রে মুসলিম পুরুষরা কেন তাদের পুরুষাঙ্গের বাড়তি চামড়াটুকু কেটে ফেলে? নিশ্চয়-ই ওই চামড়াটুকুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন বলেই আল্লাহ চামড়াটুকু দিয়েছেন! খৎনা ক'রে চামড়া কেটে ফেলা কি খোদার ওপর খোদগারি নয়? আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের মুসলিম নারীদেরকেও খৎনা করা হয়, নিশ্চয় তাও খোদার ওপর খোদগারি! মুসলমানদের দেহে যেকোনো ধরনের অস্ত্রপাচার করাও নিশ্চয় খোদার ওপর খোদগারি; কারণ সৃষ্টি যখন আল্লাহ্ করেছেন, রোগও নিশ্চয় তিনি-ই দেন!

যাকগে, আমি তুলিভাবীকে পছন্দ করতাম তার হাসিখুশি চেহারা এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য। সহজেই সে সবার সাথে মিশতে পারতো, সবাইকে আপন ক'রে নিতে পারতো। তখন বর্ষাকাল মাস; সবে আমি ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছি। শুক্রবার দুপুরবেলা; নামাজ পড়তে যাব না শুনে আব্বা গজগজ করতে করতে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে আমি ঘর থেকে বেরোলাম আমাদের গলির মোড়ের দোকানের উদ্দেশে। ভাবীদের বাড়ির সদর গেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, জানালা দিয়ে আমাকে দেখে ভাবী বললো, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'সুবলদার দোকানে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'এমনিতেই, কোনো কাজ নেই।'

'সেমাই রান্না করেছি, খেয়ে যাও।'

এটা আমার জন্য নতুন কিছু নয়, ভাল কিছু রান্না করলে ভাবী আর চাচী হরহামেশাই আমাকে খেতে ডাকতো। ভাবী এসে গেট খুলে দিলো, আমি মহানন্দে ভাবীর পিছন পিছন চললাম সেমাই খেতে। এ-বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত। ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারে বসলাম, ভাবী গেল আমার জন্য সেমাই আনতে। অল্পক্ষণ পরই ছোট্ট মেলামাইনের বাটিতে একবাটি সেমাই আর চামচ এনে আমার হাতে দিয়ে ভাবী বসলো চেয়ার লাগোয়া বিছানায়। আমি খেতে খেতে বললাম, 'চাচী কই?'

'বাবা আর মা আজ সকালে ঢাকায় গেছে, বেলা আপার পেটের টিউমার অপারেশান হবে আগামীকাল।'

বেলা আপা, মানে সিরাজ চাচার ছোট মেয়ে; ভাবীর ননদ।

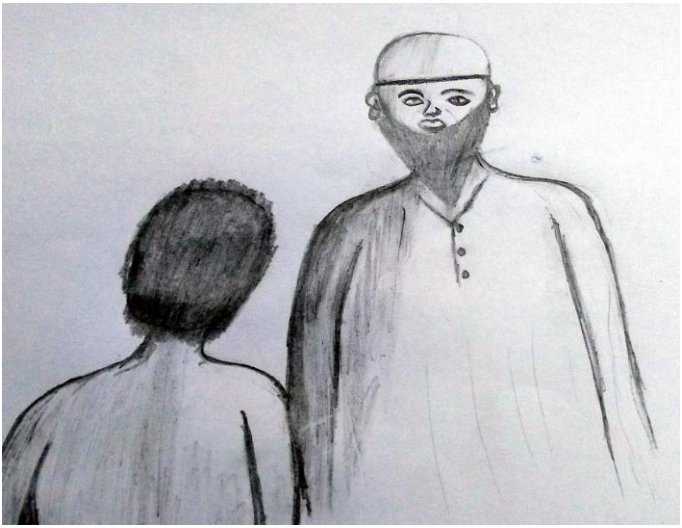
বললাম, 'কবে আসবে?'

'বাবা পরশুদিনই চ'লে আসবেন, কিন্তু মা থাকবেন আরো কিছুদিন।'

ভাবীর রান্নার হাত দারুণ! হোক তা সেমাই, মাছ কিংবা মাংস; যা রান্না করে তাই যেন অমৃত! আমি তৃপ্তির সঙ্গে সেমাই খেতে থাকলে ভাবী আদর ক'রে আমার মাথার চুলে-কাঁধে আঙুলের স্পর্শ বুলাতে লাগলো। ভাবীর এই আদুরে স্পর্শও নতুন কিছু নয়; মা আর আপুদের সামনেও ভাবী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো, পিঠ চাপড়ে দিতো, লুডু খেলতে খেলতে বা অন্য কোনো উপলক্ষ্য পেলে আদর ক'রে গাল-নাক টিপে ধরতো!

সেমাই খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, জল খেয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলাম। ভাবীও আমার এঁটো বাটি রান্নাঘরে রেখে এসে আবার আগের জায়গায় বসলো। আমার লেখাপড়া, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে করতে ভাবী একইভাবে আমাকে আদর করতে লাগলো। আমার হাতটি তার কোলের ওপর নিয়ে টিপতে লাগলো। এরপর আমার হাতটি নিয়ে তার মুখে ঘষতে ঘষতে হঠাৎ নরম স্তনে চেপে ধরলো। আমি ভয় পেয়ে বেশ জোরেই বললাম, 'ভাবী, একি করছো!'

'চুপ....!' পুকুরের জলে খসে পড়া গাছের পাতার মতো নীরবে ভাবীর ডানহাতের তিনটি আঙুল স্পর্শ করলো আমার ঠোঁট।



আজ ক্লাস না থাকায় একটু দেরিতেই ঘুম থেকে উঠি। মশারিটা খুলে বিছানা গুছিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে বাথরুমে যাই। আমার বাথরুমটা অ্যাটাচড হওয়ায় বেশ সুবিধা হয়েছে, ঘনঘন সবার সামনে পড়তে হয় না। বাথরুম থেকে বের হতেই বাবার রাগী কণ্ঠস্বর কানে আসে। রাগটা কী আমার ওপর? আমার এই হয়েছে এক সমস্যা, আজকাল বাসায় কেউ একটু রেগে জোরে কথা বললে প্রথমেই আমার মনে হয় যে আমাকে নিয়ে কিছু বলছে! আমি বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে কান পাতি, না, কথাগুলো আমার উদ্দেশে নয়; সরকার আর অসাধু ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে। কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি যে বাবা বাজারে গিয়েছিলেন আর দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া দাম দেখে চটে গেছেন সরকার এবং ব্যবসায়ীদের ওপর। এটা নতুন কিছু নয়, পুরনো চিত্র। প্রত্যেক বছর রোজা এলেই ব্যবসায়ীরা চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতার কথা ব'লে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। সরকারের মন্ত্রীরা সিংহের মতো হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, 'পণ্যদ্রব্যের কোনো ঘাটতি নেই। দাম বাড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই কথাটা এখন কৌতুকের পর্যায়ে চ'লে গেছে। বছর বছর সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী এই একই রেকর্ড বাজান, কিন্তু যথারীতি বাজার থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে!

'গেল সপ্তায় ত্রিশটাকা কেজি শসা কিনলাম, সেই একই শসা আজ কিনতে হলো একশো কুড়ি টাকা দিয়ে! চিনি ছিল আটচল্লিশ টাকা কেজি, আজকে আনলাম পঁয়ষট্টি

টাকায়। বেগুন তো আগুন! এমন কোনো একটা জিনিস নাই বাজারে যার দাম বাড়ে নাই। হারাম রোজগার করতে এদের বিবেকে একটুও বাধে না, ইবলিশের দল সব!'

আমি কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবার সংক্ষুব্ধ কথাগুলো শুনি, তারপর হাতের গামছাখানা বারান্দার তারে রেখে দরজা খুলে বের হই। বাবা বাজার থেকে ফিরে ডাইনিংয়ের চেয়ারে ব'সে আছেন আর মা রান্নাঘরের প্রবেশ পথে বসে ব্যাগের ভেতর থেকে একে একে বের করছেন অতিমূল্যে কেনা দ্রব্যসামগ্রী। বাবার গায়ে একটা সাদা-কালো চেক শার্ট, পরনে প্যান্ট; মাথায় বোধহয় টুপি ছিল, টুপিটা এখন টেবিলের ওপর। আমি বাবার মুখাবয়ব ভালমতো লক্ষ্য করি, কপাল আর দাড়ির ওপরের অনাবৃত চোয়াল ঘামে স্যাঁতসেতে এবং লাল হয়ে আছে। সত্যিকারের রাগ হ'লে তার মুখ এমন রক্তাভ হয়। আমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে সোফায় ব'সে পত্রিকা হাতে নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ রাখি, আজকের সংবাদ শিরোনামেও–ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য। খবরটা পড়তে শুরু করি, পাতা উল্টে দ্বিতীয় পাতার বাকি অংশও পড়ি। অনেক বড় প্রতিবেদন। কাঁচামরিচ থেকে শুরু ক'রে গরুর মাংস, এহেন জিনিস নেই যার দাম বাড়ে নি। সরকার গরুর মাংসের দাম নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে, তারপরও নির্ধারিত দামের চেয়েও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হচ্ছে ক্রেতাকে। সরকার কর্তৃক দাম নির্ধারিত পণ্যেরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য পণ্যের দাম যে আরো লাগামছাড়া হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে এমন অনৈতিক বাণিজ্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় কিনা আমি জানি না। অবশ্য সারাবছরই অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছে মতো পণ্যের দাম বাড়ায়-কমায়। আমি সেই বাল্যকাল থেকেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ শুনে আসছি। বরাবরই বাজারের ওপর কোনো সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। চাহিদার চেয়ে অধিক পণ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ক'রে পণ্যের দাম বাড়ানো হয়, কিন্তু সরকারের কর্তাব্যক্তিরা নীরব; কেননা এই রমজানকে কেন্দ্র ক'রে মজুদদার-ব্যবসায়ীরা যে বাড়তি মুনাফা অর্জন করে তার একটা অংশ যায় সরকারের ধার্মিক কর্তাব্যক্তিদের পকেটে। এই যে অসাধু ব্যবসায়ী এবং সরকারের কর্তাব্যক্তি, উভয় শ্রেণির অধিকাংশের কপালেই কিন্তু নামাজ পড়ার সহি দাগ বিদ্যমান!

সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন পণ্যের বাজার বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদনটি পড়তে পড়তে আমার হঠাৎ মনে পড়ে সুলতানি আমলের শাসক আলাউদ্দিন খলজীর কথা। ১২৯৬-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতে মুসলিম শাসকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরম্পরা অনুযায়ী তিনিও ছিলেন নিষ্ঠুর, নৃশংস, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, সাম্রাজ্যলোভী। তার পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য সুলতান জালালউদ্দিনের স্নেহ-ভালবাসায় বেড়ে উঠলেও সাম্রাজ্যলোভী আলাউদ্দিন সেই পিতৃব্যকে হত্যা করেই ১২৯৬ সালে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। একের পর এক রাজ্য আক্রমণ এবং নগর ধ্বংস ক'রে নিজের সাম্রাজ্য বাড়ান। তবে বেশ কিছু পদক্ষেপের কারণে তিনি তার পূর্বাপর অন্যান্য শাসকের চেয়ে ব্যতিক্রম এবং কৌশলী শাসক হিসেবে পরিচিত, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পদক্ষেপ হলো তার বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রচণ্ড স্বৈরশাসক হওয়া সত্ত্বেও প্রজাসাধারণ তার

শাসনে অনেকটাই সন্তুষ্ট ছিল এজন্য যে তিনি কঠোরভাবে পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। চার ধরনের বাজার প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি সকল প্রকার পণ্যের বাজার দর নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন। বাজার চারটি হলো-১. মান্ডি বা শস্যবাজার; শস্যবাজারে বিক্রয় হতো চাল, ডাল, গম ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য; সরকারী নির্দেশনা ঠিক মতো কার্যকর হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল শাহনা-ই-মান্ডি'র ওপর। ২. সেরা-ই আদল; এই বাজারে বিক্রয় করা হতো বস্ত্র, জ্বালানি তেল, চিনি, ফল, ওষুধ ইত্যাদি; এই বাজার পরিচালনা করতো সরকারি দপ্তর দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ। ৩. অশ্ব, গবাদীপশু, ক্রীতদাসের বাজার; বয়স এবং গুণগত মানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা হতো। ৪. সাধারণ বাজার; এই বাজারে মাছ, মাংস, সব্জি, মনোহারী দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হতো। সরকারের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক কঠোর হাতে এই বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতো। কোনো ব্যবসায়ী সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে বিক্রয় করলে বা ওজনে কম দিলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এছাড়া কৃষকদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা হতো শস্যের মাধ্যমে। সমস্ত শস্য সংরক্ষণ করা হতো দিল্লির বিভিন্ন গোলাঘরে। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগেও পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়তো না। বিপর্যয় দেখা দিলে দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পণ্যদ্রব্য বন্টন করা হতো। বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সস্তা হওয়ায় এবং তা দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকায় সেনাবাহিনীর শক্তি-দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়েছিল; জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রজাবর্গ স্বস্তি লাভ করেছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শী আলাউদ্দিন এই কঠিন কাজটি করতে পেরেছিলেন তার ইচ্ছা এবং কঠোর মনোভাবের কারণে। কেননা তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেনাবাহিনী এবং প্রজাবর্গের জীবনযাত্রার মান, সুখ-শান্তি; ফলে সেনাকে শক্তিশালী এবং প্রজাকে শান্ত রাখতে পারলে তার রাষ্ট্রপরিচালনা অনেকটাই সহজ হবে, তেমনি জনগণের দুঃখকষ্টও অনেকটা লাঘব হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুফলতার কথা স্বীকার ক'রে ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল আলাউদ্দিনকে দুঃসাহসী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ব'লে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগের একজন স্বৈরশাসক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজীয়তার কথা ভাবতে পারলেও এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বিষয়টি ভীষণভাবে উপেক্ষিত!

একালের রাজনীতিকরা ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন, অজ্ঞ; যতোটুকু জানে তা থেকে ভাল কিছু শেখে না, শেখে কেবল হিংস্রতা, দমন-পীড়ন। আর এখন তো আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা সংকুচিত করেছে ইতিহাসকেও। বর্তমান থেকে পিছন দিকে এগোলে কয়েকটি কমা'র পর ৭১ সালে যতিচিহ্ন; এরপর আবার কয়েকটি কমার পর ৫২ সালে দাঁড়ি। চূড়ান্ত সমাপ্তি টানা হয়েছে এখানেই, কি রাজনীতিকের বক্তৃতা-টকশোতে, কি বুদ্ধিজীবিদের স্মৃতিচারণায়, কি সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনে; সকলের ইতিহাস চর্চাই তরতর ক'রে এগিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ৫২ সালে। যেনবা বাংলাদেশের মানব ইতিহাসের শুরু বায়ান্নতেই, তার আগে আমাদের আর কোনো ইতিহাস নেই। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে

যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের নামও উচ্চারিত হয় না কোথাও। তারও আগে আমাদের যে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস; তার চর্চা কেবল ইতিহাসের ছাত্ররাই হয়তো করে, তারপর তারাও ভুলে যায় পাশ ক'রে বেরিয়ে চাকরি পাবার পর, যদি না কেউ ইতিহাসের শিক্ষক হয়! আর দেশের মানুষের একটা বড় অংশ তো বায়ান্ন এবং একাত্তরের ইতিহাসকেও স্বীকার করে না। ইতিহাস সম্পর্কে যাদের একটু ধারণা আছে মোগল এবং সুলতানি আমল বাদে বাকি ইতিহাসকে তারা ভাবে হিন্দুদের ইতিহাস! ইতিহাস বিস্মৃত, ঐতিহ্য বিস্তৃত, সংস্কৃতি বিস্মৃত উন্মুল এক জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা; উদ্‌ভ্রান্ত, দিকভ্রান্ত, বিপথগামী এক জাতি!

আমি ড্রয়িংরুমে এসে বসার পর বাবা আর কিছু বলেন না। না বলার কারণ, আমি যদি বলি দেখ ধর্মকে পুঁজি ক'রে ধার্মিকেরাই এই ব্যবসা করছে, কোনো নাস্তিক কিংবা ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ায়নি; তাই বাবা এখন চুপ। তবে বাবার এই সংক্ষুব্ধ মুখাবয়ব আমার বেশ ভাল লাগে।

আমি খাওয়ার জন্য ডাইনিংয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতেই বাবা উঠে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসেন। রোজার মাসে আমার জন্য পাউরুটি আর জেলি রেখে দেয় টেবিলে, আমি নিজের মতো নিয়ে খাই। দুপুরের ভাতটা নিজেই ফুটিয়ে, ফ্রিজের তরকারি গরম ক'রে খাই। আর ক্যাম্পাসে গেলে বা অন্য কোনো কাজে বাইরে থাকলে খেয়ে বাসায় ফিরি। যদিও রোজার মাসে বেশিরভাগ হোটেলেই দিনের বেলা খাবার পাওয়া যায় না।

চার বছর পূর্বে রোজার আগের রাতে আমি যখন মাকে জানাই যে আমাকে সেহেরি খেতে ডেকো না, আমি রোজা রাখবো না। তারপর কারণ জিজ্ঞাসা করায় যখন আমি বলি যে আমি তোমাদের কাল্পনিক আল্লাহ্ আর তার রীতিনীতিতে বিশ্বাস করি না; তখন বাড়িটা কারবালা হতে বাকি ছিল আর কি! বাবা-মা, বড় আপা আর দাদী শুরুতে আমার কথা শুনে আঁৎকে উঠেছিলেন এই ভেবে যে মুসলানের ছেলের মুখে এসব কি কথা! তারপর তারা আমাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হন তখন চিৎকার ক'রে ধমকি-ধামকি দিতে শুরু করেন। আমিও আমার জায়গায় অনড়। সবার উচ্চকণ্ঠ শুনে দোতলা থেকে সপরিবারে চাচা, চারতলা থেকে সপরিবারে ফুফু উঠে আসেন। চাচা তো শুনেই আগুন! তাদের মিষ্টি কথা, টক-ঝাল কথা, অগ্নিবাক্যেও যখন আমি টলি না তখন এক পর্যায়ে চাচা ক্ষেপে গিয়ে আমাকে কিল-চড় মারতে থাকেন, আমার ফুফা মার ঠেকানোর জন্য এগোতে গিয়েও কেন যেন দাঁড়িয়ে পড়েন, হয়তো ফুফুর চোখের ইশারায়। আমার ফুফুর চোখের আগুনকে ফুফা ভীষণ ভয় পান! মা গিয়ে ড্রয়িংরুমের মেঝেতে পা ছড়িয়ে এমন ভাবে কাঁদতে থাকেন যেন তার পুত্রবিয়োগ ঘটেছে! যখন বুঝলাম কেউই আমাকে রক্ষা করবে না, তখন নিজেই নিজেকে রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে তড়িৎ বেগে চড় মারতে উদ্যত চাচার হাত ধ'রে ফেলি আমি, 'আপনার আল্লাহ্ বলেছে সীমালঙ্ঘনকারীকে সে পছন্দ করে না, আমিও সীমা

লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করি না। ধর্ম পালন করা বা না করা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার এই একান্ত ব্যক্তিগত জায়গায় নাক গলাবেন না। আর সবাইকে আপনার অনুগত ভেবে গায়ে হাত তোলা কিংবা ধমকানো আপনার স্বভাব, নিজের সম্মান বজায় রাখতে চাইলে আমার ক্ষেত্রে এই স্বভাবটা আজ থেকে ত্যাগ করবেন।'

তাৎক্ষণিক এই শক্তি আমি কীভাবে সঞ্চয় করেছিলাম জানি না, জীবনে বাবা-চাচার মুখের ওপর কথা বলি নি, সেই প্রথম। বিশ বছরের টগবগে রক্তের উত্তাপে কথাগুলো ব'লে ফেলে আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে এই কণ্ঠ কি আমার! আমিও এভাবে প্রতিবাদ করতে পারি! আর অন্যরা তো রীতিমতো স্তম্ভিত-স্তব্ধ, তোরাও বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে আমি চাচার সামনে এই ভাষায় কথা বলতে পারি! সেই স্তব্ধতা ছিল কয়েক মুহূর্তের। তারপরই আমার দাদি তেড়ে উঠেছিলেন, 'কী কইলি তুই! কী করতে চাস তুই, মারবি আমার পোলারে? মার, মার, মার না দেহি তোর কতো ক্ষ্যামতা! ঘাড় ধইরা রাস্তায় বাইর কইরা দিমু।'

আমার বিশ বছরের গরম রক্ত বাক্য হয়ে ছিটকে বেরিয়েছিল, 'তুমি তোমার বাপের বাড়ি থেইকা বাড়ি নিয়া আইছিলা মনে অয়, এইটা আমার দাদার বাড়ি; বাড়ির গরম আমারে দ্যাহায়ো না।'

এরপর দাদি কেঁদে-কেটে কি না কি বলতে শুরু করেন আর আমার বাবা আমাকে শাসন করা কর্তব্যজ্ঞান মনে ক'রে আমাকে বেধড়ক পেটান। এক পর্যায়ে আমার ফুফা ফুফুর গরম চক্ষু উপেক্ষা ক'রে বাবার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন।

অমন ধুন্ধুমার কাণ্ডের পরও ভোরবেলায় বাবা আমাকে সেহেরি খেতে ডাকেন, কিন্তু আমি উঠি নি। আমাকে অনেকবার ডাকার পরও যখন আমি ভেতর থেকে সারা দিই না, বাবা তখন দড়াম দড়াম ক'রে কয়েকবার লাথি মারেন আমার রুমের দরজায়।

তারপর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর রোজকার মতো ড্রয়িংরুমে ব'সে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ভাবছিলাম মা নিশ্চয় আমাকে কিছু খেতে দেবেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়লাম দীর্ঘক্ষণ, তবু মা আমাকে খেতে বলেন নি। কি একটা কাজে মা যখন ডাইনিংয়ে এলেন তখন ইচ্ছে করেই মাকে দেখিয়ে ফিল্টার থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে ঢকঢক ক'রে পান করলাম। আড়চোখে দেখলাম যে মা একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। বড় আপাও আমার জল পান করা দেখেছিল। কিন্তু কেউ-ই আমাকে খেতে দেয় নি। এরপর আমি নিজের ঘরে ফিরে এসে ব'সে রইলাম। আমার ভেতরে আশা ছিল যে আমাকে জলপান করতে দেখার পর মা নিশ্চয় কিছু খেতে দেবেন, নিশ্চয় আমার জন্য ভাত রান্না করবেন। কিন্তু আমার ভাবনা মিথ্যে প্রমাণ ক'রে আমাকে কিছু খেতে

দিলেন না মা, দুপুরে আমার জন্য ভাতও রান্না করলেন না। প্রত্যেক বছর রোজার সময় যেমন থাকে বাড়ির পরিবেশ তেমনই রইলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, আমি পেটে ক্ষিধে নিয়ে শুয়ে-বসে, বই প'ড়ে-গান শুনে সময় পার করলাম। বাবা সেদিন অফিসে না গিয়ে বাড়িতেই ছিলেন। দুপুরের আগে বাবা ফাহাদকে সঙ্গে নিয়ে চকবাজারে গেলেন ইফতার কিনতে। প্রতিবছর রোজার প্রথম দিনটায় চকবাজার থেকে বাহারি ইফতার কিনে আনা হয়; এটা আমাদের পরিবারের রেওয়াজ। ক্লাস ফোর-ফাইভে উঠার পর থেকেই ইফতারি কিনতে বাবার সঙ্গে আমিও যেতাম। বাপ-বেটায় ঘুরে ঘুরে একেকবার একেক রকম ইফতারি কিনতাম। তবে 'বড় বাপের পোলায় খায়' কিনতাম প্রত্যেক বছরই।

'বড় বাপের পোলায় খায়
ঠোঙায় ভইরা লইয়া যায়
ধনী-গরিব সবাই খায়
মজা পাইয়া লইয়া যায়।'

এই ছড়া বলতে বলতে বিক্রেতারা 'বড় বাপের পোলায় খায়' বিক্রি করতেন। বাবা আমাকে বলতেন, 'তোর কি কি পছন্দ?' ছেলেবেলায় বিভিন্ন রকমের অতো খাবার দেখে আমার তো ধাঁধা লেগে যেতো চোখে। কোনটা রেখে কোনটার কথা বলবো! কতো যে বাহারি নাম-'বড় বাপের পোলায় খায়, শাহী পরোটা, শাহী জিলাপি, খাসির রান, আস্ত মুরগি ফ্রাই, কোয়েল পাখি, চিকেন শাশলিক, সুতি কাবাব, রেশমি কাবাব, টিক্কা কাবাব, কিমা, হালিম, দইবড়া, হালুয়া, জর্দা, লাবাং, বোরহানি, ফালুদা, আরো যে কতো কি! খাসির ইয়া বড় রান দেখে বাবাকে প্রশ্ন করতাম, 'আব্বা, এতোবড় খাসির পা কিসে রান্না করে?' বাবাকে তখন আমি আব্বা ব'লে ডাকতাম।

বাবা বলতেন, 'বড় হাঁড়িতে রান্না করে।'

আমি মনে মনে হাঁড়ির একটা মাপ কল্পনা করতাম। ছোট মাথায় বড় হাঁড়ির মোটামুটি একটা আকৃতি ধারণ করার পর এতো এতো খাবারে চোখ বুলাতাম আর ভাবতাম, আচ্ছা এতো খাবার মানুষ খেতে পারে? তারপর পছন্দ মতো খাবার কিনে বাপ-বেটা সিএনজি নিয়ে চ'লে আসতাম বাড়িতে।

কিন্তু সেবার অনেক বছর বাদে আমাদের অভ্যস্ততায় পরিবর্তন ঘটে, আমি স্বেচ্ছা গৃহবন্দী হ'য়ে থাকি আর ফাহাদ বাবার সঙ্গে ইফতার কিনতে চকবাজার যায়। এদিকে ক্ষিধেয় আমার কাহিল দশা। ধুন্ধুমার কাণ্ডের পর আগের রাতে না খেয়েই ঘুমিয়েছি। পকেট হাতরে দেখি তেইশ টাকা আছে। আমার কাছে কখনোই বেশি টাকা থাকে না। টাকার প্রয়োজন হ'লে চাইলেই পাই, তাই টাকা জমিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। টাকা জমানোর

স্বভাবও আমার নয়। এই তেইশ টাকা দিয়ে আমি কি খাব? এ দিয়ে তো চা-বিস্কুটের বেশি কিছু হবে না; অথচ পেটে ভাতের ক্ষিধে! রোদ একটু ম'রে এলে বাইরে যাবার জন্য জামা-প্যান্ট প'রে দরজা খুলে ডাইনিংয়ে যেতেই রান্নাঘরে কর্মরত মা বলেন, 'যাস কই?'

'কাজ আছে।'

'অহন বাইরে যাবি না। তোর আব্বা চকে গেছে ইফতার কিনতে, সবার লগে বইসা ইফতার করবি।'

'আমি রোজা না, জল খাইছি।'

'তাও সবার লগে ইফতার করবি।'

দরজা খুলতে খুলতে বলি, 'দেখি, কাজ হইলে ফিরবো।'

'খুব বাড়াবাড়ি করতাছিস কিন্তু তুই, অহন বাইরে যাবি না।'

কে শোনে কার কথা! আর কথা না বাড়িয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। ক্ষুধার জ্বালায় তখন মেজাজ বিগড়ে গেছে, সারাদিন না খাইয়ে রেখে সন্ধেবেলা দামড়া খাসির ঠ্যাং খাওয়ার আদর! রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটি আর ভাবি, কী করবো এখন? তেইশ টাকায় আমার এখনকার ক্ষুধা মিটানো অসম্ভব। ধুর শালা, খাবই না! বাড়ির মানুষের প্রতি রাগ আরো জমাট হয়, আর মায়ের প্রতি তীব্র অভিমান। একদিনের মধ্যেই মা এমন বদলে গেলেন, একদিনের মধ্যেই মাকে কেমন দূরের আর অচেনা লাগে; ধর্মের এতোই শক্তি যে মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানকে দূরে ঠেলে দেয়! ধর্মের প্রতি মোহগ্রস্ত থেকে মা তার সন্তানকে এভাবে না খাইয়ে কষ্ট দিতে পারেন! আমি খেতে চাইলে মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে খাবার বেড়ে দেন; আমি যদি মাকে জানাই যে মা আমার অমুক খাবারটা খেতে ইচ্ছে করছে, তাহলে মা সেদিনই আমাকে সেই খাবার বানিয়ে খাওয়ান; সন্ধেবেলা যদি বলি মা বাইরে নাস্তা খাব, মা বিনাবাক্যে আমার হাতে টাকা ধরিয়ে দেন। আমার সেই মা আজ হঠাৎ এমন বদলে গেলেন? আমার চোখ ফেটে জল আসতে চায়। না খেয়ে থাকার জন্য না, আমি আরো দু-দিন না খেয়ে থাকতেও রাজি; আমার কষ্ট হয় মায়ের জন্য, মা যে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন! আমি বাবাকে ভয় করি, বাবা আমার বন্ধু নয়, বাবা কেবলই একজন রাশভারি-বদমেজাজি বাবা। তাই বাবা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখলেও খুব একটা কষ্ট পাব না। কিন্তু মা তো আমার বন্ধু; আমার যতো আবদার মায়ের কাছে, আমার যতো দুষ্টুমি মায়ের সাথে; সেই মাকে তার ধর্ম আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলো! ধর্মের এতো শক্তি যে মা-ছেলের সম্পর্কও তার কাছে পরাজিত হয়! আমি কি আর কখনোই আমার মাকে আগের মতো ক'রে পাব, নাকি কাল্পনিক আল্লাহ এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে আমার আর মায়ের মাঝখানে?

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ছয় নম্বর বাজার পেরিয়ে প্রশিকা মোড় ছাড়িয়ে যেন অবচেতনে পৌঁছে যাই স্টেডিয়ামের কাছে। এরপর রাস্তা পেরিয়ে ন্যাশনাল বাংলা স্কুলের মাঠে ঢুকে দক্ষিণদিকের গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, তখন ন্যাশনাল বাংলা স্কুলের মাঠের গেট

না থাকায় মানুষের প্রবেশ অবাধ ছিল। পা ছড়িয়ে শরীরের ভার দু-হাতে রেখে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে, আকাশে সাদা সাদা মেঘ; কিন্তু আমার দৃষ্টি জুড়ে কেবল সাদাভাত, শুকনো মরিচ দিয়ে মাখানো আলুভর্তা, পটলভাজা আর ডাল! সেই প্রথম অনুভব করি যে আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ আর অসহায়!

একবার মনে হয় বন্ধু আদিলের বাসায় যাব, ওর বাসা মিরপুর ২ নম্বরেই, হেঁটে যেতে পাঁচমিনিট সময় লাগবে। পরমুহূর্তেই মনে হয়, না, যাব না। রোজার প্রথম দিনেই অযাচিত অতিথি হয়ে ওদেরকে বিরক্ত করবো না। তারপর মনে হয় পকেটে তেইশটাকা আছে, হাঁটতে হাঁটতে টেকনিক্যাল যাই, তারপর ওখান থেকে বাসে চেপে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। আমার বন্ধু আবির আর জাহিদ হলে থাকে, আরো অনেক সহপাঠী-ই থাকে। কিন্তু বন্ধু বলতে যা বোঝায় তারা তা নয়, আমার সত্যিকারের বন্ধু আবির আর জাহিদ। অবশ্য জাহিদ তখন হলে নেই, বাড়িতে; আবির আছে।

জাহিদ সংশয়বাদী আর আবির নাস্তিক। দু'জনেরই আছে জীবন, পৃথিবী আর মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার অদম্য কৌতুহল, আছে সংবেদনশীল মন। আমাদের তিনজনের বোঝাপড়া চমৎকার। জাহিদ সংশয়বাদী হলেও আমাদের একসাথে পথ চলতে অসুবিধা হয় না, কেননা ওর আছে যুক্তিকে গ্রহণ করার মানসিকতা।

এর মাঝে ছোট আপুকে ফোন ক'রে জানিয়ে দিই যে, 'আমি ক্যাম্পাসে যাচ্ছি, আজ আর ফিরবো না। আর আমার ফোনে চার্জ নেই, একটু পরই সেলফোন বন্ধ হয়ে যাবে।'

ফোনে চার্য না থাকার কথাটা ডাঁহা মিথ্যে, মিথ্যে কথা আমি বলি না। কিন্তু এই মিথ্যেটা বলতে পেরে আমার খারাপ লাগে না। কেননা ফোন খোলা রাখলে বাসা থেকে বাবা-মা কল করবে, বাসায় ফিরতে বলবে। কিন্তু তখন আর আমার বাসায় ফেরার মানসিকতা নেই, তাই আপুকে কল করার পরই ফোন বন্ধ ক'রে রাখি।

হাঁটতে হাঁটতে টেকনিক্যাল পৌঁছাই, ওখান থেকে বাসে উঠে সন্ধ্যার মুখে ক্যাম্পাসে পা রাখতেই আযান শুরু হয়। ক্যাম্পাসের রাস্তা ফাঁকা, ইফতারি সামনে নিয়ে মাঠে গোল হয়ে বা মুখোমুখি ব'সে যারা আজানের অপেক্ষা করছিল খেতে শুরু করে। আমি হাঁটতে হাঁটতে দু-একবার রোজাদারদের দিকে তাকাই, আমাকেও দ্যাখে কেউ কেউ। সবাই ইফতার করছে, কেবল আমিই একা হেঁটে চলেছি রাস্তা দিয়ে। যারা আমার দিকে তাকাচ্ছে কি ভাবছে তারা? নিশ্চয় ভাবছে আমি একটা হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান, নাকি একথাও ভাবছে কেউ যে আমি নাস্তিক! ভাবলে ভাবুক, তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি গটগট ক'রে হাঁটা শুরু করি আবিরের হলের দিকে।

আবিরকে রুমেই পেয়ে যাই। আমাকে দেখেই ও বলে, 'কিরে তোর মুখ এমন শুকনো লাগছে কেন? খাসনি কিছু?'

আবির জানে একজন নাস্তিককে সে রোজা রেখেছে কিনা সরাসরি তা জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা এবং তাকে অসম্মান করা। তাই ও প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করে। ক্ষুধা তাহলে আমার মুখেও ছড়িয়েছে! বলি, 'বাইরে চল, বলছি।'

আমরা বাইরে এসে পুকুরের পাড়ে বসি। কিছু যে একটা হয়েছে তা আঁচ করতে পেরেছে আবির। বলে, 'কী হয়েছে তোর বলতো?'

আগের রাত থেকে বাসা থেকে বেরোবার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সব ওকে বলি।

'আমাদের বাড়িতেও....।' ও কিছু বলতে গিয়ে আবার চুপ হয়ে যায়।

'তোদের বাড়িতেও কী?'

'না কিছু না।' ও চেপে যায়।

'না লুকিয়ে কি বলতে চাইছিলি বল?'

'পরে বলবো। এখন চল, খাবি কিছু।'

'না আগে বল।'

আমার জোরাজুরিতে বলতেই হয় ওকে, 'আমাদের বাড়িতেও নানারকম পূজাপার্বণ হয়, মা তো সব পূজায়ই উপবাস করেন, অন্যরাও উপবাস করে কোনো কোনো পূজায়। মা উপবাস থেকেও আমাদের জন্য রান্না করেন, সবাই উপবাস থাকলেও আমার একার জন্য রান্না করেন। এতে মা'র পূজা-পার্বণে তো কোনো অসুবিধা হয় না। যদিও হিন্দুদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে মাছ-মাংস খায় না, কোনো বাড়িতে মাছ-মাংস রান্না করতে দেখলে কিংবা ঘ্রাণ নাকে যাওয়ামাত্র তারা নাকে-মুখে কাপড় চেপে দূরে সরে যায়, নাক-মুখ সিঁটকে কেউ কেউ বলেও ফেলে, "নাড়ে বাড়ির মতো গোন্ধ"! কিন্তু ছোটবেলায় আমি আমার দিদাকে মানে আমার মায়ের মাকে দেখেছি, তিনি সাধু টাইপের মানুষ, মাছ-মাংস খেতেন না, কিন্তু আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে নিজে মাছ-মাংস রান্না ক'রে সবাইকে খাওয়াতেন। সংযমের কথা যদি ওঠে তবে আমার মা কিংবা দিদার মাছ-মাংস রান্না ক'রে দেওয়াটাই সংযম; যে নাকে কাপড় দিয়ে বলে "নাড়ে বাড়ির মতো গোন্ধ' কিংবা রোজার মাসে আমাদের দেশে যে বাড়াবাড়িটা হয়, সেটা সংযম নয়। লোক দেখানো সংযম কেবল বিরক্তিকর নয়, কপটতাও।'

আবিরের মা উপবাস থেকেও ওকে রান্না ক'রে দেন শুনে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না, আমার চোখ স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। বিশ বছর বয়সে রাগ-অভিমান-আবেগ সবই বেশি থাকে। আবির আমার কাঁধে হাত রেখে বলে, 'প্লিজ, মন খারাপ করিস না। এজন্যই আমি কথাটা এখন তোকে বলতে চাইনি। আমার মা আমাকে রান্না ক'রে দেন, কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস করি না ব'লে আমার বাবা কিন্তু ঠিকই মাকে বলেন "তোমার ছেলে গোল্লায়

গেছে!" আমাদের আরো অনেক কিছু সহ্য করতে হবে বন্ধু। রাজিব, অভিজিৎ, অনন্ত, নিলয়, বাবুর মতো জীবনও দিতে হতে পারে।'

আমি নিজেকে সংযত করি। সংযমের ব্যাপারটা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। বলি, 'তুই সংযমের কথা বললি না? বালের সংযম! মুসলমানরা সংযম সংযম ক'রে মুখে ফেনা তোলে, অথচ এরাই সবচেয়ে বেশি অসংযমী। রোজার মাসে বেশিরভাগ হোটেলে রান্না বন্ধ, রাস্তার টঙ দোকানের সামনে পর্দা ঝোলে। কেন? রোজাদার ব্যক্তিকে যাতে অন্যের খাওয়া দেখতে না হয়। নারীদের বোরকা প'রে রাস্তায় বের হতে হবে। কেন? হাটহাজারির শফি হুজুরের মতে মেয়েরা হচ্ছে তেঁতুলের মতো; তেঁতুল দেখলে মানুষের জিভে যেমন জল আসে তেমনি নারী দেখলেও পুরুষের অন্তরে লালা ঝরে। তাই মেয়েদের বোরকা প'রে রাস্তায় বের হতে হবে। তাহলে সংযমটা কোথায়? অন্যের খাওয়া দেখে যদি কারো লোভ লাগে, রাস্তায় বেপর্দা নারী দেখলেই যদি কারো অন্তরে লালা ঝরে আর ঈমানদণ্ড দাঁড়িয়ে যায়, তবে সে মানুষ নয়, হিংস্র পশু। হরিণ দেখলেই বাঘের লালা ঝরে, হামলে পড়ে হরিণের ওপর; ছাগী দেখলেই পাঠার লিঙ্গ দাঁড়িয়ে যায়, লিঙ্গের মাথা দিয়ে ঝোল পড়ে; ওরা হিংস্র পশু, সংযম বোঝে না। মানুষেরও যদি খাবার আর নারী দেখলে একই অবস্থা হয়, তবে সে কীসের মানুষ! অথচ এরাই আবার বলে যে মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত; আরে, সৃষ্টির সেরা জীবের খাদ্য আর যৌনতার বিষয়ে সংযম থাকবে না! এদের মুখে সংযমের বুলি কিন্তু বাস্তবে প্যাট আর চ্যাটমুখী! কারো অন্তর যদি সংযমী না হয়, তাহলে কি আর পর্দায় সংযম হয়! যার অন্তর অসংযমী, খাবারের দোকানের সামনে পর্দা দেওয়া থাকলেও অই পর্দার দিকে তাকালেই তার চোখের সামনে খাবারের ছবি ভেসে উঠবে; নারী বোরকা প'রে থাকলেও তার নগ্ন উরু, পেট, বুক কল্পনা করতে অসুবিধা হবে না। মুখে বালের সংযম চোদায় সব। সারাদিন না খেয়ে থেকে রাক্ষুসে খাওয়া খাবে সন্ধেবেলা! এই বড় বড় খাসির ঠ্যাং, আস্ত মুরগি, কতো আইটেম আর কি তার বাহারি নাম! এর নাম সংযম! আমাদের বাসায় এই একমাসে খাবার বাবদ যে টাকা ব্যয় হয়, ঈদের পরের দুই মাসেও সেই টাকা ব্যয় হয় না। আমার বালের সংযম।'

'তুই যে কথাগুলো আমাকে বললি, এই কথাগুলোই যদি আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের কাছে বলি কিংবা ফেসবুকে লিখি, তাহলে আমার ওপর সবাই হামলে পড়বে। বলবে, "তুমি শালা মালাউন, ইসলাম ধর্মের কি বোঝো, সারাক্ষণ মুসলমান ধর্মের পিছনে লেগে থাকো! নাস্তিকতার ভেক ধরছো, কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি ঠিকই দরদ আছে।" অথচ আমি কিন্তু কোনো ধর্মকেই ছেড়ে কথা বলি না।'

এরপর আবির আমার হাত ধ'রে টেনে তোলে, 'চল, আগে কিছু খাবি। কথা বলার জন্য সারারাত প'ড়ে আছে।'

আমি পরদিনও বাসায় ফিরি না, সেলফোনও বন্ধ থাকে। তার পরদিন সকালে আমি ঘুমিয়ে আছি, তখন নয়টা-দশটা বাজে। আবির আগেই উঠেছে, আমাকে জাগিয়ে বলে, 'ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

আমি উঠে বাথরুমে যাই, ফ্রেশ হয়ে এলে ও বলে, 'জামা-প্যান্ট পর, নাস্তা করতে যাব।'

তারপর নিচে নামার সময় বলে, 'শোন, তোর বাবা আর আপু এসেছেন তোকে নিতে, নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। নাস্তা ক'রে ওনাদের সাথে বাসায় যা।'

নাস্তা খেয়ে বাবা আর ছোট আপুর সঙ্গে বাসায় ফিরি। সারা রাস্তায় বাবা আমার সাথে কোনো কথা বলেন নি, বাসায় ফিরেও না। রোজা রাখার ব্যাপারে আমাকে আর কেউ জোরাজুরি করে নি, রাগারাগি তো নয়-ই। কেবল দাদি আমাকে শুনিয়ে মাকে বলেছে, 'কি আর করবা, সবই নসিব!'

এরপর থেকেই আমার জন্য পা-রুটি এনে রাখে সকালের নাস্তার জন্য। প্রথম প্রথম ছোট আপু কিংবা মা দুপুরে ভাত রান্না ক'রে ফ্রিজের তরকারি গরম ক'রে খেতে দিতো। আমি তাদের বলেছি, 'তোমাদের ভাত রান্না ক'রে দিতে হবে না, আমি নিজেই রান্না ক'রে নেব।'

তারপর থেকে আমি প্রত্যেক রমজান মাসের দুপুরে বাসায় থাকলে নিজের ভাত নিজেই ফুটিয়ে ফ্রিজের তরকারি গরম ক'রে খাই। তবে তখন থেকেই সম্পর্কের সুতোটা একটু যেন আলগা হয়ে গেছে, আমার দিক থেকে নয়, পরিবারের অন্যদের দিক থেকে। তবে আমি বিশ্বাস করি, বাবা-মা ভেতরে ভেতরে আমাকে আগের মতোই ভালবাসেন, আমার বাসায় ফিরতে দেরি হ'লে তারা আগের মতোই উদ্বিগ্ন হন। আসলে আমার জন্য সমাজে তাদের মাথা নত হয়েছে, তাই হয়তো তারা কষ্ট পেয়েছেন; এজন্যই সম্পর্কের ওপর অভিমানের একটা বিষাদময় চাদর বিছিয়ে রেখেছেন। গত চার বছর এভাবেই চলছে, প্রত্যেক রমজানের প্রথম দিন সেহেরির সময় বাবা আমাকে জাগিয়ে সেহেরি খাওয়া এবং রোজা রাখার অনুরোধ করেন আর যথারীতি আমি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখান করি।

সেই চাঁনরাতের ওই ঘটনার পর চাচা বেশ কয়েক মাস আমার সঙ্গে কথা বলেন নি। তারপর থেকে কথা বলা শুরু করলেও আমার সঙ্গে তার আচরণ পাশের বাড়ির ছেলের মতো। তবে সার্বক্ষণিক ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ যার মন, সে তো সুযোগ পেলে তার ধর্মীয় অনুশাসনের কথা তুলবেই। চাচাও তোলেন অনেক সময়, সরাসরি আমাকে কিছু না বললেও আমাকে শুনিয়ে বলেন; আমি এড়িয়ে চলি। তবে মাস ছয়েক আগে আমার বড় আপুর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর তার সঙ্গে এক নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আপার দ্বিতীয় সন্তানটি ছেলে, ওর আকিকা হয়েছিল আমাদের বাড়িতেই। আকিকার আগের সন্ধ্যায় আমি

ক্যাম্পাস থেকে ফিরে নিচের গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি গ্রিলের সাথে বাঁধা বেশ তাগড়া দুটো খাসি ম্যা ম্যা ক'রে ডাকছে। তারপর বাসায় ঢুকে দেখি মা, বড় আপু, ছোটো আপু, চাচা-চাচী, ফুফু, ফুফাতো বোন আফিয়া মালিহা, চাচাতো বোন আনতারা রাইদাহ আর সাবিহা সবাই আমাদের ড্রয়িং-ডাইনিংরুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব'সে আছে। সকলের মধ্যমণি এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আমার ছোট্ট ভাগ্নে। আমি সাধারণত পারিবারিক এমন জটলা এড়িয়ে চলি। কিন্তু বাসায় ঢোকামাত্রই মালিহা বলে, 'এইতো ভাইয়া এসে গেছে, দেখি ভাইয়ার কোন নামটা পছন্দ হয়।'

আমার ভাগ্নের জন্য কি নাম বাছাই করা হচ্ছে তা না শুনে আমি কীভাবে নিজের ঘরে যাই! ফলে আমি ড্রয়িংরুমের দিকে এগোই। মালিহার কোলে শুয়ে ড্যাবড্যাব ক'রে আমার দিকে তাকায় ভাগ্নে। আমাদের পরিবারের এবং কাছের আত্মীয়দের বাড়ির নতুন অতিথির নাম সাধারণত আমার চাচাই রাখেন। নামকরণের ব্যাপারে সকলেই চাচার ওপর নির্ভর করেন আর ব্যাপারটা চাচা বেশ উপভোগ করেন, গর্ববোধও। ফলে আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে যথারীতি এবারও ভাগ্নের জন্য নাম বাছাই করেছেন চাচা। কয়েক মুহূর্ত ভাগ্নের হাসিমুখটা দেখে মালিহার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী কী নাম?'

'একটা হলো ফাহিম আসাদ, আরেকটা আহনাফ আবিদ; আমি, ছোট আপু, রাইদাহ আর সাবিহা পছন্দ করেছি আহনাফ আবিদ; মা, মামা আর মামীদের পছন্দ ফাহিম আসাদ। বড় আপু দুধভাত, কিছুই বলছে না। ভাইয়া প্লিজ তুমি আমাদের দিকে ভোট দাও।'

চাচাকে বরাবরই স্বৈরশাসক বলেই জানি, নাম রাখার ব্যাপারে তিনি হঠাৎ গণতান্ত্রিক হয়ে গেলেন কি কারণে কে জানে, নাকি নামদুটোর ব্যাপারে তিনি নিজেই দ্বিধায় ভুগছেন! রাইদাহ বলে, 'বড়রা বুঝতেই পারছে না যে ফাহিম আসাদ কমন নাম!'

আমি জানতে চাই, 'ফাহিম আসাদ মানে কী?

এবার ওরা চাচার দিকে তাকায়। মানে ওরা জানে না, জানেন চাচা।

চাচা বলেন, 'বুদ্ধিমান সিংহ।'

শোনামাত্র আমি হো হো ক'রে হাসতে হাসতে মালিহার পাশের সোফায় ব'সে পড়ি। হাসির দমক কমলে দেখি, সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, রাগত চোখ দুটো আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে চাচা বলেন, 'এতে হাসির কী হলো?'

হাসির রেশ তখনো আমার মুখে। বললাম, 'বাহ্, হাসবো না! আমি সম্মানিত সিংহ, আমার ভাই ন্যায়বান সিংহ, আর আমাদের ভাগ্নে হবে বুদ্ধিমান সিংহ!'

'এতে তো হাসির কিছু দেখছি না!'

আমি চাচার চোখে চোখ রাখি 'আপনারাই তো বলেন, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাকলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব; তো সেই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও আমাদের পরিচিত হতে হচ্ছে একটা হিংস্র পশুর নামে, ব্যাপারটা হাস্যকর না!'

চাচা কিছুটা বিব্রত হলেও সহসাই আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বলেন, 'এটা পবিত্র আরবি ভাষার নাম, হাস্যকৌতুকের বিষয় নয়। মুসলমান সন্তানের আরবি ভাষায় নাম রাখা সোয়াব।'

'আপনি তো ফাহাদের নাম রেখেছেন আবরার ফাহাদ, মানে ন্যায়বান সিংহ। কিছুদিন আগে সৌদি আরব আবরার নামটি সহ মোট পঞ্চাশটি নাম নিষিদ্ধ করেছে। আপনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আপনার ছেলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কিন্তু ফাহাদ এখন সৌদি আরবের নিষিদ্ধ ঘোষিত নাম নিয়ে জীবনযাপন করছে, এতে ওর গুনাহ হচ্ছে না? আপনার শ্বশুরের নামও তো নিষিদ্ধ, মোহাম্মদ কিবরিয়া। আপনার শ্বশুরও তো মহা ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তার গুনাহ হচ্ছে না? আরবি ভাষার গু-ও আপনাদের কাছে পবিত্র, অমৃত; আর বাংলা ভাষার অমৃতও আপনাদের কাছে তেতো!'

'বেয়াদবের মতো কথা ব'লো না।'

'বেয়াদবের মতো কথা বলছি কোথায়! এটাই সত্য। বাংলা ভাষায় এতো সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে আরবি ভাষায় নাম রাখতে হবে কেন?'

'আরবি নবীজির পবিত্র ভাষা, বাংলা তো হিন্দুদের ভাষা!'

হায়! যার পূর্বপুরুষ হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে; বংশ পরম্পরায় হিন্দুদের রক্ত, জিন, সেল বহন ক'রে চলেছে শরীরে; হিন্দুদের জমির শস্যদানা খেয়ে জীবনধারণ করছে; এসবে কোনো দোষ নেই, যতো দোষ ভাষার! যে ভাষার জন্য রফিক-সালাম-বরকতেরা জীবন দিয়েছেন, সেই ভাষার মানুষই কিনা বলছে বাংলা হিন্দুদের ভাষা; বাংলা এখনো বাঙালীর ভাষা হতে পারে নি!

'বাংলা অপবিত্র ভাষা, এটা আপনাকে কে শিখিয়েছে?'

'বাংলা হিন্দুদের ভাষা, এই ভাষায় মুসলমানদের নাম রাখা উচিত না। গুনাহ হতে পারে।'

'আপনারা না বলেন যে সবকিছু আল্লাহ্'র সৃষ্টি; সবকিছু যদি আল্লাহ্'র সৃষ্টি হয়, তাহলে পৃথিবীর সব ভাষাই তো আল্লাহ্'র সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে কেবল আরবি নয়, পৃথিবীর সব ভাষাই তো পবিত্র; এমনকি বিলুপ্তপ্রায় যে ভাষাটিতে এখন মাত্র এক-দু'জন মানুষ কথা বলে, সে ভাষাটিও পবিত্র! আর আরবি মুসলমানদের ভাষা এটা আপনাকে কে বলেছে?'

'পবিত্র আরবি ভাষা নবীজির ভাষা, মুসলমানের ভাষা; এটা কে না জানে!'

'মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক সেটা সর্বজন বিদিত, কিন্তু তিনি যে আরবি ভাষারও প্রচলন করেছিলেন এমন কথা তো শুনি নি। কোরান-হাদিসে আছে কোথাও?'

'ইসলাম সম্পর্কে না জেনে কথা বলাটা তোমার মতো গুনাহগার নাস্তিকদের অভ্যাস। আরবি মুসলমানদের ভাষা, পবিত্র কোরান আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে।'

'কোরান আরবি ভাষায় বলা এবং লেখা হয়েছে, কিন্তু সেটা পৌত্তলিকদের ভাষা। পৌত্তলিকরা আরবি ভাষায় কথা বলতো, আরবি ভাষায় গান করতো, কবিতা লিখতো, আল্লাহ্'র কাছে প্রার্থনাও করতো, এমনকি খিস্তি-খেউড়ও করতো। মুহাম্মদের জন্মের আগেই এই ভাষার উৎপত্তি; এমনকি 'আল্লাহ' শব্দের উৎপত্তি এবং ব্যবহারও মুহাম্মদের জন্মের বহু আগে থেকেই। পৌত্তলিকরাও তাদের সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ্' নামেই ডাকতো। মুহাম্মদের বাবা আবদুল্লাহ মুহাম্মদের আগে জন্মায় নি আর তার ধর্মও ইসলাম ছিল না, তিনি পৌত্তলিক-ই ছিলেন। আবদুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ্'র দাস। তাই একথা বলা অজ্ঞানতা যে আরবি মুসলমানদের ভাষা। আর কাবাঘর? সেটাও তো মুহাম্মদের জন্মের আগে থেকেই পৌত্তলিকদের তীর্থস্থান ছিল, সমগ্র আরবের মানুষ সেখানে তীর্থ করতে আসতো। তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল ওখানে যা মক্কা বিজয়ের সময় মুহাম্মদ ধ্বংস করে। সুতরাং একথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে আরবি মুসলমানদের ভাষা আর কাবাঘর মুসলমানদের তীর্থস্থান, দুটোই মুহাম্মদ দখল করেছে। আরবের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জাতির লোকাচার মুহাম্মদ গ্রহণ করেছে; যেগুলো সম্পর্কে প্রকৃত সত্য না জেনে আজকের বেশিরভাগ মুসলমান বিশ্বাস করে যে এসবের প্রবর্তক মুহাম্মদ। সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং মজার ব্যাপার হলো মুহাম্মদের মূর্তিপূজার বিরোধীতা সত্ত্বেও পৌত্তলিকদের তীর্থস্থানেই মুসলমানরা হজের নামে পাথর পূজা করে!'

চাচার মুখ যেন পাথরের চাঁই, চোখ অগ্নিকুণ্ড, আর কণ্ঠ বজ্রনাদ, 'তুমি শয়তানের ভাষায় কথা বলছো। মুসলমানরা হিন্দুদের মতো পূজা করে না, মুসলমানরা করে ইবাদত।'

'হিন্দুরা সরাসরি হাত মুখে তুলে খায়, আর আপনারা হাতটা মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে এনে খান; কিন্তু উভয়ই খাওয়া। বাংলা ভাষায় যা পূজা, আরবি ভাষায় সেটাই ইবাদত।'

'তোমার মতো শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্ আর তার পবিত্র কাবাঘর সম্পর্কে ভুলপাঠ নিতে চাই না আমি।'

'আমারও উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই। আপনি বাংলাভাষাকে অপমান করেছেন, একজন বাংলাভাষা প্রেমিক বাঙালি হিসেবে এর প্রতিবাদ করাটা আমার নৈতিক দায়িত্ব। আপনারা পৌত্তলিকদের আল্লাহ্কে গ্রহণ করেছেন, পৌত্তলিকদের ভাষা গ্রহণ করেছেন, পৌত্তলিকদের বহু সংস্কৃতি এবং রীতি গ্রহণ করেছেন, পৌত্তলিকদের

তীর্থস্থানে তীর্থ করতে যাচ্ছেন, আর নিজ ভাষা বাংলায় সন্তানের নাম রাখলেই আপনাদের সোয়াবে টান পড়ে, গুনাহ হয়! আমার ভাগ্নের নাম আমি বাংলায় রাখবো, কারো ইচ্ছে হ'লে ওকে সেই নামে ডাকবে, ইচ্ছে না হ'লে ডাকবে না; আমি একাই ডাকবো।' বলেই আমি উঠে পড়ি।

আমি আমার ভাগ্নের নাম রেখেছি অয়ন। প্রথম প্রথম আমি একাই এই নামে ওকে ডাকতাম। এখন আমার বড় বড়আপু-দুলাভাই, ছোট আপু অয়ন নামেই ওকে ডাকে। ওই ন্যায়বান সিংহ, মানে ফহিম আসাদ নামটিও আছে কাগুজে নাম হিসেবে। কাগুজে নামটি আরবিতে না হলে তো সোয়াব হবে না!

আমার ধারণা চাচার প্রিয় পশু সিংহ, নইলে এমন নাম রাখবে কেন আমাদের? তাছাড়া সিংহকে বনের রাজা বলা হয়, আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে সিংহ ভীষণ শক্তিশালী পশু। আর কে না চায় তার বংশের ছেলে রাজার মতো হবে, খুব শক্তিশালী হবে; এজন্যই বোধহয় শক্তিশালী সিংহের নামে আমাদের নাম রেখেছেন। তবে আমাদের এই সিংহত্রয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিপদের মধ্যে আছি আমি। মনে হয় না কোনো পশ্চিমা দেশ সহজে আমাকে ভিসা দেবে! এক ভয়ংকর ইসলামী সন্ত্রাসীর নামের একটা অংশ আর আমার নামের একটা অংশ এক-উসামা। আমজাদ উসামা, মানে সম্মানিত সিংহ! আমার চাচাতো ভাই আবরার ফাহাদের নামের অর্থ হলো ন্যায়বান সিংহ।

মামা একটা বাংলা নাম রেখেছিলেন আমার-সবুজ; যদিও এই নামে আমাদের বাড়ির কেউ আমাকে ডাকে না। আমি সবুজের সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ ক'রে নিয়েছি-সমতল, সবুজ সমতল। এই নামেই আমি ফেসবুকিং-ব্লগিং করি। ক্যাম্পাসের সহপাঠী-বন্ধুরা এখন আমাকে এই নামেই ডাকে, তবে এর জন্য ওদেরকে খাওয়াতে হয়েছিল। ওরা তো প্রথম দিকে আমাকে উসামা ব'লে ডাকতো, কেউ কেউ দুষ্টমি ক'রে লাদেন নামেও ডাকতো। একদিন ওদেরকে খাইয়ে অনেক অনুরোধ ক'রে বলার পর ওরা ওইসব উসামা-লাদেনের পরিবর্তে সবুজ ব'লে ডাকতে শুরু করেছে। ফাস্ট ইয়ারের শুরুর দিকে একবার গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার আগেরদিন আমার এক বান্ধবী হৃদিকা আমাকে বলে, 'এই যে সম্মানিত সিংহ, তোমার নামের স্পেলিংটা কাগজে লিখে দাও।'

আমি তখনো আমার নামের অর্থ জানতাম না। বলি, 'আমি আবার সম্মানিত সিংহ হলাম কবে থেকে?'

ও হেসে বলে, 'কবে থেকে আবার, আকিকার দিন থেকে।'

'মানে?'

ও তখন হাসি আরো প্রলম্বিত ক'রে অন্য বন্ধুদের শুনিয়ে বলে, 'ওরে এ দেখি বেআক্কেল গাধা, ভুল ক'রে নাম রেখেছে সম্মানিত সিংহ!'

আমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টার পর হৃদিকা ব্যাপারটা খোলাসা করে। সেদিনই ক্যাম্পাস থেকে ফিরে চাচার কাছ থেকে আমার এবং সব ভাইবোনদের নামের অর্থ জেনে নিই। হাস্যকর আর বিরক্তিকর সব নাম। স্ববিরোধী নামও আছে, যেমন আমার চাচাতো বোনের নাম আনতারা রাইদাহ; মানে হলো-বীরাঙ্গনা নেত্রী! যে ধর্ম নারীকে গৃহবন্দী ক'রে রাখার কথা বলে, যে ধর্ম স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নারীকে পুরুষের অধীন থাকার কথা বলে, যে ধর্ম নারীকে পুরুষের যৌনদাসী ক'রে রাখার কথা বলে, যে ধর্ম শিখিয়েছে নারী নেতৃত্ব হারাম, যে ধর্ম শিখিয়েছে নারীর নেতৃত্বে থাকার চেয়ে পুরুষের ম'রে যাওয়াই উত্তম; সেই ধর্মের এক নারীর নাম আনতারা রাইদাহ বা বীরাঙ্গনা নেত্রী! এটা ভীষণ স্ববিরোধী এবং কৌতুকর নাম! আমার চাচাতো বোন আনতারা রাইদাহ বোরকা প'রে কেবল চোখ দুটো খোলা রেখে বাইরে যায়। বোরকা বীরাঙ্গনা নেত্রীর পোশাক বটে!

আমি ভাবছি আমার নামটি এফিডেভিট ক'রে সবুজ সমতল ক'রে নেব। একটা হিংস্র পশুর নামে আমার নাম, ভাবলেই অসহ্য লাগে!

নাস্তা খেয়ে চা বানিয়ে নিয়ে আমি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে কম্পিউটার চালু করি। ইউটিউবে রাকেশ চৌরাশিয়ার বাঁশি ছেড়ে হারিয়ে যাই নিজের ভাবরাজ্যের গহীনে। ক্লাস না থাকলে দিনটা আমি নিজের মতো ক'রে উপভোগ করি; সারাদিন সুরের মধ্যে ডুবে থেকে পড়ি কিংবা ব্লগে লিখি। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, ছাঁচে ঢালা প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা চরম মাত্রায় পৌঁছে গেছে, তাই পরীক্ষার তোড়জোর না থাকলে ছুটির দিনে ক্লাসের পাঠ্যবই ছুঁয়েও দেখি না। আজকাল নন-ফিকশন বেশি পড়ি, পুরোনো ফিকশনও পড়ি। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ ফিকশন প'ড়ে আনন্দ পাই না। পড়তে পড়তে মনে হয় পাঠককে খুশি করার জন্য, জনপ্রিয়তা পাবার জন্য আপোস ক'রে এসব লেখা হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ লেখক জনবহুল তৈরি পথে হাঁটছে; কিন্তু যে পথটা জনবিরল, খানাখন্দ আর লতাগুল্মে ভরা সেই পথে কেউই পা বাড়াতে চাইছে না; অথচ সেটা একটা নতুন সম্ভাবনাময় পথ। ওই যে বিতর্ক এড়িয়ে সবার কাছে ভাল থাকার যে সবিধাবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবি চরিত্র, সেটাই মাটি করছে নতুন সম্বাবনাকে। বেশিরভাগ লেখক মিথ্যাটাকে মিথ্যা জেনেও তা উন্মোচন করতে চায় না, বরং জনপ্রিয়তার জন্য মিথ্যার ওপর একটা আরোপিত চটকদার প্রলেপ লাগায় এরা। অন্ধকার দেখেও সুচিন্তার আলো ফেলে না, প্রগতির পথে কোনো কালো পাথর থাকলেও এরা তাতে আঘাত না ক'রে বা সরানোর চিন্তা না ক'রে খাদে নেমে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়! এইসব বৃত্তবন্দী হৃদয়ের লেখা মুক্ত হৃদয়ের খোরাক মেটাতে পারে না।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই, ভারতে কিছু ভাল গান হলেও আমাদের এখানটা যেন নিষ্ফলা মরুভূমি। না গানের কথা মন টানে না সুর টানে কান! আজকাল লোকগান আর

ক্লাসিক বেশি শুনছি। যন্ত্রসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মনটাকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের মতো ক'রে শব্দ বসিয়ে ভাবতে বেশ ভাল লাগে।

এই যা, আমার অর্ধেকটা চা আজকেও প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! এরকম প্রায়ই হয় কল্পনার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'লে। যদিও বাসায় থাকলে আমি বেশ সময় নিয়েই চা পান করি, কেননা আমি কাপে চা পান করি না, পান করি মগে। সকাল-সন্ধ্যায় এক মগ আদা চা নিয়ে আমি আমার রুমের দরজা বন্ধ ক'রে নিজের জগতে ডুবে থাকি। অবশ্য এটা শুধু ছুটির দিনে, সকালে ক্লাস থাকলে চা পানের সময় কোথায়! তখন তো ঘুম থেকে উঠেই পড়িমরি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরতে, চা পান করতে হয় ক্যাম্পাসে গিয়ে।

প্রায় ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতেই বাবার উচ্চকণ্ঠ ভেসে আসে কানে। আবার কার ওপর চোটপাট করছেন, মা নাকি ছোটো আপু? নাকি খানিক বিরতি দিয়ে পুনরায় ব্যবসায়ীদের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছেন? আমি বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পাই, 'এগুলো মানুষ না, হিংস্র পশু! ইসলামের দুশমন, ইসলামের শত্রু! ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, কতোগুলো মূর্খ কোরান বিকৃত ক'রে মানুষ হত্যায় নেমেছে।'

এটুকু শুনেই আমি বুঝতে পারি যে ইসলামী জঙ্গিরা আবার কাউকে খুন করেছে, জঙ্গিদের হাতে কেউ খুন হলেই বাবা এসব কথা বলেন। তোতাপাখির মুখের শেখানো বুলির মতো এই কথাগুলোও মডারেট মুসলিমের রপ্ত করা মুখের বুলি!

গত শতকের শেষভাগ থেকেই ইসলামী জঙ্গিরা তাদের শক্তি প্রদর্শন শুরু করে; ১৯৯৯ সালে তারা যশোর টাউন হল মাঠে উদীচী'র দ্বাদশ সম্মেলনের শেষদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে, ২০০১ সালে পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে, ২০০২ সালে ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে বোমা হামলা করে, ২০০৫ সালে একযোগে তেষট্টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ করে। এরপর থেকে তারা ধারাবাহিকভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ওপর হামলা করে। বহুবার বাউলদের আখড়ায় হামলা চালিয়ে তদেরকে মারধর করার পর চুল-দাড়ি কেটে দিয়েছে এবং আজো দিচ্ছে। আর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুখ্যাত রাজাকার কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবীতে প্রগতিশীল অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা শাহবাগে একত্রিত হয়ে গণজাগরণ মঞ্চ গঠন করলে, ফেব্রুয়ারি মাসেই গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী রাজিব হায়দারকে হত্যার মাধ্যমে ইসলামী জঙ্গিরা তাদের নতুন হত্যা মিশন শুরু করে। রাজিবের পর অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, নিলয় নীল সহ আরো কয়েকজন ব্লগারকে তারা হত্যা এবং হত্যার চেষ্টা করে। তবে কেবল ব্লগার হত্যায়-ই তারা সীমাবদ্ধ থাকে না, একে একে তারা হত্যা করে প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষক, বাউল, সুফী সাধক, মাজারের খাদেম, হিন্দু পুরোহিত, খ্রিষ্টান যাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বিদেশী নাগরিক;

মোটকথা তারা ইরাক-সিরিয়ার আইএস এর জিহাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন মতাদর্শী মানুষ হত্যার মিশনে নামে।

'এরা নাকি জিহাদী! জিহাদ ক'রে ইসলাম কায়েক করবে, বিধর্মী হত্যা ক'রে বেহেশতে যাবে, বেহেশতে যাওয়া এতো সোজা! নবীজি (সঃ) তোদের মানুষ হত্যা করতে বলেছেন! ইসলাম শান্তির ধর্ম, নবীজি (সঃ) শান্তির কথা বলেছেন। আহাম্মক-ইবলিশের দল কোরান বিকৃত ক'রে ইসলামকে বিতর্কিত ক'রে খুন-খারাবিতে মেতেছে।'

আমি বাবাকে দেখতে না পেলেও বাবার এই রাগান্বিত মুখমণ্ডল কল্পনা করতে পারি। চিতই পিঠার ছাঁচ থেকে যেমন বারবার একই রকম পিঠা তৈরি হয়, তেমনি আমার বাবার মতো আরো অসংখ্য মানুষের মুখ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বারবার একই রকম কথা বের হয়! কথাগুলো এরকম- 'ইসলাম শান্তির ধর্ম; ইসলাম শান্তির কথা বলে, ধ্বংসের কথা নয়; ইসলাম মানবতায় বিশ্বাসী, ইসলাম জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না; জঙ্গিরা বিকৃত ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, ওরা সহি ইসলামের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে; জঙ্গিরা মুসলমান নয়, জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই; ইসলাম ভিন্ন মতাবলম্বীদের সম্মান দিতে বলেছে, ইসলাম নারীদেরকে সম্মান দিতে বলেছে ইত্যাদি।'

দেশে ইসলামী জঙ্গিদের হাতে ভিন্ন ধর্মের কিংবা ভিন্ন মতাদর্শের কোনো মানুষ খুন হলেই উপরোক্ত কথাগুলো ব'লে জিগির তোলে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, মন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, কবি-কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী, নাট্যকার-নাট্যনির্দেশক, নাট্যকর্মী, চিত্রপরিচালক, চিত্রকর, ভাস্কর, শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়ার, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবি, বিজ্ঞানী, মাদ্রাসার কিছু হুজুর, মসজিদের কিছু ইমাম ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মধ্যপন্থী মুসলমান। আমি ভাবি, এরা কি কখনও কোরান-হাদিস পড়েছেন? কেউ কেউ নিশ্চয় পড়েছেন, আবার কেউ কেউ পড়েন নি। যিনি পড়েছেন তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন, আবার যিনি পড়েন নি তিনিও উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। বংশ পরম্পরায় এভাবেই চ'লে আসছে।

এই দেশের বেশিরভাই মানুষই অশিক্ষিত, তারা কোরান পড়েন নি; এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষও কোরান-হাদিস তেমন পড়েন নি; এরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছেন তা পড়ে নয়, শুনে। জেনেছেন জুম্মাবারে খতিবের মুখের জ্বালাময়ী খুতবা শুনে, ইমাম কিংবা মাদ্রাসার হুজুরের কথা শুনে, কোরান-হাদিস পড়া পাড়ার কোনো মুরুব্বির মুখ থেকে আর ওয়াজ মাহফিলে মওলানাদের মুখে পরমত বিদ্বেষী-বিধ্বংসী ওয়াজ শুনে! ফলে এরা যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন এবং বলেন, নিজেরা পড়ে কোরান-হাদিসের সত্য জানার সামর্থ্য বা তাগিদ এদের মধ্যে নেই। এদেরকেই বোধহয় বলে- 'শুনে মুসলমান'!

কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী, বুদ্ধিজীবি থেকে শুরু ক'রে নানা শ্রেণি-পেশার যে সকল শিক্ষিত মধ্যপন্থী মুসলমান কোরান হাদিস পড়েছেন বা পড়েন, তারা স্পষ্টভাবেই কোরান-হাদিসের অর্থ বোঝেন, তারপরও তারা কোরান-হাদিসের প্রকৃত সত্য গোপন ক'রে সচেতনভাবেই কোরান-হাদিসের অশান্ত-অসুস্থ আকাশে অবিরাম শান্তির পায়রা ওড়ান। এই মধ্যপন্থী মুসলমান দুই রকম চিন্তায় দুটি অংশে বিভক্ত- ছদ্ম মধ্যপন্থী এবং প্রকৃত মধ্যপন্থী। মধ্যপন্থার খোলসে চরমপন্থায় বিশ্বাসী ছদ্ম মধ্যপন্থীরা ছোটবেলায় মনের ভেতর প্রোথিত হওয়া কোরান-হাদিসের শিক্ষা উপেক্ষা করতে পারে না, প্রকাশ্যে শান্তির পায়রা ওড়ালেও ভেতরে ভেতরে এরা জঙ্গিদের সমর্থক কেননা কোরান-হাদিস লব্দ বিশ্বাস তারা বুকে লালন করে; তবে এরা কখনোই অস্ত্রধারণ ক'রে ময়দানে নামে না, এরা কেবলই জঙ্গিবাদের নীরব সমর্থক। আর প্রকৃত মধ্যপন্থীরা ভেতরে ভেতরে জঙ্গিবাদের সমর্থক নয়, তারা সত্যিই জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে; যদিও এদের অন্তরের গুপ্ত কোটরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষ থাকে আর এরা চায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের পদানত হয়েই থাকুক, তবে তাদেরকে নির্যাতন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোরান-হাদিস প'ড়ে-বুঝেও এরা প্রতিনিয়ত নিজের সত্তার সঙ্গে, শিক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করে ইসলামের আকাশে শান্তির পায়রা উড়িয়ে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবির মনোচারণা এই অংশে। এই কাজটি এরা করে সমাজে টিকে থাকার স্বার্থে। অন্য অনেক বিষয়ে এদের অগাধ জ্ঞান, বিস্তর পড়াশোনা, তত্ত্বের উপস্থাপন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ; কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে বক্তৃতায় এবং গণমাধ্যমে তারা কথা বলেন অকাট মূর্খের মতো! অথচ এদের অনেকেই আবার ব্যক্তিগত আড্ডায়, ড্রয়িং রুম কিংবা ডাইনিং টেবিলের পারিবারিক আলোচনায় কোরান-হাদিস কিংবা ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য নিয়ে ঠিকই আলোচনা করেন; নিজের উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েকে সতর্ক করেন যাতে তারা ধর্মান্ধ না হয়, জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমার বাবা মোটামুটি প্রকৃত মধ্যপন্থীর পর্যায়েই পড়ে, কিন্তু চাচা শতভাগ ছদ্ম মধ্যপন্থী।

দরজা খুলে হাতের মগটা ডাইনিং টেবিলে রেখে আমি ড্রয়িং রুমে গিয়ে বাবার মুখোমুখি সোফায় বসি যাতে বাবার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। বসেই বলি, 'কী হয়েছে বাবা?'

বাবা গম্ভীর মুখে বলেন, 'জঙ্গিরা ঝিনাইদাহে একজন হিন্দু পুরোহিতকে হত্যা করেছে।'

'বাহ্, রোজার প্রথম দিনেই হত্যার উদ্বোধন ক'রে চাপাতিবাজরা সোয়াব কামিয়ে নিলো!'

বাবা আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে পুনরায় টিভির দিকে তাকান। আমি টিভির স্ক্রলে চোখ রাখি, ঝিনাইদাহে আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী নামে একজন পুরোহিতকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গত পরশুদিনও নাটোরের মুদি দোকানদার সুনীল গোমেজকে

কুপিয়ে হত্যা করেছে ইসলামী জঙ্গিরা। একের পর এক নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে, খুনিরা খুন ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে আর সরকারের স্টুপিড স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যের শেষে আশার বাণী শুনিয়েই চলেছে, কিন্তু খুনিদের টিঁকিটিও ছুঁতে পারছে না র‍্যাব-পুলিশ।

বাবার উদ্দেশে বলি, 'যখন জঙ্গিরা একের পর এক ব্লগার খুন করছিল, তখন তোমরা বলেছিলে ব্লগাররা ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি করেছে, ব্লগারদের দোষত্রুটির বিশ্লেষণ করতে। এখন কি বলবে, সুনীল গোমেজ কিংবা আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী তো ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি করেন নি; তবে তাদেরকে কেন খুন করলো ইসলামী জঙ্গিরা?'

বাবা আমার কথার শেষ অংশটুকু সম্পাদনা ক'রে পুরোনো রেকর্ড বাজান, 'ওরা ইসলামী জঙ্গি নয়, বিপথগামী জঙ্গি। ইসলাম মানুষ খুন করতে বলে নি। ইসলামের সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। ওরা মুসলমান নয়, ওরা জঙ্গি; জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই!'

'এটা তুমি ভুল বলছো বাবা, অবশ্যই ওদের ধর্ম আছে; ওদের ধর্ম ইসলাম, "আল্লাহু আকবর" বলেই ওরা ঘাড়ে চাপাতির কোপটা দেয়!'

'আল্লাহু আকবর ব'লে মানুষ খুন করে বলেই ওরা মুসলমান নয়, কোরানের কোথাও আল্লাহ্ মানুষ খুন করতে বলেন নি।'

'আমি তোমাকে প্রচুর কোরানের আয়াত দেখাতে পারবো, যে আয়াতগুলোতে ইসলামে অবিশ্বাসী এবং বিধর্মীদেরকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে; আর হাদিস তো আরো বিধ্বংসী। তুমি দেখতে চাইলে আমি এখনই তোমাকে দেখাতে পারি।'

এবার বাবা খানিকটা অস্বস্তিতে, কিন্তু সহসাই অস্বস্তি কাটিয়ে বলেন, 'বাংলা অনুবাদে কোরানের অনেক আয়াতেরই ভুল ব্যাখা করা হয়েছে। আরবি এমন একটা ভাষা যে অন্য ভাষায় তার অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

আমি মৃদু হেসে বলি, 'বাবা, আমার ঘরে দুটো কোরান আছে। আমার কম্পিউটারে আরো দুটো কোরানের পিডিএফ ফাইল আছে। এই চারটে কোরান চারজন মানুষ অনুবাদ করেছেন; এদের মধ্যে তিনজন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। এই তিনজন মানুষ যে আরবি ভাষা ভালভাবে না জেনে কোরান অনুবাদ করেছেন আমার তা বিশ্বাস হয় না, এরা আরবি ভাষার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত, তাই এই ভাষাটা ভালমতো না জেনে এরা কোরান অনুবাদ করেছেন এটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আর অন্যজন আমাদের দেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন, এরপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর মতো একজন মানুষ কোরানের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং বিপদজনক গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা করবেন এটা একেবারেই

অসম্ভব। কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করলে তিনি দেশে থাকতে পারতেন না এবং তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হতো না।'

বাবা ধমকের সুরে বলেন, 'ধর্মের সুক্ষ্ম তত্ত্ব কেবল বড় বড় আলেমরাই বুঝতে পারেন, যার তার পক্ষে এসব বোঝা সম্ভব নয়। তোমার মতো বিপদগামী নাস্তিকদের স্বভাবই হলো ইসলাম ধর্মকে হেয় করা আর মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কথা বলা।'

আমার বাবার মতো মধ্যপন্থী মুসলমানরা কিছুতেই বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেই ইসলামের জন্ম। মুহাম্মদও কোরাইশদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছিলেন তাদের তিনশো ষাটটি মূর্তি ভেঙে এবং তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে; ইহুদিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছিলেন, আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি, রীতি-নীতি আর সংস্কৃতিতে আঘাত করেছিলেন। আমরা নাস্তিকেরা কলম দিয়ে ধর্মকে আঘাত করি; কখনোই কোনো ধার্মিককে শারীরিকভাবে আঘাত করি না, ধার্মিকদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দিই না। কারণ আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে অন্যদের বিরক্ত না ক'রে মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চয় আছে। আমরা কোনো প্রাচীর নই, আমরা উন্মুক্ত তেপান্তর। আমরা কেবল ধার্মিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে বিজ্ঞান এবং যুক্তির আলো ফেলতে চাই। আমাদের আলো গ্রহণ করা বা না করা ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা। কিন্তু মুহাম্মদ আরবের মানুষকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছিলেন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ক'রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর পরবর্তীতে মুহাম্মদের সাগরেদরা তার বিধ্বংসী মতবাদের প্রচার-প্রসারে সশস্ত্র আগ্রসন চালায় ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর; একের পর এক নগরে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, বিপন্ন করে জনজীবন। মুসলমানদের অস্ত্রের মুখে কেউ হয় ধর্মান্তরিত, কেউবা অস্ত্রের আঘাতে হয় লোকান্তরিত, ধুলিস্যাৎ হয় মানবতা; অবলুপ্ত হয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতি। কিন্তু এই সত্য কথাগুলো যদি আমি বাবাকে বলি তাহলে বাড়িতে যুদ্ধের আবহ তৈরি হবে, এমনিতেই আজ থেকে রোজা শুরু হওয়ায় এদের অন্তরে টগবগ ক'রে ফুটছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য!

ফলে আমি আর সেই ইতিহাস না তুলে শুধু বলি, 'বাবা, ধার্মিকরাও কিন্তু নাস্তিকদের সমালোচনা করে, গালাগালি করে; কিন্তু নাস্তিকরা তার জবাব অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, দেয় কলমের মাধ্যমে। পৃথিবীতে আরো অনেক ধর্মের সমালোচনা হয়, কিন্তু কোনো ধর্মের মানুষই মুসলমানদের মতো চাপাতি দিয়ে মানুষ হত্যা করে না।'

বাবা কিছু বলতে যাবে, এরই মধ্যে দাদী এসে হাজির, 'অই তুই আমার পোলারে কি উল্টা-পাল্টা বুঝাস!'

আমি দাদীর উদ্দেশে বলি, 'তোমার পোলারে আমি আর কি বুঝামু, ছোটবেলায় যা বুঝাইয়া দিছো তাতেই আর সব বুঝার রাস্তা বন্ধ! যাই, তোমার সাথে এখন আমার ঝগড়া করার ইচ্ছে নাই।'

আমি উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াই দাদীর কথা শুনতে শুনতে, 'আমার পোলা তর মতো নাস্তিক নি, ধর্ম-কর্ম নাই, সমাজ নাই, আত্মীয়-কুটুম নাই, যহন দোজখে যাবি তহন বুঝবি...!'

দাদী বলতেই থাকে। ঘরে এসে বারান্দায় চোখ পড়তেই দেখি রেলিংয়ে একটা কবুতর ব'সে ঘরের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, নিশ্চয় আমাকে খুঁজছে! আমার পোষা কবুতর। আমি রান্নাঘরে গিয়ে বাটিতে কিছু চাল নিয়ে দরজা খুলে পা বাড়াই ছাদের উদ্দেশে।

এই কবুতর পোষা নিয়েও কি আমাকে কম লড়াই করতে হয়েছে! বছর তিনেক আগে বাবাকে কবুতর পোষার কথা বলতেই বাবা বলেন, 'তোমার চাচা যদি অনুমতি দেয় তো পোষো, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

চাচাকে বলতেই চাচার সাফ জবাব, 'বাড়িতে কবুতর পোষা যাবে না। কবুতরের বিষ্ঠায় ছাদ নোংরা হবে, বারান্দার রেলিংয়েও উড়ে এসে বসবে, মলত্যাগ করবে। আর বাড়িতে পশুপাখির মলমূত্র ছড়ানো থাকলে সে বাড়িতে ফেরেশতা আসে না। অবশ্য সেসব তোমার বোঝার কথা না।'

উহ, ফেরেশতা, ফেরেশতা, ফেরেশতা! উঠতে বসতে এদের মুখে শুধু ফেরেশতা। সারা পৃথিবীতে দেড়শো কোটির বেশি মুসলমানের কোটি কোটি বাড়ি, সেসব বাড়িতে না গিয়ে এই বাড়িতেই যেন ফেরেশতা ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে! আমি আর কবুতরের বিষয়ে কোনো কথা বলি নি। চুপচাপ একদিন ঘরসহ তিন জোড়া কবুতর কিনে নিয়ে আসি, ছাদের পশ্চিমদিকে খাড়া করি কবুতরের ঘর।

অফিস থেকে ফিরে আমার কবুতর কেনার কথা শুনে চাচা নিজের ঘরে আর ড্রয়িং রুমেই হম্বিতম্বি করেছিলেন, সেসব আমার কানেও এসেছিল। এ বিষয়ে বাবা-মা কিংবা দাদীর সাথে তার কোনো আলাপ হয়েছিল কিনা আমি জানি না। তবে আমাকে আর চাচা কিছু বলেননি, বাবাও না। মা শুধু বলেছিলেন, 'তোর চাচার আপত্তি সত্ত্বে কবুতর আনতে গেলি ক্যান? তোরে তো কথা শুনতে অয় না, শুনতে অয় আমাগো।'

ব্যাস ওই পর্যন্তই। এই তিন বছরে আমার কবুতরের বহর বেড়েছে, এখন ত্রিশটার বেশি। এই তিন বছরে সত্যিই আমি বাড়িতে ফেরেশতা দেখিনি, যেমন দেখিনি তার আগেও!

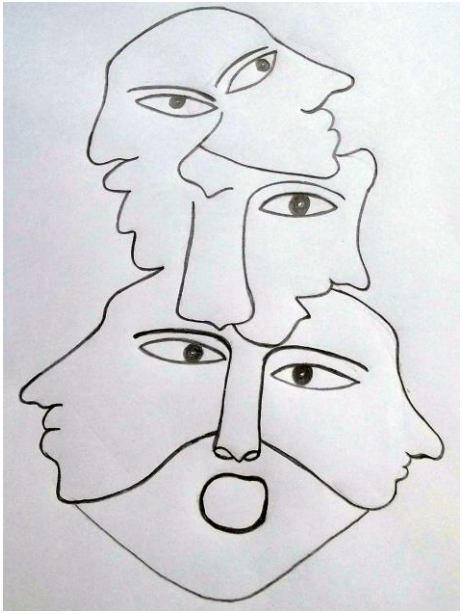
আমি ছাদে ওঠা মাত্র আমার হাতে বাটি দেখে কবুতরগুলো বাকবাকুম করতে করতে চঞ্চল হয়ে উঠে। ছাদের নিচু টুলটায় বসতেই ওরা ওদের ঘর আর রেলিং ছেড়ে নিচে নেমে আসে। আমি কিছু চাল ছড়িয়ে দিই আর কিছু নিই হাতের তালুতে। কিছু কবুতর ছাদের ছড়ানো চাল খুঁটে খায়, আর কিছু প্রায় আমার কোলের মধ্যে এসে হাত থেকে খায়। আমি হাত ক্রমশ কাছে টেনে আনি, কোলের কাছে নিয়ে খাওয়ালেও ওরা আমাকে ভয় পায় না। হাতের তালুতে ওদের ঠোঁটের ঠোক্কর আমি ভীষণ উপভোগ করি। কবুতরগুলোকে খাওয়াতে খাওয়াতে আমার একটা গল্প মনে আসে-

'পড়ন্ত বিকেলে সদ্য ধান কাটা ক্ষেতে একদল কবুতর কণ্ঠে বাকবাকুম সুর তুলে নেচে নেচে ঝ'রে পড়া পাকা ধান খুঁটে খেতে থাকে। কখনো একে অন্যের সাথে খুনসুটি করে, কখনোবা কোনো দুষ্টু সঙ্গীর দুষ্টুমি থেকে রেহাই পেতে উড়ে গিয়ে বসে অন্য জায়গায়। আর এই ক্ষেতেই একাধিক ফাঁদ পেতে সামান্য তফাতে ব'সে থাকে এক নিষ্ঠুর শিকারি। নাচতে নাচতে খেতে খেতে একটা কবুতর হঠাৎ শিকারির ফাঁদে আটকা প'ড়ে ঝাপটাঝাপটি করতে থাকে। তা দেখে আতঙ্কিত অন্য কবুতরগুলো উড়ে দূরে গিয়ে পুনরায় খেতে আরম্ভ করে। তবে এবার তারা বেশ সতর্ক। এরই মধ্যে শিকারি দ্রুত ছুটে গিয়ে ফাঁদে আটকা পড়া কবুতরটাকে ধরে, তারপর হাতের ছুরি দিয়ে আড়াই পোচে কবুতরের গলাটা কেটে ফেলে। রক্তাক্ত কবুতরটি কিছুক্ষণ ঝাপটাঝাপটি করে শিকারির হাতের মধ্যে, অল্পক্ষণ পরই তার প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ায় চিরতরে থেমে যায় ডানার চপলতা।

এরই মধ্যে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও ক্ষেতের অন্য প্রান্তে আরেকটি কবুতর ফাঁদে আটকা পড়ে। যথারীতি শিকারি ছুটে গিয়ে কবুতরটিকে ধরে একইভাবে জবাই করে। তারপর ক্ষেতের অন্য প্রান্তে আরেকটি...।

সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি অবলোকন করে একজন মানুষ। নৃত্য করতে করতে কবুতরদের ধান খুঁটে খাওয়া তিনি বেশ উপভোগ করছিলেন; আবার শিকারির হাতে কবুতরগুলোর জবাই হওয়াও দেখেন নীরবে দাঁড়িয়ে, তারপর মৃত কবুতরগুলো নৃত্য করতে করতে কি ভুল করেছিল সেই বিষয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো মানুষটি কে?

একজন মডারেট বা মধ্যপন্থী মুসলমান।



আজ আবার এক কাণ্ড ঘটে গেছে বাসায়, না আমাকে নিয়ে নয়। পাঁচতলার একটা বাসা খালি হবে আগামী মাস থেকে, টু-লেট টাঙানো হয়েছে। টু-লেট দেখে সকালের দিকে বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বাসা দেখতে। আমাদের বাড়ির দারোয়ান এরশাদুল তাকে বাসা দেখায়, বাসা পছন্দ হওয়ায় ভাড়া নিয়ে কথা বলার জন্য ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসেন, ড্রয়িংরুমে বসিয়ে বাবা তার সঙ্গে আলাপ করেন। ভদ্রলোকের নাম ইমন, একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। ভাড়াটিয়া হিসেবে বাবা ইমনকে পছন্দও করেন। ছোট পরিবার; স্বামী-স্ত্রী আর তাদের এক পুত্রসন্তান। ইমনের অফিস এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ জমানো আলাপও করেন দু'জন। ইমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে বিকেলেই তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন বাসাটা দেখানোর জন্য আর তখনই অ্যাডভান্স ক'রে যাবেন। ইমন চ'লে গেলে বাবা তার প্রশংসা করেন এই ব'লে যে ছেলেটা খুবই ভদ্র, বিনয়ী, সজ্জন; ভাল পরিবারের সন্তান, বাবা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন ইত্যাদি।

বিকেলে আমি তখন ড্রয়িংরুমে ব'সে ডিসকাভারি দেখছি। কলিংবেল বাজতেই আমি উঠে পা বাড়াই কিন্তু আমার আগেই দরজার কাছে পৌঁছে যান মা, বোধ হয় তিনি নিজের ঘর থেকে ড্রয়িং কিংবা ডাইনিংয়ের দিকে আসছিলেন। দরজা খুলেই থমকে দাঁড়ান মা, মায়ের সামনে দাঁড়ানো ইমন আর পিছনে তার স্ত্রী। ইমন বলেন, 'সকালে বাসা দেখে গেছি, অ্যাডভান্স করতে এসেছি।'

সম্ভবত মা কিছুটা ইতস্তত, তাই বেশ কয়েক মুহূর্ত পর বলেন, 'আসেন।'
মা ঘুরে দাঁড়ালে তার মুখাবয়বের অসন্তুষ্টির ভাষা পড়তে আমার একটুও দেরি হয় না। আমি টেলিভিশন বন্ধ ক'রে নিজের ঘরে প্রবেশ করি। ইমন এবং তার স্ত্রীকে ড্রয়িংরুমে বসতে দিয়ে মা যান নিজের ঘরে, সেখানে বাবা আছেন। স্বাভাবিকের চেয়েও কিছু বেশি সময় পর বাবা আসেন ড্রয়িংরুমে। বাবা কিছুটা বিব্রত, তার এই বিব্রত ভাবের কারণ আগেই আঁচ করতে পেরে আমি আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান সজাগ রাখি।

বাবা বলেন, 'ব্যাপারটা কীভাবে আপনাদেরকে বলি, বলতে সংকোচও হচ্ছে। আসলে আপনাকে যে ফ্ল্যাটটা দেখিয়েছি সেটায় আমার বড়বোন উঠবে। আমার বড়বোন নাকি মাকে আগেই বলেছে, কিন্তু মা আমাকে জানাতে ভুলে যাওয়ায় টু-লেটটা আর নামানো হয় নি। শুধু শুধু আপনাদেরকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর ইমন বলেন, 'ঠিক আছে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইমনের স্ত্রী বলেন, 'আপনার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। হয়তো কোনো কারণে আপনি আমাদেরকে বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন না। সেটা আপনি না দিতেই পারেন, কিন্তু সেটা শুরুতে বলাই ভদ্রতা। কেননা, আমাদের সময়ের মূল্য আছে। চলো...।'

দারুণ স্মার্টলি কথাগুলো বলেন ইমনের স্ত্রী। বাবার মিথ্যা বলার ধরনটা বেশ অপটু, ফলে ইমনের স্ত্রীর মনে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধা অস্বাভাবিক নয়। আবার এমনও হতে পারে যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা আগেও পড়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কিছু আঁচ করতে পেরেছেন। উঠে পড়েন দু'জনই। বাবা বলেন, 'না, না, আপনাদের বাসা ভাড়া দেব না কেন! আসলে আমার মায়ের ভুলেই...।'

'রোজার দিনে মিথ্যা বলতে হয় না আংকেল। যিনি দরজা খুলে দিলেন তার এবং আপনার দৃষ্টি হোঁচট খেয়েছে আমার হাতে আর কপালে, যা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এতো আড়াল করার কি আছে, সোজা কথাটা সোজাভাবে ব'লে দিলেই তো পারেন যে আপনারা হিন্দুদের বাড়িভাড়া দেন না!' ইমনের স্ত্রীর ইয়র্কারে বাবা এবার ক্লিনবোল্ড!

ইমন স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'বাদ দাও, চলো। ঠিক আছে আংকেল। আসি।'

বাসা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান দু'জনই। আমি ঘর থেকে ডাইনিংয়ে যাই, টেবিলে রাখা জগ থেকে একগ্লাস জল খেয়ে দরজা বন্ধ করি। এরই মধ্যে আড়চোখে তাকিয়ে প'ড়ে ফেলি বাবার মুখের ভাষা। অপরাধীর মতো বাবা ব'সে থাকেন সোফায়। আমি বলি, 'কিছু মনে ক'রো না বাবা, এর পর থেকে কেউ বাসা ভাড়া নিতে এলে হয় তাকে

সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রো যে সে সুন্নি মুসলমান নাকি অন্য কোনো সম্প্রদায়ের, অথবা তোমাদের এই ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করো। তাহলে মানুষকে হয়রানি করা হবে না আর তোমাদেরকেও অপমানিত হতে হবে না। নিজে না পারো এরশাদুলকে ব'লে রেখ যাতে টু-লেট দেখে কেউ এলে ও প্রথমেই জেনে নিতে পারে।'

আসলে যতো গোল লেগেছে ভদ্রলোকের ইমন নামটা নিয়ে। ইমন নাম শুনে বাবা ধ'রে নেন ভদ্রলোক মুসলমান, ইমন নাম যে হিন্দুদেরও হতে পারে বাবা সেটা ভাবেন নি। আর ইমনকে দেখে এবং তার কথা শুনে বাবা অপছন্দনীয় কিছু পান নি, ফলে তিনি তাকে বাড়িভাড়া দিতে চান এবং তার প্রশংসাও করেন মা এবং দাদীর কাছে। কিন্তু ইমনের স্ত্রীর সিঁথির এক চিলতে সিঁদূর এবং দুই হাতের শাঁখা পাল্টে দিয়েছে সবকিছু। মা ইমনের স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর দেখে দরজায় থমকে দাঁড়ান! তারপর বাবাকে গিয়ে বলার পর বাবা ইমনকে বাড়িভাড়া দেবার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।

কি হতে চলেছে আমি সেটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম ভদ্রমহিলার সিঁথির সিঁদুর দেখেই, যদিও এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই; তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে এখন আমি নীরব দর্শক মাত্র। আমাদের বাড়িতে সুন্নি মুসলমান ব্যতিত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে ভাড়া দেওয়া হয় না। এমনকি আহমদিয়া মুসলমানদেরকেও না। একবার একটা পরিবার উঠেছিল, কিন্তু কিছুদিন পর যখন জানা যায় যে তারা সুন্নি নয় আহমদিয়া, তখন অন্য কারণ দেখিয়ে তাদেরকে বাড়িছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয় এবং তারা বাড়ি ছেড়েও যায়। আহমদিয়া পরিবারটি বাড়ি ছাড়ার পর দাদী ওই ফ্ল্যাটে গোলাপজল ছিটিয়ে দেন আর বলেন, 'আধা হিন্দুগুলা আমার বাড়িডা নাপাক কইরা দিয়া গেল, হ্যাগো মাইয়া মানুষও নি মসজিদে যায়; হিন্দুগো মতো চাল-চলন!'

হিন্দুরা ঘরে দেবদেবীর ছবি-মূর্তি রাখে, পূজা দেয়, শঙ্খ বাজায়, উলু দেয়; বাড়ি নাকি উপাসনালয় বানিয়ে ছাড়ে! বাড়িতে কোরান শরীফ-হাদিস শরীফ আছে, তা যদি নামাক হয়ে যায়! তাছাড়া বাড়িতে দেবদেবীর ছবি-মূর্তি থাকলে নাকি ফেরেশতা আসে না! আমি এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও ধোপে টেকে নি, এবাড়িতে আমি নিজেই সংখ্যালঘু! প্রতিবাদ করলে বাবা আর দাদী আমাকে হাদিস শুনিয়েছিলেন। একবার নাকি মুহাম্মদের স্ত্রী আয়েশা বাজার থেকে একটি বালিশ বা গদি কিনে এনেছিলেন যার মধ্যে ছবি ছিল। মুহাম্মদ ঘরে প্রবেশের সময় যখন সেই ছবি দেখেন তখন তিনি ঘরে প্রবেশ না ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যান। আয়েশা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'এই বালিশ কীসের জন্য?'

আয়েশা উত্তর দেন, 'এটা আপনার জন্য খরিদ ক'রে এনেছি, যাতে আপনি বসতে পারেন বা হেলান দিতে পারেন।'

মুহাম্মদ তখন বলেন, 'এই ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে যা তুমি সৃষ্টি করেছ তার প্রাণ দাও।' তিনি আরও বলেন, 'যে ঘরে প্রাণির ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

অন্য আরেকদিন মুহাম্মদের কাছে জিবরাঈলের আসার কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও জিবরাঈল না আসায় মুহাম্মদ তার হাতে থাকা লাঠিটা ফেলে দেন, তবু জিবরাঈল আসে না। এরপর তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে চৌকির নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা দেখতে পান। কুকুরের বাচ্চাটি কখন ঢুকেছে জানতে চাইলে আয়েশা জানান যে তিনি জানেন না। এরপর মুহাম্মদের নির্দেশে কুকুরটিকে বের ক'রে দেওয়া হয়, আর একটু পরই জিবরাঈল আসে। ওয়াদা দিয়েও সময় মতো আসতে না পারার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে জিবরাঈল মুহাম্মদকে জানায়, এতোক্ষণ ঘরে যে কুকুরটা ছিল সেটাই তাকে আসতে বাধা দিয়েছিল, কেননা কোনো ঘরে কুকুর বা প্রাণির ছবি থাকলে সেই ঘরে সে প্রবেশ করে না।

সঙ্গত কারণেই আমাদের বাড়িতে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান ভাড়াটিয়া তোলা হয় না। আমার ঘরে অবশ্য পেইন্টিং, ভাস্কর্য এবং মুখোশ আছে। তবে এর জন্য আমাকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে হয়েছে। প্রথম যেদিন আমি আমার ঘরের দেয়ালে একটি মুখোশ লাগাই সেদিনই মুখোশটি ফেলে দেবার নির্দেশ জারি করেন বাবা এবং দাদী।

আমিও পিছু হটার পাত্র নই। বলি, 'তোমরা যদি কোরান-হাদিস অনুযায়ী সহি ইসলামী জীবন-যাপন করো তাহলে আমি অবশ্যই মুখোশটি ফেলে দেব।'

বাবা-মায়ের সামনে খেঁকিয়ে উঠেন দাদী, 'আমরা সহি ইসলামী জীবন-যাপন করি না তো কি মালাউন গো মতো জীবন-যাপন করি?'

'অবশ্যই তোমরা সহি ইসলামী জীবন-যাপন করো না। বাড়ি থেকে আগে টেলিভিশনটা বের ক'রে নাটক-সিনেমা দেখা বন্ধ করো; সাবান-শ্যাম্পু-হারপিক থেকে শুরু ক'রে নানা ধরনের যেসব পণ্যের মোড়ক বা লেবেলে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির ছবি থাকে সেসব পণ্য বর্জন করো; যেসব টাকার ওপর বঙ্গবন্ধুর ছবি, পাখির ছবি, বাঘের জলছাপ আছে সেগুলোর ব্যবহার বন্ধ করো; যদি করতে পারো আমি অবশ্যই মুখোশ ফেলে দেব!'

বাবা হাঁ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দাদী গজগজ করতে করতে সামনে থেকে সরে পড়েন। তারপর বাবাকে বলি, 'বাবা, ধর্ম নিয়ে রোজ রোজ তোমাদের সাথে বাক্‌যুদ্ধ করতে আমার ভাললাগে না। আমার নিজের পছন্দ-রুচি অনুযায়ী আমি

থাকতে চাই, এতে যদি তোমাদের অসুবিধা হয় বলো, আমি হলে গিয়ে থাকবো। সাভারের দিকে দুটো টিউশনি করবো, ওতেই আমার চ'লে যাবে।'

এই শেষ কথাটায় কাজ হয়, তারপর থেকে আমাকে আর এসব ব্যাপারে ঘাটায় না কেউ। আমার ইসলাম ত্যাগের প্রথম আড়াই বছর আমি মানসিকভাবে ভীষণ রকম নির্যাতিত হয়েছি; এরপর থেকে আমি কৌশল পাল্টেছি, আমাকে মানসিকভাবে পীড়ন করতে এলে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমিও পাল্টা আক্রমণ করি। এতে ফলও পেয়েছি, আমার ওপর মানসিক পীড়ন আগের চেয়ে কমেছে। সকলে বুঝেছে যে আমি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে কথা বলি না, ধর্মগ্রন্থগুলো রীতিমতো ঘাটাঘাটি করেই তর্ক করি। তাছাড়া আমি যে আর সেই গোপাল টাইপের ছেলেটি নেই, এখন খুব জেদি হয়ে উঠেছি সেটা বাড়ির সকলেই টের পেয়েছে। কিন্তু যতোই নাস্তিক হই আমি তো তাদের সন্তান, একমাত্র ছেলে বাড়ি ছাড়া হ'লে ব্যথাটা যে তাদের বুকেই বাজবে; ফলে আজকাল তারা আমার স্বাধীনতায় আগের মতো ব্যাঘাত ঘটায়না। আমি আমার ঘরের দেয়ালে আরও মুখোশ লাগিয়েছি, একটা পেইন্টিং ঝুলিয়েছি, বুক শেলফের ওপর দুটো ভাস্কর্য আর বেশ কয়েকটা পুতুল এনে রেখেছি। আর এরপর থেকেই সম্ভবত গুণাহ হওয়ার ভয়ে ছোট আপু ব্যতিত আমার ঘরে খুব দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আমাদের বাসায় ঠিকা কাজ করে আসমা আপা, সে আমার ঘর ঝাড়ু দিয়ে মোছে। দাদী তো আমার ঘরের ছায়াই মারায় না। বাবার আসার প্রয়োজন পড়ে না। খুব দরকার পড়লে মা কখনো-সখনো আসে। ছোট আপু আসে, ঘরটা এলোমেলো থাকলে ও মাঝে মাঝে গুছিয়ে দেয়।

ছেলেবেলায় আমরা কোনোদিন পুতুল খেলি নি, মানে আমাদেরকে কোনো ধরনের পুতুল কিনে দেওয়া হয় নি; কারণ পুতুল তো প্রাণির আদলে গড়া, তাই পুতুল খেলাও হারাম! কী আশ্চর্য একটা ধর্ম! বাচ্চারা পুতুল খেলবে না? আমাদেরই মতো আরো হাজার হাজার পরিবারের বাচ্চারা ছেলেবেলায় পুতুল খেলে না, পুতুলের সঙ্গে কথা বলে না, পুতুলের বিয়ে দেয় না, পুতুলকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমায় না, কোনোরকম বন্ধুত্ব হয় না পুতুলের সঙ্গে! অথচ পুতুল বাচ্চাদের কল্পনা শক্তি বাড়ায়, মানসিক বিকাশ ঘটায়।

বাবা-মা এখনো স্বপ্ন দেখে যে বয়স বাড়লে হয়তো আমার মাথা থেকে নাস্তিকতার ভূত ছেড়ে যাবে; এই ভেবেই তারা তাদের আল্লাহ্‌কে ডাকেন, ইসলামের দিকে আমার মন ফেরানোর জন্য দোয়া-দরূদ পড়েন!

আমার কম্পিউটারের মাউসটা নষ্ট হয়ে যায় হঠাৎ, তাই শেষ বিকেলে বাইরে বেরোই মাউস কিনতে। মিরপুর ১০ নম্বর না গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যাই ১ নম্বরে, উদ্দেশ্য হেঁটে সন্ধেটা বাইরে কাটিয়ে আসা। ইফতারের কিছুক্ষণ আগে মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের তিনতলার একটা দোকান থেকে মাউস কিনে আবার ফেরার পথ ধরি। ২ নম্বর চত্বর, মানে

সনি সিনেমা হলের কাছে এসে মনে হয় এখনই বাসায় ফিরে কি করবো? তার চেয়ে ভিড়হীন ফুটপাতে হাঁটি। সোজা না গিয়ে পা বাড়াই চিড়িয়াখানা রোডের দিকে, রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে চিড়িয়াখানা আর বোর্টানিক্যাল গার্ডেনের গেটের মুখে। আমি হাঁটি আর আশপাশের দোকানগুলোর দিকে তাকাই। দোকানের লোকজন মাথায় টুপি প'রে ইফতার সামনে নিয়ে ব'সে আছে আযানের অপেক্ষায়, একটু পরই তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে চতুর্দিক থেকে একের পর এক হেঁকে উঠে মসজিদের মাইক।

ফুটপাত ভাঙাচোরা, কোথাওবা তা গাড়ির গ্যারেজগুলোর দখলে, রাস্তারও প্রায় অর্ধেক জুড়ে গাড়ি রাখা। রাস্তা এবং ফুটপাত দখল করেই চিড়িয়াখানারোডে গাড়ি মেরামত করা হয়। গ্রিলের দোকানগুলো ফুটপাত দখল করেই গ্রিল কাটে-ঝালাই করে, ছিটকে বেরোয় আগুনের ফুলকি; এর ভেতর দিয়েই মানুষকে চলাচল করতে হয়। সারাক্ষণ লোহা-লক্কড়ের শব্দে কানে তালা লেগে যায়। এই যে ফুটপাত আর রাস্তার দখল নিয়ে দিনের পর দিন এরা পথচারীদের অসুবিধায় ফেলে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে, এসব দেখার জন্য এই শহরে কেউ আছে বলেই মনে হয় না। এখন অবশ্য বেশ সুনসান, সবাই ইফতারে ব্যস্ত।

রাইনখোলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে বটগাছের নিচে দাঁড়াই। যাত্রীর অপেক্ষায় কোনো বাস নেই, যাত্রীও নেই বাসের অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ পর পর একটা-দুটো রিক্স যাচ্ছে-আসছে। রাস্তার ওপাশেই কাঁচা-বাজার, ভিড় নেই ওখানেও। এই ফাঁকা রাস্তা দেখে মনে আফসোস হয়, ইস্, সবসময় যদি রাস্তা এমন ফাঁকা থাকতো! মিরপুরের ভিড়টা আজকাল দুঃসহ লাগে। বছর পাঁচ-ছয় আগেও মিরপুরে এতো মানুষের চাপ ছিল না। আর দশ-বারো বছর আগের আমার কৈশোরের কথা মনে পড়লে তো কেবলই দীর্ঘশ্বাস ঝ'রে পড়ে বুক থেকে! ১০ নম্বর চত্ত্বর থেকে বাসার দিকে হেঁটে এলে কারো গায়ের সাথে গা লাগতো না, ফুটপাতে এখনকার মতো এতো হকার ছিল না। এতো মার্কেট আর দোকানও ছিল না। এখন গোলচত্ত্বরে গিয়ে দাঁড়ালে কেবল ব্যস্ত মানুষের চতুর্মুখী স্রোত চোখে পড়ে; এ ওকে ঠেলে বা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ছোটে। এতো বাস তবু ঠেলাঠেলি ক'রে একে-অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাসে উঠতে হয়। অথচ পাঁচ-ছয় বছর আগেও মিরপুরে এতো বাস ছিল না, এখন নতুন নতুন কতো বাস নেমেছে কিন্তু তাতেও ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। চতুর্দিকের রাস্তায় যানজট, বাসগুলোর মধ্যে চলে আগে যাবার প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষও; প্রাণ যায় মানুষের! পৃথিবীর বসবাসের অযোগ্য বড় শহরগুলোর তালিকায় ঢাকা এখন প্রথম দিকেই থাকে। বাবার মুখে শুনেছি যে আগে মিরপুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, একতলা-দু'তলা বা টিনের বাড়ি, ঘরের আশপাশে গাছপালা; রাস্তার মোড়ে মোড়ে বট, আম, জাম আর কৃষ্ণচূড়া গাছ; যেখানে ব'সে মানুষ চা খেতে খেতে আড্ডা দিতো; বাচ্চাদের খেলার জন্য খোলা জায়গাও ছিল অনেক। বাবার কথা কি বলবো, আমরাও তো কতো খেলার জায়গা পেয়েছি। চোখের সামনে সেইসব জায়গা বৃক্ষশূন্য হয়ে গেছে, গড়ে উঠেছে বিল্ডিং।

দেশের বেশিরভাগ মধু রাজধানীতে এনে জমা ক'রে রেখেছে সরকার, মানুষ তো সারাদেশ থেকে পিঁপড়ার মতো ছুটে আসবেই। কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সুবিধা সারাদেশে ছড়িয়ে দিলে আজ ঢাকা শহরের এই দূরাবস্থা হতো না। তার ওপর বছর বছর নদী ভাঙনে বিলুপ্ত হচ্ছে জনপদ; সরকার তাদের পুনর্বাসন এবং কর্মসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। ফলে জমিজমা-ঘরবাড়ি হারানো নিঃস্ব মানুষ দুটো খেয়ে বাঁচার জন্য ছুটে আসছে রাজধানীর দিকে। কোথাও কাজ না পেলে গুলিস্থান কিংবা বঙ্গবাজার থেকে কাপড়-চোপড় বা অন্য কোনো পণ্য কিনে এনে পাতিনেতা আর পুলিশকে টাকা দিয়ে ফুটপাতে যত্র-তত্র ব'সে যাচ্ছে বিক্রির জন্য। মেইনরোড তো বটেই ক্রমশ ভেতরের দিকের রাস্তার ফুটপাতও হকারদের দখলে চ'লে যাচ্ছে। তবু তো এরা কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিচ্ছে, কিন্তু ঢাকামুখী এইসব নিঃস্ব মানুষের আরেকটা অংশ জড়িয়ে পড়ছে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো অপরাধে; পুলিশের প্রশ্রয়েই এই অপরাধ তারা করছে, নাকাল হচ্ছে নগরবাসীর জীবন। এমনিতেই নগরবাসী নাকাল নয়-দশ ঘন্টার দীর্ঘ কর্মঘন্টা, জ্যামে ঠেলে কর্মস্থলে যাতায়াতে তিনচার-ঘন্টা, বছর বছর ঊর্ধ্বমুখী বাড়িভাড়া, লাগামহীন বাসভাড়া, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বেতন, হাসপাতাল সেবার অমানবিক মূল্য, ওষুধের উচ্চ মূল্য, ঘন ঘন গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যনৈমিত্তিক পন্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে। তার ওপর চুরি, চিনতাই বা অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা কারো কারো জীবনে মরার ওপর খরার ঘা হয়ে আসে। পুলিশও কি কম হয়রানি করে? এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে, এখন যদি পুলিশ এসে আমার পকেটে এক পুরিয়া গাঁজা বা গোটাকতক ইয়াবা গুঁজে দিয়ে আমাকে অপরাধী বানিয়ে মামলা করার ভয় দেখিয়ে আমার পরিবারের কাছ থেকে মোটা টাকা খসিয়ে নেয়, তাহলে কারো কিচ্ছু করার নেই; এমন ঘটনা আজকাল হরহামেশাই ঘটে! একটা-দুটো ঘটনা হয়তো মিডিয়ায় আসে, মিডিয়াকে দেখাতে দোষী পুলিশকে প্রত্যাহার করা হয় কিন্তু পুলিশের সাজানো বিচিত্র ধরনের আরো হাজারো ঘটনা ঘটে এবং তা আমাদের অগোচরেই থেকে যায়।

পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে আমার দাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, আবার বাবাও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন; বাপ-দাদার সঙ্গে এই ব্যাপারে আমার দারুণ মিল, আমার দেখা শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোর কথা মনে ক'রে আমিও এরই মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু করেছি।

আমি আবার পা চালাই। রাইনখোলা মোড় থেকে ঢাল বেয়ে সোজা হেঁটে বিসিআইসি স্কুলের সামনের অবিভাবকদের জন্য নির্মিত বেঞ্চে বসি। আমি বিসিআইসি স্কুল এবং কলেজে পড়েছি। ঘনীভূত অন্ধকারে এখানে এসে বসতেই হাজারো স্মৃতি বুদবুদের মতো ঠেলে ওঠে মনের ভেতর; কতো দুষ্টুমি, মারামারি আর আড্ডায় কেটেছে সময়। কতো বন্ধু-বান্ধব ছিল, এখন মাত্র কয়েকজনের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা জায়গায়, কেউবা চ'লে গেছে দেশের বাইরে।

স্মৃতিকাতর হয়ে অনেকটা সময় ব'সে থাকার পর আমি উঠে পড়ি, কমার্স কলেজ রোড ধ'রে পা চালাই বাড়ির দিকে। আজ চতুর্থ রোজা শেষ হলো, এখনও কেনাকাটার ধুম লাগে নি ব'লে ইফতারের পরও রাস্তা বেশ ফাঁকা।

বাসার সদরগেটের লক খুলে গ্যারেজে প্রবেশ করতেই শোরগোল শুনতে পাই। চাচা-চাচী আর বড় ফুফু-মেজো ফুফুর গলা, মনে হয় দোতলায় কিছু হয়েছে। আমাদের দারোয়ান এরশাদুল নিচতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কান খাঁড়া ক'রে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। এরশাদুল আমার সমবয়সী অথবা এক-আধ বছর এদিক-ওদিক হবে, একটা জাত হারামি! মেজো ফুফুর শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ওর বাড়ি। মেজো ফুফু-ই ওকে এনেছে, সেই সূত্রে ও মেজোফুফুর চ্যালা। ভুরি ভুরি মানুষের খবর মেজোফুফুর সংগ্রহে থাকে। আশ-পাশের কার বাড়িতে কি হয়, কার ছেলে কি করেছে, কার মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, কোন বাসার ভাড়াটিয়া কেমন, কোন কোন বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে, চাচীর দূর সম্পর্কের কোন বোনের ডিভোর্স হয়েছে কিংবা চাচার কোন কলিগের মেয়ের বিয়েতে পঞ্চাশ ভরি গহনা দিয়েছে, মেজো ফুফার কোন খালাতো ভাই ঘুষ খেয়ে হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছে, আমাদের ছয়তলার ভাড়াটিয়া মানে আমার চাচীর বান্ধবী তার খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে কেন পরকীয়া করছে, মালিহার কোন বান্ধবীর বাবা-মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে, কার কার সংসারে শান্তি নেই; এইসব খবরে মেজোফুফুর মাথা ঠাসা থাকে। তাই মেজো ফুফুকে আমি বলি সিএনএন, আর মেজো ফুফু সিএনএন হ'লে এরশাদুল দুঁদে রিপোর্টার! আশপাশের তাবৎ বাড়ির দারোয়ান আর কাজের বুয়াদের সঙ্গে ওর যতো সখ্যতা, সেই সূত্রে ও সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে সিএনএন এ লোড করে! একটা সহজ বিষয়েও ইনিয়ে-বিনিয়ে প্যাঁচ লাগায়, এর কথা ওর কানে লাগায়। ভাড়াটিয়াদের খুঁত খুঁজে বের ক'রে মেজোফুফু তো বটেই বাবা-মা, চাচা-চাচী এবং দাদীরও কান ভাঙায়। ওর কথায় বাবা বেশ কয়েকটা পরিবারকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছিল।

আমাকে দেখে ও সিঁড়ির কাছ থেকে স'রে আসে। আমি মুখে কিছু না ব'লে শুধু চোখে চোখ রেখে আঙুল দিয়ে ওর ঘরের দিকে নির্দেশ করতেই ও সুড়সুড় ক'রে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আমিও সিঁড়ির দিকে পা বাড়াই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পাই চাচার কণ্ঠস্বর, 'বাড়ি করার টাকা তো মারায়ে আনছিলাম!'

আমি সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই ঘরের ভেতরে দরজার কাছে দাঁড়ানো চাচার বাম গালে ঠাস ক'রে চড় মারেন দরজার বাইরে দাঁড়ানো বড়ফুফু। আমার আশঙ্কা হয় যে চাচা যদি আবার বড় ফুফুর গায়ে হাত তোলে! বদ মেজাজি চাচার পক্ষে সেটা সম্ভব কি অসম্ভব সে ব্যাপারে আমি অবশ্য নিশ্চিত নই। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে বড়ফুফুর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। আমার সামনে বড়ফুফুর হাতে চড় খেয়ে চাচা কিছুটা হতভম্ব এবং নীরব! চাচার হয়ে পিছন থেকে কথার লড়াই চালিয়ে যান চাচী, আর তিনতলায় আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের সিঁড়িতে

দাঁড়িয়ে নিচের দিকে গলা বাড়িয়ে ফোঁড়ন কাটেন মেজোফুফু। চাচী বলেন, 'কতো বড় সাহস, গায়ে হাত তোলে!'

বড়ফুফু অভিভাবকের গলায় বলেন, 'আমার ভাই বেয়াদ্দপি করছে আমি মারছি তাতে তোমার কী! মায় তো প্যাটের থেইকা বাইর কইরা দিয়াই খালাস, ত্যালতুল মাইখা, নাওয়াইয়া-খাওয়াইয়া এগুলারে বড় করছি তো আমি, তহন কই আছিলা তুমি! জবর দরদ দ্যাহাইতাছো!'

এই কথার পর চাচা আর কোনো কথা বলেন না। দরজার মুখ থেকে স'রে গিয়ে ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসেন।

তিনতলার সিঁড়ি থেকে মেজোফুফু গলা চড়ান, 'আসছো কেন তুমি? আইসাই তো ঝামেলা পাকাও! আম্মা তোমারে আসতে নিষেধ করে তবু নির্লজ্জের মতো কেন আসো তুমি!'

এবার তিনতলার সিঁড়ির দিকে স'রে ওপরের দিকে তাকিয়ে আমি মুখ খুলি, 'মেজোফুফু, এটা তোমাদের বাবার বাড়ি। তোমার বাবা, তার রোজগারের টাকা আর গ্রাম থেকে পৈত্রিক জমি বিক্রি ক'রে এনে এই বাড়ির জমি কিনেছিলেন। বাড়ির কাজ শুরু ক'রে প্রায় শেষও ক'রে এনেছিলেন তিনি-ই। দাদা মারা যাবার পর বাড়ির অসম্পূর্ণ কাজ বাবা-চাচা করলেও তাদের নিজের রোজগারের টাকায় করেন নি, গ্রামের জমি বেচে সেই টাকা দিয়েই করেছেন। বড়ফুফু দাদার বড় সন্তান, সুতরাং এই বাড়িতে তার অধিকার আছে, তার যখন খুশি আসবে-যাবে। তাকে আসতে নিষেধ করার অধিকার তোমার নেই।'

আমার মা নিশ্চয় আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মেজোফুফু তার ঝুলন্ত মুখখানা সরিয়ে মায়ের উদ্দেশে বলেন, 'দেখছো ভাবি, তোমার পোলার কথা শুনছো? দরদ উথলায়ে উঠতাছে!'

মায়ের কণ্ঠ, 'আমজাদ, বড়গো কথার মইদ্যে তোর কথা কইতে অইবো না, তুই ওপরে আয়।'

'বড়রা কোনো অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত মা। মেজোফুফু কোনোভাবেই বড়ফুফুকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করতে পারে না।'

মেজোফুফু আবার কথার কামান দাগান, 'দুইদিনের পোলা তুই, ওরে কি দিছে না দিছে তুই তার কী জানোস! অহন আইছে বাড়ির ভাগ লইতে!'

'বড়ফুফুকে কি দিয়েছে তা আমি জানি; এও জানি যে বড়ফুফু তোমার মতো রাজনীতি বোঝেন না, যদি বুঝতেন তাহলে বড়ফুফুও তোমার মতো এই বাড়িতে একটা ফ্ল্যাট পেতেন, বাবার বাড়ি থাকতেও তাকে মাসে মাসে ভাড়া গুনতে হতো না।'

'আমি রাজনীতি করি, অয় ভাবী তোমার পোলায় কয় কী! আমি নাকি রাজনীতি করি, রাজনীতি করি আমি! ভাই বাজার থেইকা আসুক আগে...!' এইসব বলতে বলতে মেজোফুফু কেঁদেকেটে একাকার ক'রে ফেলেন।

এদিকে চাচীর মুখ থেকে কথার স্রোত বইতে থাকে। চাচীর দিকে তাকিয়ে বলি, 'চাচী এবার একটু থামেন তো।'
চাচী তেড়ে ওঠেন, 'কোন সাহসে উনি তোর চাচার গায়ে হাত তুললো!'
'চাচা যে ভাষায় বড়ফুফুর সঙ্গে কথা বলেছে, সেই ভাষায় যদি আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি, আপনি আমাকে চড় মারবেন না? অন্যায় করলে মুরুব্বি হিসেবে নিশ্চয় আমাকে চড় মারা অসঙ্গত না, তাই না?'
আমি বড়ফুফুর কাঁধে হাত রেখে বলি, 'চলো, ওপরে চলো।'
'ওপর থেইকাই তো আইলাম, বাসায় যামু।'
'তাইলে চলো, আমি আগায়ে দেই।'

বড়ফুফুকে নিয়ে আমি নিচে নামি। ওপরে চাচী আর মেজোফুফু একসঙ্গে কথার ঝড় তুলেছেন; বোধহয় মেজোফুফু দোতলায় নেমেছেন। আমার মা এখন এর মধ্যে আসবেন না তা আমি জানি, কেননা এর মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি; এলে আমাকে জন্ম দেওয়া এবং সহি পথের মানুষ করতে না পারার অপরাধে তাকে কথা শুনতে হবে। আমি গেট খুলে বড়ফুফুকে নিয়ে বাইরে বের হই। বড়ফুফুর কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। বড়ফুফুর বাসা এখানেই, এক মিনিটের রাস্তা। আমার পড়ার টেবিল থেকে বড়ফুফুর বাসা দেখা যায়, বড়ফুফু বারান্দায় এলে আমি তাকে দেখতে পাই।

'আমার সংসারডা যে কেমনে চলতাছেরে বাবা তা খালি আমি-ই জানি, আম্মারে কোনোভাবেই বোঝাইতে পারতাছি না। কইলাম যে, টু-লেট লাগাইছো, বাসা তো খালি অইবো। টু-লেট নামায়া ফ্যালাও বাসা খালি অইলে আমি উঠি। উঠতে দিবো না আমারে, কয় ভাড়া অইয়া গেছে, এরশাদুল টু-লেট নামানোর কতা ভুইলা গেছে। ডাহা মিছা কতা! আমার আম্মারে আমি চিনি না, সারাজীবন আব্বার লগে মিছা কতা কইয়া সংসার করলো! এরপর কইলাম, তাইলে আমারে নিচতলার হাফ ইউনিটে থাকতে দাও। দুইডা রুম আর এট্টা ডাইনিং, ওতেই আমার অইবো; অহনও তো অমনেই আছি, দরকার অইলে আমি তোমারে অর্ধেক ভাড়া দিমুনে। আম্মা কয়, "ভাড়া দিয়া যেহানে আছিস সেইহানেই থাক;

আমার বাড়িতে তরে আইতে অইবো না।" আমি তার সৎ মাইয়ানি ক্যাডা জানে!' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন বড়ফুফু।

আমি বড়ফুফুকে আমার শরীরের আরো কাছে টেনে বলি, 'চুপ করো, কেঁদো না।'
'আল্লারে, নিজের প্যাটের মাইয়ার লগে কেউ নি এমন করে! আমি পারুম আমার মাইয়া কষ্টে থাকলে এমন চোখ বুইজা থাকতে? মাইয়া আমার কলেজ থেইকা আইতে এট্টু দেরি করলেই উতলা অইয়া আমি ফোন দেই। আর হ্যারা বচ্ছর বচ্ছর কুত্তা-বিলাইর মতোন বিয়াইছে, মইরা-ধইরাও তো কমডি নাই; হ্যার লাইগাই দয়া-মায়া কম!'

আঁচলে চোখ মুছে বড়ফুফু আবার বলেন, 'কতো কইরা বুঝাইলাম, কিছুতেই সে বোঝে না।'
'তোমার আম্মা কি বোঝার বান্দা যে তুমি বোঝাইলেই সে বুঝবে! সে কি তার বুদ্ধিতে চলে? সে চলে চাচা আর মেজোফুফুর বুদ্ধিতে। আর আমার বাবা-মাও তাদের কথায় তাল দেয়। বললাম যে মামলা করো, তা না ক'রে তুমি বুড়ির কাছে যাও ঘান ঘ্যান করতে, আর সারা বাড়ির মানুষের কাছে অপমানিত হও।'

'নিজের আম্মা, নিজের ছোট ভাই, তাগো বিরুদ্ধে মামলা করলে মাইনষে কইবো কী! মামলা করুম না বইলাই তো সালিশ ডাকছিলাম। সালিশে আইলো মাত্র দুইজন মুরুব্বি।'

'আসবে কি, বাবা আর চাচা তো আগেই সবার বাড়ি গিয়ে তাদের আসতে নিষেধ করছিল। বাবা-চাচার ক্ষমতা আছে, তোমার তো ক্ষমতা নাই; কে দাঁড়াবে তোমার পক্ষে! যে দুইজন আসছিল তারা ভাল মানুষ, এজন্যই তো মহল্লার মানুষ তাদের দেখতে পারে না।'
বড়ফুফুর বাসার সামনে এসে দাঁড়াই। বলি, 'যাও বাসায় যাও।'
'তুই বাসায় চল, ভাত খাইয়া যাস।'
'না, এখন আর উপরে উঠবো না। তুমি যাও।'
'না, তুই চল। লাউ দিয়া শোলমাছ রানছি, তুই তো পছন্দ করস; খাইয়া যা। তুই ছাড়া আমার বাপের বাড়িতে আপন বলতে আর ক্যাডা আছে যারে এট্টু ভাল-মন্দ রাইন্ধে খাওয়ামু, যার লগে মন খুইলা দুইডা কথা কমু, আমি তো সবার শত্তুর! চল।'
'তাইলে তুমি যাও, আমি বাসায় গিয়ে গোসল ক'রে আসি।'
'আইবি তো?'
'হ আসবো।'

বড়ফুফুকে গেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি ফিরি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখি দোতলায় চাচার বাসার সামনে চাচী আর মেজোফুফু আলাপ করছেন; যথারীতি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এরশাদুল। আমার উপস্থিতি তাদের গতিময় আলাপ কিছুটা ছন্দ হারালো, আমি চুপচাপ ওপরে উঠে আসি। স্নানে যাবার আগে মাকে বলি, 'আমি রাতে খাব না।'

'খাবি না ক্যান?'
'বড়ফুফুর বাসায় খাব।'

আমি মাকে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গামছাখানা নিয়ে বাথরুমে ঢুকি। অস্বস্তিকর গরম থেকে এসে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতেই প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মনে। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। বেশ সময় নিয়ে গোসল ক'রে বের হই। থ্রি কোয়ার্টার আর গেঞ্জির ভেতরে শরীর গলাতেই ফোন বেজে ওঠে। বিছানায় রাখা মোবাইলের স্ক্রীনে তাকাতেই দেখি–শাশ্বতীদি। গামছাখানা বারান্দার তারে নেড়ে দিয়ে এসে ফোন রিসিভ করি–'হ্যালো...দিদি, কেমন আছো?'
'ভাল। তুই ঢাকায় আছিস?'
'হ্যাঁ।'
'আগামী সোমবার সন্ধ্যায় বাসায় আসিস।'
'কেন?'
'আসিস তো, এলেই দেখতে পাবি।'
'ও বুঝতে পেরেছি, তোমাদের অ্যানিভার্সারি। পরাগদা কোথায়?'
'ও এখনো ফেরে নি, রাস্তায়। শোন, গল্পটার দ্বিতীয় পর্ব ব্লগে দিয়েছি, ফেসবুকেও শেয়ার দিয়েছি, পড়ে দেখিস।'
'হ্যাঁ পড়বো, আজ রাতেই পড়বো। প্রথম পর্ব পড়ার পর আমি ভীষণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। এই সময়ে তোমার এই লেখাটা ভীষণ প্রয়োজনীয়, এই কথাগুলো মানুষকে জানানো দরকার। শিক্ষিত মানুষও না জেনে এই বিষয়ে অসভ্যের মতো মন্তব্য করে। এইসব তথাকথিত শিক্ষিতগুলোকে সভ্য করতে হ'লে এ ধরনের লেখার কোনো বিকল্প নেই।'
'দেখিস নি কি রকম গালাগালির বন্যা বইয়ে দিয়েছে!'
'তোমার বেশিরভাগ পোস্টেই তো মুমিনরা কোরান তেলাওয়াত আর গোঁড়া হিন্দুরা গীতাপাঠ করে! লেখাপড়া ক'রে কি আর সবাই সভ্য হয়? এরাও হবে না। তবে হাজার জনের মধ্যে দু'জনও যদি তোমার লেখা পড়ে বিষয়টা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে, সেখানেই সার্থকতা।'
'আমিও তাই মনে করি। মানসিকতার পরিবর্তনটা আসতে সময় লাগবে। তবে সংখ্যায় খুব কম হলেও নতুন প্রজন্মের কিছু ছেলেমেয়ের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাকে আশা জাগাচ্ছে।'
'পরিবর্তনের ব্যাপারে আমি দ্বিধাদন্দ্বে ভুগি। দেশে যেভাবে মাদ্রাসা বেড়েই চলেছে, দেশটা যে কোনদিকে যাচ্ছে! তবে ইন্টারনেটের কল্যাণে মুক্তচিন্তার মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এটা সত্য। হয়তো সমাজ কখনো বদলাবে কিন্তু আমরা তা দেখে যেতে পারবো না।'

'নিশ্চয় বদলাবে, এখন আমরা হয়তো একটা অন্ধকার সময় পার করছি। কিন্তু মহাকালের হিসাবে একশো-দুশো বছর সামান্য সময়। আমি আশাবাদী যে একদিন সমাজ বদলাবেই। শোন, তুই কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই চ'লে আসিস।'
'সোমবার তোমরা অফিসে যাবে না?'
'অফিস থেকে দুপুরের পরপরই চ'লে আসবো। বাসায় ব'লে আসিস যে রাতে থাকবি, জমিয়ে আড্ডা দেব।'
'ঠিক আছে, আমি সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পড়বো।....ওকে বাই।'

ফোন রাখতেই দেখি আমার দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে দাদি, তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখে-মুখে অপ্রসন্নতা। বলি, 'কি গো কমলাসুন্দরী, চোখে-মুখে তো প্রেম একেবারে উছলাইয়া পড়তাছে। অমন প্রেমময় দৃষ্টিতে কী দ্যাখতাছো? আসো ভেতরে আসো।' বেশিরভাগ সময়ই আমি দাদীর সঙ্গে ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলি।

দাদী দেয়ালের মুখোশগুলোর দিকে তাকান, তারপর পুনরায় আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন, 'তর ঘরে ঢুকুম না, তর ঘরে ঢোকনও গুণাহ। আল্লারে আল্লাহ্, পেত্নি-পুত্নি ঝুলাইয়া ঘরডারে করছে কী! এই বাড়িতে নি ফেরেশতা আইবো কুনোদিন! যে জইন্যে হিন্দুগো বাড়িভাড়া দেই না, সেই বেশরিয়তী কাম অহন আমার বাড়ির মইদ্যে। আল্লাহ্ আমারে তুইলা নেয় না ক্যান!'

এক বাড়িতে থাকলেও দাদি আমার ঘরে প্রবেশ করেন না অনেকদিন। বলি, 'এই যে রোজার দিনে এতোক্ষণ বইসা ইন্ডিয়ান বেপর্দা মালাউন মাইয়াগো নাটক দ্যাখতাছিলে, তাতে তোমার গুণাহ অয় নাই? আমার ঘরের ছবি আর ভাস্কর্য দেখলেই তোমার যতো গুণাহ অয়! টিভিতে নাটক-সিনেমা দ্যাখন তো হারাম। এই হারাম জিনিস দেইখা একটু পর আবার তারাবি নামাজ পড়বা!'
'তর কাছ থেইকা আমার ধর্মের জ্ঞান নিতে অইবো না। তরে আমি যা কই তাই হুন।'
'কও কী কইবা।'
'তুই শামীমারে যা তা কইছস ক্যান?'
'যা তা তো কই নাই। মেজোফুফু বড়ফুফুকে এই বাসায় আসতে নিষেধ করছে, তাই আমি তারে কইছি বাপের বাড়িতে বড়ফুফু যহন খুশি আইবো, তুমি নিষেধ করবার পারো না।'
'মাইয়া আমার, তর লগে এতো খাতির কিয়ের?'
'সত্যিই তোমার মাইয়া! নাকি দাদার লগে কারো গোপন সম্পর্ক আছিল, তার মাইয়া।'
'তর দাদা তোগো মতো গুণাহগার আছিল না।'
'তোমার মাইয়াই যদি অইবো তাইলে তুমি মাইয়াডারে এতো শাস্তি দিতাছো ক্যান?'
'ওরে শাস্তি দিতাছি কই! তুই দুইদিনের পোলা, তুই কী জানোস? ওরে কম দেই নাই! বহুত দিছি ওরে। দুই-দুইবার বিয়া দিতে খরচ অইচে। আগের জামাইডা ভাল আছিল না, মারধর

করতো; ছাড়াইয়া নিয়া আইলাম। বহুত খরচা-পাতি কইরা আবার বিয়া দিলাম। এই জামাইডা এমনিতে বালা আছিল, মারধর করতো না; ব্যভারও ভাল আছিল। তয় বেহিসেবী আছিল, কী ফুডানি তার, খাওন-পরনের কী বাহার! জামায় এট্টা ভাঁজ পরছে নি কুনোদিন? মনে অইতো জমিদারের ব্যাডা! ট্যাহা-পয়সা গুছাইতে পারে নাই, হ্যার দায় কী আমার? ডি ব্লকে ওগোতো প্লটও আছে, মামলা চলতাছে। মামলায় অরাই জিতবো।'

'কবে মামলা জিতবো সেই আশায় বাতাস খাইয়া থাকবো ওরা! ওই জমির পার্টি তিনটা; জিতলেও তিনভাগ অইবো, ফুফারাও তিন ভাই।'

'কয়দিন পর ওর মাইয়া পাস দিয়া বাইর অইবো, বাইর অইলেই তো চাকরি পাইবো। তহন ওগো ভাত খাইবো পরে।'

উহ্! এই বুড়ির সাথে কথা বলা মানে বাজে সময় নষ্ট করা। মেজাজও ঠিক থাকে না। বলি, 'তাই ব'লে বাপের সম্পত্তি থেইকা তুমি তারে বঞ্চিত করবা?'

দাদী এবার উত্তেজিত, 'বুঞ্চিত করলাম কই, কইলাম না ওরে বহুত দিছি। হুন, তরে এইসব নিয়া মাতা ঘামাইতে অইবো না। এ নিয়া মাতা ঘামানোর লাইগা আমি আছি, তর বাপ-চাচা আছে।'

'আমি তো মাথা ঘামাই না। কিন্তু কইয়া দিও কেউ যেন বড়ফুফুরে এই বাড়িতে আসতে নিষেধ না করে। তাইলে কিন্তু আমি তারে ছাইড়া কথা কমু না।'

'ই...মার পোড়ে না পোড়ে মাসির!'

দাদীর মুখে প্রবাদবাক্য শুনে আমার হাসি পায়! যতো রকমের বাঙালিয়ানা আছে তাকে হিন্দুয়ানী আখ্যা দিয়ে উঠতে-বসতে এরা ফোঁড়ন কাটে; অথচ চাল-চলন, কথাবার্তায় নিজেরাই সেই বাঙালিয়ানা থেকে বের হতে পারে না।

'বড়ফুফু তোমারে ভালবাসে, তাই সে বারবার আইসা তোমারে তোষামোদ করতাছে, কিন্তু তুমি কোনো কথা কানেই নিতাছো না। যহন মামলা দিবো, বুড়াকালে কাঠগড়ায় যাইয়া দাঁড়াইবা, তহন কিন্তু আদালতের কথা ঠিকই কানে নিতে অইবো।'

দাদীর চোখ-মুখের তেজ হঠাৎ কমে যায়, আমার ঘরের ভেতরে কয়েক পা এগিয়ে আসে, 'অয় কি মামলা দিবো নাকি, তরে কইচে কিছু?'

'তোমরা তারে বাপের সম্পত্তি থেইকা বঞ্চিত করবা, আর সে চুপ কইরা বইসা থাকবো!'

'হ, অতো সোজা না, মামলা দিলেই অইলো, আমি বাইচ্চা আছি না!'

'এইটা ব্রিটিশ আমল না আর তুমিও রানি ভিক্টোরিয়া না, মামলা দিলে কিন্তু ঠিক-ই তারে সম্পত্তি দিতে অইবো।'

'মামলার ব্যাপারে অয় তরে কী কইছে?'

দাদীর নরম সুর দেখে হাত ধ'রে তাকে বিছানায় বসাই কোনোরকম জোরাজুরি ছাড়াই। অর্থাৎ মামলা বিষয়ে ফুফু আমাকে কিছু বলেছে কিনা সেই ব্যাপারে তার এখন প্রবল কৌতুহল। কিন্তু আমি মামলার প্রসঙ্গ এড়িয়ে তুলি মুহাম্মদীয় তরিকা, 'আচ্ছা, সারাক্ষণ তো আল্লাহ্-বিল্লাহ্ আর ফেরেশতা ফেরেশতা কইরা মুখে ফ্যানা তুইলা ফ্যালো। আমারে তো

উঠতে বসতে গুণাহগার কও, দোজখের আগুনে পোড়ার ভয় দ্যাহাও, গরম তেলে ভাজার-গরম জলে সিদ্ধ ভয় দ্যাহাও। কিন্তু তুমিও তো ধরাডা খাইবা, তোমার দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামান আর কাতেবীন বইয়া বইয়া সব লেইখা রাখতাছে, এই যে মাইয়ারে ফাঁকি দিতাছো, সেইটাও লেখতাছে। মাইয়া ফাঁকি দেওনের অপরাধে তোমার আল্লায় যে তোমারেও আগুনে পোড়াইবো, গরম তেলে ভাঁজবো তা কী তুমি জানো?'
'হ, তরে কইছে!'
'আমারে কইবো ক্যা, তোমার আল্লাহ্'র সাহস আছে নি আমার সামনে আসার? কইছে নাকি তোমাগো পিয়ারের নবী মুহাম্মদরে, বসো দ্যাহাইতাছি।'

আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র দাদী উঠে যেতে চাইলে আমি তাকে জোর ক'রে পুনরায় বসিয়ে দিই। দ্রুততার সঙ্গে বইয়ের তাক থেকে কোরান নিয়ে সুরা নিসার সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত এগারো নম্বর আয়াত দাদীকে প'ড়ে শুনিয়ে বলি, 'বুঝলে কিছু? এক ছেলের সমান সম্পত্তি পাইবো দুই মাইয়া; সেই হিসাবে বড়ফুফু কিন্তু একটা ফ্ল্যাট পায়।'

শুনে দাদী গম্ভীর, মুখে কোনো কথা নেই। এরপর শোনালাম তেরো এবং চৌদ্দ নম্বর আয়াত- 'এসব আল্লাহ্'র নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে স্থান দেবেন জান্নাতে, যার নিচে বইবে নদী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এ মহাসাফল্য।' সুরা নিসা (৪:১৩)।

'অপরদিকে যে আল্লাহ্ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে ও তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে ছুড়ে ফেলে দেবেন, সেখানে সে থাকবে চিরকাল; আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।' সুরা নিসা (৪:১৪)।

দাদীর মুখ আরো গম্ভীর, তিনি যে ভেতরে ভেতরে বিচলিত তা বেশ বুঝতে পারি আমি। তাকে আরো বিচলিত করতে বলি, 'কী বুঝলে? মুখে মুখে সারাক্ষণ যতোই আল্লা-বিল্লারে ডাকো, আগুনের হাত থেইকা কিন্তু তোমারও রেহাই নাই। সময় থাকতে মাইয়ার সম্পত্তি বুঝাইয়া দাও।'
'সর, তারাবি পড়মু।' উঠে পড়েন দাদী।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে কোনো কাজ হবে না, বড়ফুফুকে ফ্ল্যাট না দেবার সিদ্ধান্তে সবাই অনড়। তাই বিষে বিষক্ষয় করার পথ বাতলেছি। অবশ্য এতে কাজ হবে কিনা আমি জানি না, চেষ্টা তো ক'রে দেখি। কোনোভাবে দাদীকে একবার রাজি করাতে পারলেই কাজ হবে; কারণ, দাদী যদি একবার বলে যে বড়ফুফুকে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে, তাহলে বাবা-চাচার সাধ্য নেই দাদীর মুখের ওপর কথা বলার। দাদী ভয়ানক কড়া, চেঁচামেচি ক'রে মহল্লার লোক

জড়ো করবে; বছর চারেক আগেও চাচাকে চড় মেরেছিলেন। আর ধমক তো তিনি সবাইকেই দেন, কেবল আমার সঙ্গেই সুবিধামতো খবরদারি করতে পারেন না আজকাল।

আমার বড়ফুফু একদম সরল মনের মানুষ। আমি তাকে আমার মায়ের মতোই ভালবাসি, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মায়ের চেয়েও তাকে বেশি শ্রদ্ধা করি। দাদার মধ্যে যে সারল্য ছিল, সেটাই পেয়েছেন বড়ফুফু; ছোটফুফুও অনেকটা তেমনই। বাবা, চাচা আর মেজোফুফু পেয়েছে দাদীর স্বভাব; তবে মেজোফুফু দাদীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তুখোর কূটনৈতিক জ্ঞান তার; আমার ধারণা তিনি গোয়েন্দা, সাংবাদিক কিংবা রাষ্ট্রদূত হ'লে একেবারে মাত ক'রে দিতেন! কিন্তু বিএ পাস করেও তিনি পারিবারিক কূটনীতিতেই জীবনের অপচয় করলেন।

ছোটবেলা থেকেই নাকি মেজোফুফু আত্মসচেতন; ঈদে ভাল জামাটা তার চাই, বাসার ভাল খাবারটা তার চাই। আর বড়ফুফু ঠিক এর উল্টো, নিজের চেয়ে বোনের জামাটা ভাল হলেই তিনি খুশি হতেন, নিজের খাবারটা ভাই-বোনের মুখে তুলে দিতে পারলেই তিনি তৃপ্তি পেতেন। অথচ তার সেই ভাইবোনদের কাছেই আজ তিনি ব্রাত্য। বড়ফুফুর প্রথম বিয়েটা টিকেছিল বছর খানেক। তার বর এবং বরের পরিবার তাকে নির্যাতন করতো, দাদার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তাকে চাপ দিতো। ফলে দাদা বড়ফুফুকে ডিভোর্স করিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর বড়ফুফু আর বিয়ে করতে চাননি, বাবা-মা, ভাইদের সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। পরে দাদা তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে এগারো বছর পর আবার বিয়ে দিয়েছেন।

আমার এই ফুফা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সৌখিন ছিলেন খুব, পরিপাটী থাকতে পছন্দ করতেন। বছরে অন্তত দু-বার পরিবার নিয়ে ঘুরতে যেতেন। নিজে খেতে এবং মানুষকে খাওয়াতে ভীষণ পছন্দ করতেন। কাছাকাছি শ্বশুরবাড়ি, কিন্তু খালিহাতে কখনোই আসতেন না, ছোটদের জন্য আইসক্রিম হলেও নিয়ে আসতেন। তার এই স্বভাবই আমার দাদী পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'জমিদারের ব্যাডা, খালি ফুডানি!'

ফুফা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বছর দেড়েক হলো। ফুফা যেহেতু কৃপণ স্বভাবের ছিলেন না, আবার পেশাগত জীবনেও সৎ ছিলেন, ফলে তিনি খুব বেশি সঞ্চয় করতে পারেন নি। আকস্মিক ফুফা মারা যাবার পর দুই সন্তান নিয়ে ফুফু খুব সমস্যায় পড়েছেন। তার বাবার বাড়ির পাওনা ফ্ল্যাটে উঠতে চাইলেও দাদী এবং আমার বাবা-চাচা তাকে উঠতে দেন নি। তিন বেড, ড্রয়িং-ডাইনিংয়ের বড় বাসা ছেড়ে ফুফু এখন দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে দুই বেড আর ডাইনিংয়ের ছোট্ট একটা বাসায় ভাড়া থাকেন। স্থান সংকুলানের অভাবে বেশিরভাগ ফার্নিচার বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। বড়ফুফুর মেয়ে নাদিয়া আপু ইডেন কলেজে পড়ছে, অনার্স

ফোর্থ ইয়ার; ছেলে আবিদ একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও ফুফা মারা যাবার পর খরচ টানতে পারবে না ব'লে এক বছর লস দিয়ে কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি ইসলামী রাষ্ট্র, দেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান; সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে কোরানে স্পষ্ট লেখা আছে, দেশের প্রচলিত আইনেও তা আছে; যদিও তা নারীর সঙ্গে স্পষ্টত প্রতারণা। মুসলমানরা মুখে মুখে নারী অধিকারের কথা বললেও আদতে ইসলামই প্রায় সর্বক্ষেত্রে নারীকে সবচেয়ে বেশি অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে এবং পদে পদে নারীর সঙ্গে করেছে প্রতারণা; সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রেও তাই করেছে এক পুরুষের সমান সম্পত্তি দুই নারীকে দিতে ব'লে। তারপরও আমার বড়ফুফুর মতো লাখ লাখ নারী পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। যে বাড়িতে তারা জন্মে, বেড়ে উঠে, বিয়ের পর সেই বাড়িতে বাস করার অধিকার তারা হারায় স্বয়ং মা-বাবা এবং ভাইদের চক্রান্তে। দেশে এখন আশংকাজনক হারে বাড়ছে সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা। কেবল ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোন নয়; ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই, মায়ের বিরুদ্ধে মেয়ে, বোনের বিরুদ্ধে বোন, চাচার বিরুদ্ধে ভাতিজা, মামার বিরুদ্ধে ভাগ্নে-ভাগ্নি ইত্যাদি ধরনের মামলা দিনকে দিন বাড়ছে। অথচ এরা নিজেদের মুসলমান দাবি করে, নামাজ পড়তে পড়তে কপালে সহিদাগ প'ড়ে যায়, বছর বছর লক্ষাধিক মানুষ হজে যায়, মসজিদের মাইক দিনে পাঁচবার হাঁক দেয়, মহল্লায় মহল্লায় ওয়াজের শব্দে কানের বারোটা বাজে। যে ধর্মগ্রন্থের জন্য এদেরই কেউ কেউ জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে, নিজের স্বার্থের জন্য সেই ধর্মগ্রন্থকেই আবার অমান্য করে এরা।

ফুফুর বাসা থেকে খেয়ে নাদিয়া আপু আর আবিদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে এগারোটা বেজে যায়। ওদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভাল লাগে, আমি উপভোগ করি। বাড়াবাড়ি রকমের ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয় নি ব'লে ওরা ধার্মিক হলেও বেশ উদার। নাদিয়া আপু সবগুলো রোজা রাখলেও আবিদের টেনেটুনে পাঁচ-সাতটা হয়। আমি যে নাস্তিক এই ব্যাপারে ওদের কোনো অ্যালার্জি নেই আমাদের বাসার মতো। আমি তো আমার ছোট আপু আর চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে টানা দশ মিনিটও আলাপ করতে পারি না। ওরা আমার সঙ্গে আড্ডা চালিয়ে যাওয়ার মতো কথা খুঁজে পায় না, আমিও ওদের সঙ্গে আলাপের সময় বিষয়বৈচিত্রে ভুগি। ফলে প্রয়োজনের বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে আমার কথা হয় না। পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একটু মন খুলে কথা বলতে পারি শুধু নাদিয়া আপু আর আবিদের সঙ্গেই।

বাসায় ফিরে কম্পিউটারে বসতেই শাশ্বতিদির লেখাটার কথা মনে পড়ে। ইউটিউবে পণ্ডিত রবিশংকরের সেতার ছেড়ে ব্লগে ঢুকে পড়তে শুরু করি।



# জন্মান্তর: পর্ব-দুই

ভাবীর ব্লাউজের ওপরের বোতামটা আগে থেকেই খোলা ছিল, তরিৎ বেগে সে অন্য বোতামগুলোও খুলে ফেললো আর আমার হাতদুটো নিয়ে তার অনাবৃত ফর্সা নরম স্তনে ঘষতে লাগলো। আমি তখন তার বুকের দিকে তাকাতে পারছি না, তাকিয়ে আছি মেঝেয় লুটিয়ে থাকা শাড়ির আঁচলের দিকে। সে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে হাঁটুমুড়ে ব'সে আমার উরুর কাছে মুখ নিয়ে লুঙ্গির গিঁট ধ'রে টান দিতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম লুঙ্গির ঢিলা গিঁট বাম হাতের মুঠোয় চেপে।

আমি অনুভব করলাম আমার পা কাঁপছে, গা কাঁপছে। অনুনয়ের সুরে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও ভাবী, আমি বাড়ি যাব।'
ভাবীও উঠে দাঁড়ালো, 'আমি যেতে দিলে তো তুমি যাবে!' বলেই ডান হাত দিয়ে আমাকে জাপটে ধরলো আর বাম হাত আলতোভাবে রাখলো আমার ডান গালে।
আমি জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে সে চাপাস্বরে গর্জে উঠলো, 'কোথায় যাবে তুমি? এখন আমার কথা না শুনলে আমি চিৎকার ক'রে পাড়ার মানুষ জড়ো ক'রে বলবো যে তুমি আমাকে ধর্ষণ করতে এসেছো!'

ভাবীর এই কণ্ঠস্বর, এই রূপ আমার অচেনা; ভাবী যেন ক্ষুধার্ত বাঘিনী!
ভাবীর কথা শুনে আমি ভয়ে-বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার বুকখোলা ব্লাউজটা শরীর থেকে খুলে ছুড়ে ফেললো মেঝেতে, মুহূর্তেই খুলে ফেললো শাড়ি-ছায়াও। ভাবী সম্পূর্ণ নগ্ন, কোমরে সুতোটিও নেই। জানালার পর্দা ভেদ ক'রে আসা আদুরে আলোয় আমি অবাক হ'য়ে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম তার সারা শরীরে, এর আগে আমি এমনিভাবে কোনো নগ্ন নারীকে দেখি নি। একবার মাত্র সুবলের ঠাকুমাকে দেখেছিলাম অর্ধনগ্ন; ভাঙা মাজার বুড়ি পরনের কাপড় কোমরে তুলে বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মতো প্রসাব করছিল! কিন্তু এভাবে সম্পূর্ণ নগ্ন নারীকে কখনো দেখি নি, তাও আবার যুবতী। ভাবীর শরীর দেখে আমার ভীষণ লোভ হলো, সম্ভোগ করার জন্য নয়; মনে হলো, আহারে, আমার তো নারীর মন আছেই, এমন একটা শরীরও যদি থাকতো! থাকতো যদি অমন দুটি সুডৌল স্তন, আমি যত্নে আগলে রাখতাম আমার বর আর সন্তানের জন্য; থাকতো যদি অমন ঝিনুকের মতো যোনি, আমিও ওই ঝিনুকে মানব মুক্তো ফলাতাম; সার্থক হতো আমার জীবন, নারী জীবন! কতো রাতে বিছানায় শুয়ে কল্পনায় নিজের বুকে অমন দুটি কোমল স্তন ধারণ করেছি, শিশ্নের জায়গায় ভেবেছি যোনি; তারপর....তারপর সেই কল্পিত দেহের ওপর টেনে নিয়েছি আমাদেরই পাড়ার রায়হান ভাইকে!

ভাবী আমার জামার বোতাম খুলতে লাগলো একটা একটা ক'রে, আমার দৃষ্টি ঘুরতে লাগলো তার মুখে আর বুকে। আমার গা থেকে জামাটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখতেই আমি তার হাত ধ'রে মুক্তি পাবার শেষ চেষ্টা করলাম, 'ভাবী, আমি দেখতে ছেলেদের মতো হলেও মনে-প্রাণে আমি আসলে মেয়ে। তোমার দোহাই লাগে ভাবী, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র ভাবীর বাম হাতের হ্যাঁচকা টানে আমার কোমর থেকে লুঙ্গিখানা পা বেয়ে নেমে গেল মেঝেতে। তার দু-চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার উত্থিত সরু শিশ্নের দিকে। আমার শেষ কথাটি শোনামাত্র ভাবীর মুখে আঁধার জমেছিল, কিন্তু উত্থিত শিশ্ন যেন তার মুখে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দিলো! শিশ্নের ডগায় আদুরে চিমটি কেটে, ঠোঁটে খুশির দুষ্টু ঝিলিক ছড়িয়ে বললো, 'মিথ্যুক!'

তারপর প্রায় পাঁজাকোলা ক'রে আমাকে বিছানায় তুলে ভাবী তার শরীর রাখলো আমার শরীরের ওপর। দীর্ঘসময় পর খাবার পেলে অভুক্ত মানুষ যেমন খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি ভাবীও চুমু-লেহনের বর্ষণে তার মুখের লালায় ভাসাতে লাগলো আমার মুখমণ্ডল আর গলা। কিছুক্ষণ পর সে আমার শরীর বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে, আমার তলপেটে সুড়সুড়ি দিলো, তারপর শিশ্নে চুমু খেয়ে বললো, 'এতো ছোটো কেন, একটা বড় সাইজের কাঁচামরিচের মতো!'

ভাবী আমার কাঁচামরিচটা মুখে পুরে নিলো, সুড়সুড়ির প্রবলতায় আমার শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠলো!

আমার মনোলিঙ্গ নারীর হলেও জৈবলিঙ্গ যেহেতু পুরুষের তাই ধর্ম অনুযায়ী জৈবলিঙ্গ জেগে উঠেছে। কিন্তু আমার মনোলিঙ্গের কোনো সাড়া নেই, সে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ছটফট করতে লাগলো মুক্তির অপেক্ষায়।

দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ ক'রে রেখে সুড়সুড়ির প্রবলতায় আমাকে চোখ বুজে থাকতে দেখে ভাবী বিরক্ত হয়ে বললো, 'অমন ভ্যাদামাছের মতো উল্টে আছো কেন, কখনো ব্লু-ফিল্ম দ্যাখো নি?'

সত্যিই আমি তখনো পর্যন্ত ব্লু-ফিল্ম দেখি নি। আজকের দিনের মতো তখন তো আর হাতে হাতে মোবাইল-ইন্টারনেট ছিল না। তখন সিনেমা-ই দেখতে হতো হলে গিয়ে নয়তো ভিসিআর ভাড়া ক'রে এনে। ব্লু-ফিল্ম না দেখলেও শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে আমি অবগত, আর জৈবলিঙ্গের ধর্ম অনুযায়ী শরীরও তখন ভাবীকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে; কিন্তু মন চাইছে রায়হান ভাইকে জড়িয়ে ধরতে! তবু শরীরের ধর্মে সায় দিয়ে আমি এক হাতে ভাবীর চুল মুঠি ক'রে ধরলাম, আরেক হাতে স্পর্শ করলাম ভাবীর নগ্ন মসৃণ কাঁধ।

এরপর ভাবী চিৎ হয়ে শুয়ে আমাকে তার শরীরের ওপর তুলে নিলো। আমার ডানহাত তার স্তনের ওপর রেখে বললো, 'অ আ কিচ্ছু জানো না, সব শিখিয়ে নিতে হবে দেখছি! হাত দিয়ে চাপ দাও, কামড় দাও।'

তখন আমার মনোলিঙ্গ মূর্ছা গেছে; আর জৈবলিঙ্গের প্রভাবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো ফুঁসে উঠেছে আমার শরীর; ঠোঁট আর জিভ চুম্বন-লেহন করছে ভাবীর ঠোঁট-গাল-গলা, হাত মন্থন করছে কোমল স্তন; কামাগ্নির উত্তেজনায় আমি লাভার মতো ধাবিত ভাবীর শরীরের সকল গিরিখাদে। এরপর ভাবী নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমার শক্ত পুরুষাঙ্গ অবগাহন করালো তার অথৈই যোনিসরোবরে! ভাবীর দেহসমুদ্রে আমি এক আনাড়ি দাঁড়ি, তার যোনিসরোবরে আমার অসহায় কৃশ কামদাঁড়! ভাবীর পীড়াপীড়িতে আমি একপ্রকার ঘোরের মধ্যে অযাচিত কামযাত্রা শুরু করলাম, একজন চৈত্তিক নারী হয়ে একজন দৈহিক নারীর সঙ্গে মিলিত হলাম অযাচিত রতিরঙ্গে!

পর্বতশিখরে আরোহণের পর ক্লান্তির ভারে দেহ যেমনি নুয়ে পড়ে ভূমিতে তেমনি অল্পক্ষণের মধ্যেই রতিপাতের ক্লান্তিকর দীর্ঘ তপ্ত শ্বাস ফেলতে ফেলতে আমি মুখ থুবড়ে পড়লাম ভাবীর স্তনযুগলের ওপর। ভাবী তখন উত্তাল সমুদ্র, আমাকে রণেভঙ্গ দিতে দেখে ডানহাতের মুঠোয় আমার চুল আর বাঁ-হাতে মুখ ধ'রে বললো, 'কী হলো?'

ভাবীর বাম স্তনে থুতনি আর তার চোখে লাজুক চোখ রেখে বললাম, 'আর পারবো না ভাবী, আমার ইয়ে হয়ে গেছে....!'

ভাবীর মুখে হতাশা ঘনীভূত হলেও আমার মাথায় আদর বুলাতে বুলাতে বললো, 'কি আমার পুরুষরে, ষাট বছরের বুড়োও বোধহয় তোমার চেয়ে বেশিক্ষণ করতে পারবে! যাও ওই জগ থেকে একটু জল খেয়ে আবার এসো।'
আমি ভাবীর শরীরের ওপর থেকে নেমে পাশে বসলাম, 'আবার!'
'তয়, আমার তো কিছুই হয় নি!'
আমি মিনতির সুরে বলরাম, 'আমি আর পারবো না ভাবী।'
ভাবী চাপাস্বরে আমাকে ধমক মারলো, 'যা বলছি তাই শোনো, বোকার হদ্দ কোথাকার!'
আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে টেবিলে রাখা জগ থেকে দুই ঢোক জল খেলাম। আমার দেহ-মন আমাকে পালাতে বললো, কিন্তু ভাবী যদি রেগে গিয়ে কোনো কাণ্ড ক'রে বসে! তাই জল খেয়ে আমি অসহায়ের মতো ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।
ভাবী অধৈর্য, 'কী হলো, এসো!'
আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বিছানার কাছে, 'প্লিজ ভাবী, আমাকে এখন যেতে দাও।'
ভাবী বিরক্ত, 'বারবার এক কথা ব'লো নাতো!'

শোয়া থেকে উঠে ব'সে সে আমার হাত ধ'রে বিছানায় তুলে শুইয়ে দিলো আমাকে। আমার শরীরের ওপর এক পা তুলে বুকে স্তন ঠেকিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বললো, 'প্রথম প্রথম এমন তাড়াতাড়ি-ই হয়, অভ্যাস হয়ে গেলে অনেক সময় থাকতে পারবা; লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

বলেই আমার ঠোঁটে বিলম্বিত চুম্বন করলো। তারপর কয়েকবার গালে আর কপালেও চুমু খেলো। গাল-থুতনি-গলা চপল জিভ দিয়ে চেটে, দাঁত দিয়ে কামড়ে লালায় ভিজিয়ে দিলো, বুক কামড়ে ধরলো। এরপর তার ডানহাতের আঙুলগুলো নিপুণ নৃত্যে আমার শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নেমে গেল নিচের দিকে। তার আঙুল, ঠোঁট আর জিভের কুশলী আদরে অল্পক্ষণের মধ্যেই পুনরায় জেগে উঠলো আমার শিশ্ন। তারপর অবাধ্য ছেলেকে ঘাড় ধ'রে শাসন করার মতো পুনরায় সে আমার শিশ্ন তার যোনিসরোবরে প্রবেশ করিয়ে আমার শরীরের ওপর ওঠ-বস করতে লাগলো। আমি কেবল অবাক হয়ে ভাবীকে দেখতে লাগলাম, দেখলাম তার অদ্ভুত মুখভঙ্গি, শুনলাম তার বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর; এতোদিনের চেনা ভাবীর সঙ্গে কামোন্মত্ত ভাবীকে কিছুতেই মেলাতে পারলাম না; অমন হাসি-খুশি, স্নেহশীল, মিশুক স্বভাবের ভাবীর এ কোন রূপ! সব মানুষের ভেতরেই কি জৈব কামনাপীড়িত এই রূপটি লুকোনো থাকে!

কিছুক্ষণ পর আমার শরীরের ওপর থেকে নেমে ভাবী পুনরায় আমাকে টেনে নিলো তার শরীরের ওপর। এবার আমার শিশ্ন আপনা-আপনি-ই চিনে নিলো তার যোনিসরোবর। ভাবীর মুখে কখনো অস্ফুট কখনো স্ফুট শব্দ। প্রবল কামোত্তেজনায় দুই হাতে সে আমাকে জাপটে ধ'রে তার বুকের সাথে পিষতে লাগলো, পাগলিনীর মতো আমার মাথার চুল হাতের মুঠোয় টানতে লাগলো, উন্মত্তের মতো আমার কাঁধে আর ঘাড়ে কামড়ে দাঁত বসিয়ে দিলো! আমার পিঠ খামচে ধ'রে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, 'জোরে শাহিন, আরো জোরে! ঝড় তোলো, আমাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দাও!'

আমি তাকে কি লণ্ডভণ্ড করবো, আমি তো নিজেই তখন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছি! ভাবী যেন সর্বগ্রাসী রাক্ষুসে পদ্মা আর আমি পদ্মার ভাঙনে উপড়ে পড়া এক অসহায় সুপারিগাছ, মূলোৎপাটিত হয়ে অথৈ জলে কেবলই হাবুডুবু খাচ্ছি! পারলে সে যেন তার শরীরে আমাকে লোশনের মতো নিঃশ্বেষ ক'রে ফেলে আর কি!

'আগুন, আগুন আমার শরীরে, তুমি নিভিয়ে দাও শাহিন, নিভিয়ে দাও!' সুখের আতিশয্যে ভাবীর চোখের কোনা দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। তার গালে চেপে ধরলো আমার গাল।

এবারো অল্পক্ষণের মধ্যেই রণেভঙ্গ দিয়ে আমি মুখ থুবড়ে পড়লাম ভাবীর নরম স্তনচূড়ায়! সে আমার শিশ্নের শিথিলতা অনুভব ক'রে আকর্ষিক প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দুই হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে আমাকে তার শরীরের ওপর থেকে ফেলে দিলো আর আমি নিভাতে ব্যর্থ হওয়ায় তার শরীরের জলন্ত আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোলো মুখ থেকে, 'হিজড়া কোথাকার একটা! যা দূর হ আমার সামনে থেকে!'

আমি কোমল দেহশয্যা থেকে পতিত হয়ে কোনোক্রমে একটা পা মাটিতে রেখে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম, দু-হাত দিয়ে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধ'রে তাকিয়ে রইলাম ভাবীর অতৃপ্ত কামোন্মত্ত ক্রুদ্ধ চেহারার দিকে। ঘন ঘন তার শ্বাস পড়তে লাগলো, স্তন দুটো কামারের হাপরের মতো ফুঁসতে থাকলো; সারা মুখে যেন বজ্ররেখা, কণ্ঠস্বরে বজ্রপাত, 'যা যা হিজড়া মাগি, আমার সামনে থেকে যা!'

আমি একই অবস্থানে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম, দু-চোখে আমার ক্ষোভের আগুন। হঠাৎ-ই আমাকে অবাক ক'রে ভাবী ডুঁকরে কেঁদে উঠে প্রচণ্ড আক্রোশে বামহাতে খাঁমচে ধরলো নিজের ডান স্তন আর দাঁতে কামড়ে ধরলো ডানহাতের আঙুলগুলো! এই আকর্ষিক পরিবর্তনে আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, অনাকাঙ্ক্ষিত এই কান্নার দৃশ্য আমার ক্ষোভের আগুনে জল ঢেলে দিলো। ভাবীকে আর বর্ষার সর্বগ্রাসী পদ্মার মতো মনে হলো না, তাকে দেখে মনে হলো জল বিনে কাতর গ্রীষ্মের শুষ্ক অসহায় পদ্মা! তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু আছড়ে পড়লো আমার বুকে, আমার অক্ষমতা অপরাধ আর অনুশোচনার মতো যেন

পোড়াতে লাগলো আমাকে। জীবনে প্রথমবারের মতো চৈত্তিকভাবে পুরুষ না হবার জন্য আফসোস হলো আমার; মনে হলো, আহারে, আমি যদি দৈহিক এবং চৈত্তিকভাবে একজন পরিপূর্ণ সমর্থ পুরুষ হতাম, তাহলে এই স্বামী পরবাসী অতৃপ্ত অসুখী নারীকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী করতে পারতাম!

সেদিনই বিকেলবেলা ভাবী আমাদের বাড়িতে এলো; বাড়িতে তখন আমি, মা আর মেজোবুবু। বাবা অফিসে আর ছোটবুবু তখনো কলেজ থেকে ফেরে নি। হঠাৎ-ই ছোটবুবুর কলেজ থেকে ফেরার সময় বিকেল থেকে গড়িয়ে সন্ধ্যায় ঠেকেছে, কেননা ছোটবুবু তখন নতুন প্রেমে মজেছে। আমি বারান্দার চেয়ারে ব'সে থাকলেও ভাবীকে দেখেই সঙ্কোচে নিজের ঘরে চ'লে গেলাম। ভাবী এসেই রান্নাঘরের বারান্দায় মোড়া টেনে বসলো। মা রান্নাঘরের মধ্যে কোনো কাজ করছিল, আর মেজোবুবু রান্নাঘরের বারান্দায় ব'সে ভাত খাচ্ছিল, তিনজনে একথা-সেকথা বলছিল। মেজোবুবুর খাওয়া শেষ হ'লে টিউবয়েলে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ওর ঘরে গেল। ততোক্ষণে ভাবীও রান্নাঘরের বারান্দা থেকে আমাদের শোবার ঘরের বারান্দায় উঠে এসেছে। মেজোবুবু ঘর থেকে ভাবীর উদ্দেশে বললো, 'ভাবী, দেখ, লুডু বোধ হয় শাহিনের ঘরে।'

ভাবী আমার ঘরে এলো। আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' উপন্যাসে মুখ গুঁজে ছিলাম। ভাবী আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'লুডু কোথায়?'
ভয়-সঙ্কোচ-দ্বিধা আমার কণ্ঠ চেপে ধরলেও আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা ক'রে তার দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'বুক শেলফের নিচের তাকে।'
ভাবী শেলফের তাক থেকে লুডু এবং গুটি নিয়ে বললো, 'আসো লুডু খেলি।' অন্যদিনের মতোই তার স্বাভাবিক প্রস্তাব, যেন দুপুরে তার সঙ্গে আমার কিছুই হয় নি!

আমি এক মুহূর্তের জন্য আড়চোখে ভাবীর দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজলাম। কি চেহারায় কি কথায়, ভাবী একদম সাবলীল, দুপুরে যে আমাদের মধ্যে অমন একটি কাণ্ড ঘটলো, তা যেন গত জীবনের ঘটনা! কিন্তু আমি ভাবীর মতো সহজ হতে পারলাম না, দুপুরের ঘটনায় আমার মন ছেয়ে গেছে বিষন্নতায়, আমি নিশ্চিত মুখেও পড়েছে বিষন্নতার ছায়া। কোনোরকমে বললাম, 'আমি খেলবো না।'

ব'লে একবার আড়চোখে ভাবীর দিকে তাকালাম, ভাবী ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'পারো না তো, তা খেলবা কী!'

ভাবী ঢিলটা কোথায় ছুড়লো তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। লুডু খেলায় আমি দারুণ পটু, সহজে হারি না; তবু আমি প্রতিবাদ না ক'রে বাঁকা কথাটা হজম করলাম দুপুরের পরাজয়ের কারণে। হঠাৎ ভাবী তার ব্লাউজের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো কাগজ বের ক'রে

আমার কোলের কাছে ছুড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাগজের টুকরোটা আমার কোল থেকে গড়িয়ে পড়লো বিছানায় আর আমার দৃষ্টি ভাবীর শেষ ছায়াটুকু অনুসরণ করার পর ফিরে এলো তার বুকের গন্ধ-স্পর্শ লাগা দোমড়ানো-মোচড়ানো ছোট্ট কাগজের টুকরোটার ওপর। ঘরে আমি একা, অন্য কারো আসার সম্ভাবনাও নেই; তবু দ্রুত কাগজখানা তুলে বইয়ের মাঝখানে নিয়ে খুলে তাতে চোখ বুলালাম–'কাল কলেজে যাবার সময় অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমার ব্যাংকে একটু কাজ আছে। যদি আমাকে নিয়ে না যাও, তাহলে আমি তোমার বুবুদেরকে....!'

একবার পড়া শেষ হ'লে আবার পড়লাম, তারপর আবার....! তিনবার পড়ার পর চিরকুটটা মুখে পুরে চিবিয়ে পিষতে লাগলাম আর আমার চোখে ভাসতে লাগলো দুপুরের দৃশ্যগুলো!

পরদিন সকালবেলা কলেজে যাবার সময় ভয়ে ভয়ে ভাবীদের বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবী চিরকুটের শেষে লিখেছে, 'যদি আমাকে নিয়ে না যাও, তাহলে আমি তোমার বুবুদেরকে....।' কি বলবে ভাবী? সে নিজেই তো আমাকে.....; অথচ এখন কিনা বুবুদেরকে ব'লে দেবার ভয় দেখাচ্ছে! ভাবীর পেটে তলে তলে এতো শয়তানি! এখন আবার তাকে নিয়ে ব্যাংকে যেতে হবে, যদি না নিয়ে যাই তাহলে কি সে সত্যিই ব'লে দেবে বুবুদেরকে? নিয়ে যাব কি যাব না এই নিয়ে আমার ভেতরে দ্বিধা। আকাশ মেঘলা, আবহাওয়া তপ্ত নয়, তবু আমি রীতিমতো ঘামছিলাম! হঠাৎ সদর দরজা খুলে গেল আর বেরিয়ে এলো হাসিমুখের ভাবী; পরনে একটা জলপাই রঙের শাড়ি, গায়ে একই রঙের ব্লাউজ-হাতে চুড়ি। ভাবী তাহলে সেজে-গুঁজে তৈরি হয়েই ছিল, নিশ্চয় জানালা দিয়ে আমাকে দেখে বেরিয়ে এসেছে। আমার দিকে ভ্যানিটি ব্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ধরো এটা, না ডেকে এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ভাবীর বাড়িয়ে দেওয়া ব্যাগটা ধরলাম। সে সদর দরজায় তালা দিয়ে আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে চাবির গুচ্ছ ব্যাগের ভেতর রেখে বললো, 'চলো।'

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলাম, আমি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছি আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছি তার দিকে। সে-ও মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে। একটুখানি হাঁটার পরই আমরা রিক্সা পেয়ে গেলাম। রিক্সায় ওঠার আগে রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, 'কনে যাবেন?'

ভাবী বললো, 'আগান, তারপর বলছি। যা ভাড়া তাই দেব, আপনাকে ঠকাবো না।'
রিক্সা চলতে শুরু করলে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবী আমার বামহাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস ক'রে বললো, 'কি এভাবে চুপ ক'রে থাকবা, কথা বলবা না?'
আমি না তাকিয়ে বললাম, 'আমরা কোন ব্যাংকে যাব?'

‘ব্যাংকে কি মানুষের টাকা গোনা দেখতে যাব!’
আমি অবাক হ’য়ে তার দিকে মুখ ফেরালাম, ‘মানে! তাহলে আমরা কোথায় যাব?’
সে আমার মাথাটা তার দিকে টেনে কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে বললো, ‘প্রেম করতে!’
আমি বিস্ময়ে তাকালাম ভাবীর দিকে, তার হাত আমার ঘাড়ে। সত্যিই ভাবীকে তখন সুন্দর লাগছিল, খোলা চুল বাতাসে উড়ছিল। দারুণ সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল তার শরীর! আমার মনোলিঙ্গ পুরুষের হ’লে সত্যিই আমি নিজেকে সঁপে দিতাম তার কাছে, তার দেহ-মনে এতো মায়া যে কেবল পাথুরে হৃদয়ের পুরুষই তাকে উপেক্ষা করতে পারে! আমি আবার জানতে চাইলাম, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’
ভাবী রিক্সওয়ালার উদ্দেশে বললো, ‘চাচা, বেড়িবাঁধের দিকে যান।’
আমার প্রতিবাদী প্রশ্ন, ‘বেড়িবাঁধে কেন?’
ভাবী তার হাতের মুঠোয় আমার চুল ধ’রে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিসফিস ক’রে বললো, ‘বললাম না প্রেম করতে!’
‘আমি কলেজে যাব।’
‘আজ আর কলেজে যাওয়া হবে না চান্দু, সারাদিন আমাকে সময় দিতে হবে।’
‘আমাকে নামিয়ে দাও, আমি কলেজে যাব।’
ভাবী আবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, ‘অবাধ্যতা করলে রাস্তার লোকজনের সামনে তোমাকে চুমু খাব কিন্তু!’

এ কোন ভাবী? গতকাল দুপুরের পর থেকে ভাবীকে যেন প্রতি মুহূর্তে নতুন লাগছে! আমি চুপ ক’রে ব’সে রইলাম রিক্সায়। ভাবী আমার অসহায়তা দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। শহর ছাড়িয়ে বেড়িবাঁধের ফাঁকা রাস্তায় ওঠার পর কে জানে কোন আনন্দে সে নিচু গলায় গেয়ে উঠলো, ‘এতো দিন যে ব’সে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে দেখা পেলেম ফাল্গুনে।’ ভরা বর্ষায় বসন্তের গান! গাইবে না কেন, ভাবীর হৃদয়ে তখন বইছে বসন্তের মাতাল হাওয়া, মুখে ফুঠেছে পলাশ-শিমুল! কি আছে তার মনে বুঝতে পারছি না, আজ আবার কোন কাণ্ড করবে কে জানে! আমি পদ্মার উত্তাল বুকের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আমার কান ভাবীর সুরে। গলায় বেশ সুর আছে, হতে পারে বিয়ের আগে সে গান গাইতো।

সকালের নির্জন বেড়িবাঁধ, বিকেলের দিকে জোড়া জোড়া প্রেমাতুর যৌবন ভিড় করে বেড়িবাঁধে; অনেকে বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিবার নিয়েও আসে। আমরা রিক্স থেকে নামলাম একটা মেহগনিগাছের নিচে, ভাবী রিক্সভাড়া মিটিয়ে আমার হাত ধ’রে রাস্তার কোনারদিকের ঘাস দেখিয়ে বললো, ‘চলো, ওখানে বসি।’

আমি বসলাম রাস্তার ঢালের দিকে পা ছড়িয়ে; ভাবী বসলো আমার ডানপাশে গা ঘেঁষে, এতোটাই ঘেঁষে যে আমি তার শরীরের উত্তাপ টের পেলাম। আমি পদ্মার বুকে দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে বললাম, ‘আমাকে এখানে নিয়ে এলো কেন?’

‘বললাম না প্রেম করবো!’
‘ভাবী আমার এসব ভাললাগে না।’
ভাবী আমার ডানহাত তার দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, ‘কালকের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। হঠাৎ ক’রে তোমাকে ওই পরিস্থিতে ফেলা আমার উচিত হয় নি।’

তখন আর ভাবীর মুখে সেই হাসিখুশি ভাবটি নেই, বেশ গম্ভীর। বললো, ‘কালকে হঠাৎ বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আমার দেহমন হঠাৎ-ই অশান্ত হয়ে উঠেছিল, মাথায় দুষ্টুবুদ্ধির ভূত চেপেছিল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে কখন তোমাকে পাব, না পেলেও তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে ডেকে আনতাম, এমন রোখ চেপে গিয়েছিল! কাল কেন অমন হয়েছিল কে জানে! তীব্র কামনার ঘোরে ছিলাম আমি। অতৃপ্ত হয়ে অসভ্যের মতো তোমাকে যা-তা বলেছি; প্লিজ শাহিন, তুমি কিছু মনে ক’রো না।’

আমি চুপ ক’রে রইলাম। ভাবী বললো, ‘বিয়ের কুড়িদিন পর তোমার ভাই ইতালি চ’লে গেল, সে-ও আজ দেড় বছর। আসার নামগন্ধও নেই মুখে, সে ভালই আছে....! কিন্তু আমি? আমারও তো মন আছে, বারুদ ভরা শরীর আছে, শরীর আর মনের কিছু চাহিদা আছে; কিন্তু সে-সব বোঝার মতো মন তোমার ভাইয়ের নেই। সে আমাকে ওখানে নেবে না, আবার বছরে একবার আসবেও না। এই নিয়ে চিঠিতে ঝগড়া হয়; মাসে একবার টিএন্ডটি অফিসে গিয়ে ফোন করি, ফোনেও ঝগড়া হয়। আমাকে জানিয়েছে বছরখানেক পর একবার এসে ঘুরে যাবে, তারপর একটানা চার-পাঁচ বছর থেকে একেবারে চ’লে আসবে। এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। অথচ বিয়ের আগে বলেছিল ইতালিতে সে ভাল চাকরি করে, আমাকেও ওখানে নিয়ে যাবে। বছরখানেক পর কেন দেশে আসবে জানো? আমাকে গর্ভবতী করতে! আমার প্রতি ভালবাসার টানে নয়, আমার শরীরের টানেও নয়; প্রয়োজনে। আমি যেন বাচ্চা উৎপাদন করার একখণ্ড জমি, বীজ পুঁতে দিয়েই সে চ’লে যাবে! আমার শরীর-মনের যেন কোনো চাহিদা নেই! কি করবো আমি? যে স্বামী স্ত্রীর শরীর-মন বোঝে না, তার জন্য শরীর আগলে অপেক্ষা করতে করতে বুড়ি হবো? সে তো ওখানে ঠিকই সাদা মাগিগুলোর সঙ্গে শুচ্ছে, শরীর জুড়োচ্ছে! কিন্তু আমি? অনেক অপেক্ষা করেছি, আর পারবো না।’

এটুকু ব’লে থামলো ভাবী; আশপাশে কোনো মানুষ নেই, নেই মানুষের সাড়াশব্দও। আছে কেবল ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর গাছে বসা একটা-দুটো পাখির ডাক। ভাবী শক্ত ক’রে আমার ডানহাতটা ধ’রে আছে। আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। মানুষের সাথে দিনের পর দিন মেলামেশা করলে কিংবা কথাবার্তা বললেও আমরা তার ভেতরের কথা কতোটুকু জানতে পারি? হয়তো খুব সামান্য-ই। ভাবীর ভেতরে এতো ব্যথা, এতো না-পাওয়া ছিল তা আমি কখনো বুঝতেও পারি নি। হাসি-খুশি ভাবীকে দেখে মনে করেছি সে তো দারুণ সুখী,

বর বিদেশ থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার ক'রে পাঠায়, আর সে শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে মহা সুখে থাকে!

ভাবী আমার কাঁধে মাথা রেখে বললো, 'জানো, কতোদিন মনে হয়েছে তোমার সঙ্গে সম্পর্কে জড়াই, কিন্তু সরাসরি কিছু বলতে পারি নি। আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়েছি, কিন্তু তুমি এমন ছেলেমানুষ যে সে-সব বুঝতেও পারো নি!'

ভাবী এবার কাঁধ থেকে মাথা তুলে বললো, 'শাহিন, তোমার চাল-চলন দেখে অন্যরা যা-ই বলুক, তোমাকে আমার ভাল লাগে; তুমি খুব সহজ-সরল। তোমার প্রতি আমার মায়া জন্মে গেছে, আমি ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে।'

হায়, কী সর্বনাশের কথা! আমার ভাললাগে আমাদেরই পাড়ার রায়হান ভাইকে, শাড়ি প'রে সেজেগুঁজে রায়হান ভাইয়ের হাত ধ'রে ওর সঙ্গে ঘুরতে বেরোতে ইচ্ছে করে, ওকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে এবং আদর পেতে ইচ্ছে করে, শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওর মুখের ঘাম, ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে রাত জেগে পাহাড়া দিতে ইচ্ছে করে পূর্ণিমার চাঁদ! দেহটা পুরুষের হলেও মনে-প্রাণে তো আমি নারী, অথচ অন্য একজন মনো-দৈহিক নারী কিনা বলছে সে আমাকে ভালবাসে! এখন এই নারীকে আমি কী বলবো!

ভাবী তার ডানহাত আমার বামগালে রেখে মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে বললো, 'কালকের ঘটনার জন্য আমি খুবই লজ্জিত, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওই ঘটনাকে মনে রেখে তুমি আবার ভেবো না যে আমি কেবল দৈহিক ক্ষুধা মিটানোর জন্য তোমার ভালবাসা প্রার্থনা করছি, সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে। আমার স্বামী-সংসার যেমন আছে থাকুক, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার গোপন সম্পর্কটাও থাকুক না শাহিন, তাহলে আমি মনে শান্তি পাব। এটা তোমার আর আমার গোপন সংসার, যতোদিন বেঁচে থাকবো যত্ন নেবো এই সম্পর্কের, আগলে রাখবো এই সংসার। আর ভবিষ্যতে তুমি যদি কখনো আমাকে বিয়ে করতে চাও, তবে বর্তমানের এই লোক দেখানো সাজানো সংসার ছেড়ে আমি তোমার কাছেই চ'লে আসবো। আমার দৈহিক প্রয়োজনে যেমনি তোমাকে প্রয়োজন, তেমনি মানসিক প্রয়োজনেও।'

ভাবী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো আমার মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় আর আমি তাকিয়ে রইলাম রাস্তার ঢালের ঘাসের দিকে, যেখানে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল। আমাকে মৌন থাকতে দেখে ভাবী বললো, 'কথা বলছো না কেন শাহিন?'
'ভাবছি কি বলবো।'
'এতো ভাবাভাবির কী আছে!'

'ভাবী, তুমি তো কাল দেখলেই আমি শারীরিকভাবে অক্ষম।' আমি মনের কথাটা না ব'লে কেবল শরীরের কথাটাই বললাম।
'ও তেমন কিছু না, প্রথম প্রথম অমনই হয়। আমি অহেতুক উত্তেজিত হয়ে তোমাকে বকেছি। অভ্যস্ত হ'লে ঠিক হ'য়ে যাবে।'

ওহ! আমি কী বলবো? আমি কি সব খুলে বলবো ভাবীকে? কিন্তু সব শুনে আবার যদি কালকের মতো রণচণ্ডী রূপ ধারণ করে! ভাবী এবার আমার ডান গালের সঙ্গে তার বাম গাল স্পর্শ ক'রে বললো, 'প্লিজ শাহিন, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। দেহ-মনের এই জ্বালা আমি আর সইতে পারছি না।'

ভাবী তার ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো আমার গালে। আমি ভাবীর মাথাটা ধ'রে সতর্ক করলাম, 'ভাবী, লোকজন চ'লে আসতে পারে।'

ভাবী আমার কাঁধে মাথা রেখে বাহুবেষ্টনে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, অল্পক্ষণ পরই একটা মোটরসাইকেলের আগমনী বার্তা কানে আসায় আমাকে ছেড়ে সোজা হয়ে বসলো। শাঁই ক'রে মোটরসাইকেলটি বেরিয়ে গেল আমাদের পিছন দিয়ে।

ভাবী পুনরায় আমার কাঁধে মাথা রেখে বামহাত দিয়ে পিঠ জাপটে ধরলো। আমি তাকিয়ে রইলাম পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে শূন্যে আর আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জল। মানুষের ভালবাসা পেলে আমার কান্না পায়। কিন্তু আমাদের সমাজে যে ছেলের স্বভাব কিছুটা মেয়েদের মতো বা যে ছেলে চৈত্তিকভাবে নারী, বেশিরভাগ মানুষ স্নেহ-ভালবাসা দেবার পরিবর্তে তাকে নিয়ে কৌতুক করে; ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ক'রে মজা পায়। অথচ একজন নারী আমাকে নিয়ে মজা না ক'রে অসহায়ভাবে আমার ভালবাসা প্রার্থনা করছে, আমার চোখে জল আসবে না তো কি চোখ দিয়ে আগুন ঝরবে! কিন্তু এখন আমি যদি বলি যে ভাবী আমিও তোমাকে ভালবাসি, যতোদিন বেঁচে থাকবো তোমার-আমার গোপন প্রণয় অটুট থাকবে। তবে তা মিথ্যে বলা হবে, তার সাথে প্রতারণা করা হবে, প্রতরণা করা হবে নিজের সত্তার সঙ্গেও। প্রতারণা আমি করতে পারবো না, তার চেয়ে ভাবীকে সব খুলে বলাই শ্রেয়।

আমার দীর্ঘ মৌনতা দেখে ভাবী বললো, 'কী হলো, তুমি কিছু বলবে না?'
আমি দৃষ্টি সংকুচিত ক'রে আমার কাঁধে মাথা রাখা ভাবীর মুখের দিকে তাকালাম; তার হৃদয়ে যে স্বপ্ন-আশা-ভালবাসার দীপ জ্বলছে, তার রোশনাই ছড়িয়েছে মুখেও; কি ক'রে আমি এই দীপ নিভিয়ে দিই, মুখের রোশনাই ঢেকে দিই অন্ধকারে! কিন্তু দীপ নেভানো ছাড়া তখন ভিন্ন কোনো পথও খোলা নেই আমার সামনে।
অবশেষে আমি সত্যের পথই ধরলাম, 'কি বলবো ভাবী, আমিও যে তোমার মতোই নারী!'
'ধ্যাৎ, বাজে কথা ব'লো না!'

‘বাজে কথা নয় ভাবী, সত্যি বলছি, নিজেকে আমি নারী-ই মনে করি।’
ভাবী এবার আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে মুখের দিকে তাকালো, চোখে-কপোলে জল দেখে খানিকটা ধাক্কাও খেল।
‘কাঁদছো কেন তুমি?’

আমি ভাবীর চোখে চোখ রাখলাম, ‘তোমার ভালবাসা পেয়ে। আমি তো তোমার এই ভালবাসার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারবো না। কিন্তু তোমার এই ভালবাসাটুকু আমার সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে ভাবী।’
‘মানে?’

‘ওই যে বললাম, আমি নারী। তোমাকে সব খুলেই বলি, আমি তো এসব কথা কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না, আমার ভেতরে কথা গুমরে মরে। জানো, সারাক্ষণ আমার শরীরের সাথে মনের ঝগড়া হয়; মন চায় তোমার মতো একটি শরীর। আমারও তোমার মতো শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে, গয়না পরতে ইচ্ছে করে, কপালে টিপ পরতে ইচ্ছে করে, চোখে কাজল দিতে ইচ্ছে করে, ভীষণ সাজতে ইচ্ছে করে; আমিও তোমার মতোই এমন একজন পুরুষের স্বপ্ন দেখি যে তার হৃদয় উপুড় ক’রে আমাকে ভালবাসা দেবে, আমিও যাকে হৃদয় উজার ক’রে ভালবাসতে পারবো। সবাই ভাবে আমি মেয়েলি স্বভাবের ছেলে, আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ভাবী, আমার শরীরটা পুরুষের হলেও মনটা নারীর; মনে-প্রাণে আমি একজন নারী।’

ভাবী বিস্ময়াবিভূত চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনলো। আমি আবার বললাম, ‘এই কথাগুলো আমি কাউকে বলতে পারি না জানো, এমনকি আমার পরিবারের কারো কাছেও না। বাবা-মায়ের ছেলের স্বপ্ন ছিল, তাইতো প্রথম তিনটি সন্তান মেয়ে হবার পর আবার তারা সন্তান নিয়েছেন। আমাকে পেয়ে তারা নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন, এখনো আমাকে ঘিরেই তারা স্বপ্ন বোনেন। বাবা-মা আঘাত পাবে ব’লে আমি তাদেরকে কিছু বলি না, কিন্তু কোনো একদিন তাদেরকে এই সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে। তারা এই আঘাত কি ক’রে সামলাবে আমি জানি না। বাবা-মায়ের কথা ভেবে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমি জানি যে বাবা-মা আমার কথা শুনে যতো না আঘাত পাবে আর চেয়ে বেশি আঘাত পাবে পাড়া-পড়শির সুচালো কথায়।’

আমি অপেক্ষায় রইলাম ভাবীর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য, ভাবী খুব স্বাভাবিকভাবে আমার পিঠে স্নেহের হাত রেখে বললো, ‘এটা বোধ হয় এক ধরনের অসুস্থতা। তুমি বাড়িতে খুলে বলো, তুমি যদি বলতে না পারো আমি বলি। ডাক্তার দেখালে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

‘তোমার মতো আমিও তাই ভাবতাম, ভাবতাম এটা এক ধরনের অসুখ; নইলে পুরুষ হয়ে জন্মেছি, অথচ নারীর প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই কেন, কেন পুরুষ-ই আমাকে আকর্ষণ করে। সে-জন্যই কিছুদিন আগে আমার পরিচিত একজনের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেছি। তিনি একজন উন্নয়নকর্মী, কাজ করেন হিজড়া আর যৌনকর্মীদের নিয়ে। আর তিনি নিজেও আমারই মতো দৈহিকভাবে পুরুষ, চৈত্তিকভাবে নারী। তার কাছ থেকেই জানতে পারি যে এটা কোনো অসুস্থতা নয়, আমার প্রকৃতি-ই এমন; আমার জৈবলিঙ্গ পুরুষের, কিন্তু আমার মনোলিঙ্গ নারীর।’

একটু থেমে আবার বললাম, ‘জানো ভাবী, ওই বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা না বললে আমি বুঝতেই পারতাম না যে আমাদের শরীরও একটা মহাবিশ্ব; মহাবিশ্বের মতো শরীরেও রয়েছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, বিচিত্র এর গতি-প্রকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া! আমরা সাধারণ মানুষ এসবের কতোটুকুই বা জানতে পারি! এমনি কি বিজ্ঞানীরাও প্রতিনিয়ত শরীর ঘেঁটে উদ্‌ঘাটন করছে নতুন নতুন বিস্ময়কর সব তথ্য। নারী-পুরুষ উভয়ের শরীরেই থাকে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন আর নারী হরমোন এস্ট্রোজেন। সাধারণত পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন আর নারীর শরীরে এস্ট্রোজেন হরমোন বেশি থাকে। কিন্তু কোনো পুরুষের শরীরে যদি নারী হরমোন এস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি থাকে তাহলে তার চেহারায় এবং আচরণে নারীত্ব প্রকট হয়ে ওঠে, আবার একইভাবে যদি কোনো নারীর শরীরে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন হরমোন বেশি থাকে তাহলে তার চেহারা এবং আচরণে পুরুষত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। এর জন্য সেই পুরুষ বা নারী কোনোভাবেই দায়ী নয় এবং এটা কোনো রোগও নয়। কেবল আমি-ই নই, আমাদের দেশে নাকি বহু মানুষ আছে যারা পুরুষের দেহ নিয়ে জন্মালেও ভেতরে ভেতরে আসলে নারী। কিন্তু সমাজের অপমান-লজ্জা থেকে বাঁচতে তারা তাদের মনোলিঙ্গের কথা গোপন রাখে। কেউ কেউ সামাজিকতার জন্য বিয়ে করে, সন্তান হয়; স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এক সাজানো মিথ্যে সংসার ক’রে যায় আজীবন। কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে সংসার করলেও শরীরের তাড়নায় গোপনে পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়ায়। আবার এর উল্টোটাও আছে, অনেকে নারীর শরীর নিয়ে জন্মায় কিন্তু তার মনোলিঙ্গ পুরুষের। এটা অসুস্থতা নয়, কিছু মানুষের প্রকৃতিই এমন হয়, আমিও তাই।’

আমি নদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ ভাবীর দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম তার দু-চোখ থেকে জলের ধারা নামছে কপোল বেয়ে। ভাবীর হাতের মধ্যে আমার ডান হাত, বললাম, ‘ভাবী!’

ভাবী আমার হাত ছেড়ে দুইহাতে নিজের মুখ ঢেকে হু হু ক’রে কেঁদে উঠলো। আমি অশ্রুসিক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবীর নারী হৃদয় আহত হয়েছে, তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে; এ তার স্বপ্নভঙ্গের কান্না। কাঁদুক, কেঁদে বুকের ভার নামাক।
বেশ কিছুক্ষণ পর আমি ভাবীর মাথায় হাত রাখলাম, ‘ভাবী।’

সে মুখ তুলে তার অশ্রুভেজা চোখ আমার চোখে রাখলো, 'আমি না জেনে তোমার সঙ্গে সত্যিই খুব অন্যায় করেছি শাহিন, এখন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'প্লিজ ভাবী, এভাবে ব'লো না। তোমার কষ্টটাও আমি বুঝতে পারি।'

'শাহিন, তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা জন্মেছে তা তো মিথ্যে নয়, ফুরোবারও নয়। আজ থেকে তুমি আমার সই; যে গোপন দুঃখ-ব্যথা আমরা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবো না, তা একে অন্যের সাথে ভাগ ক'রে নেব। আমরা একে অন্যের সুখের ভাগীদার যেমনি হবো, তেমনি দুঃখও ছোব!'

আমি ভাবীর চোখের দিকে তাকালাম, সেখানে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নেই, আছে আমার জন্য অকৃত্রিম মমতা-ভালবাসা। ভাবী বামহাত দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধ'রে গালে গাল ঠেকালো, আমিও ডানহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম; একজন চৈত্তিক-দৈহিক নারী আর আরেকজন কেবল চৈত্তিক নারী সই পাতিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধ'রে, গালে গাল ঠেকিয়ে, একে অন্যের নিগূঢ় ব্যথা স্পর্শ ক'রে, সময়ের হিসাব ভুলে কল্লোলিত পদ্মার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলাম!



মিরপুর-১০ থেকে বাসে উঠে টেকনিক্যালে নেমে তারপর ভার্সিটির বাসে উঠে বসি একদম পিছনের সিটে। আমি টেকনিক্যাল থেকে উঠি ব'লে বেশিরভাগ দিনই বসার সিট পাই না। যেদিন পাই সেদিন একটু সুবিধে হয়, ঘুম না হলেও চোখ বুজে থাকি, একধরনের আরামদায়ক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আসে, চোখে এবং মস্তিষ্কে একটু আরাম পাওয়া যায়; কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলে আর তা হয় না, দাঁড়নো অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে অন্যরা মজা করে আর হাসে।

বাস গাবতলী ব্রিজের ওপর। তুরাগের বুকের আয়নায় নিস্তেজ লালচে সূর্যের মুখ। এই জায়গায় তুরাগকে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখে মানুষ আর যন্ত্র। দিবারাত্রি বালি-পাথর ভর্তি কার্গো লঞ্চ এখানে নোঙর করে, আবার এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার চতুর্দিকে; ঢাকার ভেতরে এবং আশ-পাশে বালি-পাথর নেওয়া হয় ট্রাকে। মানুষের লোভ সম্প্রসারিত হচ্ছে, লোভের চাপে ব্রিজের দু'পাশ থেকে ক্রমশ ছোট হচ্ছে তুরাগ, বালি ভরাট ক'রে গ'ড়ে উঠেছে ট্রাকস্ট্যান্ড। কে জানে আমাদের উত্তরপুরুষ তুরাগকে দেখতে পাবে কিনা, তারা হয়তো তুরাগের কথা পড়বে বইয়ের পাতায়!

ব্রিজ পার হয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে বাস। এতোক্ষণ ভ্যাপসা গরম লাগলেও ব্রিজ পার হবার পর বাসের গতি বাড়লে বেশ স্বস্তি লাগে জানালা দিয়ে ঢোকা ডানপিটে বাতাসে। আমি

চোখ বন্ধ করি। রাতে শুতে দেরি হওয়ায় ঘুম কম হয়েছে। চোখের পাতায় এবং মগজে দারুণ আরাম অনুভব করি! আর এই আরামদায়ক অনুভূতির ভেতরেই হঠাৎ ফিরে আসে দাদার স্মৃতি। দাদা মারা গেছেন চৌদ্দ বছর হলো, আমার বয়স তখন দশ। আজকে দাদার মৃত্যুবার্ষিকী, বাসার সবাই মিরপুর কবরস্থানে গেছে দাদার কবর জিয়ারত করতে; আমি যাই নি। গত চার বছর যাবৎ আমি পরিবারের সঙ্গে দাদার কবর জিয়ারত করতে যাই না। মুসলিমদের কবর জিয়ারত করার ব্যাপারটা স্ববিরোধী মনে হয় আমার কাছে। মুহাম্মদ যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তার দুই স্ত্রী উম্মে হাবীবা এবং উম্মে সালামা তার কাছে মারিয়া নামক গীর্জার বর্ণনা করেছিলেন, যে গীর্জার ভেতরে মৃত মানুষের মূর্তি এবং ছবি ছিল; যা তারা দেখেছিলেন হাবশায় প্রবাসী থাকাকালীন। দুই স্ত্রীর মুখে গীর্জার বর্ণনা শুনে মুহাম্মদ যা বলেছিলেন হাদিস অনুযায়ী তা এরকম, 'আল্লাহ্ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ এবং সিজদার স্থান ক'রে নিয়েছে। কিয়ামতের দিন এরা হবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'

হাদিস ঘাটলে জানা যায় যে মৃতের কফিনে বা কবরে সিজদা করা, পূজা করা, ফুল দেওয়া, মোমবাতি বা ধুপকাঠি জ্বালানো, লোবান দেওয়া বা অন্য কোনো প্রকারে মর্যাদা বা সম্মান দেওয়া শিরক-বেদাত। তবে শুধুমাত্র জিয়ারত করা বা দোয়া-খায়েরের জন্য কবরে যাওয়া জায়েজ। স্ববিরোধীতার ব্যাপারটা এখানেই, যখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মৃত ব্যক্তির সমাধিতে গিয়ে ফুল দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে সম্মান জানায় তখন মুসলমানরা সেটাকে পূজা করা বলে। মুহাম্মদ তাদের ধ্বংস কামনা ক'রে তাদেরকে আল্লাহ্'র নিকৃষ্ট সৃষ্টি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ মুসলমানরা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করলে কিংবা দোয়া পড়লে সেটা পূজা নয়, কেন? অন্যান্য ধর্মাবললম্বীদের কবরে সম্মান জানানোটা যদি পূজা হয়, তবে মুসলমানদের কবর জিয়ারত করাও নিশ্চয় এক ধরনের পূজা, রীতিটা কেবল আলাদা। তাছাড়া মাজারের কথা না হয় বাদই দিলাম, এখন কবরও খ্রিষ্টানদের সমাধির মতো পাকা ক'রে বাঁধানো নয়। কবরেও ধুপকাঠি জ্বালানো হয়, ফুল দেওয়া হয়।

স্বয়ং মুহাম্মদের কবরও জিয়ারত করে তার কোটি কোটি অন্ধ ভক্ত। এসবই মুসলিমদের স্ববিরোধীতা। অন্যরা যা করছে সেটা ভাল নয়, খুব খারাপ; আমি যেটা করছি সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট ভেবে অন্যদের ধ্বংস কামনা করার প্রবল মানসিকতা থেকেই জন্ম হয় সহিংসতা-সংঘর্ষের। এই মানসিকতা থেকেই মুসলমান মানসে মনে সৃষ্টি হয় সাইমুম, আর সময়ে-অসময়ে তা আছড়ে পড়ে ভিন্নমতাদর্শীদের ওপর।

গত চার বছর যাবৎ আমি দাদার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করি আমার মতো ক'রে। সেখানে কোনো ধর্মীয় রীতি-নীতি বা অনুশাসন থাকে না, থাকে ভালবাসা-শ্রদ্ধা। মৃত্যুবার্ষিকীর দিন বিকেলে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে আমি একা যাই কবরস্থানে; দাদার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই, দাদার সঙ্গে একান্তে কথা বলি, তার গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করি। আত্মা-পরকাল এসবে

আমি বিশ্বাসী নই; কিন্তু তারপরও আমি যাই এজন্য যে, আমি মনে করি মৃতের কবরে শ্রদ্ধা জানানো যেতেই পারে। দাদা ছিলেন বলেই আমি আছি, তাই দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত আমার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

বিকেলে ক্লাস শেষে ফেরার পথে ভার্সিটির বাস থেকে নেমে পড়ি গাবতলীতে– মাজাররোডের মাথায়। তারপর রিক্সযোগে এসে নামি কবরস্থানের গেটে। পিঠে বইয়ের ব্যাগ আর হাতে একগুচ্ছ সাদা এবং হলুদ গোলাপ নিয়ে আমি হেঁটে এগিয়ে যাই কবরস্থানের রাস্তা ধ'রে। লোকজন খুব একটা নেই। আলাদা দুটো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনজন মানুষ জিয়ারত করছেন। তাদের থেকে সামান্য তফাতেই একটি বাঁধানো কবরের ওপর গোলাপ এবং রজনীগন্ধার ম্রিয়মাণ পাপড়ি ছড়ানো রয়েছে। অন্য একটি কবরের পাশে শুকিয়ে যাওয়া একটি ফুলের তোড়া। কোরান-হাদিস অনুযায়ী এই পুষ্পাঞ্জলি নিঃসন্দেহে শরীয়ত বিরোধী কাজ। হয়তোবা না জেনেই প্রয়াত লোকটির স্বজন-প্রিয়জনেরা শ্রদ্ধাভরে তার কবরের ওপর পুষ্পাঞ্জলি করেছে। এই যে প্রিয়জনেরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে তাদের এক সময়ের খুব কাছের একজন মানুষের কবরে; জীবদ্দশায় এই মানুষটি প্রিয়জনদেরকে ভালবেসেছে, স্নেহের পরশ বুলিয়েছে সন্তানের গায়ে, আদর বুলিয়েছে প্রেয়সীর গালে; তো সেই প্রিয় মানুষটির কবরে ফুলের মতো সুন্দর বস্তু দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো কি কখনো খারাপ কাজ হতে পারে! যে বলে এটা খারাপ কাজ, শরিয়ত বিরোধী কাজ; সে এক হৃদয়হীন পাষণ্ড, যেমন–মুহাম্মদ! যে পুস্তকে লেখা এই বিধান, নিকুচি করি আমি সেই পুস্তক!

হাঁটতে হাঁটতে দাদার কবরের কাছে পৌঁছে যাই। দাদার কবরটা রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরের দিকে, বেশ সুনসান জায়গায়। সামান্য তফাতেই একটা নিমগাছ। সাদা টাইলস-এ বাঁধানো দাদার কবরটি চকচক করছে। কবরের ওপর কোনো ফুলের পাপড়ি বা ফুল নেই; আছে কয়েকটি ঝ'রে পড়া নিমপাতা। ইসলাম ধর্মমতে কবরে ফুল দেওয়া যে বেদাত, তা আমার পরিবার জানে, এজন্যই তারা কবরে এসে শুধুই জিয়ারত ক'রে চ'লে যায়। কিন্তু গত চার বছর ধ'রে আমি কবরস্থানে আসার সময় একগুচ্ছ ফুল নিয়ে আসি দাদার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। ফুল আমার খুবই প্রিয়, ফুলের ব্যবহার আমি পছন্দ করি; হোক তা জীবিত মানুষের হাতে কিংবা খোঁপায়, মৃত মানুষের শয্যায়-কফিনে কিংবা কবরে-সমাধিতে।

নিস্তেজ সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। এদিকের কবরগুলোর ওপর মাতৃস্নেহের মতো গাছের নিবিড় ছায়া পড়েছে। আমি কাঁধের ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে হাঁটু মুড়ে ব'সে দাদার কবরের ওপর ফুলের গুচ্ছ রেখে কবর স্পর্শ করি, হাত বুলাতে থাকি কবরে। দাদার কবরে হাতের পরশ বুলাতে বুলাতে আমি আমার সারা গায়ে দাদার হাতের স্পর্শ অনুভব করি যেন! দাদা প্রায়ই আমার সারা গায়ে গ্রাম থেকে আনা ঘানি সরিষার তেল মালিশ ক'রে দিতেন স্নানের আগে। সেই স্পর্শের অনুভূতি, সেই ঘানি সরিষার তেল আর দাদার গায়ের গন্ধ, সেই ছবি

এখনো আমার স্মৃতিতে সজীব। আসলে আমি তার ছেলের ঘরের প্রথম নাতি ব'লে দাদা আমাকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এটা নিয়ে আমার চাচী বেশ মনঃক্ষুন্নও ছিলেন। ব্যাগে কিছু গোলাপের পাপড়ি এনেছি, সেখান থেকে দু-মুঠো পাপড়ি নিয়ে ছড়িয়ে দিই দাদার কবরের ওপর আর অবশিষ্ট পাপড়িপুলো রেখে দিই ব্যাগে। আমি দাদার কবর স্পর্শ ক'রে ব'সে থাকি। মনে মনে কথাও বলি দাদার সঙ্গে, অনেক কথা! কেবল দাদার মৃত্যুবার্ষিকীতেই নয়, প্রায়ই আমি কবরে আসি, ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন শ্মশানেও যাই। কবর কিংবা শ্মশানে মানুষের প্রায়ই আসা উচিত, একা। তাহলে জীবনটা একটু অন্যভাবে উপলব্দি করা যায়, এই উপলব্ধিটা আসলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ব্যাপারটা বিমূর্ত শিল্পের মতো, কেবল অনুভব করাই ভাল, ব্যাখ্যা করতে যাওয়াও বোকামি। শ্মশান কিংবা কবরে এলেই আমার মনে হয় যে একদিন আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না, আমি এই পৃথিবীর ক্ষণকালের অতিথি; পৃথিবীর বায়ু-পানি আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে, পৃথিবীর শস্যদানা খেয়েই আমার শরীরের বৃদ্ধি ঘটছে আর আমি বেঁচে থাকছি; অতএব পারতপক্ষে আমার দ্বারা যেন এই পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হয়।

আশপাশের গাছগুলোয় বসা পাখিরা থেকে থেকে ডেকে ওঠে, দু-একটা চড়ুইপাখি গাছের ডালে নাচতে নাচতে হঠাৎ-ই নিচে নেমে বসে কোনো বাঁধানো কবর কিংবা বাঁশের বেড়ার ওপর, আবার ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে যায়। নিমগাছের একটা হেলে পড়া ডালে ব'সে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে যেন-বা দার্শনিক ভাবনায় মগ্ন একটা হলদে পাখি! পাখিটার মাথা, গলা, ঊর্ধ্ব বক্ষ, পুচ্ছ এবং ডানার আগার দিকের কিছু অংশ কালো; দেহের বাকি অংশ উজ্জ্বল সোনালি হলুদ রঙের, গোলাপি ঠোঁট আর গাঢ় লাল চোখ। ডানে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে 'কোয়াক' বোল তুলে ডেকে ওঠে দু-বার। তারপর হঠাৎ একপশলা বাতাস ছুঁয়ে যায় নিমগাছ, হলদে পাখি, কবর আর আমাকে; হলদে পাখিটা উড়ে যায়। আচমকা আমি নিজেই যেন হলদে পাখি হয়ে যাই! কালের গায়ে ঠেস দিয়ে হলদে পাখি হয়ে আমি উড়ে যাই মহাকালের শরীর বেয়ে অতীতের দিকে! আমি উড়তে থাকি, ক্রমাগত উড়তেই থাকি–গ্রাম, উপশহর, শহরের ওপর দিয়ে; কতো জনপদ, কতো খালবিল, নদী-নালা পেরিয়ে, মেঘ ফুঁড়ে আমি উড়ে চলি; কতো জনপদের ওপর আমার ছায়া পড়ে, কতো নদী বা বিলের ওপর পড়ে চঞ্চল প্রতিবিম্ব! উড়তে উড়তে আমি পৌঁছে যাই চতুর্দশ শতকের প্রাচীন নগর শ্রীহট্টে, শ্রীহট্টের আকাশে চক্কর মারতে মারতে নদীতে দৃষ্টি পড়তেই ভীষণ তৃষ্ণা অনুভব করি। তৃষ্ণা মিটাতে অবতরণ করি নদীটির পারে, সুরমা নদী; সুরমার জলে গোলাপি ঠোঁট ডুবিয়ে জলপান করতেই আবার আমি মানুষ হয়ে যাই! জলের ওপর ঝুঁকে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে দেখি নিজের প্রতিবিম্ব! সুরমার শীতল জল আঁজলায় তুলে পুনরায় পান করি আর মুখমণ্ডলে জল ছিটিয়ে জলের কাছে সঁপে দিই ক্লান্তি। তারপর নদীর ঢাল বেয়ে উঠে হাঁটতে শুরু করি সুরমা পারের রাস্তা ধ'রে। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াই একটা নৌ-ঘাটের কাছে এসে। ঘাটে অনেকগুলো নৌকা নোঙর করা; ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ বাণিজ্য নৌকা। মানুষেরা নৌকায় মালামাল তুলছে-নামাচ্ছে; কিছু নৌকা ঘাটে নোঙর করছে, আবার কিছু ঘাট ছেড়ে যাচ্ছে। আমি আবার

হাঁটতে শুরু করি নৌ-ঘাট পিছনে ফেলে। প্রশস্ত রাস্তার একদিকে বসতি, কোথাও ছোট-বড় ইমারত কোথাওবা মাটির ঘর; অন্যদিকে স্রোতস্বিনী সুরমা। অনেকটা পথ হেঁটে সুরমা পারের একটা প্রাচীন বটগাছের নিচে এসে দাঁড়াই, পাশেই একটা ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ধ্বসে পড়া ছাদ আর দেয়ালের ইটে স্যাঁতার বসতি। মন্দিরটার সামান্যই অবশিষ্ট আছে তবু তারই ভেতর থেকে ডানপিটে বালক-বালিকার মতো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে একটি অশ্বত্থ আর দুটি বটের চারা। কেউ বা কারা ভাঙা দেয়ালের স্যাঁতাপড়া ইটে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে রেখেছে, যা দেখে আরো নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটা একটা মন্দির ছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ে নদীর ঢাল বেয়ে উঠে আসা মাঝারি গড়নের কৃষ্ণবর্ণ একজন মানুষের দিকে; শ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখ, খালি গা, মাথায় সাদা নামাজি টুপি, পরনে লুঙ্গির মতো ক'রে পরা মলিন ধুতি। চোখে বিষাদমাখা উদাসীনতা। কাছে এসে অপলক দৃষ্টি রাখেন আমার দিকে, আমিও তার চোখে চোখ রাখি। তাকে চিনতে পেরে আমি হতবাক, আবেগাপ্লুত! কি ক'রে কথা শুরু করবো, কোথা থেকে শুরু করবো তা বুঝে উঠতে পারি না! তিনি আমার পূর্বপুরুষ, দু-চোখ মেলে আমি কেবল তাকিয়ে থাকি তার দিকে, যার শরীরের জিন-সেল মাঝখানের আরো অনেক পুরুষের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বইছে আমার শরীরে। তিনি হঠাৎ মাথার টুপিটা খুলে ফেলেন। আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি মাথার কাঁচা-পাকা চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। তার নাকটা অবিকল আমারই মতো বড়, ভ্রু আর চোখেরও দারুণ মিল, চিবুকের টোল একইরকম! তার ঠোঁট দুটো যেন আমার বাবার ঠোঁট, চুলগুলোও বাবার মতো; মেদহীন শরীর, চিকন হাত বেশ লম্বা, হাত-পায়ের আঙুলগুলো সরু; ঠিক আমার বাবা-চাচা আর আমার মতো! বাম বাহুতে বেশ বড় একটি কাটা দাগ। তিনিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আমাকে, হয়তো আমারই মতো সাদৃশ্য খোঁজেন। তার কণ্ঠস্বর শোনার ব্যাকুলতায় নীরবতার অদৃশ্য আব্রু সরিয়ে বলি, 'কেমন আছেন?'

তিনি আমার কথার উত্তর দেন না, ছলছল চোখে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন ত্বক ভেদ ক'রে তিনি আমার শরীরের অভ্যন্তর দেখছেন! আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

এবার তিনি মৃদুভাবে হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়েন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। কথা না বলায় আমি বোঝার চেষ্টা করি যে আমার এই পূর্বপুরুষ বোবা কিনা। তার চোখে জোয়ারের পূর্বাভাস, নিমীলিত ঠোঁটে প্রভূত আনন্দের হাসি। হাতের টুপিটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে তিনি নীরবে দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেন। আমি মাথা পেতে তার বুকের স্পন্দন শুনি, তার শরীরের ঘ্রাণে নাক গুঁজে রাখি। আরে! এ যে চেনা স্পর্শের অনুভূতি, চেনা ঘ্রাণ; আমার বাবা আর দাদার স্পর্শের মতো একই অনুভূতি আর তাদের গায়ের মতোই ঘ্রাণ! আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা মগজের কোষে কোষে সঞ্চয় করি আমার পূর্বপুরুষের শরীরের গন্ধ-স্পর্শ। তার চোখ থেকে একফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ে আমার ঘাড়ে। বেশ কিছুক্ষণ তার বুকে মুখ গুঁজে থাকার পর আমি মুখ তুলে তাকাই তার দিকে, এরই মধ্যে আমার দু-চোখ থেকে জল গড়িয়ে

নেমেছে গাল বেয়ে, তিনি ডান হাতের আঙুলের পরশে আমার চোখের জল মুছে দেন, আমার মাথায়-মুখে-বুকে-কাঁধে হাতের স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে বলেন, 'কেঁদো না।'
আমি এতোক্ষণে নিশ্চিত হই যে তিনি বোবা নন, কথা বলতে পারেন। কিছুটা অভিমানের সুরে বলেন, 'এতোকাল পর এই প্রথম আমার কোনো উত্তরপুরুষ তার পূর্বপুরুষের কথা ভাবলো! '
'এর আগে আর কেউই ভাবেন নি?'
'না, ভাবে নি। আমার উত্তরপুরুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের কথা কখনো ভাবে নি, ভাবার চেষ্টাও করে নি। ওরা কেবল ওদের সৃষ্টিকর্তা, নিজের আর পরিবারের জীবন্ত মানুষগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু যাদের ত্যাগ আর লড়াই-সংগ্রামের ফসল ওরা, সেই পূর্বপুরুষদের কথা কখনোই ওদের মনে স্থান পায় নি। যেন ওদের কোনো পূর্বপুরুষ ছিল না, ওরাই ওদের বংশের গোরাপত্তন করেছে! অনেক বেশরিয়তী কর্ম ক'রেও প্রতিনিয়ত সহি মুসলমান হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। তুমি কেন পূর্বপুরুষদের সন্ধান করছো?'

'আমি ইতিহাস বিস্মৃত হতে পারি নি, নিজের শিকড় অনুসন্ধান করবার অদম্য কৌতুহল আমার মধ্যে বিদ্যমান। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার সেইসব পূর্বপুরুষদের, যারা জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে, অনেক লড়াই-সংগ্রাম ক'রে জীবনটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যু অবধি।'

তিনি বিড়বিড় করতে থাকেন, 'ইতিহাস, শিকড়, ইতিহাস! বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর!'
তারপর স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমারই উত্তরপুরুষেরা বারবার আঘাত করছে আমার সেইসব স্বজনের উত্তরপুরুষকে, যারা শ্রীহট্ট থেকে পালাতে পেরেছিল, যাদেরকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হতে হয় নি। কিন্তু কি নির্মম পরিহাস, দীর্ঘকালব্যাপী একই রক্তের একটি ধারা আরেকটি ধারাকে হত্যা করছে! হায়, আমার উত্তরপুরুষেরা আজ ইতিহাস বিস্মৃত, শিকড়চ্যুত!'
'আপনার স্বজনেরা পালিয়েছিল কেন?'
'না পালালে যে আমার আরো অনেক স্বজনের মতো হয় ওদেরকে তরবারির আঘাতে মরতে হতো, নয়তো আমার মতো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হতো।'
'তরবারি! আমি তো শুনেছি ভারতবর্ষে, বিশেষত বঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রসার ঘটেছে; সুফিদের অলৌকিক ক্রিয়া, তাদের মুখে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা, শান্তির বার্তা শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে!'

আমার এই কথায় নিমেষেই তার চোখ-মুখের ভাষা বদলে যায়, উত্তেজনায়-আক্রোশে দু-হাতে নিজের মাথার চুল টানতে থাকেন, তারপর ভগ্ন মন্দিরের দেয়ালে পরপর সজোরে কয়েকটি ঘুষি মেরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলেন, 'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা!'

আমি দ্রুত তাকে জাপটে ধরি। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ডুকরে কেঁদে ওঠেন আর কান্না জড়ানো গলায় বারবার বলতে থাকেন, 'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা!'
বেশ কিছুক্ষণ আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধ'রে রাখি। তারপর তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ-মুখের জল মোছেন। কিছুটা শান্ত হ'লে বলি, 'আমি সত্যটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।'

তিনি তার বাম বাহুর দাগটি দেখিয়ে বলেন, 'দেখ, এটা তরবারির কোপের দাগ।'
আমি দাগের ওপর আলতোভাবে হাত বুলাই, 'কে কোপ মেরেছিল?'
'ভারবর্ষের শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার যোগ্য শিষ্য, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক, তোমাদের শান্তিকামী মহান সুফিসাধক হযরত শাহ্ জালাল!'
আমি আঁৎকে উঠি, 'হযরত শাহ্ জালাল!'
'হ্যাঁ, হযরত শাহ্ জালাল।'

আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে, তিনি আমার পূর্বপুরুষ, আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারি না। আবার হযরত শাহ্ জালাল যে তাকে তরবারির আঘাত করেছে, একথা বিশ্বাস করতে আমার খারাপ লাগে। যে শাহ্ জালালের নামে বিশাল মাজার হয়েছে, কোটি কোটি ভক্ত যাকে অহিংস সুফিসাধক জেনে তার মাজারে আসে শ্রদ্ধা জানাতে-মানত করতে, যার সম্পর্কে কেবলই ভাল ভাল কথা শুনেছি এতোদিন, সেই সুফিসাধক হযরত শাহ্ জালাল হাতে তরবারি তুলে নিয়েছিলেন! আঘাত করেছিলেন আমারই পূর্বপুরুষকে!

'তবে যে হযরত শাহ্ জালাল সম্পর্কে শুনতে পাই–তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, দয়ালু ছিলেন, তার মুখে ইসলামের সাম্যবাদের কথা শুনে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?'

'সব মিথ্যে কথা, বানানো কথা। শাহ্ জালাল তো বাংলা ভাষা জানতেনই না, তাহলে তিনি কি ক'রে ইসলামের সাম্যবাদের কথা ব'লে মানুষকে প্রভাবিত করবেন? পারস্য এবং আরব ভূমি থেকে আসা সুফিরা আরবি আর ফারসি ভাষা ব্যতিত কোনো ভারতীয় ভাষায় কথা বলতেন না। ভারতীয় ভাষাকে তারা ঘৃণা করতেন, ভারতীয় ভাষাকে "জাহিলিয়া ভাষা" বলতেন। অন্যদিকে শ্রীহট্টের সাধারণ মানুষও আরবি-ফারসি ভাষা বুঝতো না। তাহলে তারা কি ক'রে শাহ্ জালালের কথায় মুগ্ধ হবে!'

রাস্তার পাশের সবুজ ঘাস দেখিয়ে আমি তাকে বলি, 'চলুন, ওখানে গিয়ে বসি। আমি শুনতে চাই সেসব কথা।'

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে ঘাসের ওপর বসি। তিনি সুরমার বুকে দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলতে শুরু করেন, 'তখন আমাদের শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন গৌরগোবিন্দ। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ'র নির্দেশে তার ভাতিজা সিকান্দার খান গাজী দু-বার আমাদের রাজ্যে হামলা চালায়, রাজ্যের কিছু ধন-প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হলেও হামলাকারীরা দু-বারই পরাজিত হয় আমাদের রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর কাছে। সুলতানের প্রধান সেনাপতি নাসিরুদ্দিন তৃতীয়বার যখন আমাদের রাজ্যে হামলা চালায়, তখন আমার বয়স তেরো। দিল্লীর সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আদেশে তিনশো ষাট জন অনুসারী নিয়ে নাসিরুদ্দিনের পক্ষে জিহাদ করতে শ্রীহট্টে আসে শেখ শাহ্ জালাল। দু-পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। চারিদিকে খবর রটে যায় যে সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করতে দিল্লী থেকে শেখ শাহ্ জালাল নামে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন যোদ্ধার নেতৃত্বে একদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এসেছে, যাদের পরাজিত করা অসম্ভব; রাজা গৌরগোবিন্দের সৈন্যদেরকে তারা কচুকাটা করছে! রাজ্যের পরাজয় আসন্ন ভেবে অনেকেই তখন পরিবার-পরিজন নিয়ে ধর্ম এবং জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যেতে শুরু করে আসাম আর কামরূপের জঙ্গলের দিকে, অনেকে শ্রীহট্ট ছেড়ে অন্য কোথাও। আবার অনেকেই রয়ে যায় এই আশায় যে আগের দু-বার সুলতানের বাহিনী পরাজিত হয়েছে, নিশ্চয় এবারো হবে।

এই আশায় বুক বেঁধে আমাদের পরিবারও শ্রীহট্টে থেকে যায়। আমার তখন বারো বছর বয়স। এক সন্ধেয় বাবার সাথে হাট থেকে ফিরছি, আমাদের পল্লীর কাছাকাছি চ'লে এসেছি। বাবার মাথায় দ্রব্যসামগ্রীর ধামা। আমার হাতে এক ঠোঙা মিঠাই, আমি মনের আনন্দে মিঠাই খেতে খেতে বাবার পাশে পাশে হাঁটছি। হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে পিছন থেকে ধেয়ে আসে একদল অশ্বারোহী সৈন্য! ভয়ে আমার হাত থেকে প'ড়ে যায় মিঠাই, বাবার মাথা থেকে দ্রব্যসামগ্রীর ধামা! দৌড়ে পালাবার আগেই তারা আমাদের ধ'রে ফেলে। সর্দার গোছের একজন বাবাকে কোপ দিতে গেলে আমি ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরি, বাবা আর আমি দু'জনেই হুড়মুড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে যাই। প'ড়ে যাবার সময় তরবারি'র ডগা আমার বাম বাহুর মাংস কেটে বেরিয়ে যায়। গলগল ক'রে রক্ত বেরোতে থাকে আমার কাটা বাহু থেকে। একজন সৈন্য আমার চুলের মুঠি ধ'রে বাবার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেয়, বাবা আমাকে আঁকড়ে ধরতে গেলে সে বাবার বুকে লাথি মেরে পুনরায় বাবাকে ধুলোর মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর সর্দার গোছের লোকটি ঘোড়া থেকে নেমে তার হাতের তরবারি দিয়ে এক কোপে বাবার ধড় থেকে মস্তক আলাদা ক'রে ফেলে, ছিন্ন মস্তক ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়ে আর ধড়টা আছাড়ি-পিছাড়ি করতে থাকে! আমি আর্তচিৎকার ক'রে উঠায় একজন সৈন্য আমার উদ্দেশে তরবারি তুলতেই বাবার খুনি হাতের ইশারায় থামার ইঙ্গিত ক'রে দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে কিছু বলায় আমার মস্তকটি আর ধুলোয় লুটায় না।

এরপর তারা আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করে। বাড়ি-ঘর আগুন জ্বালিয়ে দেয়, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে সারা পল্লী; মানুষের চিৎকার, কান্নাকাটি, আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে বাতাস। পুরুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে ওরা; আর নারী-শিশু-বালকদের করে বন্দী, আমাকেও। শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন, অনেক সৈন্য পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করে। আর যারা পালাতে পারে না, তারা মুসলিম বাহিনীর হাতে কচুকাটা হয়!

এরপর আমাদেরকে বন্দী ক'রে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে আগে থেকেই আমার মতো অনেক কিশোর, শিশু, নারী আর কিছু পুরুষ ছিল। আমার মতো যারা আহত ছিল, তাদের ক্ষতস্থানে লতাপাতার ওষুধ লাগিয়ে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। আমাদেরকে জানানো হয় ইসলাম গ্রহণ করলে আমরা প্রাণে বাঁচতে পারবো, অন্যথায় আমাদেরকে হত্যা করা হবে। পরদিনই আমাদের মুসলমান হিসেবে দীক্ষিত করা হয়। ইসলামে ধর্মান্তরিত বহু মহিলাকে যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়, তাদের সর্বনাশ করে, গর্ভে বাচ্চা উৎপাদন করে। আরো অনেকের মতোই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে প্রাণে বেঁচে যাই আমি; কানাই মণ্ডল থেকে হই মোহাম্মদ কলিমুদ্দি।

যার তরবারির আঘাতে আমার বাহুতে ক্ষত হয়েছিল, যার তরবারির আঘাতে আমার বাবার মস্তক ধড় থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তার কাছেই আমরা কলেমা প'ড়ে ইসলামে দীক্ষিত হই; তখনই জানতে পারি যে তিনিই শাহ্ শাহজালাল। সেদিন একসঙ্গে বহু মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাই কাউকেই খৎনা করা হয় নি; শুধুমাত্র শেখানো কলেমা মুখে মুখে বলেই আমরা মুসলমান হই; আমরা কেউ শুদ্ধভাবে কলেমা উচ্চারণ করতেও পারি নি!'

এ পর্যন্ত ব'লে তিনি ছলছল চোখে উদাসীন দৃষ্টি আকাশে ভাসিয়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকেন, তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা, তারপর বলেন, 'আমার পূর্বপুরুষেরা সনাতন ধর্মাবলম্বী, আমার উত্তরপুরুষেরা খৎনা করা মুসলমান, মাঝখানে আমি এক হতভাগ্য পুরুষ–খৎনাবিহীন মুসলমান; আমিও সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিলাম জীবনের প্রথম বারো বছর। আমি এক অভিশপ্ত মানুষ, আমি আমার পূর্বপুরুষ এবং উত্তরপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন; মুসলমান হওয়ার পর থেকে আমি পূজাপার্বণ করতে পারি নি, আবার ঠিকমতো নামাজপড়া-কলেমা পড়াও শিখতে পারি নি! আমি নিঃসঙ্গ। সারাজীবন আমি কেবলই এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেরিয়েছি–আমার জীবনেই কেন এমন দূর্ঘটনা ঘটলো, কেন আমাকেই এতো রক্তপাত-স্বজনের মৃত্যু দেখতে হলো, আমার আগের কিংবা পরের কোনো পুরুষের ক্ষেত্রে কেন এমন দূর্ঘটনা ঘটলো না?'

তিনি উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকেন শূন্যে, আমি ঝাপসা চোখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকি। আমার কানে বাজতে থাকে তার বলা শেষ কথাগুলো আর চোখের সামনে ভাসতে থাকে হযরত শাহ্ জালালের মাজার, অসংখ্য ভক্তের ভিড়; তাদের মানত করা, মোমবাতি-আগরবাতি প্রজ্জ্বলন,

ভক্তি-শ্রদ্ধার কতোরকম দৃশ্য; অথচ তারা জানেও না যে যাকে তারা এতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে, তারই হাতে নির্যাতিত, খুন এবং ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদেরই পূর্বপুরুষেরা; সম্ভ্রম হারিয়েছে কুলনারীরা। আমার চোখের সামনে ভাসে সিলেট শাহ্ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। যে সুফি একজন গোঁড়া-ধর্মান্ধ-হিংস্র মুসলিম, যে সুফি ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যে সুফি ইসলামী শিক্ষা ব্যতিত অন্য কোনো শিক্ষার কথা ভাবতেও পারে নি; তার নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহ্ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়! দেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নামকরণও হয়েছে তারই নামে! হায়রে ইতিহাসের গায়ে পরিহাসের কী নিষ্ঠুর আলখাল্লা!

বুকে ব্যথার ভারে দু'জনেই মৌন, অনেকক্ষণ পর আমার পূর্বপুরুষ কানাই মণ্ডল অথবা কলিমুদ্দি বলেন, 'শাহ্ জালাল সাতশো জিহাদি সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসেছিল ইসলামী জিহাদে অংশ নেবার জন্য। কোনো সাধু উদ্দেশ্য তার ছিল না। তারও অনেক বছর আগে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর বাহিনীর সাথে ভারতে এসেছিল সুফিসাধক খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেওয়া। দিল্লী এবং আজমীরের শাসক তখন পৃথ্বীরাজ চৌহান। ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করলে পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয় তরাইন নামক স্থানে। তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পৃথ্বীরাজের হাতে বন্দী হয় ঘোরী। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণহানি সত্ত্বেও দয়ালু রাজা পৃথ্বীরাজ ঘোরীকে সসম্মানে মুক্তি দেন। বিশ্বাসঘাতক ঘোরী সংগঠিত হয়ে পরের বছর পুনরায় দিল্লী এবং আজমীর আক্রমণ করে। তরাইনের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘোরীর কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হন পৃথ্বীরাজ। বেঈমান ঘোরী পৃথ্বীরাজের চোখ উপড়ে ফেলে তাকে হত্যা করে।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী অস্ত্রহাতে ঘোরীর পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। এরপর সে আজমীরের আনাসাগর সরোবরের কাছে আস্তানা গ'ড়ে তোলে এবং আশপাশের প্রচুর হিন্দুকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত ও তাদের মন্দির ধ্বংস করে। সে যখন জানতে পারে যে গরু খেলে হিন্দুদের জাত যায়, তখন থেকেই সে এক হিন্দু মন্দিরের সামনে প্রতিদিন একটি ক'রে গরু জবাই করা শুরু ক'রে হিন্দুদেরকে অপমান এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য।

বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর এসেছিল আরেক সুফি শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী, পান্দুয়ার (মালদাহ) দেবতলায় একটি মন্দির ধ্বংসের পর সেখানে খানকাহ্ নির্মাণ ক'রে প্রচুর হিন্দু এবং বৌদ্ধকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করে সে।

সুফিরা কোথাও অস্ত্র হাতে সরাসরি জিহাদে অংশ নিতো আবার কোথাও পিছনে থেকে মুসলিম শাসকদের ইন্দন জোগাতো বিধর্মীদের মন্দির-উপসনালয় ধ্বংস ক'রে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত অথবা হত্যা করার জন্য। কোথাও ইসলামের বিজয়ের খবর পেলে তারা

উল্লাসিত হয়ে মুসলিম শাসকদের প্রশংসা করতো আর বিধর্মীদের ওপর আরো জোরালো হামলা চালানোর জন্য উৎসাহিত করতো। বিধর্মীদের রাজ্য থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ আল্লাহ্'র উপহার হিসেবে তারা গ্রহণ করতো। দিল্লী, কাশ্মীর, গুজরাট, বঙ্গসহ ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের চিত্র একই রকম নির্মম ও নিষ্ঠুর।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, 'অথচ সকলে বলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সাম্যবাদে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্চায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

'হুম, সাম্যবাদ! কীসের সাম্যবাদ? জাতপাতহীন ইসলামের সাম্যবাদ এক বাতাসের ঘর, তা আর চোখে দেখি নি কোনোদিন। ইসলাম যদি সাম্যবাদের ধর্মই হবে, তাহলে আশরাফ আর আতরাফ শব্দদুটোর প্রচলন হলো কী ক'রে? তুর্কি, আফগান আর পারসিকরা নিজেদেরকে উঁচুজাত মনে করে, ওরা নিজেদেরকে বলে আশরাফ; আশরাফরা আমাদেরকে মানে ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদেরকে বলে আতরাফ অর্থাৎ নিচুজাত, নিচুজাত হিসেবেই ওরা আমাদেরকে অবহেলা, অপমান আর তুচ্ছবাচ্ছল্য করে। হিন্দু তাঁতী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় তন্তুবায় জোলা, জেলে হয় নিকিরি; নাম পরিবর্তন হলেও সামাজিক অবস্থানের কোনো-ই পরিবর্তন হয় না। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে; কিছু দাগী চোর-ডাকাত আর উচ্ছৃঙ্খল-মাতাল-লম্পট প্রলোভিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। শাহ্ জালালের মুরিদদের মুখে ওরা যখন শোনে যে ইসলাম গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণসহ সকল বর্ণের হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে ভোগ করা যাবে, তাদের অন্তঃপুরের নারীদের গনিমতের মাল হিসেবে সম্ভোগ করা যাবে, সেবার জন্য তাদের বালক এবং কিশোর পুত্রদেরকে দাস হিসেবে রাখা যাবে; আর এসবে কোনো পাপ হবে না, হবে পূণ্য। আবার ইহজগতে এতোসব ভোগ-বিলাসিতার পরেও পরজগতে বেহেশতে যাওয়া যাবে, সেখানেও মিলবে ভোগ-বিলাসের অঢেল উপকরণ-ফলের বাগান, ঝর্ণা, দুধ আর মদের নহর, পদ্মরাগের মতো বাহাত্তরটা ষোড়শী হুরি, মুক্তার মতো আশি হাজার সুদর্শন বালক গেলমান ইত্যাদি; তখন ওদের রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠে; জিভ লকলক করতে শুরু করে! একদিকে এতো সব ভোগ-বিলাসিতা আবার অন্যদিকে মুসলমানদের হাত থেকে নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করাও যাবে; তখন ওরা ছুটে যায় সুফির কাছে, ইসলাম গ্রহণের পর ওরা আরো উশৃঙ্খল হয়ে উঠে; যারা কোনোদিন ব্রাহ্মণ কিংবা উচ্চবর্ণের মানুষের অন্তঃপুরে যাবার সাহস পায় নি, তারাই বিছানায় নিয়ে সম্ভোগ করে ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের নারীদের; বাদ যায় না হিন্দু নিম্নবর্ণের নারীরাও।

পরে কিছু ভাল মানুষও ইসলাম গ্রহণ করেছে একান্ত বাধ্য হয়ে; জিজিয়া, খারাজ আর অন্যসব করের বোঝা টানতে আর নিত্যদিন অপমান-অবহেলা সহ্য করতে না পেরে। একদা যেসব হিন্দু আর বৌদ্ধরা ছিল সম্ভ্রান্ত ধনী, একসময় তাদেরকেই দেখেছি অতীতের চোর-ডাকাত নব্য মুসলমানের দ্বারে দ্বারে করুণা ভিক্ষে করতে; তবু তারা নিজধর্ম ত্যাগ করে নি। কিন্তু সবাই নিজধর্ম ধ'রে রাখতে পারে নি, অভাব আর অত্যাচারের কাছে হার মেনেছে।

হিন্দু আর বৌদ্ধদের কাছ থেকে খারাজ এবং জিজিয়া কর বাবদ ফসলের চার ভাগের তিন ভাগই নিয়ে নিলে কখনো আধপেটা খেয়ে কখনোবা না খেয়ে দিন কেটেছে তাদের। মন্দিরের সাথে সাথে হিন্দুদের পাঠশালা এবং বৌদ্ধদের বিহার ধ্বংস ক'রে তার জায়গায় গ'ড়ে তুলেছে মক্তব আর মাদ্রাসা, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ছেলে-মেয়েরা বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করবে কোথায়?। দরিদ্র হিন্দু আর বৌদ্ধরা তো বটেই, অপেক্ষাকৃত ধনীরাও খারাজ আর জিজিয়া কর দিতে গিয়ে নানা রকম অপমানের শিকার হয়। সামর্থ থাকলেও কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ মূল্যবান পোশাক প'রে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে কর দিতে আসতে পারে না, অতি সাধারণ পোশাক পরিধান ক'রে তাদেরকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়। কর আদায়কারী ব'সে থাকে আর কর প্রদানকারী থাকে দাঁড়িয়ে। এরপর কর আদায়কারী তার ঘাড় ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বলে, "জিজিয়া পরিশোধ কর।"

জিজিয়া পরিশোধ করার পর তার মাথার পিছনে চড় মেরে তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেয়। অন্য নব্য মুসলমানরা তখন উল্লাস করে, হাসে। খারাজ প্রদানের সময় যদি কোনো আদায়কারীর মনে হয় যে খারাজ দাতার মুখে সে থুথু দেবে, তখন খারাজ দাতাকে মুখ হাঁ করতে হয় আর আদায়কারী তার মুখে থুথু দেয়। অনেক সময়ই দেখা যায় যে কর আদায়কারী অতীতে চোর-ডাকাত ছিল, নয়তো নিচুজাতের কোনো দরিদ্র কারিগর ছিল, যে হয়তো একদা কর প্রদানকারীর বাড়িতে কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো; কিন্তু পরে তারাই নিপীড়ন করতে আরম্ভ করে পূর্বের মালিককের ওপর। কারো সাথে কোনো বিষয়ে পূর্ব শত্রুতা থাকলে তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বিধর্মীদের ওপর এইসব অত্যাচার করা নাকি সুন্নত, এইসব অবমাননা এবং অপমানজনক কাজ ওরা করে অন্য ধর্মকে হেয় আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য।

অনেক জায়গায় হিন্দু আর বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তোলে মুসলমানরা। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার পর এই ঋণ যাতে শোধ না করতে হয় সে-জন্য তারা কাজীর কাছে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করে যে মহাজন নবী এবং ইসলাম ধর্মকে গালিগালাজ করেছে। এই ধর্মীয় অবমাননার কথা শুনে ক্ষিপ্ত মুসলমানরা মহাজনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-ঘরবাড়িতে লুঠপাট চালায়, মারধর করে, তারপর খৎনা ক'রে কলেমা পড়িয়ে তাকে মুসলমান বানায়। এইরকম নানাবিধ ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিপীড়ন-নির্যাতনের ফলে অনেকে বাধ্য হয়েই ইসলাম গ্রহণ করে।'

শুনতে শুনতে আমার অতীত-বর্তমান একাকার হয়ে যায়, আমি হতবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে মধ্যযুগের মুসলমানদের এই সব কৌশল একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশী মুসলমানরা এখনো কি অবলীলায় প্রয়োগ করছে! ২০১২ সালে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম অবমাননার সাজানো অভিযোগ তুলে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া; চট্টগ্রামের পটিয়াসহ আরো কিছু জায়গায় অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির এবং বৌদ্ধপল্লীতে হামলা

চালায় মৌলবাদী মুসলমানরা; মন্দির আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ছারখার ক'রে দেয়! পাবনা এবং আরো কয়েকটি জেলাতেও হিন্দু কোনো যুবকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক ক'রে ইসলামবিরোধী ছবি এবং লেখা পোস্ট দেয় মুসলিম মৌলবাদীরা, তারপর নিজেরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে তাদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুঠপাট ক'রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ যেন মহাকালের মঞ্চে ইতিহাসের পুনর্মঞ্চায়ন! পার্থক্য কেবল এটুকুই হিন্দু এবং বৌদ্ধরা এখন ইসলাম গ্রহণ না ক'রে দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে ভারতে কিংবা অন্য কোনো দেশে।

কানাই মণ্ডল অথবা কলিমুদ্দি আবার বলতে শুরু করেন, 'ইসলামের কি দেখে মুগ্ধ হবে মানুষ? ইসলাম আমাদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম, ঘৃণার নাম ছিল। মুসলমানদের আক্রমণের আগে থেকেই তাদের ভয়ে রাজ্যের মানুষ তটস্থ হয়ে থাকতো, ঘুমোতে পারতো না রাতে, ঘুমের মধ্যেও দুশ্চিন্তা এই বুঝি তারা আক্রমণ করে। কতো গুজব ছড়াতো বাতাসে যে মুসলমানরা আক্রমণ শুরু করেছে, এদিকেই ধেয়ে আসছে। শুনলেই আমরা বনে-জঙ্গলে গিয়ে লুকোতাম, বহুবার এমন হয়েছে। তবে আসল খবরটি পেতাম বাণিজ্য থেকে ফেরা মানুষের কাছে। চেনা-জানা অনেকেই বড় বড় বণিকদের বাণিজ্য নৌকায় দাঁড়বাহক অথবা ভৃত্যের কাজ করতো, তারা ফিরে এলে মানুষ তাদের ছেকে ধরতো সংবাদ শোনার জন্য। তাদের মুখে কেবলই দুঃসংবাদ শুনতাম–অমুক রাজ্যের রাজাকে হত্যা ক'রে মুসলমানরা রাজ্য দখল ক'রে নিয়েছে, তমুক রাজ্য মুসলমানরা দখল ক'রে মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে; ইত্যাদি ধরনের বুক হিম করা সব দুঃসংবাদ। মুসলমানদের এইসব অপকর্মের বৃত্তান্ত শোনার পর একসময় নিজেদের রাজ্যই যখন আক্রমণের শিকার হয় তখন মানুষ কোন বুদ্ধিতে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে, আর কেনইবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে?'

কথা শুনতে শুনতে অনেক সময় পেরিয়ে যায়, শুনতে হবে আরো অনেক কথা। কিন্তু আমার ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে পূর্বপুরুষের আদি ভিটেটা দেখার জন্য। বলি, 'যেখানে আমার শিকড়, যেখানে আপনার জন্ম, যেখানে আমাদের আরো অনেক পূর্বপুরুষের নাড়িপোঁতা; আমি সেই বাড়িটি দেখতে চাই।'
'দেখবে?'
'হ্যাঁ।'
'দেখো না, দেখে সহ্য করতে পারবে না।'
'তবু আমি দেখবো।'
'বেশ, চলো।'

আমরা উঠে পড়ি। সুরমার পার ধ'রে হাঁটতে থাকি আমি আমার পূর্বপুরুষের কাঁধে হাত রেখে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের একটা মসজিদ চোখে পড়ে। মসজিদের আঙিনায়

একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ পাগল বিড়বিড় করছিল, আমাদেরকে দেখে সে ছুটে আসে। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে আমার পূর্বপুরুষের দিকে তাকাই, তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন, 'ভয় পেয়ো না, ওর নাম রইচউদ্দিন, ও কাউকে আঘাত করে না, শুধু প্রশ্ন করে।'

'লা ইল্লাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইল্লাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হয় নাই?' রইচউদ্দিন আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিলে আমার পূর্বপুরুষ ইশারা করেন হ্যাঁ বলার জন্য। রইচউদ্দিনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলি, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

রইচউদ্দিন শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে হাততালি দিতে দিতে নাচতে থাকে, 'তয় ব'লে পারি না, পারছি, পারছি!'

তার মাথায় জটা পাকানো ধুলো মলিন চুল, মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফ; গায়ে কালি-ঝুলি মাখা ময়লা চাদর, পরনেও লুঙ্গির মতো ক'রে পরা ময়লা ধুতি। দাঁতগুলো কালচে, হাত-মুখের ত্বক রুক্ষ। নাকটা ডানদিকে কিছুটা বাঁকানো।

অল্পক্ষণ পরই নাচ থামিয়ে হাসি বন্ধ ক'রে খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আল্লাহ্‌রে দেখিছো, আল্লাহ্?'
দু-দিকে মাথা নাড়ি, 'না, দেখি নাই।'
'আল্লাহ্'র কাছে বিচার দেব, বিচার।' আকাশের দিকে আঙুল তোলে, 'ওই সাত আসমানের ওপর থেকে যেদিন আল্লাহ্ নেমে আসবে এই ঘরে, সেদিন তার কাছে বিচার দেব।'
'কীসের বিচার দেবেন আপনি?'

'কেন জানো না? আল্লাহ্'র লোকজন এসে আমার বাবাকে বলি দিলো, তারপর মূর্তি ভাঙতে ভাঙতে বললো যে এই মাটির মূর্তিতে আল্লাহ্ থাকে না, আল্লাহ্ থাকে সাত আসমানের ওপরে। তারপর তারা মন্দির ভেঙে এখানে আল্লাহ্'র ঘর বানালো। সেই থেকে ব'সে আছি আল্লাহ্'র অপেক্ষায়, কিন্তু আল্লাহ্'র ঘরে আল্লাহ্ আর এলো না। বৃষ্টির সময় আমি আল্লাহ্'র ঘরে ঢুকলেই আমাকে মেরে বের ক'রে দেয়। আমি ওদের কতো বলি যে আমাকে থাকতে দাও, আল্লাহ্ এলেই আমি বাইরে গিয়ে শোব, ওরা শোনে না, আমাকে মেরে বের ক'রে দেয়। এই ঘরে কতো মানুষ আসে নামাজ পড়তে, কিন্তু আল্লাহ্'র ঘরে আল্লাহ্ কেন আসে না, কেন আসে না? আল্লাহ্'র কাছে বিচার দেব, বিচার...!'

বলতে বলতে চ'লে যায় রইচউদ্দিন, আমরাও সামনের দিকে পা বাড়াই। আমার পূর্বপুরুষ বলেন, 'ওর বাবা এখানকার মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। ওর সামনেই তাকে জবাই করেছিল শাহ্ জালালের মুরিদরা। এরপর ওর পরিবারের অন্যদেরকেও হত্যা করেছিল। আমার সাথেই ওকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল শাহ্ জালাল। কিন্তু তারপর থেকেই ও পাগল হয়ে

গেল। ওর পরিবারের কেউ বেঁচে ছিল না তখন, কোনো আত্মীয়-স্বজনেরও খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই থেকে ও এখানেই আছে, ক্ষুধা পেলে হাটে-ঘাটে কিংবা মানুষের বাড়িতে গিয়ে চেয়ে খায়।'

শুনতে শুনতে বুকটা ভার হয়ে যায়, না জানি কতো মানুষের জীবন এমন বিপন্ন হয়েছে নির্মম ইসলামী আগ্রাসনে। কতো জীবন, কতো সম্পর্ক, কতো সংসার, কতো জনপদ ধুলোয় মিশেছে!

আমার পূর্বপুরুষদের নাড়িপোঁতা ভিটেয় এসে দাঁড়াই আমরা দু'জন। ঘাস, লতা-পাতায় জঙ্গলাকীর্ণ একটি মাটির বাড়ি। আমার পূর্বপুরুষকে পিছনে ফেলে আঙিনার ঘাস, লতা-পাতার ভেতর দিয়ে আমি এগোই; আঙিনার একপাশে গরুর গাড়ির একটি পুরনো পচন ধরা চাকা, তার ওপরে পিঁপড়ের সারি। পাশেই জবা গাছে ফুটে রয়েছে দুটো রক্তজবা। কাছেই প্রায় ব'সে যাওয়া তুলসি ভিটে, গাছ নেই, তুলসি ভিটের ওপর স্যাঁতাপড়া দুটো কড়ি আর একটা তামার পয়সা, নিচে এক টুকরো ভাঙা শাখা। ঘরের সামনে একটা পোড়ামাটির পুতুল। ঘরের দেয়ালের মাটি জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে, দেয়াল বেয়ে লতা উঠেছে টালির চালে; চালার ওপর রাশি রাশি শুকনো ঝরা পাতা-পচা পাতা, গাছের দু-চারখানা মরা ডাল, একটা শুকনো নারকেল; কয়েক জায়গা থেকে টালি খসে পড়েছে। হঠাৎ ঘরের পাশের পুঁইপাচার কাছে গিয়ে চমকে থমকে দাঁড়াই বেশ লম্বা একটা কঙ্কাল দেখে! কঙ্কালটির মাথার খুলি ভাঙা।

আমার পূর্বপুরুষকে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কার কঙ্কাল?'
কঙ্কালে চোখ স্থির রেখে তিনি বলেন, 'আমার কাকার।'
কয়েক পা এগোতেই বারান্দার নিচে দেখতে পাই আরেকটি কঙ্কাল, এটা আগেরটার চেয়ে কিছুটা ছোট। জিজ্ঞেস করি, 'এটা?'
'আমার জ্যাঠার।'
আমার দৃষ্টি পইঠায় প'ড়ে থাকা একটি হুঁকো আঁকড়ে ধরে।

ঘরের উদ্দেশ্যে পইঠায় পা রাখি, আমার পূর্বপুরুষ আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকার মুহূর্তে কয়েকটা চড়ুই আর বুনো কৈতর উড়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মাটির ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে ঢোকা মোলায়েম আলো ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। দক্ষিণদিকের মেঝেতে তাকাতেই আমি আঁৎকে উঠি কঙ্কালের স্তূপ দেখে! কোনটার মাথা কোনটা, কোনটার পা বা হাত কোনটা দেখে তা বোঝার উপায় নেই! একটা কঙ্কালের বুকের পাঁজ ভেদ ক'রে রয়েছে জং ধরা তরবারি। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে নিথর চোখে তাকিয়ে থাকি কঙ্কালগুলোর দিকে। আমার হাত নাড়াতে পারি না, পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে, বুঝিবা থেমে গেছে বুকের স্পন্দন! কতোক্ষণ কেটে যায় জানি না, নৈঃশব্দ খান খান ক'রে ডেকে

ওঠা একটি কাকের কর্কশ স্বর শুনে আমি অবচেতন থেকে চেতনে ফিরি। দু-চোখ ঝাপসা, কপোল বেয়ে চিবুকে ঠেকেছে জল। আমি সারা ঘরে দৃষ্টি বুলাই–মেঝেতে ছাড়ানো ছিটানো ভাঙা কয়েকটি মাটির স্যাঁতাপড়া হাঁড়ি-পাতিল, পচন ধরা কাঠের চিরুনি, কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো, একটা ছোট্ট শঙ্খ ইত্যাদি। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। কোথায় আমার পূর্বপুরুষ, কানাই মণ্ডল অথবা কলিমুদ্দি! ডেকে সাড়া পাই না, সারা বাড়ি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তার দেখা মেলে না। বুঝতে পারি তিনি আর আমার সামনে আসবেন না। আমার দৃষ্টি স্থির হয় উঠোনে প'ড়ে থাকা পুতুলটার ওপর, বউ পুতুল। নিশ্চয় আমার কোনো পূর্বপুরুষের ছোট্ট মেয়ে খেলা করতো পুতুলটা নিয়ে, তুলতুলে হাতে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতো পুতুলটাকে, হয়তো মিথ্যে মিথ্যে বুকের দুধও পান করাতো। আহা, মেয়েটার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। আমার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আরো কতো কিছু জানবার বাকি!

আমি নিচু হয়ে পুতুলটা স্পর্শ করতেই পুনরায় হলদে পাখি হয়ে যাই! আঙিনায় ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে পূর্বপুরুষের ভিটের কিছু শস্যদানা খাই, নিমগাছের নিচে একটা ভাঙা মৃৎপাত্রে জমে থাকা জল পান ক'রে তৃপ্ত হই। তারপর উড়ে গিয়ে বসি কদমগাছের ডালে, শেষবারের মতো পূর্বপুরুষের ভিটেয় জলভরা দু-চোখের বেদনার্ত দৃষ্টি বুলিয়ে আবার উড়াল দিই আকাশে!

ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে আমি উড়তে থাকি, অতিক্রম করি ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ভাগীরথী, গঙ্গা, যমুনা আরও কতো শত নদ-নদী ও জনপদ; উড়তে থাকি আরো অতীতের দিকে, নিগূঢ় শিকড়ের সন্ধানে। পাহাড়, সমভূমি, মরুভূমির ওপর দিয়ে অনবরত-অবিশ্রান্ত উড়ি আমি এক মুক্ত হলদে পাখি, দু-ডানায় ক্লান্তি ভর করলে জিরিয়ে নিই কোনো পাহাড়ি ঝিরির পাশের তেঁতুল কি হরিতকী কিংবা নাম না জানা কোনো বৃক্ষশাখায় ব'সে, ঝিরির জল পান ক'রে তৃষ্ণা মিটাই; কখনো বা বসি কোনো নদীর পারের বটবৃক্ষের ডালে, নিচে নেমে ঠোঁট ডুবিয়ে আকণ্ঠ পান করি নদীর জল; আবার উড়তে উড়তে ক্লান্ত হ'লে রাজস্থানের তপ্ত মরুভূমির কোনো পাথর চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা জলে দূর করি বুকের খরা। তারপর আবার উড়ি কেবলই অতীতের দিকে। উড়তে উড়তে সিন্ধু নদী পেরিয়ে পৌঁছে যাই ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তে সিন্ধুর দেবল বন্দরে। বন্দর সংলগ্ন এলাকায় এক পাক উড়ে এসে বসি বন্দরের কাছের এক পুরাতন উঁচু অশ্বত্থের মগডালে, কোথাও কোথাও রয়ে গেছে ধ্বংসের চিহ্ন; গত বছর জুন মাসে ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে পরাজিত ক'রে দেবল নগরী দখল করেছে মোহাম্মদ বিন কাশিম। আমি উড়াল দিই নগরীর ভেতরের দিকে; কোথাও ঘরবাড়ির পোড়া কাঠামো, কোথাও বড় বড় প্রসাদ কিংবা মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ চোখে পড়ে, কোথাও পুরাতন প্রাসাদের জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন ইমারত, মন্দিরের জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে মসজিদ এবং উঁচু মিনার। আমি একটি পিপুলগাছে ব'সে দেখতে পাই এক জায়গায় বিশাল একটি মন্দির ধ্বংস করার পর সেই মন্দিরের পাথর এবং অন্যান্য মাল-মসলা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে

বিশাল মসজিদ। ভারতীয় নব্য মুসলমান ক্রীতদাস কারিগররা ত্রস্ত হয়ে ব্যস্ত হাতে মসজিদ নির্মাণের কাজ করছে; নিকট অতীতে এদের কাউকে অজিত থেকে আজিজ, কাউকে নকুল থেকে কবিরুল করা হয়েছে। আজিজ-কবিরুলদের বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই, যেনবা নেই ক্ষুধা-তৃষ্ণাও! কেবল কাজ করার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে, এক মনে তারা কাজ করছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদার আরব ক্রীতদাসরা চাবুক হাতে তাদের ওপর নজরদারি করছে। শারীরিক দূর্বলতার কারণে কাজে ধীরগতি বা সামান্য কোনো ভুল-ত্রুটি হলেই আরব ক্রীতদাসদের চাবুক আছড়ে পড়ছে তাদের পিঠে, তাদের মাথা ঠুকে দিচ্ছে দেয়ালে। মাটিতে ফেলে কাউকে কাউকে পা দিয়ে পিষছে তাদের কওমের ভাইয়েরা!

আমি হলদে পাখি থেকে মানুষ হয়ে নগরীর রাস্তায় নেমে নব্য মুসলমানের বেশে গায়ে আলখাল্লা-মাথায় পাগড়ি প'রে হাঁটতে থাকি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমার সামনে পড়ে একটি ক্রীতদাসের বহর; আমি পথ ছেড়ে দাঁড়াই একটা গাছের আড়ালে। চামড়ার ফিতে দিয়ে ক্রীতদাসদের হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা, কারো কারো হাতে-পায়ে লোহার বেঁড়ি পড়ানো। তাদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়ই আছে, আছে অল্প বয়সী বালক-বালিকা ও শিশু। শরীরে জীর্ণ পোশাক, শরীরের অনাবৃত অংশে চাবুকের লালচে লম্বা দাগ। সকলেই ক্লান্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর; অপেক্ষাকৃত দূর্বলরা খুব কষ্টে দলের অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছে চাবুকের ঘা খেতে খেতে, অশ্রুশূন্য শুষ্ক তাদের চোখ, গালে ময়লা কাটা শুকনো অশ্রুরেখা। চাবুক হাতে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে কয়েকজন অশ্বারোহী আরব মুসলমান; তাদের কথায় কান পেতে বুঝতে পারি যাত্রাপথে এই বহরটির সাথে আরো কয়েকটি বহর যোগ হবে। তারপর একত্রিত বিশাল বহরটিকে নিয়ে যাওয়া হবে প্রথমে বাগদাদে, কিছু বিক্রি করা হবে বাগদাদের দাসবাজারে; অবশিষ্ট দাসদের পাঠানো হবে দামেস্কে।

টানা দু-দিন আমি কখনো মুসলমানের বেশে কখনোবা হলদে পাখি হয়ে দেবল নগরীতে ঘুরে বেড়াই আর প্রত্যক্ষ করি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। সর্বত্রই প্রায় একই রকম দৃশ্য; কোথাও ক্রীতদাসরা কারখানায় অস্ত্র এবং বর্ম তৈরি করছে, কোথাও তৈরি করছে সোনা-রূপা-তামার অলঙ্কার, কোথাও মাঠ থেকে ফসল কেটে এনে প্রক্রিয়াজাত করছে, কোথাও বস্ত্র কিংবা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করছে, কোথাও খনন করছে কিংবা ভারী বস্তু বহন করছে; আর সবখানেই তাদেরকে নজরদারি ও নিপীড়ন করছে আরবরা। সর্বত্রই একই রকম নিপীড়ন ক্রীতদাসদের ওপর। কোথাও কোথাও নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে মানসিকভাবে দূর্বল কোনো ক্রীতদাস আত্মহত্যাও করেছে। এই জনপদে মানুষের দুঃখগাঁথা ব্যতিত যেন কিছু নেই! ভারতীয়দের মুখে কোনো হাসি নেই, জীবনে কোনো সুখ-আনন্দ নেই; নিজের জীবনটাও তাদের নিজের নেই। সকলেই যেন অপরের জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে, আপন দেহের ভেতরে আপনিই নেই!

উড়তে উড়তে আমি একজন পদাতিক যোদ্ধার অন্দরমহলের বারান্দার রেলিংয়ের ওপর গিয়ে বসি। যোদ্ধা বাড়িতে নেই; আছে দামী রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত তার চারজন পত্নী, সাধারণ বেশভূষায় ছয়জন ভারতীয় ধর্মান্তরিত যৌনদাসী, তিনজন সুদর্শন বালক ক্রীতদাস আর একজন বালকের মতো দেখতে কিন্তু তার সাজগোজ অনেকটা নারীদের মতোই। বাড়িতে বিপুল বিত্ত-বৈভব। বাড়ির বাইরের মহলে বল্লম হাতে পাহাড়ায় রয়েছে তিনজন ক্রীতদাস। একজন পদাতিক যোদ্ধার এতো দাস-দাসী, বিত্ত-বৈভব; তাহলে আরো বড় যোদ্ধাদের না জানি কী অবস্থা!

আমি একজন বড় মাপের ঘোড়সওয়ার যোদ্ধার বাড়ির আমগাছে গিয়ে বসি। বাড়ির আভিজাত্য দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়; দামী আসবাপত্র, বাসন-কোসন, পত্নী, দাস-দাসীর যেন অভাব নেই! এরপর আমি সেনাপতির বিশাল প্রাসাদের এদিক-সেদিক উঁকি দিই; অসংখ্য পত্নী, যৌনদাসী আর দাস-দাসীর বহর দেখে আমার বেঁহুশ অবস্থা! আমি এলোমেলোভাবে উড়তে থাকি যোদ্ধা আর পদস্থ আরবীয়দের বাড়ির ওপর দিয়ে। একটা ব্যাপার আমাকে বিস্মিত করে–ঋতুবতী নারী মাত্রই গর্ভবতী; তা সে বয়স তেরো হোক কিংবা তেতাল্লিশ, পত্নী কিংবা দাসী! একসঙ্গে এতো নারী গর্ভবতী হবার কী রহস্য! পত্নীরা অন্দরমহলে উঁচু পেট নিয়ে হাঁটছে, খাচ্ছে, দাস-দাসীদের সেবা গ্রহণ করছে; দাসীরা উঁচু পেট নিয়ে মালকিনের সেবা এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম করছে!

উড়ে যাবার সময় একটা বাড়ির জানালায় চোখ পড়তেই আমি ফিরে এসে বসি জানালা থেকে সামান্য দূরত্বের একটা পেয়ারা গাছের ডালে, ঘরের ভেতর জানালার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছেন খোলা চুলের বছর চল্লিশের এক নারী; পরনে শাড়ি, গায়ে কিছু নেই। বুকে শাড়ির আগল থাকলেও অনাবৃত তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চিকন বাহু আর স্ফীত পেটের অংশবিশেষ, যথারীতি তিনিও গর্ভবতী! আমি তার চোখ চিনি, চিনি তার চোয়াল আর চুল; তিনি আমার মায়ের পূর্বসুরি! তার সঙ্গে কথা বলার উদগ্র বাসনায় আমি পেয়ারা গাছ থেকে ভূমিতে নামতে যাব এমন সময় আমাকে হতাশ ক'রে এক যুবতী এসে তাকে ডেকে নিয়ে যায় অন্য কক্ষে। আমি এদিকে-ওদিকে উঁকি দিয়েও তাকে আর দেখতে পাই না। কিন্তু দেখা যে আমাকে করতেই হবে, আবার কখন তাকে একা পাব সেই অপেক্ষায় এগাছ-ওগাছ করছি এমন সময় চোখ পড়ে এই বাড়িরই পিছন দিকের বাগানে, একজন প্রৌঢ় শীতলপাটিতে ব'সে সামনের জলচৌকির ওপর ঝুঁকে কিছু লিখছেন আর বারবার কালির পাত্রে কলম চুবিয়ে নিচ্ছেন। পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে পাখার বাতাস করছে এক সুদর্শন কিশোর, আমার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিশোরটি প্রৌঢ়ের ক্রীতদাস। আমি উড়ে গিয়ে বসি তাদের মাথার ওপরের কাঁঠাল গাছের শাখায়। প্রৌঢ় একটু পরপর কালির পাত্রে কলম চুবিয়ে উটের চামড়ায় একমনে লিখছেন; এখন বসন্তকালের শুরু, এলোমেলো বাতাস বইছে, তেমন গরম লাগছে না তবু কিশোর অনবরত তার মনিবকে বাতাস ক'রে চলেছে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি প্রৌঢ়কে; দুধে আলতা তার গায়ের রঙ,

দাড়ি-গোঁফের আশি ভাগই সাদা, মাথায় সাদা পাগড়ি, গায়ে সাদা আলখাল্লা। কিছুক্ষণ পর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কলমটি রেখে আবৃত্তি করতে থাকেন লেখাগুলো। বুঝতে পারি যে তিনি একজন কবি। পর পর কিছু পংক্তি আবৃত্তি করার পর তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, দারুণ উদ্যম আর উচ্ছ্বাসে তিনি পরবর্তী পংক্তিগুচ্ছ আবৃত্তি শুরু করেন–

কাফেরের অন্ধকার আসমানে ইসলামের পবিত্র সূর্য
উঠিয়েছে মোহাম্মদ বিন কাশিমের শৌর্য।
কাফেরের নাপাক জমিনে ধ্বনিত হয়েছে পাক আল্লাহ্'র নাম
মোহাম্মদ বিন কাশিমের তলোয়ারেই বেঁচে থাকবে ইসলাম।
কাফেরের রক্তে লিখে আল্লাহ্'র নাম
মোহম্মদ বিন কাশিম রেখেছেন নবীজির সম্মান।
বসন্তের কোকিলের কণ্ঠেও আজ শুনি যার নাম
সেই মোহাম্মদ বিন কাশিমকে হাজার সালাম।

আবৃত্তি শেষ হ'লে কবি বিপুল উচ্ছ্বাসে নিজের মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত ঊর্ধ্বে ছুড়তে ছুড়তে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'মারহাবা! মারহাবা! পেরেছি! কেমন হয়েছে নাসিরউদ্দিন?'
'মারহাবা, মারহাবা; খুব ভাল, খুব ভাল।' নাসিরউদ্দিন নামক সুদর্শন কিশোর ক্রীতদাসের চোখ থেকে অশ্রু গড়ালেও কবি তা দেখতে পাচ্ছেন না!
'জাঁহাপনার ছন্দ হবে বলছো?'
'খুব হবে, শিরোপা দেবে আপনাকে।'
'সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্; নাসিরউদ্দিন, তাহলে আমিও তোমাকে শিরোপা দেব; একরাতের জন্য দাসী সালমাকে তুমি পাবে, তোমার ইচ্ছে মতো সালমা তোমাকে সেবা করবে!'
নাসিরউদ্দিনকে চুপ থাকতে দেখে কবি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আহ্ তোমাকে কতোবার বলেছি যে কোনো সুংসংবাদ শুনলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে হয়!'
নাসিরউদ্দিন দ্রুত উচ্চারণ করে, 'আলহামদুল্লাহ্... আলহামদুল্লাহ্...!'
'আলহামদুল্লাহ্ নয়, নালায়েক; আলহামদুলিল্লাহ্! মালাউন ভারতীয়, আল্লাহ্'র পবিত্র ভাষাও মুখে আনতে পারে না! তিনবার বলো, আলহামদুলিল্লাহ্...!'
নাসিরউদ্দিন খুব সাবধানে উচ্চারণ করে, 'আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্।'

কবি কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিজের লেখায় চোখ বুলান, দুটি সংশোধন করেন, তারপর পুনরায় কিছু পংক্তি আবৃত্তি করার পর ওপরে দু-হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শুকরিয়া, শুকরিয়া, আপনার অশেষ মেহেরবানি; আমিন!'

কবির দেখাদেখি পাখা মাটিতে নামিয়ে রেখে নাসিরউদ্দিনও দু-হাত ওপরে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'শুকরিয়া, শুকরিয়া, আপনার অশেষ মেহেরবানি; আমিন!'

নাসিরউদ্দিন পুনরায় পাখা হাতে নিয়ে কবিকে বাতাস করতে থাকে। মুখে হাসি ছড়িয়ে কবি নাসিরউদ্দিনের উদ্দেশে বলেন, 'শিরোপা পাব বলছো, নাসিরউদ্দিন?'
'আলবত পাবেন, আলবত পাবেন।'
'কবি মোহাম্মদ আফাজউল্লাহ আর শামসুদ্দিন খাঁর চেয়ে আমি ঢের বড় কবি নই, নাসিরউদ্দিন?'
'আলবত আপনি তাদের চেয়ে বড় কবি। গেল সপ্তাহের কবিতার আসরেও তো তারা আপনার কাছে হেরে গেছে!'
'নাসিরউদ্দিন...'
'জী।'
'কাছে এসো।'

নাসিরউদ্দিন পাখা রেখে ব্যস্ত হাতে চোখের জল মুছে কবির বাম হাতের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কবি তার বাম হাত ধ'রে কাছে বসিয়ে বাঁ হাতে তাকে নিজের শরীরের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধ'রে কপালে চুম্বন করেন, এরপর চুম্বন করেন দুইগালে এবং ঠোঁটে। তার চুল আঘ্রাণ ক'রে বলেন, 'তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় নোকর, ইহজগতের গেলমান; আমি যদি জাঁহাপনার কাছ থেকে শিরোপা পাই তাহলে একরাত নয়, তোমাকে তিনরাতের জন্য দাসী সালমাকে উপহার দেব; আর অতি উত্তম বাক্য বলার জন্য আজকের রাতটি কোনো বিবি কিংবা দাসী নয়, তোমাকে উপহার দেব প্রিয় গেলমান আমার!'

পুনরায় নাসিরউদ্দিনের কপালে ও মাথায় চুম্বন ক'রে চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলেন, 'যাও, খুশ দিলে আমাকে হাওয়া করো প্রিয় আমার।'

নাসিরউদ্দিন আবার পাখার বাতাস করতে থাকে। আর কবি পুনরায় কবিতা রচনায় মনযোগ দেন। কবির কবিতাগুলো না মানবপ্রেমের, না ঈশ্বরপ্রেমের, না প্রকৃতিপ্রেমের; সকলই শাসকপ্রেমের কসিদা। গত বর্ষায় সিন্ধু জয় করা, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া শাসক মোহাম্মদ বিন কাশিমের স্তুতিগাঁথা; অন্যান্য যোদ্ধাদের স্তুতিগাঁথা। কীভাবে তারা বীরত্ব দেখিয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কীভাবে কাফেরদের ধড় থেকে মাথা আলাদা ক'রে ফেলেছে, কীভাবে কাফেরদের মন্দির এবং মূর্তি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, কীভাবে কাফের রাজা দাহিরের মস্তক ছিন্ন ক'রে মস্তকের সাথে লুণ্ঠিত মূল্যবান সামগ্রী এবং রূপবতী নারী ও ক্রীতদাস উপহারস্বরূপ দামেস্কে পাঠানো হয়েছে খলিফা আল-ওয়ালিদের নিকট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা! দুয়েকটি কবিতা কাফের যুবতীদের আশ্চর্য সৌন্ধর্য, তাদের যৌনদাসীতে রূপান্তরিত হওয়া এবং তাদের সঙ্গে রতিসুখ বিষয়ক!

একটু পর এক বালিকা দাসী দু-পাত্র মদ নিয়ে আসে, নত হয়ে কবির লেখার জলচৌকির পাশের আরেকটি জলচৌকির ওপর নামিয়ে রাখতেই কবি দুই হাতে তার মুখমণ্ডল ধ'রে কপালে ও ঠোঁটে চুম্বন ক'রে গাল টিপে দেন, তারপর তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন,

কিন্তু এই আদরে দাসীটির মুখশ্রীতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, বরং মুখশ্রীতে ভেসে ওঠে গোপন ব্যথার সুক্ষ্ম আস্তরণ। কবির বুকে মাথা রেখেও সে নির্লিপ্ত। কবি তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'নার্গিস, প্রিয় বাঁদী আমার, তোমাকে কখনও হাসতে দেখি না কেন, তুমি কি এখনো তোমার কাফের আব্বা-আম্মার কথা মনে ক'রে কষ্ট পাও? তাদেরকে ভুলে যাও নার্গিস, তারা অবিশ্বাসী কাফের ছিলো, তারা মূর্তি পূজারি ছিল, তাই তোমার আব্বাকে হত্যা করা হয়েছে আর তোমার আম্মাকে উম্মতের সেবার জন্য কোথাও পাঠানো হয়েছে। তোমার আব্বা নিশ্চয় এখন দোজখের আগুনে জ্বলছে। তুমি এখন মুসলমান, ন্যায় ও সত্য ধর্মের পথে এসেছো; পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও আর নতুন ক'রে বাঁচো। কাফের আব্বা-আম্মার কথা ভেবে কখনোই মন খারাপ করবে না, চোখের জলও ফেলবে না; তাহলে আল্লাহ্ তোমার ওপর নাখোশ হবেন। খুশ দিলে থাকো আর আমার সেবা করো প্রিয় বাঁদী।'
নার্গিসের দু-চোখের পাতায় চুম্বন ক'রে বলেন, 'যাও'
চ'লে যায় নার্গিস। কবি পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বলেন, 'নাসিরউদ্দিন...।'
'জী।'
'নার্গিস এখনো গোলাপের কুড়ি। দু-তিন বছর পর ও বসরাই গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে রোশনাই ছড়াবে! আল্লাহ্ যেন ততোদিন আমাকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন, আমি ওর গর্ভে আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করতে চাই, যে পুত্র একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করবে; ইনশাল্লাহ্।'
নাসিরউদ্দিনও কবিকে অনুসরণ করে, 'ইনশাল্লাহ্।'

কবি লেখার ফাঁকে ফাঁকে পানপাত্রে চুমুক দিতে থাকেন। লিখতে লিখতে কখনো বিড়বিড় করেন, আবার কখনো নিচুস্বরে কখনো গলা ছেড়ে আবৃত্তি করেন। থেকে থেকে নিজেই প্রশংসা করেন নিজের কবিতার আবার কখনো নাসিরউদ্দিনের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় ক'রে নেন। দীর্ঘক্ষণ লেখার পর অন্য একজন দাসী এসে কুর্নিশ ক'রে জানায়, 'গোসলের পানি প্রস্তুত।'

দাসীর বয়স চৌদ্দ-পনের, গায়ের রঙ প্রায় ফর্সা এবং সুন্দরী। পরনে শাড়ি, তার স্ফীত পেটে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে সে চার-পাঁচ মাসের পোয়াতি। সদ্য স্নান করায় তাকে যেমনি স্নিগ্ধ লাগছে, তেমনি গা থেকে একটা স্নিগ্ধ গন্ধও ছড়াচ্ছে বাতাসে। তাকে দেখেই বোঝা যায় যে সে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। কবি প্রথমে তার মুখের দিকে তাকান, তারপর মাথা থেকে পা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'জোহরা, আমার একবার কঠিন পীড়া হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তখন আমাকে বেহেশতে তুলে নেন নি কেন জানো? ভারতীয় মেয়েদের সেবা গ্রহণ করার জন্য, তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য। তোমরা ভারতীয় মেয়েরা অপার সৌন্দর্যের অধিকারী, তোমাদের শরীর আমার কাছে এক মহাবিস্ময়; তোমাদের স্পর্শে দেহাভ্যন্তরে ব'য়ে যায় সাইমুম! স্নানের পরে তোমাকে অপূর্ব লাগছে জোহরা!'

জোহরা হাত কপালে ছুঁইয়ে বলে, 'সোবহানাল্লাহ, সোবহানাল্লাহ, শুকরিয়া!'
কবি কলম রেখে হাত বাড়ান জোহরার দিকে। জোহরার সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়ান, জোহরার কপালে চুমু খেয়ে তার চুলে নাক গুঁজে গন্ধ শুঁকে বলেন, 'আশ্চর্য তোমার শরীরের ঘ্রাণ! চলো, প্রিয় বাঁদী আমার।'

কবি জোহরাকে ডানপাশে রেখে তার পিঠের ওপর দিয়ে হাত নিয়ে পেটের ডানপাশে বীনার তারের মতো আঙুলের স্পন্দন করতে করতে হাঁটতে শুরু করেন; তারপর হঠাৎ মাথাটা পিছনে ঘুরিয়ে নাসিরউদ্দিনের মুখে দৃষ্টি রেখে বলেন, 'শিরোপা পেলে আমি আমার কথা রাখবো নাসিরউদ্দিন!'

ঘাড় ফিরিয়ে পুনরায় একইভাবে হাঁটতে শুরু করেন বাসগৃহের দিকে। নাসিরউদ্দিন পাখা নামিয়ে রেখে কবির লেখার উটের চামড়া এবং কালি-কলম গোছাতে থাকে। আমি কাঁঠালগাছের শাখা থেকে ভূমিস্পর্শ করা মাত্র মানুষ হয়ে যাই, আমাকে দেখে নাসিরউদ্দিনের হাত থেমে যায়, হয়তো কিছুটা চমকায়ও।
বলি, 'তোমার নাম নাসিরউদ্দিন?'
ও নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বুঝিবা ভয়ে। আমি ওকে আশ্বস্ত করি, 'আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি জানি তুমি নাসিরউদ্দিন।'
হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নেড়ে ও।
'তোমার বাবার নাম?'
ও একইভাবে চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, 'বলো, তোমার বাবার নাম কী?'
নাসিরউদ্দিনের চোখে জলের জোয়ার, হয়তো এখনই ঝ'রে পড়বে। মাটির দিকে মাথা নামিয়ে বলে, 'চন্দ্রদেব।'
'আর তোমার আগের নাম?'
'অর্জুন।'

সত্যিই ও এখন নাসিরউদ্দিন নয়, অর্জুন। হয়তো সকলের সামনে ওকে নাসিরউদ্দিন হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু একা হলেই ওর ভেতরের অর্জন সত্তা চাগাড় দিয়ে ওঠে। অর্জুনের চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল ঝুপ ক'রে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। বলি, 'কবিতা শুনে কষ্ট পেয়েছো?'
ঘাড় নেড়ে জানায়, 'হ্যাঁ।'
'কবিকে খুশি করতে ভাল বলেছ?'
'হ্যাঁ, নইলে মারতো।'
'এখানে তোমার আপনজন কেউ নেই?'
'না, আমার বাবাকে সৈন্যরা মেরে ফেলেছে; আমার মামার মাথা কেটে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর বুড়ো কবিটা সেইসব কথাই লিখেছে ওর কবিতায়।'
'মহারাজ দাহির তোমার মামা?'

'হ্যাঁ, আমার মায়ের মামাতো ভাই। আমাদের পরিবারের সব পুরুষদেরকে মেরে ফেলেছে, মেয়েদের আর ছোটদেরকে দাস-দাসী বানিয়েছে। আমার মা কোথায় আছে আমি জানি না, মনে হয় আর কোনোদিন আমি আমার মাকে দেখতে পাব না।'

কেঁদে ফেলে অর্জুন। আমি ওর পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখি, মুখে বলার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাই না। চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোর, যার এখন দুষ্টুমি আর খেলাধুলা করার বয়স, পাঠশালায় লেখাপড়া করার বয়স, অথচ সে এখন বাবা-মাকে হারিয়ে এক কবির সেবাদাস-যৌনদাস হয়ে জীবন কাটাচ্ছে; একে সান্ত্বনা দেবার মতো শব্দ বা ভাষার কি জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে!

বেশ কিছুক্ষণ পর বলি, 'এই বাড়িতে একজন নারী আছেন, বয়স চল্লিশের মতো, মাথায় লম্বা চুল, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; শাড়ি প'রে ঐ পূর্বদিকের জানালার কাছে আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তুমি চেন তাকে?'
'চিনিতো, সত্যবতী মাসি।'
'তিনি এখানে কী করছেন?'
'তিনিও একজন দাসী।'
'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি এই সংবাদটি তাকে দিতে পারবে?'
'হ্যাঁ, পারবো।'
'আমি রাতে তার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো, তিনি যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন।'
'আপনি তার কী হন?'
'আমি তার আত্মীয়। তুমি খবরটা সাবধানে দিও, কেউ যেন বুঝতে না পারে।'
'কেউ বুঝতে পারবে না। আমি গোপনে মাসিকে বলবো। আমি এখন যাই, নইলে বুড়ো কবিটা আবার বকবে।'
'আচ্ছা, যাও।'
'আপনার বসার জন্য একখানা জলচৌকি রেখে যাচ্ছি।'
'জলচৌকি রেখে গেলে কেউ কিছু বলবে না?'
'বললে বলবো ভুলে ফেলে এসেছি। মাসি আপনার কাছে এলেও বসতে পারবে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাসির কষ্ট হয়, আবার মাটিতে বসতেও কষ্ট হয়।'

জলচৌকিখানা রেখে অন্য সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে চ'লে যায় অর্জুন। রাজার ভাগ্নে, সকলের আদরের দুলাল; বাবা-মা হয়তো মহাভারতের অর্জুনের নামে ওর নাম রেখেছিল অর্জুন, তারা হয়তো ভেবেছিল ছেলে বড় হ'লে অর্জুনের মতোই বীর হবে; অথচ সেই ছেলে আজ একজন কবির ক্রীতদাস-যৌনদাস; যে কবি কিনা তারই পিতা আর আত্মীয়-স্বজনের হত্যাকারী শাসককে খুশি করতে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে লিখছে স্তুতিগাঁথা, প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছে জিহাদিদেরকে! হায়, কবি এতোটাই বিবেকহীন নির্লজ্জ আর শাসকের পদলেহনকারী

জ্ঞানদাস যে ভুলে গেছে মানবতা; মানবতার পক্ষে না লিখে লিখছে হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষকের প্রশস্তিগাঁথা! যে জাতির কবি শাসকের গোলাম; সে জাতি তো উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, হিংস্র, লোভী, ধর্ষক, রক্তপিপাসু, পথভ্রষ্ট হবেই!

অনেক রাত, ঝিঁঝির খেয়াল ব্যতিত চতুর্দিক সুনসান। আমি বাগানে কাঁঠালগাছের নিচে ঘন অন্ধকারে জলচৌকির ওপর ব'সে আছি সত্যবতীদেবীর অপেক্ষায়, যিনি আমার মায়ের বহু প্রজন্ম আগের পূর্বসূরি; যার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু তিনি দেরি করছেন কেন বুঝতে পারছি না। অর্জুন সংবাদটা ঠিক মতো দিতে পেরেছে তো, নাকি তিনি সংবাদ পেয়েও আসার সুযোগ পাচ্ছেন না? অন্ধকারে ব'সে বারবার পথের দিকে তাকাই, আমার ভাবনা জুড়ে কেবলই তিনি, দৃষ্টিজুড়ে জানালায় দণ্ডায়মাণ তার মুখচ্ছবি। একসময় গাছের অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেন সত্যবতীদেবী, আমি কাঁঠালগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে অনুজ্জ্বল চাঁদের কৃপণ আলোয় গিয়ে দাঁড়াই। তিনি আমার ছোঁয়ার দূরত্বে এসে দাঁড়ান। তিনি কেমন আছেন, এই প্রশ্ন করা উপহাসের নামান্তর। তাই একবারেই বলি, 'আমি আপনার উত্তরসূরির পুত্র।'

তিনি কথা বলেন না, অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আমরা একে-অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি; মনে হয় চাঁদের আলো যদি আরেকটু বৃদ্ধি পেতো, যদি আরেকটু স্পষ্ট দেখতে পেতাম তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি। তিনি আমার মাথায় হাত রাখেন, অল্প আলোতেও আমি দেখতে পাই তিনি চোখ বুজে আছেন। আমি তার স্পর্শের আনন্দে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকি। মনে হয় তাকে আমি বহুকাল আগে থেকেই চিনি, তার এই স্পর্শ নতুন নয়; আমার মা যখন ছেলেবেলায় আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে যত্ন করতেন, আদর করতেন, তখন সেই যত্নে-আদরে এই হাত দুটিরও অদৃশ্য উপস্থিতি থাকতো; তার গায়ের গন্ধ ঠিক আমার মায়ের গায়ের গন্ধের মতোই! বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি আমার মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিলে আমি জলচৌকিখানা নিয়ে তাকে বসতে দিই কাঁঠালগাছের ঘন অন্ধকারের বাইরে; তিনি বসেন, আমি বসি তার পায়ের কাছে মাটিতে। জলচৌকির একদিকে স'রে তিনি আমাকেও বসতে বললে বলি, 'আপনি বসুন, মাটিতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

আমার ডান হাতখানা দু-হাতে ধ'রে কোলের কাছে নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে; যেন দেখছেন আর আমার অন্তরাত্মা পাঠ করছেন! নিজের অদম্য কৌতুহল নিবারণে আমি তার পাঠে বিঘ্ন ঘটিয়ে বলি, 'আপনি এখানে কতোদিন আছেন?'
তিনি উদাসীনভাবে উত্তর দেন, 'গত বর্ষায় যখন মোহাম্মদ বিন কাশিম দেবল দখল করলো, তখন থেকেই।'
'এখানে আপনার আপনজন কেউ আছেন?'
মুখ থেকে শব্দ নয়, যেন বুকের দীর্ঘশ্বাস বেরোয়, 'না।'
'পরিবারের আর সবাই কোথায়?'
'কেন জানতে চাও এসব কথা?'

'শিকড়ের কথা জানা আমার দায়িত্ব। শিকড়ের প্রতি যার আগ্রহ-শ্রদ্ধা নেই সে তো এক উন্মুল চেতনার মানুষ; সহজেই পতিত কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়; নিজেকে হারিয়ে ফেলে পতিত-পঙ্কিল স্রোতে।'

বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যায় নীরবে। তার বাম হাত আমার কাঁধে, ডান হাত মাথায়; দৃষ্টি শূন্যে। তারপর ঝিঁঝির আবহসংগীত ছাপিয়ে ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠস্বর, 'আমার স্বামী দেবল বন্দরে কাজ করতেন। বন্দরের কাছেই আমার বাবার দোকান ছিল; সেই সূত্রেই বাবার সঙ্গে তার পরিচয় এবং আমাদের বিয়ে। আমাদের সংসার সুখের হয়েছিল, একসময় কোল আলো ক'রে এলো আমার মেয়ে, তারপর ছেলে। সন্তানেরা বড় হলো, পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে লাগলো। ততোদিনে শ্বশুর গত হয়েছেন। সংসারে অভাব ছিল না; স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর, বড় জা, তাদের দুই মেয়ে আর আমাদের এক মেয়ে এক ছেলেকে নিয়ে যৌথ সংসারে তখন উপচে পড়া সুখ! ভাসুরের বড় মেয়ের তখন সবে বিয়ে হয়েছে, আমার মেয়ে অমলার বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক, ভেবেছিলাম দু-তিন বছরের মধ্যে ছেলেটাকেও বিয়ে দিয়ে টুকটুকে একটা বউ আনবো ঘরে; তার আগেই আমাদের সব শেষ গেল!'

আমার হাতটা নিজের গালে চেপে ধ'রে তিনি নিঃশব্দে কাঁদেন, তার চোখের জলে আমার হাত ভিজে যায়। আমি জানি এইসব কথা তুললে তার ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠবে, কিন্তু আমাকেও যে জানতে হবে আমার শিকড়ের কথা। আমি তার হাঁটুতে কপাল ঠেকাই, আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে নাক বেয়ে পড়ে তার হাঁটুর কাছের শাড়িতে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার মাথায় হাত বুলান, চোখের জল মুছে আমি মাথা তুলি।

বলেন, 'মুসলমানরা যেদিন হামলা চালালো সেদিনও আমার স্বামী কাজে গিয়েছিলেন বন্দরে, তারপর আর আমাদের দেখা হয় নি কোনোদিন। রাজার সৈন্যরা প্রতিরোধ করেছিল মুসলমানদের, কিন্তু মোহাম্মদ বিন কাশিমের হাজার হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের অতর্কিত হামলা সামলাতে পারে নি তারা। প্রথম তিনদিন ওরা মহাতাণ্ডব চালায় দেবলের বুকে! সামনে যাকেই পেলো তাকেই হত্যা করলো, ধড় থেকে মাথা নামিয়ে শরীর ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে ফেললো। ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে বাড়ি-ঘরে আগুন দিলো, মন্দির-বিগ্রহ ধ্বংস করলো, অধিকাংশ পুরোহিতদের শিরোচ্ছেদ করলো আর কাউকে কাউকে সুন্নত করিয়ে বানালো মুসলমান, সতেরো বছরের বেশি বয়সের অধিকাংশ পুরুষদের ধ'রে ধ'রে কচুকাটা করলো, সতেরো বছর পর্যন্ত ছেলেদের বানালো ক্রীতদাস; সকল মেয়েদেরকে বানালো যৌনদাসী। এমন সর্বভুক যুদ্ধ দেবলের মানুষ তো বটেই সারা ভারতের মানুষও কোনোদিন দেখেছে কি-না সন্দেহ। ভারতেও তো কখনো কখনো যুদ্ধ হতো রাজ্যে রাজ্যে; কিন্তু সে যুদ্ধ করতো রাজার সৈন্যরা, মেয়েদের সর্বনাশ করা তো দূরের কথা ইচ্ছাকৃত সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষয়ক্ষতিও তারা করতো না। যুদ্ধে যে রাজা জিততো সে-ই লালন-পালন করতো প্রজাদের। রাজা বদলালেও নতুন রাজা বিদ্বেষবশত প্রজা উচ্ছেদ বা দমন-পীড়ন করতো না, রাজ্য শাসনেও বিরাট কোনো পার্থক্য চোখে পড়তো না। তবে এমন সর্বভুক যুদ্ধের কথা আমরা

শুনতাম বটে। আমার স্বামী তো বন্দরে চাকরি করতেন, তাই দেশ-বিদেশের খবরা-খবর তিনি জানতে পারতেন। নানান দেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ আসতো দেবল বন্দরে, আবার দেবলের জাহাজও বিভিন্ন দেশে যেতো বাণিজ্য করতে, কতো রকমের মানুষ আসতো-যেতো, সেসব মানুষের সাথে আমার স্বামীর পরিচয় ছিল, তাদের মুখেই তিনি দেশ-বিদেশের নানান গল্প শুনতেন। তার মুখেই শুনতাম সেইসব সর্বভুক যুদ্ধের কথা। আরবে মুহাম্মদ নামে এক ডাকাত নাকি ইসলাম নামে এক ধর্ম চালু করেছিল, তার শিষ্যরা মুসলমান নামে পরিচিত; তারা সব মূর্তি পূজাবিরোধী। মুহাম্মদ নাকি প্রথমদিকে ডাকাতি করতো, তারপর আস্তে আস্তে যখন তার ধন-সম্পদ আর শিষ্য বেড়ে গেল, তখন সে বিভিন্ন জাতির ওপর হামলা চালাতো। সে এমনই পাষণ্ড ছিল যে নিজের জাতির ওপরও আক্রমণ চালিয়েছিল, মক্কার কাবা মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙেচুরে নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে মেরে-ধ'রে ধর্মান্তরিত ক'রে তাদেরকে মুসলমান বানিয়েছিল। বেঁচে থাকতে সে বহু যুদ্ধ ক'রে বহু জনপদ দখল করেছিল, যুদ্ধে জিতলেই নাকি তারা পরাজিত জনপদের সম্পদ লুণ্ঠন করতো, তরবারির মুখে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত ক'রে ক্রীতদাস বানাতো, মেয়েদের ভোগ করতো আর বাজারে বেচে দিতো। সে মরার পর তার শিষ্যরাও নানা দেশের সাথে একইরকম ভাবে যুদ্ধ ক'রে চলেছে। আমরা এসব কথা শুনতাম আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, এমন অমানবিক পাষণ্ড মুসলমান শরীর স্পর্শ করার আগে যেন আমাদের মরণ হয়! ভগবান আমাদের প্রার্থনা শোনেন নি, তাই পেটে মুসলমানের জারজ সন্তান...!'

অল্পক্ষণের জন্য থামেন সত্যবতীদেবী, যেন আচমকা একঝাঁক স্মৃতির শর তার হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়! শর-যন্ত্রণা গোপন রেখে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, 'বছর পাঁচেক আগে সিংহল থেকে ইরাকগামী একটি জাহাজ দেবল বন্দরের কাছে জলদস্যুরা লুণ্ঠন করেছিল; ইরাকের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর দায় চাপিয়েছিল মহারাজ দাহিরের ওপর, ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল; রাজা দাহির জলদস্যুদের এই হামলার দায় নিতে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সত্যিই এতে রাজার কোনো হাত ছিল না, এটা নিছকই একটি দূর্ঘটনা, জলদস্যুদের কাজ; জলদস্যুরা তো সুযোগ পেলে দেবলের বণিকদের জাহাজও লুণ্ঠন করতো। জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠনের দায় চাপানো হাজ্জাজের একটা অজুহাত, কেননা অনেক আগে থেকেই ভারতভূমির ওপর তাদের লোভ। ভারতবর্ষের মশলা-রেশম, সোনাদানার প্রতি যেমনি লোভ; তেমনি লোভ ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের। আরবভূমির পূর্ব ও পশ্চিমে তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ডাকাত মোহাম্মদ নাকি মদিনা দখলের মধ্য দিয়ে শুরু করেছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার, তারপর তার মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা সমগ্র আরব দখল করেছে, উত্তর আফ্রিকা দখল ক'রে পশ্চিমের স্পেন দখল করেছে। এদিকে পারস্য দখল করলেও ভারতবর্ষে সুবিধা করতে পারছিল না, অতীতে বারবার হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। আমার জন্মেরও বহু আগে, ডাকাত মোহাম্মদ মরার বছর চারেক পরই আরবের খলিফা ওমরের শাসনামলে মুসলমানরা নাকি প্রথম ভারতে হামলা চালিয়েছিল থানা অঞ্চলে, কিন্তু তখন ওরা বেশিদূর এগোতে পারে নি। এর কিছুকাল পর রাজা দাহিরের বাবা চাচের শাসনামলে নাকি সিন্ধুতে নৌ-অভিযান চালিয়েছিল, কিন্তু সেবারও তারা সুবিধা করতে পারে

নি, পরাজিত হয়েছিল, নিহত হয়েছিল তাদের নেতা। এরপর আরবের খলিফা ওসমান, আলি আর মুয়াবিয়ার আমলে আরো আটবার হামলা চালিয়েছিল; কিন্তু আটবারই তারা ব্যর্থ হয়। খলিফা আলির সৈন্যরা নাকি উত্তরের বোলান গিরিপথ দিয়ে কিকান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু কিকানের অধিবাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয় কিছু মানুষকে হত্যা, কিছু সম্পদ লুণ্ঠন আর কিছু মানুষকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দী করে। বার বার ব্যর্থ আরবরা এরপর থেকে হাজ্জাজের হামলার আগ পর্যন্ত অনেকদিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছোটো-খাটো দস্যুবৃত্তি ব্যতিত বড় কোনো হামলা করে নি।

মোহাম্মদ বিন কাশিমের আক্রমণের আগে হাজ্জাজের নির্দেশে দু'জন সেনাপতির নেতৃত্বে মুসলমানবাহিনী আরো দু-বার আক্রমণ করলে দু'বারই আমাদের সৈন্যরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে, হাজ্জাজের সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ আর বুদাইল নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত খলিফা আল ওয়ালিদের সহযোগিতায় তার দেওয়া ছয় হাজার শক্তিশালী সিরীয় সৈন্যসহ হাজ্জাজ নিজের জামাতা সতেরো বছরের মোহাম্মদ বিন কাশিমকে দেবল আক্রমণ করতে পাঠায়। এবার আর তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে নি আমাদের সৈন্যরা। পার্শ্ববর্তী কোনো রাজ্যও সাহায্য করে নি, রাজা দাহিরের ওপর প্রতিবেশি রাজাদের ক্ষোভ ছিল। দাহিরের বাবা চাচ ছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। রাজা দ্বিতীয় সাহসি রাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি সিন্ধুর ক্ষমতা দখল করেন। ব্রাহ্মণ রাজার ক্ষমতা দখল রাজ্যের বাইরের এবং ভেতরের অনেকেরই ভাল লাগে নি; তাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। চাচের মৃত্যুর পর রাজা হন তার কনিষ্ঠপুত্র দাহির। এ কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ রাজারা সুশাসক ছিলেন না, নিম্নবর্ণের মানুষ আর বৌদ্ধদেরকে নানাভাবে নিপীড়ন করতেন। রাজ্যের গণ্যমান্য মানুষও রাজার বিরোধিতা করতেন। তাই মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাজা দাহির রাজ্যের ভেতর-বাহির থেকে তেমন সহযোগিতা পান নি। ফলে খুব সহজেই তিনি পরাজিত হন। সর্বকালেই রাজারা ক্ষ্যাপা ষাঁড়; তাদের একটু-আধটু ঢুঁসঢাস খেয়ে চলাই যেন সাধারণ প্রজার নিয়তি! কিন্তু ষাঁড়ের মুখ থেকে হঠাৎ যেন আমরা দৈত্যের মুখে পড়লাম, এর ঢুঁস দেবার বালাই নেই, খেয়ে সাবার ক'রে দেয়!

স্বামী বাড়িতে না ফেরায় রাতে তাকে খুঁজতে বের হলেন আমার ভাসুর, তিনিও আর ফিরে এলেন না। আমরা ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রাখতাম। মাঝে মাঝে জানালা একটুখানি খুলে রাস্তায় তাকালেই টুকরো টুকরো লাশ চোখে পড়তো, রক্ত-মাংসের পচা গন্ধ এসে লাগতো নাকে! মুসলমানদের নারী লোলুপতার কথা জানা থাকায় আমরা মেয়েদেরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ভয়ে মরছি তখন, আমার মেয়ে আর ভাসুরের ছোট মেয়ে; ভাসুরের বড় মেয়ে তখন শ্বশুরবাড়িতে। ঘরে চাল ব্যতিত আর কোনো খাবার ছিল না, ভাত ফুটিয়ে লবণ দিয়ে খেতাম; তখন প্রতিটা মুহূর্ত যেন সহস্র বছর! একদিন দুপুরে দরজায় দরাম দরাম শব্দ হলো; মেয়েদেরকে আর আমার চৌদ্দ বছরের ছেলে যাদবকে নিয়ে আমি পালঙ্কের নিচে লুকোলাম। দরজা প্রায় ভেঙে ফেলে দেখে আমার জা দরজা খুলে দিলো, আমি পালঙ্কের নিচ থেকে একটুখানি উঁকি দিয়ে দেখি যে একজন মুসলমান সৈন্য জা'র চুলের মুঠি ধ'রে তাকে বাইরে

নিয়ে যাচ্ছে। অন্য সৈন্যরা তখন ঘরে অনুসন্ধান চালালো, আমার বৃদ্ধ শাশুড়ি তাদেরকে বাধা দিতে গেলে সৈনারা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো। তারপর একে একে তারা পালঙ্কের নিচ থেকে বের ক'রে আমাদের চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে গেল আঙিনায়। পিছমোড়া ক'রে সবার হাত বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল রাজবাড়ীতে, সেখানে তখন পশুবলির মতো নরবলি চলছিল! মুসলমানরা 'আল্লাহু আকবর' ব'লে চিৎকার করছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কোনো পুরুষ বন্দীর মাথা ধড় থেকে ছিন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল রক্তের মধ্যে, আছাড়ি-পিছাড়ি করতে করতে একটু পরই নিথর হয়ে যাচ্ছিল ধড়টা! তাজা রক্তের গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠছিল আমাদের, কেউ কেউ বমি ক'রে ভাসাচ্ছিল। কী মর্মান্তিক সেই দৃশ্য!

রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর আমার বুকের ধন যাদবকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলো ওরা, "মা মা" ব'লে চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে ছুটে আসতে চাইলে এক সৈন্য ওকে চাপড়ে-চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।'

কান্নায় গলা ধ'রে আসে সত্যবতীদেবীর, নিঃশব্দে কাঁদেন তিনি; বুকভরা তার শূন্যতা আর হাহাকার পুত্র যাদবের জন্য। সত্যবতীদেবী আবার শুরু করেন, 'হাতের বাঁধন খুলে আমাদের রাখা হলো রাজপ্রাসাদের বিশাল একটি কক্ষে যেখানে আগে থেকেই আরো অনেক মহিলা, যুবতী ও বালিকাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে রাজবাড়ীর দু-একজন মহিলাও ছিল, ছিল রাজা দাহিরের কয়েকজন ভাগ্নি, সেনাধ্যক্ষদের কন্যা। তখন কে রাজরানি, কে রাজকন্যা আর কে মেথরানি এই হিসেব ছিল না; সকলেই বন্দী দাসী। কয়েক দিন যাবৎ দেবল নগরীর নানা প্রান্ত থেকে আরো অনেক নারীকে তুলে আনলো ওরা। আমাদের যা হবার হবে, দুঃচিন্তা তখন মেয়েদের নিয়ে; তখন মনে হচ্ছিল যদি হাতের কাছে বিষ পেতাম তাহলে আগে মেয়েদের খাইয়ে তারপর নিজেরা খেতাম। আমরা তখন কক্ষে বন্দী হয়ে আছি আর থেকে থেকে কেঁপে উঠছি বাইরে থেকে ভেসে আসার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনে!

আমাদের দিন কাটতে লাগলো শুধু রুটি আর জল খেয়ে; স্নান নেই, ঘুম নেই, চোখের জলও যেন তখন আর অবশিষ্ট নেই! আমাদের নিয়তি আমরা বুঝে ফেলেছিলাম, তাই একে অন্যকে জড়িয়ে ধ'রে ঠায় ব'সে থাকতাম। এরই মধ্যে নতুন নতুন মহিলা, যুবতী ও নাবালিকাকে আনা হ'লে তারা এসেই খুব কান্নাকাটি করতো, কার স্বজনকে কেমন ক'রে খুন করা হয়েছে সেসব বলতো আর বিলাপ করতো; তারপর একসময় ক্লান্তিতে তাদের মুখে নেমে আসতো শ্মশানের নীরবতা। নতুন আসা কয়েকজনের মুখেই শুনেছিলাম যে আমাদের রাজ্যের সেনাধ্যক্ষদের পর রাজা দাহিরেরও শিরোচ্ছেদ করা হয়েছে।

কয়েকদিন পর আমাদেরকে বাইরে আনা হলো; আমাদেরই মতো আরো কিছু কক্ষে বন্দী থাকা মহিলা, যুবতী ও নাবালিকাদেরকে এনে সারিসারি দাঁড় করানো হলো। বাজারের পশুর মতো আমাদেরকে গুণলো ওরা, তারপর মোট সংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ হিসেবে

আমাদের ভেতর থেকে বেছে বেছে কুমারীদের আলাদা করলো। আমার বুকের ধন অমলা আর ভাসুরের মেয়ে ইন্দুমতীকেও ফেললো ওই এক ভাগে। আমরা মেয়েদেরকে জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চাইলে আমাদেরকে মেরে মেয়েদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া নিলো। ওই একভাগকে আমাদের সামনে থেকে নিয়ে গেল সৈন্যরা। তারপর অবশিষ্ট চারভাগের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক কম বয়সী মেয়েকে রাখা হলো রাজপ্রাসাদে আর বাকিদের বণ্টন ক'রে দেওয়া হলো বিভিন্ন পর্যায়ের যোদ্ধা, কবি এবং অন্যসব আরবীয়দের মধ্যে। আমি পড়লাম একজন কবির ভাগে। আরব মুসলমানরা যুদ্ধে জিতলে নারীভোগ করে তা আগেই শুনেছিলাম কিন্তু তার ব্যাপকতা এতোটা তা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। জানতে পারলাম যে আমরা যুদ্ধে বিজয়ী মুসলমানদের গণিমতের মাল, দেবল নগরীর সম্পদের মতো আমাদেরও ভোগ কারার অধিকার তাদের ধর্মসম্মত। পরে শুনেছিলাম, যে একভাগ কুমারীকে প্রথমে আলাদা করেছিল, খলিফা আল ওয়ালিদের হিস্যা হিসেবে লুণ্ঠিত মালামাল এবং ক্রীতদাসদের সঙ্গে তাদেরকেও পাঠানো হয়েছে দামেস্কে; সঙ্গে রাজা দাহিরের কাটা মস্তকটিও পাঠানো হয়েছে। এটাই নাকি ইসলামের নিয়ম; লুণ্ঠিত মালামাল, পুরুষ ক্রীতদাস আর নারীদের পাঁচভাগের একভাগ পায় খলিফা, বাকি চারভাগ পায় যোদ্ধা এবং অন্যান্যরা। ডাকাত মোহাম্মদও নাকি তাই-ই করতো, আল্লাহ্ নাকি তাকে তেমন নির্দেশই দিয়েছিলেন।'

বলতে বলতে যেন পাথর হয়ে যান সত্যবতীদেবী! এখন আর কোনো কান্না নেই, কোনো শোক নেই; যেন একটি নিশ্চল পাথরের মূর্তির মুখ থেকে কালের কথন শুনছি, 'নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায়-ই বুঝতে পারি যে মেয়ে দুটো সেই দূর দেশে কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে! ওদের একটা মরার খবরও যদি পেতাম তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হতো না! জা আর তার ছোট মেয়ের কোনো খবর জানি না, আছে হয়তো এই নগরে আমারই মতো।'

'আর যাদব, তার কোনো খবর পেয়েছেন?'

'ওর জন্যই তো বেঁচে আছি, নইলে কবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম; ভ্রষ্ট কবির পাপ পেটে নিয়ে বেঁচে থাকতাম না। সেই যে আমার বুকের ধন যাদবকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলো ওরা, তারপর রাজবাড়ীতে ওর সাথে আর দেখা হয় নি। আমি দাসী হয়ে কবির বাড়িতে এলাম। প্রতিদিনই ভাবতাম আত্মহত্যা করবো, কিন্তু যাদবের কথা মনে হলেই আত্মহত্যার ইচ্ছেটা দমন করতাম। মনে হতো আরো কিছুদিন দেখি, যদি যাদবের কোনো খবর পাই। বয়স চৌদ্দ হওয়ায় ওকে নিশ্চয় হত্যা করা হয় নি, ও হয় এই নগরীতেই আছে নয়তো ক্রীতদাস হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দামেস্কে। সুযোগ পেলেই আমি রাস্তায় তাকিয়ে থাকতাম। এই বাড়ির দু-জন ক্রীতদাস দারোয়ানের মধ্যে একজন আমার পূর্ব পরিচিত। গোপনে ওর সাথে দেখা ক'রে ব'লে রেখেছিলাম যাদবকে কোথাও দেখলে আমাকে যেন জানায়। ও একদিন রাজবাড়ীর সামনের রাস্তায় দেখেছিল যাদবকে, বলেছিল আমার কথা। তারপর কবির অনুমতি নিয়ে কয়েকদিন পরই যাদব আমার সঙ্গে দেখা করতে

এসেছিল, ছেলে আমার আর ছেলে নেই! আরো অনেক ছেলের মতো যাদবকেও খোঁজা ক'রে দিয়েছে পাষণ্ডরা!'

ক্রোধে-কান্নায় নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেন সত্যবতীদেবী। আমি আঁৎকে উঠি, 'খোঁজা ক'রে দিয়েছে!'

'রাজ্যের কম বয়সী দাড়ি-গোঁফবিহীন কিছু ছেলেকে পাষণ্ডরা খোঁজা ক'রে দিয়েছে ওদের সঙ্গে ফুর্তি আর রাজপ্রাসাদের হেরেমের মহিলাদের ওপর নজরদারি করার জন্য। ওকে পেয়েই আর মরতে পারি নি, পেটের পাপ নিয়েও বেঁচে আছি এজন্য যে আমি বেঁচে থাকলে ও তো তবু মা ব'লে ডাকতে পারবে, ম'রে গেলে তো তাও পারবে না। কবির কাছ থেকে অনুমতি আদায় ক'রে নিয়েছি যাতে মাসে অন্তত চার-পাঁচদিন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। ও তো আমায় কিছুই বলে না লজ্জায়, শুনেছি ও মোহাম্মদ বিন কাশিমের খুব কাছের, তাই রাজপ্রসাদের বাইরে বেরোতে ওকে কেউ বাধা দেয় না।'

রাত বয়ে যায়, আমি ব্যথায়-বিস্ময়ে সত্যবতীদেবীর কথা শুনতে থাকি। শুনতে শুনতে শুকতারা ডুবে যায়, সত্যবতীদেবী অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় নিয়ে চ'লে যান, আমিও অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে থাকি কাঁঠালতলায়। আবার যেদিন যাদব আসবে সত্যবতীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে সেদিন আমি যাদবের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে যাব।

আমি হলদে পাখি হয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরি, শস্যদানা খুঁটে খাই, আর রাতেরবেলা সত্যবতীদেবীর সঙ্গে দেখা করি। দু-দিন পরই যাদব আসে মায়ের সাথে দেখা করতে, চৌদ্দ বছরের কিশোর কিন্তু মুখ দেখে মনে হয় এখনো বাল্যের ঘুম ভাঙে নি। মিষ্টি চেহারা, একমাথা কালো রেশমি চুল। গায়ে মেয়েদের পোশাক, বুকে উত্তরীয়, ঠোঁটে রঙ। আরব মুসলমানরা ওকে শারীরিকভাবে হত্যা না করলেও প্রস্ফুটিত হবার আগেই হত্যা করেছে ওর ভেতরের পৌরুষ! ওর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব হত্যা করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। ও রাজবাড়ীতে ফেরার পথে আমি ওর সঙ্গ নিলাম খোঁজার বেশে! রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ও জানায় যে আমি ওর বন্ধু। বিনা বাধায় প্রবেশ করি অন্তঃপুরের হেরেমে; যেখানে রয়েছে আঠারো বছরের যুবক মোহাম্মদ বিন কাশিমের অসংখ্য যৌনদাসী; তাদের প্রহরায় রয়েছে আরো কিছু খোঁজা। অন্তঃপুরে পুরুষ প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ, কিন্তু খোঁজার বেশ ধারণ করায় কেউ আমাকে সন্দেহ করে না, যাদবের সঙ্গে যৌনদাসীদের কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখি আর বিস্ময় বনে যাই, সাত-আট বছরের বালিকা থেকে চল্লিশ বছর বয়সী অসংখ্য নারী; এদের মধ্যে বেশিরভাগই গর্ভবতী, একজন পুরুষের জন্য এতো যৌনদাসী, একজন পুরুষ এতোটা কামলিপ্সু! ছোট্ট মেয়েদের কেউ হয়তো পাঠশালায় পড়তো, কিশোরী-যুবতীদের কারো কারো হয়তো বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়েছিল, আরেকটু বেশি বয়সের নারীদের হয়তো স্বামী-সন্তান-সংসার ছিল; সেসব ভেসে গেছে এই একজন পুরুষের

কামলিপ্সায়! এরা আর কোনোদিন স্বামী পাবে না, সংসার পাবে না, প্রিয়তম'র আদর-সোহাগ পাবে না, হয়তো আর কাউকে ভালবাসতেও পারবে না।

সন্ধ্যা নামলে সাধারণ দাসী আর খোঁজারা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় যৌনদাসীদের ঘরে ঘরে। আমি এক ফাঁকে যাদবের সহায়তায় পারভীন নামের একজন সন্তানসম্ভবা যুবতী যৌনদাসীর কক্ষে প্রবেশ করি, পূর্বে যার নাম ছিল রেণুকা। গল্পে গল্পে অনেক কথার পর বলি, 'মোহাম্মদ বিন কাশিম আপনাকে ভালবাসে?'

কটাক্ষের হাসি হেসে পারভীন বলে, 'ভালবাসার সময় কোথায় তার! দু-তিন মাস পর পর একেকজনের পালা আসে তার সঙ্গে থাকার, রাতের এক প্রহর অথবা একরাতের জন্য; তিনমাস আগে আমার পালা গেছে, এখন তো পেটে সন্তান, পেট খালি হলে হয়তোবা আবার ডাক পড়বে পেট ভরানোর জন্য; তখন হয়তো চিনতেই পারবে না আমাকে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে, 'ডাক না পরলে আরো ভাল, অমন একটা নরপশু শরীর ছুঁলে ঘেন্না লাগে!'
'আমি একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, আরব মুসলমানদের অন্দরমহলের অধিকাংশ নারী-ই গর্ভবতী!'

পুনরায় তার শ্লেষোক্তি, 'উম্মত! ভারতভূমিতে দ্রুত উম্মতের সম্প্রসারণের জন্য ওরা বেছে নিয়েছে আমাদের মতো ভারতীয় মেয়েদেরকেই, ধর্মান্তরিত ক'রে আমাদের গর্ভে ঢেলেছে বিষাক্ত আরব ঔরস! আমাদের গর্ভে বেড়ে উঠছে আমাদেরই পিতা, স্বামী-স্বজন হন্তারকের সন্তান। আমাদের সন্তানেরাই নাকি একদিন উম্মত রক্ষা করবে।'

পারভীনের এই কথায় আমার চৈতন্যে বিদ্যুৎচমক হয়, পুনপুন ঝলকায়! সেই ঝলকানিতে অতীতে ব'সে বর্তমানের চিত্রটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, একাকার হয়ে যায় অতীত-বর্তমান। প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আমাদের গলিতে ডিশ লাইনের কাজ করা ইমরানের মুখটি। ইমরানকে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দেখার পর হঠাৎ একদিন আমার মনে হয়, আচ্ছা এই লোকটি ডিশ লাইনের কাজ করে কেন? ইমরানের বয়স তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ কিন্তু বয়স আরো কম মনে হয় চিকন শারীরিক গড়ন ও সুন্দর মুখাবয়বের কারণে, ছয় ফুটের মতো লম্বা, গায়ের রঙ টকটকে লালচে ফর্সা, মাথাভরা চুল। ডিশ লাইনে কাজ করলেও বেশিরভাগ সময়ই খুব পরিপাটী থাকার চেষ্টা করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে, শার্ট আর জিন্স পরে অধিকাংশ সময়, বিকেল কিংবা সন্ধ্যার দিকে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবি পরতেও দেখা যায়। নিজে সবসময় পরিপাটী থাকলেও ওর বউটা কালো বোরকায় মোড়া থাকে, শুধু চোখ দুটো দেখা যায়, হাত এবং পায়ে মোজা পরে। মাঝে মাঝে বউকে নিয়ে যখন গলি দিয়ে হেঁটে যায় তখন ওর বউটাকে মনে হয়ে একটা চলমান তাবলীগের ব্যাগ!

ফরমাল পোশাকে ইমরানকে কোনো বহুজাতিক কোম্পানীর প্রধান নির্বাহীর চেয়ারে বসালে অনায়াসে মানিয়ে যাবে কিংবা সিনেমার পর্দায় কোনো নায়িকার সাথে রোমান্স করতে দেখলেও মোটেই খাপছাড়া লাগবে না; অথচ ও ডিশের লাইন মেরামত করে! গলিতে রোজই ওকে দেখতে পাই; কখনো একগাদা কালো তার হাতে নিয়ে হেঁটে যায় কখনো খালি হাতে, কখনো খুঁটিতে লাগানো মইয়ের মাথায় চ'ড়ে কাজ করে, কখনো-বা গলির মাথার সেলুনের খালি চেয়ারটিতে ব'সে রাজকীয় ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে তামিল ছবির হিন্দি ভার্সন কিংবা ক্রিকেট খেলা দ্যাখে। বাংলাদেশ-ভারত কিংবা ভারত-পাকিস্থানের খেলার সময় ওর হাতের জলন্ত সিগারেটটি যেন মশাল হয়ে যায়, পারলে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা ভারতীয় খেলোয়াড়দেরকে ও পুড়িয়ে মারে; অকথ্য ভাষায় গালাগলি করে খেলোয়াড়দের মা-বোন-স্ত্রীকে নিয়ে! এমন কি বাংলাদেশ দলে যখন কোনো হিন্দু খেলোয়াড় থাকে তখন তাকেও একইরকম ভাষায় গালাগালি করে এবং সে যাতে তাড়াতাড়ি আউট হয় সেজন্য আল্লাহ্'র স্মরণাপন্ন হয়। অথচ পাকিস্থানী খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে ওর কী উচ্ছ্বাস, কী বিপুল আনন্দ! আমি আগে ওই সেলুনটাতে চুল কাটাতাম, নিজের কানকে নিস্তার দিতে কয়েক বছর হলো অন্য সেলুনে যাই। প্রথমদিকে ওকে দেখলেই আমার মনে হতো ডিশের লাইনম্যান নয়, ও এর চেয়ে ভাল কোনো কাজের যোগ্য। এখন ওকে দেখলেই গু'র পোকা দেখার মতো ঘৃণার উদ্রেক হয় আমার, কানে বাজে ওরই মুখে শোনা অশালীন বাক্য, 'মালাউনের মায়রে বাপ, আউট অয় না ক্যা পুঙ্গির পুত, খানকির পোলার মায়রে চুদি!'

আমার সিএনএন ফুফুর মুখে যেদিন শুনেছি যে ইমরান একাত্তরের যুদ্ধশিশু, সেদিন থেকে ওর জন্য আমার ভীষণ করুণা হয়; পৃথিবীর আর কোন দেশে ওর মতো দূর্ভাগা সন্তান আছে যে নিজের মায়ের ধর্ষকের জাতিকে পাগলের মতো ভালবাসে! একাত্তরে পাকিস্থানীরা বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নিধনে নেমেছিল, কাফের হিন্দু আর কাফেরদের দালাল মুসলমান পুরুষদের মেরে নারীদেরকে গর্ভবতী ক'রে আধা পশ্চিম পাকিস্থানী-আধা বাঙালী এক শংকর জাতি উৎপন্ন করতে চেয়েছিল, যারা ওদের অপশাসনের বিরোধিতা করবে না, ওরা যা বলবে মাথা নত ক'রে তা-ই মেনে নেবে। ইমরানকে দেখে মনে হয় পাকিস্থানীদের সেই কৌশল একেবারে বৃথা যায় নি! উম্মতের সম্প্রসারণে পাকিস্থানীদের এই দর্শনের বীজ ইসলামের একেবারে শিকড়ে প্রোথিত; মদিনার বানু কোরাইজা গোত্রের নারীদের ওপর মুহাম্মদ তার এই দর্শন প্রয়োগ করেছিলেন। এরপর মুহাম্মদ এবং তার শিষ্যরা আরো অনেক জাতি-গোত্রের ওপর এই দর্শন প্রয়োগ করেছে। ভারতে সিন্ধু দখলের পর মোহাম্মদ বিন কাশিম এবং তার যোদ্ধারাও মুহাম্মদের এই দর্শন প্রয়োগ করে দ্রুত মুসলমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সময়-কালের স্রোতে অনেক কিছুর উত্থান-পতন হলেও মুহাম্মদের সেই দর্শন এখনো ভেসে চলেছে উম্মতের জনস্রোতে!

পারভীনের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। এখন অনেক রাত, হেরেমের সদর দরজা বন্ধ, একজন খোঁজা প্রহরী সদর দরজার কাছে দেয়ালে মাথা এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি মৃদু পায়ে হেরেমের ভেতরের গলি দিয়ে হাঁটতে থাকি, যৌনদাসীদের কক্ষের দরজা বন্ধ। চলতে

চলতে পিছনের বারান্দার দিকের একটা কক্ষের জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই আচমকা আমার পা থমকে যায়, প্রদীপের অল্প আলোয় বিছানায় দুটো নগ্ন শরীর; শায়িত শরীরটির ওপর ঝুঁকে অপর শরীরটি তাকে চুম্বন করছে আর ডান হাতে মন্থন করছে স্তন। শায়িতের হাতদুটো আদর করছে তাকে চুম্বন ও মন্থনরত শরীরটির পিঠে ও চুলে। দু'জনেরই মাথায় দীর্ঘ চুল, দু'জনের বুকেই স্ফীত স্তন, দু'জনকেই নিবিড়ভাবে অবলোকন ক'রে আমি নিশ্চিত হই যে দু'জনেই নারী!

জানালা থেকে স'রে আসি আমি, কিন্তু মাথার মধ্যে ভাবনার ঘুর্ণিপাক। দু-তিন মাস পর পর এরা পুরুষ সঙ্গ পায় কিছু সময়ের জন্য, বাকি সময় পুরুষসঙ্গ বঞ্চিত হয়ে হেরেমে বন্দী থাকে, বন্দী জীবন থেকে মুক্তির কোনো আশা নেই, পছন্দের পুরুষের সঙ্গ পাওয়া এবং মনো-দৈহিক চাহিদা মিটানোর কোনো উপায় নেই। হতে পারে ওরা দু'জন সহজাত সমকামী, আবার এমনও হতে পারে অতীতে ওদের দু'জনেরই স্বামী-সংসার ছিল; হয়তো দিনের পর দিন পুরুষ শূন্যতায় জৈবিক প্রয়োজনে একে অন্যকে কাছে টেনেছে, হয়তো ভালও বেসেছে। এই বন্দী জীবনে সীমাহীন দঃখ-যন্ত্রণার মাঝেও সমপ্রেমে-সমকামে ডুবে ওরা হয়তো খুঁজে পেয়েছে কিছুটা মুক্তির স্বাদ আর হৃদয়ে জেগেছে বেঁচে থাকার নতুন আকাঙ্ক্ষা।

যাদবকে কোথাও না দেখে আমি হলদে পাখি হয়ে গরাদের ফাঁক গ'লে উড়ে বাইরে এসে বসি একটা গাছের ডালে। তারপর সিন্ধুর বিয়োগান্তক অধ্যায় অতিক্রম ক'রে আমি আবার উড়াল দিই অতীতের দিকে। আমার অসংখ্য পূর্বপুরুষের দেখা পাই; কোথাও আমার পূর্বপুরুষ খেয়াঘাটের মাঝি, কোথাও চাষী, কোথাও রাজকর্মচারী, কোথাও নট, কোথাও চার্বাক দার্শনিক, কোথাও ঋষি, কোথাওবা যাযাবর। তাদেরকে অতিক্রম ক'রে আমি উড়ে যাই আরো অতীতের দিকে। আমার উড়ানযাত্রা আর থামে না; মনের আনন্দে আমি উড়ে বেড়াই এশিরিয়া, ব্যাবিলন, সুমেরীয়, মিশরীয়, হিব্রু, গ্রীক, রোমান সভ্যতার ওপর দিয়ে! উড়তে উড়তে একসময় পৌঁছে যাই প্রাচীন আফ্রিকায়; ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত আমি। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গহীন অরণ্যের মাঝখানের এক পাহাড়ী ছড়ার পাশের পাথরে বসতেই মানুষ হয়ে যাই; ছড়াটা বেশ গভীর, শীতল-স্বচ্ছ জল। আমি হাঁটুজল অব্দি নেমে জলের আয়নায় নিজেকে দেখি, হাত-মুখ ধুয়ে আঁজলা ভ'রে পান করি শীতল জল! হঠাৎ-ই আমার কানে ভেসে আসে কাশির শব্দ। আমি মাথা তুলে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরাই। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অদূরে পাথরের ওপর বসা একজন নগ্ন মানুষের পিঠে। আমি তার মুখ দেখতে না পেলেও এটুকু বুঝতে পারি যে তিনি কিছু খাচ্ছেন। আমি ছড়া থেকে উঠে কিছুটা বায়ে স'রে ধীর পায়ে তার পিছনদিকের একটা বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি মিষ্টি আলু খাচ্ছেন, পাথরের ওপর রাখা আরো একটি মিষ্টি আলু এবং একটি পাকা পেঁপে। আমি নীরবে দাঁড়িয়েই থাকি। মানুষ নাকি মানুষের মতো দেখতে অন্য কোনো প্রাণি! রোমশ শরীর দীর্ঘ, সুঠাম আর কালো। হাতে-পায়ে বড় বড় নখ, মাথার কাঁচা-পাকা দীর্ঘ কোঁকড়া চুল পিঠে ছড়ানো। মিষ্টি আলু খাওয়া হ'লে ঘাড় কাত ক'রে পাথর থেকে পেঁপে হাতে তুলে নেবার সময় তার মুখের

ডানদিকের কিছু অংশ দেখতে পাই, মুখে কিঞ্চিত বানরের আদল; মুখের দাড়ি-গোঁফও কাঁচা-পাকা। পেঁপে খাওয়ার পর তিনি ছড়ার দিকে এগিয়ে যান, আমি তার মুখের ডান পাশটি আরো ভালভাবে দেখতে পাই, দাড়ি-গোঁফে লেগে আছে পাকা পেঁপে। তিনি ছড়ার কোমরজলে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে পর পর কয়েকটি ডুব দেন। হাত দিয়ে চুল, দাড়ি-গোঁফ এবং শরীর মার্জন করেন; তারপর আরো দুটি ডুব দেন। এরপর আঁজলা ভ'রে জলপান করার পর ঘাড় উঁচিয়ে আকাশ অথবা গাছের দিকে তাকিয়ে নিজে নিজেই এমনভাবে নিঃশব্দে হাসতে থাকেন যেন তিনি অমৃত পান করেছেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ তিনি!

স্নান শেষ হ'লে ছড়া থেকে উঠে এসে রৌদ্রজ্জ্বল একটা বড় পাথরের ওপর ব'সে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। তার চুল-দাড়ি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শরীরের নিচের দিকে, পাথর বেয়ে মাটিতে। এবার আমি তাকে খুব ভালভাবে দেখতে পাই, আড়াল থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাকে চিনতে চেষ্টা করি। ইনি কি হোমো ইরেকটাস, হোমো হাইডেলবারজেনসিস নাকি হোমো স্যাপিয়েন্স গোত্রের? মুখের বানরের আদলটা খুব একটা প্রকট নয়। আবার ফল খাওয়া, শরীর মার্জন ক'রে স্নান করা, নিঃশব্দ হাসি, স্নান শেষে পাথরের ওপর ব'সে শরীর শুকোতে শুকোতে তার উদাসীন অথচ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি; এসব দেখে আমার মনে হয় যে তিনি হোমো ইরেকটাস বা হোমো হাইডেলবারজেনসিস গোত্রের নন; হোমো ইরেকটাস এবং হাইডেলবারজেনসিসের বিবর্তিত উত্তরপুরুষ হোমো স্যাপিয়েন্স। আমি মৃদু পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে আছেন। মৃদু শব্দে দু-বার নাক টানেন, বোধহয় গন্ধ শুকে আমার অস্তিত্ব অনুভব ক'রে চোখ খুলে মাথা নামিয়ে দৃষ্টি ছুড়ে দেন আমার দিকে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দ্রুত একবার দৃষ্টি বোলান, তারপর দৃষ্টি স্থির করেন আমার মুখে। আমি দৃষ্টি রাখি তার দৃষ্টিতে। বেশ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যায়, তিনি দৃষ্টি নামান না, আমিও না। তার দৃষ্টির ভেতরে আমি আমার অসংখ্য পূর্বপুরুষদের দেখতে পাই! তাদের একেকজনকে অতিক্রম ক'রে এগোতে থাকে আমার দৃষ্টি, দৃষ্টি যতো এগোয় আমার সঙ্গে তাদের শারীরিক পরিবর্তন ততো প্রকট হয়ে ওঠে, তাদের মুখ অবিকল বানরের মতো, মানুষ থেকে ক্রমশ তারা বানর! আমার ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে, ইনি আমার বহু প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষ, সে-ই হোমো স্যাপিয়েন্স গোত্রের! আনন্দে আমার ভেতরটা উদ্বেলিত, আমার চোখের পলক পড়ে। তিনি আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। একবার নিজের শরীরের দিকে তাকান, পুনরায় আমার দিকে। আমি তার আরো কাছে গিয়ে বলি, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

তিনি কোনো কথা বলেন না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো নেড়ে কথা বলার ভঙ্গি করেন কিন্তু কোনো শব্দ বের হয় না মুখ থেকে।
আমি আবার বলি, 'আমি আপনার উত্তরপুরুষ, কেমন আছেন আপনি?'
তিনি নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের দাড়িতে আঙুল বোলাতে থাকেন। বোধহয় আমার শ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখে তিনি অবাক হন।

'আপনি আমার পূর্বপুরুষ, আপনার বংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি আমি।'

তিনি ধীরে ধীরে পাথর থেকে নেমে এসে আমাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। আমিও পর্যবেক্ষণ করি আমাকে প্রদক্ষিণরত আমারই পূর্বপুরুষকে, যার শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই! নগ্ন তিনি; আমি দৃষ্টি রাখি তার মুখে, বুকে, পেটে, পিঠে, নিতম্বে, উরুতে, পায়ের পাতায়, এমনকি কাঁচা-পাকা কেশাবৃত শিশ্নেও! কিন্তু কী আশ্চর্য, তাকে দেখে আমার একটুও লজ্জা লাগে না, তিনিও লজ্জিত বোধ করেন না! তাকে দেখে একবারও মনে হয় না যে আমার মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন ব'লে তিনি অশিক্ষিত; নগ্ন ব'লে মনে হয় না তিনি অসভ্য-অশালীন, তার নিম্নাঙ্গের কেশের ভেতর থেকে নেতিয়ে ঝুলে থাকা শিশ্নটাকে অশ্লীলতার ধ্বজা মনে হয় না আমার। বরং মনে হয় তিনি স্বাভাবিক, সত্য, সুন্দর!

আমি ভাবতে থাকি, আচ্ছা আমি যদি আমার বাবা কিংবা চাচাকে এরকম নগ্ন অবস্থায় দেখতাম তাহলে আমার কি মনে হতো? আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম, কয়েকটা দিন হয়তো তাদের সম্মুখে যেতে চাইতাম না, না চাইলেও মনের আয়নায় বারবার ভেসে উঠতো তাদের নগ্ন শরীর। মনে হতো কী অশ্লীল, কী অশালীন দৃশ্য! অথচ বাবা-চাচারই পূর্বপুরুষকে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় দেখেও আমার কিন্তু তেমন অনুভূতি হয় না! হয়তোবা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতা ঢুকে পড়েছে আমাদের মগজে, আমাদের চৈতন্যে ছড়িয়েছে অশ্লীলতাবোধ, আমাদের দৃশ্যমান লিঙ্গ কোমরের নিচে থাকলেও অদৃশ্য লিঙ্গ পাল তুলে ছুটছে মগজের কোষে কোষে। আমাদের মনন গ্রাস করেছে অস্বাভাবিক, অসত্য আর অসুন্দর তত্ত্বে; অথচ এই তত্ত্বকেই আমরা মেনে নিয়েছি স্বাভাবিক, সত্য আর সুন্দর ব'লে। কাল আমাদের গায়ে পরিয়ে দিয়েছে সুন্দর চাকচিক্য পোশাক, কিন্তু আমাদের অন্তর করেছে অসভ্য-অশালীন!

এবার আমার পূর্বপুরুষ আমার মুখোমুখি দাঁড়ান। দুই হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেন আমার শ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখমণ্ডল, চুল। হাত রাখেন আমার বুকে, বুকে মাথা ঠেকিয়ে কান পাতেন। তিনি কি আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখছেন যে আমিই তার উত্তরপুরুষ কি-না? কি জানি! এরপর তিনি আমার হাত ধরেন, একটা একটা ক'রে হাতের আঙুল টিপে দ্যাখেন। আমার ডান হাতটা রাখেন তার শ্মশ্রুময় গালে। তার গালে হাত রেখে আমি স্থির-স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি মুখের দিকে। কোনো কথা বলতে পারি না। আমি আবেগাপ্লুত, আমার চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। হয়তোবা মনের আনন্দে-আবেগে, হঠাৎ-ই তিনি আমার হাত ছেড়ে ময়লা দাঁতগুলো বের ক'রে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে লাফাতে থাকেন। কেন? তিনি তার উত্তরপুরুষকে চিনতে পেরেছেন ব'লে! তারপর আচমকাই আবার দাঁড়িয়ে দৃষ্টি স্থির করেন আমার শরীরের পোশাকের দিকে; শার্ট, শার্টের পকেট, বোতাম, কলার, প্যান্ট, প্যান্টের পকেট ইত্যাদি হাত দিয়ে ধ'রে ধ'রে দ্যাখেন; অজান্তেই তিনি প্যান্টের চেইন ধ'রে টান দিলে প্রথমে একটুখানি খোলে, তারপর আরেকটু টান দিলে পুরোটাই খুলে যায়; এরপর বেশ কয়েকবার

চেইন খোলেন আর লাগান। প্যান্টের চেইন ছেড়ে আমার পায়ের কাছে ব'সে আঙুলের ডগা দিয়ে জুতো টিপে টিপে দ্যাখেন; বিস্ময়ে বারবার নিজের পায়ের পাতায়-আঙুলে এবং আমার জুতোয় হাত বুলান। আবার উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় আমার গায়ে হাত বুলিয়ে, আঙুল দিয়ে শার্টের কাপড় ধ'রে দেখতে থাকেন। আমি বলি, 'মানুষ এখন সভ্য হয়েছে; এখন মানুষ পোশাক পরে, স্কুল-কলেজে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করে, পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। আপনার পরবর্তী বংশধরদের আমাদের ভূ-খণ্ডে পৌঁছতে অনেককাল লেগেছিল।'

আমার কথা শুনে তার মুখের বিস্ময় আর আনন্দ উবে যায়, তিনি গম্ভীর হন। আমি আবার বলি, 'আচ্ছা, আপনার নাম কী? ধর্ম কী? আমরা সভ্য মানুষেরা তো এখন সাড়ম্বরে অনেক রকম ধর্ম পালন করি, আপনারা কী সেরকম কিছু পালন করেছেন?'

এবার আচমকা তার মুখাবয়বের ভাষা বদলে যায়; একটু আগে যে মুখে ছিল বিস্ময় আর আনন্দ, ক্ষণকাল পরেই সেখানে ফুটে ওঠে ক্ষুব্ধতা, দু-চোখের ভাবুক-স্নিগ্ধ দৃষ্টি হয়ে ওঠে ক্ষিপ্র! তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকান, তারপর ক্ষিপ্র হাতে আমার শার্ট ধ'রে টানেন। শার্টের প্রতি তার কৌতুহল দেখে আমি নির্বোধের মতো ভাবি তিনি বোধ হয় আমার শার্টটা পছন্দ করেছেন, হয়তো শার্টটা গায়ে দিতে চান। আমি শার্টটা গা থেকে খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিই, 'এটা শার্ট, আপনি রাখুন। রোদ এবং শীত থেকে জামা মানুষকে সুরক্ষা দেয়।'

আমার হাতে ধরা শার্টের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও বেশি ক্ষুব্ধ হন আর তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে আরো চঞ্চল! ক্ষিপ্র হাতে তিনি আমার হাত থেকে শার্টটা নিয়ে ছুড়ে ফেলেন মাটিতে। আমাকে অবাক ক'রে তিনি দু-হাতে তার শিশ্ন উঁচিয়ে মূত্র বিসর্জন করেন শার্টটার ওপর! তারপর মূত্রবিসর্জন শেষ হওয়ামাত্র তিনি দৌড় দেন অরণ্যের দিকে এবং নিমিষের মধ্যে মিলিয়ে যান অরণ্যের গাঢ় সবুজ শরীরে। বেশ কয়েক মুহূর্ত পর আমি অরণ্যের দিক থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে আনি মূত্রস্নাত শার্টটার ওপর। শার্ট কোথায়, তিনি তো আমাদের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা আর সভ্য মানুষের ধর্মের ওপর মূত্র বিসর্জন ক'রে গেছেন!

মাগরিব এর আযানের কর্কশ সুর আমার মনের হলদে পাখিটাকে ফিরিয়ে আনে দাদার কবরে। সর্য ডুবে গেলেও এখনো চারিদিকে আদুরে আলোর পরশ। কবরস্থান এখন সুনসান, কোনো মানুষজন নেই। কবরস্থানের অফিসের লোকজনও হয়তো এখন ভেতরে ইফতারে ব্যস্ত। আমি শেষবারের মতো দাদার কবর স্পর্শ ক'রে উঠে দাঁড়াই। দাদার কাছ থেকে বিদায় নিই, ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে থাকি অন্য একটি কবরের দিকে। এখানে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকের কবর আছে। জীবদ্দশায় তাদের কাউকে কাউকে আমি দেখেছি, দু-একজনের সঙ্গে কথাও বলেছি। কবরস্থানে এলেই দাদার কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর আমি আমার পছন্দের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের কবরে শ্রদ্ধা জানাই, তাদের সৃষ্টির অতলে ডুব দিয়ে কথা বলি তাদের সঙ্গে। আসলে জীবিত কবি-সাহিত্যিকদের

চেয়ে মৃত কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অধিক দৃঢ়! তাদেরকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি এই জন্য যে তারা অবিমৃশ্যকারী বা মিথ্যাবাদী নন; আর যেখানে অবিমৃশ্যকারিতা নেই, সাজানো মিথ্যার চাষ নেই, সেখানেই আমার সম্পর্ক দৃঢ় হয়। তা ব'লে মানুষ হিসেবে খুব নিকৃষ্ট, সাম্প্রদায়িক আর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিলেন; এমন কবি-সাহিত্যিকদের কবরেও আমি শ্রদ্ধা জানাই না।

আমি একজন উঠতি লেখক হলেও বিখ্যাত শিল্পী বা কবি-সাহিত্যিকদের সাহচর্য আজকাল এড়িয়ে চলি। কারণ এই যে তাদের সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশার পরই তাদের স্বভাবের উৎকট দূর্গন্ধ আমার চিত্তকে আহত করে। দেখি যে তারা পারিবারে, ঘরোয়া আড্ডায়, সাহিত্যসভায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ প'রে অবতীর্ণ হন। তাদের চরিত্রের বৈপরীত্য দেখে, তাদের দ্বিচারিতা দেখে আমি রীতিমতো হাঁ হয়ে যাই! আমি তাদের সৃষ্টির সঙ্গে মানুষটিকে কিছুতেই আর মেলাতে পারি না। অধিকাংশের ভেতরেই প্রভু হবার বিপুল বাসনা, বন্ধু হতে চায় না কেউ। অধিকাংশ-ই একে অন্যের কুৎসা করে আর তিন পেগ তরল আগুন পেটে পড়লেই কেউ কেউ অন্যকে গালিগালি করে, অন্যের সৃষ্টি খারিজ ক'রে দিয়ে বোঝাতে চায় যে সে যা সৃষ্টি করেছে তাতে এরই মধ্যে তার অমরত্ব নিশ্চিত! এছাড়া নানা ধরনের প্রতারণা, অন্যের ক্ষতি করবার প্রবণতা, নারীলিপ্সা, অর্থলিপ্সা এসব তো আছেই!

এইসব নানাবিধ কারণে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছুতেই অটুট রাখতে পারি না, আর তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে আমি সকল সঙ্গ ত্যাগ ক'রে একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছি। আর এই উপলব্ধি আমার হয়েছে যে বিখ্যাতজনদের বেশি ঘনিষ্ঠ হতে নেই, তাতে পিঠ চাপড়ানি জুটলেও নিজের প্রতিভা নষ্ট হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। বুঝেছি যে অন্য অনেক কর্মের মতো সৃজনশীল কর্মও একটা দক্ষতা; একজন ব্যক্তি নিজেকে ঘষামাজা করতে করতে একটা পর্যায়ে গিয়ে হয়তো সৃজনশীলতায় দক্ষ হয়ে ওঠেন, তিনি দারুণ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তিনি দারুণ কিছু সৃষ্টি করছেন মানেই যে তিনি নিজের ভেতরের বিশ্বাস থেকে করছেন বা ব্যক্তি মানুষটির সততাই যে তার সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হচ্ছে, এমনটা ভাবা মানে বোকার স্বর্গে বাস করা, আমি অনেকদিন ওই বোকাস্বর্গে বাস করেছি! আসলে সবই ওই দক্ষতা, একজন পকেটমার যেমন চেষ্টা করতে করতে দক্ষ হয়ে ওঠে, সৃজনশীল মানুষও তাই। দক্ষ হলেই যে তার ভেতরে সততা থাকবে, তিনি একজন সৎ মানুষ হবেন তা নয়; তার সৃষ্টির সততা, ভালমানুষিতা, মিষ্টবচন, মহানুভবতা ইত্যাদি আরোপিতও হতে পারে। দক্ষতা অর্জন করলে সৃষ্টিতে নানান গুণের শীলিত বিন্যাস সম্ভব। এসব বুঝতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে। আর বোঝার পরেই বিখ্যাত ব্যক্তির সাহচার্য পাবার মোহ আমার কেটে গেছে। মনে হয়েছে যে বিখ্যাত ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থেকে কেবল তার সৃষ্টির রস আস্বাদন করাই উত্তম, কাছে গেলেই বিপদ বাড়ে, বাড়ে মানসিক পীড়ন। তার সৃষ্টির প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মায়। অবশ্য সবাই যে এই রকম তা নয়, সংখ্যায় খুব কম হলেও কেউ কেউ আছেন ব্যতিক্রম; যাদের মুখের ওপর আলাদা মুখোশ নেই; দূর থেকে আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই!

মাস ছয়েক আগে একজন কবি পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তখন। সেই সূত্রে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সমাজভাবনা-বিশ্ববীক্ষা অনেক বিষয়েই আমি অবগত। মুসলমানের সন্তান হলেও তিনি নামাজ পড়েন না, রোজা রাখেন না, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় মোল্লাদের গালাগাল করতেন, কোরানকে আখ্যা দিতেন পাগলা মুহাম্মদের প্রলাপ ব'লে, মুহাম্মদকে বলতেন জঙ্গীবাদের জনক, আড্ডার মাঝখানে বা কবিতা পড়ার সময় আযান শুরু হ'লে বিরক্ত হয়ে 'শুয়োরের বাচ্চা' ব'লে মুয়াজ্জিনকে গালি দিতেন। অথচ সেই তিনি প্রবন্ধে এই কথাগুলো লিখেছিলেন–'ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না। একটি স্বার্থান্বেষী মহল পবিত্র কোরানের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে দেশে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম চালাচ্ছে।' আমি রীতিমতো থ হয়ে গিয়েছিলাম তার লেখা প'ড়ে! কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় তার বাসায় ব্যক্তিগত আড্ডায় আমি কোরান হাদিসের কয়েকটি আয়াত তার সামনে তুলে ধরি–

'অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত করো। শেষ যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত ক'রে বাঁধবে। তারপর তোমরা ইচ্ছে করলে ওদেরকে মুক্ত ক'রে দিতে পারো বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পারো। যতোক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করে, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান। এজন্য যে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এককে অপরকে দিয়ে পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না।' (আল কোরান, সুরা মুহাম্মদ, আয়াত-৪)।

'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওপর প্রত্যাদেশ করেন, "আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে সাহস দাও।" যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে ও সারা অঙ্গে আঘাত করো।' (আল কোরান, সুরা আনফাল, আয়াত-১২)।

'তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, আল্লাহ তাদেরকে মেরেছিলেন, আর তুমি যখন (কাঁকর) ছুড়েছিলে তখন তুমি ছোড়োনি, আল্লাহ-ই তা ছুড়েছিলেন; তার তা ছিল অবিশ্বাসীদেরকে ভাল পুরস্কার দেওয়ার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।' (আল কোরান, সুরা আনফাল, আয়াত-১৭)।

'যারা আমার উদ্দেশে জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।' (আল কোরান, সুরা আনকাবুত, আয়াত-৬৯)।

হাদিস থেকেও উল্লেখ করেছিলাম মুহাম্মদের উক্তি- 'আমি বাদ্য-যন্ত্র ও মুর্তি ধ্বংস করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।'

তারপর তাকে প্রশ্ন করি, 'আমি জানি এই আয়াতগুলোসহ কোরান-হাদিসের আরো অনেক ধ্বংসাত্মক উক্তি সম্পর্কে আপনি অবগত, ধর্ম সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসও আমি জানি, সব জেনেও আপনি অমন একটি স্ববিরোধী প্রবন্ধ কেন লিখলেন?'

তখন তার চার পেগ চলছে, আমার প্রশ্ন শুনে বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে ব'সে থাকার পর তিনি গড়গড় ক'রে এই বিষয়ে যে দীর্ঘ বয়ান আমাকে শোনান তার সারসংক্ষেপ এইরকম- 'প্রবন্ধটা আমি নিজের ইচ্ছায় লিখি নি। ওটা ছিল একটা ফরমায়েশি কাজ। পত্রিকা থেকে জঙ্গিবাদের বিপক্ষে এই ধরনের একটা প্রবন্ধ আমাকে লিখতে বলা হয়েছিল, কেননা ওরা জানে যে পাঠকের ওপর আমার বেশ প্রভাব আছে। ওদের প্রস্তাবে আমি না করতে পারি নি; কারণ, ওরাই আমাকে প্রমোট ক'রে বড় কবি বানিয়েছে। যে পাঁচ-দশজন মানুষ আজ আমাকে চেনে-জানে বা সম্মান করে, যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আমাকে সম্মাননা দেয়; তা ওদের জন্য। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা সংবাদপত্রে আমি ধর্ম বিষয়ক লেখালেখি থেকে বিরত থাকলেও এবার ওদের প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিতে পারি নি। ধর্ম সম্পর্কে সত্য কথা শোনার মতো সুশিক্ষিত এবং সহনশীল নয় আমাদের সমাজ। আমাদের সমাজ মিথ এবং মিথ্যায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, বংশ পরম্পরায় মস্তিষ্কে বহন ক'রে চলেছে কুসংস্কার। প্রগতি এবং সত্যের জন্য আমাদের সমাজ এখনো তৈরি হয় নি। ফলে, ধর্মটাকে পুঁজি ক'রে বাণিজ্য ক'রে নিচ্ছে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমের লোকজন। আর তার বলি হচ্ছে কারা জানো? আমরা, আমার মতো কিছু প্রগতিশীল মানুষ; গণমাধ্যম যাদেরকে আখ্যা দিয়েছে বুদ্ধিজীবি, সমাজের মানুষও আমাদের সেভাবেই চেনে। যেহেতু আমাদের ভেতরেও অদম্য নেশা ও আশা থাকে জনপ্রিয় হওয়ার, গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবির কাতারে পৌঁছনোর, ঘন ঘন পত্রিকায় লেখা ছাপানো আর মানুষের প্রশংসা পাবার, টেলিভিশন-সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানের, সভা-সমিতির চেয়ার অলংকৃত করার; ফলে ওরা আমাদের এই দূর্বল জায়গাটাকে ব্যবহার করে ওদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, কারণ ওদের টেলিভিশন কিংবা সংবাদপত্রের জন্য আসল হোক বা নকল হোক বুদ্ধিজীবি তৈরি করা প্রয়োজন। রাজনীতিবিদদেরও বুদ্ধিজীবি প্রয়োজন তাদের সভাসমিতির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি এবং দল ও ব্যক্তির গুণগান করানোর জন্য। এজন্য ওরা আমাদের সামনে লোভের জাল বিছায়, আর আমরা সহজেই তাতে জড়িয়ে পড়ি। একবার জালে জড়িয়ে গেলে আর বের হবার উপায় থাকে না। তুমি বের হতে চাইলেও লোভ তোমাকে বের হতে দেবে না। যার ফলে সমস্ত সত্য নিজের মধ্যে গোপন ক'রে একটা দুধভাত টাইপের বুদ্ধিজীবির ভেগ ধ'রে থাকতে হয়। তবে এখন এটাই সিস্টেম হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝলে, সমাজ তো চিরকাল একই রীতিনীতি আর মূল্যবোধ নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না; আজ যা আমরা অনৈতিক ব'লে ভাবছি, কাল হয়তো তাই-ই নৈতিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে; পেয়েছেও তাই। পুঁজিবাদের এই ঘোর দৌড়ের দিনে সবকিছু দ্রুত ভেঙেচুরে যাচ্ছে; অন্যায়, অনৈতিকতার ওপরে পুঁজিবাদের জৌলুসের রঙ প'ড়ে তা শুদ্ধ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা জেনেশুনে পাপ ক'রে গায়ে-মাথায় গঙ্গাজল কিংবা গোলাপজল ছিটিয়ে পাপ মোচনের মতো আর কি! পুঁজিবাদের জৌলুস হচ্ছে আধুনিক যুগের নতুন ধরনের গঙ্গাজল বা গোলাপজল,

অন্যায়কেও ন্যায় হিসেবে মানুষের চেতনায় ঢুকিয়ে তা প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলতে পারে! ফলে এই সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।'

জানতে চাই, 'আত্মগ্লানি হয় না? নিজেকে ঠকানোর জন্য নিজের ওপর ঘৃণা হয় না?'

হো হো ক'রে হেসে তিনি বলেন, 'ধুর! কীসের আত্মগ্লানি, কীসের ঘৃণা! অর্থ-জনপ্রিয়তা এমন এক মাদক যা একবার তুমি পান করলে ভুলে যাবে সব নীতি-নৈতিকতা! আর বললাম তো পুঁজিবাদের গোলাপজলের কারণে এটাই এখন প্রতিষ্ঠিত নব্য মূল্যবোধ। হ্যাঁ, আগে মাঝে মাঝে খানিকটা আত্মগ্লানি হতো, কিন্তু এখন আর হয় না। কেন হবে? অর্থ পাচ্ছি, আমি যা-ই লিখছি পাঠক গোগ্রাসে গিলছে। আমার বাপ-দাদা কোনোদিন বিজনেস ক্লাস বাসেই চড়ে নি, তাদের ঘরের ছেলে হয়ে আমি সরকারি-বেসরকারি ট্যুরে বিমানে চ'ড়ে সারা বিশ্ব চ'ষে বেড়াচ্ছি, নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর সাহিত্যসভায় যোগ দিচ্ছি। এসব পেতে হ'লে তোমাকে কলমে লাগাম পরাতেই হবে। তুমি শাসকের বিরুদ্ধে লিখতে পারবে না, ধর্মের বিরুদ্ধেও না। এখন আমি ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ের বিরুদ্ধে লিখলে পাঠক হারাবো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাখ লাখ পাঠক আমাকে ধিক্কার দেবে, গণমাধ্যম আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সরকার আমাকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন কাউকে বসাবে আমার জায়গায়, আমি অচ্ছুত হয়ে পড়বো, আমার গর্দানের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরবে চাপতিবাজরা। কেন জেনে বুঝে এই আত্মহত্যা আমি করবো! আমার দুটো সন্তান আছে, স্ত্রী আছে; ওরা ভেসে যাবে। তাই আপোস ক'রে বেঁচে থাকা। আর কে না আপোস করছে বলো? এককালের বাঘা বাঘা সব মার্ক্সবাদীরা এখন এমন ভেগ ধরেছে যে তাদেরকে আর চিনতেই পারি না, মনে হয় এরা কোনোকালেও মার্ক্সবাদী ছিল না, জন্মলগ্ন থেকেই এরা কট্টর ডানপন্থী! সমাজ এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল, তুমি যদি এই পরিবর্তনটা ধরতে না পারো তবে তুমি বোকা, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না; তুমি ব্যর্থ হবে। শোনো কিছু করতে হ'লে মিডিয়ার সাপোর্ট তোমার লাগবেই, মিডিয়া যাকে প্রমোট করে আমজনতা তাকে নিয়েই হইচই করে, তার বই কেনার জন্য বইমেলায় স্টলের সামনে পাঠকেরা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে; লেখার গুণ নয়, কে বড় লেখক আর কে মাঝারি লেখক তা নির্ধারণ ক'রে মিডিয়া। সবাই এখন স্রোতের একদিকে ভেসে চলেছে বুঝলে, যে এই স্রোতে গা না ভাসাবে সে নির্বোধ! সে সুবিমলমিশ্র; সুবিমলমিশ্র জীবনে কিচ্ছু পায়নি, না অর্থ না জনপ্রিয়তা। স্বীকার করছি যে তিনি অসম্ভব ভাল লেখেন, আমি তাকে শ্রদ্ধাও করি; কিন্তু আমাদের মতো দু-চারজন লেখক-কবি ছাড়া তাকে কে চেনে বলো?'

গ্লাসে আরেক পেগ ঢালতে ঢালতে তিনি বলেন, 'তোমার এখন বয়স কম, তাই নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে তুমি অটল। কিন্তু যখন তুমি বিয়ে করবে, সংসার-সন্তান হবে তখন বুঝবে যে আমাদের মতো দেশে এইসব নীতি-নৈতিকতা ফালতু আবেগ ছাড়া কিছুই নয়। তখন স্ত্রী-সন্তানের কথা ভেবে জীবন-জীবিকার তাগিদে তুমিও আপোস করবে। তুমি আমার

কাছের মানুষ তাই তোমাকে আগে থেকেই আমি পথ বাথলে দিচ্ছি। অযথা ধর্মের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে লিখে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরো না। ধর্ম কিংবা রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। সৈয়দ শামসুল হককে দেখ, রাজনীতি গুলে খেয়েছেন, তার স্ট্র্যাট্রেজি'র কাছে ঝানু রাজনীতিকও হার মানতে বাধ্য! শাসকের সঙ্গে বিটে বিটে পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলেছেন, আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সময়ে পুরনো শাসকের হাত ছেড়ে নতুন শাসকের হাত ধরতেও তার তাল ভঙ্গ হয় নি; জিন্নাহকে নায়ক বানিয়ে কবিতা লিখেছেন আবার বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও লিখেছেন! পাকিস্থান আমলে লিখেছেন জিহাদী কবিতা, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাকিস্থানের সমর্থনে লেখালেখি করেছেন, শুধু তাই-ই নয় যে পঞ্চান্নজন দালাল বুদ্ধিজীবি পাকিস্থানের পক্ষে এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই তালিকার পঞ্চাশ নম্বরে তার নাম ছিল এবং তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।'

আমি কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে তাকাই, সৈয়দ শামসুল হকের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার বিষয়টি আমার জানা ছিল না। সেটা বুঝতে পেরে তিনি বলেন, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? ভাবছো যে লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এতো এতো গান-কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখেছে সে কেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করবে? চাঁদ-তারা ছেড়ে লাল-সবুজে মাথা গলিয়ে দেশপ্রেমে গদগদ ওসব মুক্তিযুদ্ধের গান-কবিতা-উপন্যাস লিখেছেন স্বাধীনতার পরে, পরিস্থিতি বুঝে দু-চারটা হয়তোবা মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকেও লিখে থাকতে পারেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান আর শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' বইটি প'ড়ে দেখো।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হাসেন তিনি, তারপর আবার বলেন, 'পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি জলপাই রঙ ধারণ করেন। মেজর জিয়ার আমলে গুলশানে একটি বাড়ি বরাদ্দ পেয়েছেন, স্বৈরাচার এরশাদ তার বাড়িটি পুনঃনির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। সাহিত্যাঙ্গনে এমন কথাও শোনা যায় যে এরশাদের নামে বেরোনো কবিতাগুলো যারা লিখে দিতেন, সৈয়দ শামসুল হক তাদেরই একজন। আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, আমরা সাংস্কৃতিক কর্মীরা তখন মাঠে নেমে প্রতিবাদ করছি গান-কবিতা-নাটকের মাধ্যমে; আর সৈয়দ শামসুল হক তখন এরশাদের তৈরি ক'রে দেওয়া বাড়িতে সুখনিদ্রা দিচ্ছেন। আবার নব্বই পরবর্তীতে স্বাধীনতার পক্ষের মূল স্রোতে ঢুকে পড়েছেন সুড়সুড় করে, এখন তিনি আওয়ামীলীগের সভাকবি! কাল এই দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সেই খেলাফতের নায়ককে নিয়েও বীররসে পরিপূর্ণ কবিতা লিখবেন এবং তাদের দলে ভিড়ে যাবেন, পাকিস্থান আমলের মতো আবারো জিহাদি কবিতা লিখবেন; এটাও এক ধরনের স্মার্টনেস! এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আধিপত্য ধ'রে রাখতে হ'লে এটা খুব প্রয়োজন। বুদ্ধিমান মানুষেরা সময়ের নার্ভটা সঠিক সময়ে ধরতে জানেন বুঝলে, তাই তারা সফল হন। দ্যাখো, এতোবার আদর্শ বদলানোর পরও প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলো তাকেই বেশি ফোকাস করে, সরকার তাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়, জনপ্রিয় কবি-সাহিত্যিকেরা তাকে

মাথায় তুলে রাখে। বাঙালী আত্মভোলা এক জাতি বুঝলে, তুমি আজ কি করছো কাল কেউ তা মনে রাখবে না। বুদ্ধিমানেরা এটা জানে বলেই তারা সময়-সুবিধা মতো আদর্শ বদলায়। তুমিও ওইসব জোলো এথিকস বাতাসে ভাসিয়ে দাও নইলে কিচ্ছুটি পাবে না জীবনে, শেষ বয়সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের আঙুল নিজে কামড়াবে; কিন্তু তখন হয়তো কিচ্ছু করার থাকবে না। এসব পরামর্শ আমি কাউকেই দিই না, কিন্তু তুমি আমার খুব কাছের মানুষ, লাইক মাই ইয়াঙ্গার্ ব্রাদার, তোমাকে ভালবাসি-স্নেহ করি তাই তোমাকে বলছি। জীবনে বেঁচে থাকতে যদি তুমি কিছু না পাও, মরার পর মানুষ তোমার সৃষ্টি নিয়ে মাথায় ক'রে নাচলো না দৌড়লো তাতে তোমার কিচ্ছু আসে-যায় না!'

আমি আর তাকে কিছু বলি নি। কারণ আমি জানি তিনি যা করছেন সচেতনভাবে জেনে-বুঝেই করছেন। অর্থ, ক্ষমতা আর জনপ্রিয়তার মাদক পান করেছেন তিনি, আমৃত্যু এই নেশা থাকবে। নষ্ট আর বিপথগামী সমাজের অধিকাংশ মানুষ মুখ বুজে সকল অন্যায় মেনে নিয়ে সত্যের পথ থেকে সরে আসে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে, একা হবার ভয়ে; কিন্তু এই নষ্ট-ভ্রষ্ট, বিপথগামী আর ক্রমাগত পতোনোন্মুখ সমাজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্য ও ন্যায় আঁকড়ে ধ'রে একা হবার যে কী অপার আনন্দ, কী যে মুক্তির স্বাধীনতা ও সুখ, মাথা বন্ধক দেওয়া এইসব জ্ঞানপাপীরা তা জানে না!

আমি একজন কবির কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মুহূর্ত খানেক দাঁড়াই, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করি। এই কবি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ব্যক্তিজীবনে নিয়ম মেনে ধর্মকর্ম পালন না করলেও তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কিছুটা ইসলাম বাতিক তার ছিল। তার কবিতায় বারবার উঠে এসেছে প্রেম এবং কাম; অথচ ইসলামে এসবের অনুমোদন নেই। ইসলাম কেবল সেই কবিতাকেই অনুমোদন করে যা কোরান-হাদিসের মূল্যমান, মূল্যবোধ এবং ইসলামী ভাবাদর্শ অনুসরণ ক'রে লেখা। মুহাম্মদ কবি লবীদের কবিতা পছন্দ করতেন, কবি লবীদের কবিতার প্রশংসা ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'আরবের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে সত্য কবিতাটি রচনা করেছে লবীদ–জেনে রাখো আল্লাহ্ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল।'

যদিও কবি লবীদ এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন তথাকথিত জাহেলী যুগে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে।

একবার মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীরা মদিনা থেকে আশি মাইল দূরের আরজ নামক এক পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একজন কবি এসে তাদেরকে কবিতা শোনাতে থাকেন, কবিতা শুনে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের বলেন, 'এই শয়তানটাকে আটক করো। কবিতা দিয়ে পেট ভরার চেয়ে পুঁজ দিয়ে ভরা ভাল, যে পুঁজ তার যকৃতে পচন ধরায়।'

বর্তমান কালের কোনো কোনো আলেমের মতে, সেই কবির কবিতা অশ্লীল ছিল, তাই মুহাম্মদ তাকে শয়তান আখ্যা দিয়ে আটক করতে বলেছিলেন। কবিতা চর্চা করা মুবাহ

যদি তা ইসলামী আদর্শে লেখা হয়। আবার অনেক আলেমের মতে, কবিতা চর্চা করা মাকরূহ।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধরনের সাহিত্যের চর্চা হয়, বলা বাহুল্য যে তা ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ক'রে নয়; বস্তুত ইসলামে শিল্প-সাহিত্য চর্চার পথ রুদ্ধ। তারপরও ইসলামের ছায়াতলে থেকেই এদেশের বহু মানুষ শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করেছেন এবং এখনো করছেন। গত আড়াই দশক ধ'রে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ। নানা ধর্মের নানা পেশার মানুষ তার বই কিনেছেন, পাঠ করেছেন এবং এখনো করছেন। মাদ্রাসার হুজুর থেকে শুরু ক'রে ইংলিশ মিডিয়ামের ইয়ো ইয়ো ছাত্রও তার পাঠক। আমি অনেক মুসলিম বাসার বুক শেলফে দেখেছি কোরান শরীফ, সহি মুসলিম শরীফ, বোখারী শরীফ, এ ধরনের কয়েকখানা ধর্মীয় বইয়ের পাশে হুমায়ুন আহমেদের হিমু কিংবা মিসির আলী সিরিজের কয়েকখানা বই; এর বাইরে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার কয়েকখানা পুরোনো পাঠ্যবই, ইন্টার্নি রিপোর্ট, দু-একখানা ডায়েরি; সারা শেলফে এর বাইরে আর কোনো বই নেই; শেলফের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে দু-একটা ট্রফি কিংবা ক্রেস্ট, মগ-প্লেট, করো ছোটবেলার একখানা বাঁধানো ছবি ইত্যাদি দিয়ে। এই ধরনের বুক শেলফ বর্তমান মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের আভিজাত্য এবং মূল্যবোধের প্রতীক! বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের কাছে এখন কোরান-হাদিসের পরেই হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের স্থান! হুমায়ুন আহমেদ ধার্মিক ছিলেন, ঈদগায় ঈদের নামাজ পড়ার পর ছেলে কোলে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তার কুশল বিনিময়ের ছবি ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছিল পত্রিকার পাতায়। একবার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি লেখক তসলিমা নাসরিনকে খোঁচা দিয়ে যা বলেছিলেন তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম, 'আমাদের দেশের একজন সাহিত্যিক পশ্চিমাদের কাছে জনপ্রিয় হবার জন্য আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে লেখে।'

এমন একজন ধার্মিক সাহিত্যিক তার সাহিত্যে যে ধরনের গল্প বলেছেন এবং যেভাবে যৌনতা এনেছেন তা কোনোভাবেই ইসলাম সম্মত নয়। কোরান-হাদিসে এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির অনুমোদন নেই। সম্ভবত তার সৃষ্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র হিমু; সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং মজার ব্যাপার হলো একজন ধার্মিক মানুষ হয়েও তিনি হিমুর গায়ে পরিয়ে দিয়েছেন হারাম পোশাক হলুদ পাঞ্জাবি, মুসলমান পুরুষের জন্য হলুদ পোশাক পরা হারাম! হারাম পোশাক পরেও হিমু তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র, মাদ্রাসার হুজুর থেকে শুরু ক'রে কোটি কোটি ধর্মান্ধ মুসলমান তার বই কিনে পড়েছে এবং বুক শেলফে কোরান-হাদিসের পাশে কিংবা কাছাকাছি রেখেছে; আর তিনিও তার এই হারাম সৃষ্টির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন এবং তা দিয়ে হারাম মদ্যপান ও আরামে তার ধর্মপ্রাণ জীবন যাপন করেছেন!

বিচিত্র ধরনের জ্ঞানপাপীর বাস আমাদের এই বাংলাদেশে, জ্ঞানপাপীদের স্বর্গরাজ্যও বলা যায়! এদেশে ইসলামবিরোধী অনেক কাজ করেও পার পাওয়া যায়, মুসলমানদের মন জয়

করা যায় যদি না ইসলাম সম্পর্কে কেউ সঠিক সত্য কথাটি না বলে। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সত্য তথ্য ও ইতিহাস সামনে নিয়ে এলেই তার সমূহ বিপদ; স্ব-নামে লিখলে হয় তাকে জেল খাটতে হয়, নয়তো চাপতির কোপে ঘাড় থেকে মাথাটা নেমে যায়; অথবা স্বাধীনভাবে বাঁচতে হ'লে তাকে দেশত্যাগ করতে হয়।

পৃথিবীর কোনো ইসলামী রাষ্ট্রেই মুক্তচিন্তক বা ইসলামের সমালোচকের কোনো স্বাধীনতা নেই; জেল, নির্বাসন কিংবা মৃত্যুই তার ভবিতব্য। মুক্তচিন্তার মূলোৎপাটনের এই বীজমন্ত্র প্রোথিত করেছিলেন স্বয়ং মুহাম্মদ মদিনার ইহুদি বানু আমর ইবনে আউফ গোত্রের একশো বিশ বছর বয়সী কবি আবু আফাকের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। মুহাম্মদ এবং তার শিষ্যরা আল-হারিথ বিন সুয়া'দ বিন সামিত নামের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলেন। এই খুনের প্রতিবাদে কবি আবু আফাক একটি কবিতা লেখেন, প্রতিবাদী কবিতা লিখে তিনি মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কবি আবু আফাকের কবিতা যাতে মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে, সে-জন্যই মুহাম্মদ তাকে খুন জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। একটা মানুষ কতোটা নৃশংস এবং উৎপীড়ক হ'লে একশো বিশ বছরের একজন বৃদ্ধ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতা লিখে মানুষকে জাগানোর চেষ্টা করতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শাওয়াল মাসের গরমের রাত, বার্ধক্যপীড়িত কবি ঘরের সামনের আঙিনায় ঘুমিয়ে ছিলেন। হয়তো সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল, হয়তো ছিল না; হয়তো আঙিনার পাশে একটা পোয়াতি খেঁজুরগাছ ছিল, হয়তো ছিল না। কবি হয়তোবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন কিংবা নিমীলিত চোখে করছিলেন বিগত দিনের স্মৃতিচারণা অথবা অপলক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সাজাচ্ছিলেন নতুন কোনো কবিতার পংক্তি। আর তখনই মুহাম্মদের শিষ্য ঘাতক সালিম বিন উমায়েরের ধারালো তরবারি গেঁথে যায় কবির বুকে, কলিজা আর পিঠ ফুঁড়ে বেরোয় রক্তমাখা তরবারির মাথা! অসম্পূর্ণ-ই থেকে যায় কবির স্বপ্ন কিংবা স্মৃতিচারণা অথবা পংক্তিমালা!

মুহাম্মদ একইভাবে তার শিষ্য উমায়ের বিন আদি আল খাতমিকে নিযুক্ত করেছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী মদিনার কবি আসমা বিনতে মারোয়ানের কলম স্তব্ধ করার জন্য। আসমা ছিলেন বানু উমাইয়া গোত্রের কিন্তু তিনি বিয়ে করেছিলেন বানু খাতমা গোত্রের ইয়াজিদ বিন জায়েদকে। কবি আবু আফাককে হত্যার পর তিনি ইসলাম ধর্ম, মুহাম্মদ এবং তার শিষ্যদের সমালোচনা করেছিলেন, লিখেছিলেন প্রতিবাদী এবং মানুষের ঘুম ভাঙানিয়া এক অসীম সাহসী কবিতা। এক অদম্য সাহসী কবি, হত্যভাগ্য জননী; রাতেরবেলা পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, কনিষ্ঠ সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যায় ঘাতক উমায়ের বিন আদি। আকর্ষিক স্তনবৃন্তচ্যুত দুধপানরত সন্তানটি নিশ্চয় কেঁদে উঠেছিল তখন, কিন্তু সে কান্না শুনেও ঘাতক উমায়ের বিন আদি'র হৃদয় আর্দ্র হয় নি, তরবারির আঘাতে সে আসমার বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে চিরতরে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আসমাকে হত্যার পর ঘাতক উমায়ের বিন আদি

সংবাদ নিয়ে ভোরবেলা ছুটে গিয়েছিল মুহাম্মদের কাছে, মুহাম্মদ তাকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর তিনি ঘাতক উমায়ের বিন আদিকে 'বসির' অর্থাৎ চক্ষুষ্মান উপাধি দেন।

বানু নাভান গোত্রের কাব বিন আল-আশরাফও মুহাম্মদের বদরযুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠনের সমালোচনা ক'রে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এরপর তিনি এক মুসলমান নারীকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন, যা ইসলামের জন্য অপমানজনক মনে করেছিলেন মুহাম্মদ। মুহাম্মদের নির্দেশে তার কয়েকজন শিষ্য বন্ধুত্বের ছলনার মাধ্যমে কাব বিন আল-আশরাফকে হত্যা করেছিল। সে-রাত ছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, আল-আশরাফ তার নববিবাহিত পত্নীকে নিয়ে শুয়েছিলেন। তারই পালিত ভাই এবং মুহাম্মদের শিষ্য সিলকান বিন সালাম বিন ওয়াকাশ তাকে মাঝরাতে ডেকেছিল, স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। সিলকান ছলনা ক'রে তাকে অন্যত্র নিয়ে যায় এবং অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে তাকে হত্যা করে। তারপর তারা আল-আশরাফের ছিন্ন মস্তক ফজরের ওয়াক্তে নিয়ে যায় মসজিদে, মুহাম্মদ তখন নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, নামাজ আদায় না করেই তিনি বাইরে আসেন, রক্তাক্ত কাটা মস্তকের ওপর থুথু নিক্ষেপ ক'রে শিষ্যদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

সেই থেকে গত চৌদ্দ'শ বছরে আরবভূমিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত, নির্বাসিত এবং নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছে অসংখ্য কবি, মুক্তচিন্তক, সমালোচক। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিতা লেখার অপরাধে ১৯৭৪ সালে প্রথম নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন কবি দাউদ হায়দারকে। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ১৯৯৪ সালে নির্বাসিত হয়েছেন তসলিমা নাসরিন। আর মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে গত সাত-আট বছরে অনেকে ইসলামী জঙ্গীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, অনেকে জেল খেটেছেন এবং এখনো জেল খাটছেন, অনেকে আত্মগোপনে আছেন, আর তরুণ মুক্তমনা লেখকদের কেউ কেউ জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন এবং এখনো জমাচ্ছেন। অথচ কী আশ্চর্য, এই দেশের অধিকাংশ শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক এই হত্যা, নির্যাতন এবং নির্বাসনের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ; তারা ব্যস্ত শাসকের স্তুতিতে! ইমলামী জঙ্গিরা যে দেশে দাপিয়ে বেড়ায়, লেখকের রক্তে যে দেশের রাজপথ ভেসে যায়, সেই দেশেরই শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ নিয়ে গঠিত নাগরিক কমিটি উন্নয়ন ও সুশাসনের জননী আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করে, আর সেই তথাকথিত নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে উত্তর প্রজন্মের লেখকের রক্তের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শেখ হাসিনাকে 'দেশরত্ন' উপাধিতে ভূষিত ক'রে তার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন আরেক লেখক সৈয়দ শামসুল হক!

আমি এবার আমার কাঙ্ক্ষিত কবির কবরের সামনে এসে ব্যাগ থেকে ফুলের পাপড়ি নিয়ে কবরের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি ক্রমশ ঘনায়মাণ ছায়া ছায়া অন্ধকারে।

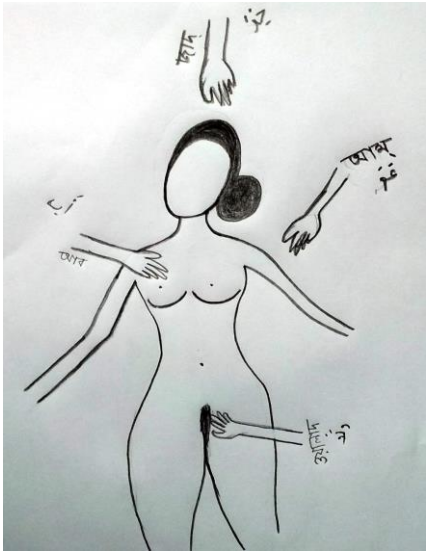
স্মৃতিতে জলবিম্বের মতো ভেসে ওঠে কবির কবিতার কিছু পংক্তি। আমি প্রথমে যে কবির কবরের সামনে দাঁড়াই তিনি ধার্মিক ছিলেন আর এখন যে কবির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তিনি নাস্তিক ছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মৃত্যুর পর দু'জনের মৃতদেহই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে প্রথমে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য শহীদ মিনারে রাখা হয়, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে জানাযা শেষে এখানে কবর দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রথমটি বেশরিয়তী কর্ম এবং পরেরটি শরিয়তী কর্ম; কিন্তু দু'জনের ক্ষেত্রেই এই বিপরীতধর্মী দুটি কর্ম পর পর সম্পাদন করা হয়। ধার্মিকের কফিনে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজন ক'রে যেমনি ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা হয়, তেমনি নাস্তিক কবির লাশের জানাযা পড়ানোয় তার বিশ্বাসকে অবমূল্যায়ন করা হয়। আজকাল বিজ্ঞ-অজ্ঞ সকলেই মুখে ফ্যানা তুলে ফেলছে একটা কথা বলতে বলতে যে নাস্তিক ব্লগাররা ইসলামের অনুভূতিতে আঘাত দিচ্ছে, তারা ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করছে। কিন্তু কোরান-হাদিসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যে মৃতের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এটা কি ইসলাম ধর্মের অবমাননা নয়? এতে কি মুমিন বান্দাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে না? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ হাজারো মানুষ মৃতের কবরে বা মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়; শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে; নিঃসন্দেহে এসব শরিয়ত বিরোধী কাজ, অনৈসলামিক কাজ। এরা একদিকে বলছে নাস্তিক ব্লগাররা ইসলাম অবমাননা করছে, আবার অন্যদিকে নিজেরাই ইসলাম অবমাননার অনুষ্ঠানে সাড়ম্বরে যোগ দিচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকেরা রাষ্ট্রের শরীরে বোরকা পরিয়ে দিয়েছে, তারা বাংলাদেশের পাহাড়-সমতলের মাটির প্রতিটি কণাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছে; গাছপালা, নদী-নালা-খাল-বিল, জীবজন্তু, পশুপখি, জল-বাতাস, বঙ্গোপসাগরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। অথচ কী আশ্চর্য এরাই আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং বিধর্মী কাফেরদের সাথে তাতে অংশ নিয়ে প্রতিনিয়ত মুহাম্মদের সহি ইসলামের অবমাননা করে!

একদিকে রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের বিরাট অংশ এইসব ইসলাম বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে নিজেদের সুবিধামতো নতুন এক জগাখিচুরি ধরনের অলিখিত শরিয়তের জন্ম দিয়েছে এবং তা পালন করছে; অন্যদিকে জুম্মার খুতবায় কিংবা ওয়াজ মাহফিলে এইসব বেশরিয়তী কাজকর্মের বিরুদ্ধে উস্কানিমুলক বক্তব্য দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করছে মওলানারা। মওলানাদের উস্কানিমুলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারকগণ অবগত, কিন্তু এর বিরুদ্ধে তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না, কারণ তারা জানেন যে মওলানারা যেটা বলছেন সেটাই প্রকৃত ইসলাম।

আজকাল কবরে কিংবা শ্মশানে এলেই আমার মনে হয় নাস্তিকদের জন্য আলাদা সমাধিক্ষেত্র প্রয়োজন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী একজন মানুষ সকল প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সারাজীবন মুক্তচিন্তা করে, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করে, ধর্মান্ধতার শৃঙ্খল থেকে

মানুষের মুক্তির কথা বলে, সাম্প্রদায়িকতার কথা না ব'লে মানবতার কথা বলে, একটি মাত্র গোষ্ঠীর উন্নতির কথা না ব'লে সমগ্র মানবজাতির উন্নতির কথা বলে। এমন একজন মানুষের মৃত্যুর পর কোনো ধর্মীয় রীতি অনুসরণ ক'রে তার দেহের শেষকৃত্য করা মানে তার সারাজীবনের বিশ্বাস, তার চিন্তা, তার সততা, তার মূল্যবোধ, তার জীবনদর্শন ও আদর্শকে তীব্রভাবে অপমান করা। একজন নাস্তিক জীবদ্দশায় তার মরনোত্তর দেহ দান ক'রে যেতে পারেন, কিন্তু কারো কারো তো এই আশাও থাকতে পারে যে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন মাটিতে। কিন্তু যেহেতু নাস্তিকদের জন্য কোনো আলাদা সমাধিক্ষেত্র নেই, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যু পরবর্তী তার দেহের করণীয় বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দিয়ে যান না অথবা দিলেও তার পরিবারের লোকেরা সমাজের কথা বিবেচনা ক'রে ধর্মীয় রীতি অনুসরণ ক'রে একজন ধার্মিকের দেহের মতোই তার দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাও করে সকল ধর্মীয় রীতি মেনে। এটা একজন মৃত নাস্তিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়, তাকে ভীষণভাবে অসম্মান করা।

সঙ্গত কারণেই নাস্তিকদের জন্য আলাদা সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করা এখন সময়ের দাবি। উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো দেশে তা সম্ভব হলেও আমাদের মতো ইসলামিক রাষ্ট্রে তা কল্পনাতীত। বর্তমানে কোটি কোটি ধার্মিকের ভিড়ে এই চাওয়া পূরণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ না হোক, বিজ্ঞানের আলো আরো বিস্তৃত হ'লে, মানুষ আরও সুশিক্ষিত এবং সভ্য হ'লে আগামীর কোনো এক শতাব্দীতে আমাদের এই ভূ-খণ্ডে নাস্তিকদের জন্য আলাদা সমাধিক্ষেত্র গড়ে উঠবেই।



সকালবেলা একটা প্রাইভেট হাসপাতালের আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষের সামনের করিডরে হাঁটছি আর একটু পর পর বোতল থেকে জল পান করছি প্রসাবের চাপ আনার জন্য, মাত্রই টেস্টের জন্য প্রসাব দিয়ে এসেছি নিচতলায়, আমার সিরিয়ালের পরের রোগীরা আলট্রাসনোগ্রাম করিয়ে চ'লে যাচ্ছে আর আমি চাপ আনার জন্য কসরত চালিয়ে যাচ্ছি; তবু প্রসাবের চাপ আসছে না, অথচ ঘন ঘন প্রসাবের জন্যই আমার ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া! আলট্রাসনোগ্রাম করার সময় প্রসাবের চাপ থাকতে হয় তা যদি জানতাম তাহলে কি আর আগে প্রসাবের টেস্ট দিই, এখন বেকুবের মতো জল গিলছি আর হাঁটছি। আমি একা নই আমার মতো আরো কয়েকজন জল পান করছে আর হাঁটছে।

শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছে না; ঘন ঘন প্রসাব হচ্ছে, বুক-পেট জ্বলছে আর ব্যথা করছে। কাল বিকেলে এই হাসপাতালেই ডাক্তার দেখিয়ে গিয়েছি। ডাক্তার একগাদা টেস্ট দিয়েছে। কাল ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে প্রথমেই আমার নজরে পড়ে প্রৌঢ় ডাক্তারের কপালের নামাজ পড়ার সহি দাগ, এরপর তার পিছেনের দেয়ালে বাঁধাই করা আরবি হরফে লেখা আল্লাহ্। ডাক্তার বেশ সময় নিয়েই আমাকে দ্যাখেন এগল্প-সেগল্প করতে করতে। কি করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি শোনেন; রোগ ভাল হওয়ার ব্যাপারে ইনশাল্লাহ্-টাল্লাহ্ ব'লে আল্লাহ্'র ওপর ভরসা রাখার পরামর্শও দেন। মনে মনে বলি, ওরে বেকুব, আল্লাহ্'র ওপর ভরসাই যদি রাখবো তাহলে তোর কাছে টাকা খরচ করতে এসেছি কেন, আর তুই যদি আমাকে আল্লাহ্'র ওপর ভরসাই রাখতে বলবি তাহলে কষ্ট ক'রে ডাক্তারি প'ড়ে এখন এখানে রোগীর পকেট কাটতে বসেছিস কেন! ডাক্তার হোক আর যাই-ই হোক, আল্লাহ্ আর তার

নবীর কাছে এদের মাথা বন্ধক রাখা যেন বাধ্যতামুলক! অথচ ডাক্তারিবিদ্যা রপ্ত করতে হয়েছে আল্লাহ্ আর তার নবীকে অমান্য ক'রে। মেডিকেলের পাঠ্যবইয়ে মানবদেহ এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি নিয়ে স্টাডি করতে হয়েছে, নারী-পুরুষের দেহ কাটাছেঁড়া করতে হয়েছে! মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বইয়ে বিভিন্ন প্রাণির ছবি নিয়ে স্টাডি করতে হয়েছে এবং তেলাপোকা-ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণি কাটতেও হয়েছে।

রুগ্ন ব্যক্তিকে মুহাম্মদ ঝাঁড়ফুঁক করতে বলেছেন। কেউ অসুস্থ হ'লে তিনি সুরা ফালাক এবং সুরা নাস প'ড়ে তাকে ঝাঁড়ফুঁক করতেন। তিনি নিজে অসুস্থ হ'লে জিবরাঈল এসে ঝাঁড়ফুঁক ক'রে নাকি তাকে সুস্থ করতেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তার বিবি আয়েশা সুরা ফালাক এবং সুরা নাস প'ড়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, তার হাত আয়েশার হাতের চেয়ে বেশি বরকতময় এমন ধারণা থেকে কখনো কখনো আয়েশা দোয়া পড়তেন আর নবীর হাত ধ'রে তার নিজের গায়েই বুলিয়ে দিতেন! তাতেও অবশ্য মুহাম্মদকে বাঁচানো যায় নি, তার আবিস্কৃত দোয়া দাওয়াই তার নিজের ক্ষেত্রেই কাজ করে নি; আর আল্লাহ্ও মৃত্যুপথযাত্রী তার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে বাঁচানোর জন্য জিবরাঈলকে পাঠায় নি!

আল্লাহ্'র বান্দা পরম দয়ালু ডাক্তার আমার টেস্টে পঁচিশ পারসেন্ট ডিসকাউন্টের বিষয়টা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিতে দিতে বলেন, 'সবাইকে দিই না, কিন্তু আপনি স্টুডেন্ট, তাই টেস্টে পঁচিশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট লিখে দিচ্ছি।'

ছয়শো টাকা ভিজিট দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আমি বাসায় ফেরার সময় ডাক্তারের দয়ার কথা ভাবছিলাম। তিনি রাজধানীর একটি সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, দয়া ক'রে বেসরকারী হাসপাতালে মাত্র ছয়শো টাকা ভিজিটের বিনিময়ে রোগী দেখতে এসেছেন, টেস্ট দেখানোর সময় আবারো মাত্র তিনশো টাকা নেবেন, এরপর এক মাসের মধ্যে যতোবার আসবো মাত্র তিনশো টাকা ক'রে নেবেন আর একমাস পর এলে পুনরায় মাত্র ছয়শো টাকা নেবেন; আর এই যে তিনি আমাকে ডিসকাউন্ট দেবার পরও সব টেস্টের বিল বাবদ প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা দিলাম এখান থেকেও তিনি দয়া ক'রে কমিশন গ্রহণ করবেন; ডাক্তারের অনেক দয়া!

আলট্রাসনোগ্রাম করিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাসার দিকে রওনা হই। সকালের ব্যস্ত রাস্তা-ফুটপাত, মানুষ হনহন ক'রে ছুটছে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে; জনস্রোতের উজানে চলছি আমি ধীরে ধীরে। আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। রক্ত দিতে গেলে আমার মতো একজন পরপুরুষের হাত স্পর্শ ক'রে রক্ত নিয়েছে বোরকা পরা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক নারী; ইসিজি করাতে গেলে বদ্ধ রুমে চিৎ হয়ে বেড়ে শয়ান আমার মতো একজন পরপুরুষের বুকে-হাতে-পায়ে জেল মাখিয়ে দিয়েছে বোরকা পরা চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের এক নারী, তারপর ইসিজি করার পর যত্ন ক'রে মুছেও দিয়েছে জেল; আলট্রাসনোগ্রাম

করাতে গেলে আমার মতো একজন পরপুরুষের তলপেটে প্যান্টের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে এক টুকরো কাপড় গুঁজে সারা পেটে জেল মাখিয়ে দিয়েছে বোরকা পরা ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক নারী, শাড়ি পরিহিত অন্য একজন নারী আলট্রাসনোগ্রাম করার পর বোরকা পরা নারী যত্ন ক'রে আমার পেটের জেল মুছে দিয়েছে। বোরকা পরা থাকলেও তিনজনেরই মুখ ছিল অনাবৃত, ভ্রু প্লাক করা এবং ঠোঁটে লিপস্টিক; যা ইসলামে নিষিদ্ধ। কোনো সন্দেহ নেই যে অর্থের বিনিময়ে করলেও তারা একটি সেবামুলক কাজ করছেন এবং কাজটির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। যে তিনজন নারী আমার শরীর স্পর্শ ক'রে তাদের কর্ম সম্পাদন করেছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি; কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার ভেতর থেকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় নি তাদের স্বভাবের বৈপরীত্যের কারণে। কে কি পোশাক পরবে না পরবে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু কেউ যখন নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর পোশাক প'রে সেই ধর্মটিকেই অবমাননা করে তখন আর মানুষ হিসেবে তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। এই তিন নারীর প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল নই এজন্য যে তারা যে কাজটি করছে সেটা তাদের ধর্ম অনুমোদন করে না। ইসলামে পরপুরুষকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, মুখ দেখানোও নিষেধ। অথচ ইসলাম অনুমোদিত পোশাক প'রে তারা অননুমোদিত কাজ করছে।

আজকাল বোরকাওয়ালীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়েছে; রাস্তাঘাট, মার্কেট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেপ্লেক্সসহ সব জায়গায় বিপুল সংখ্যক বোরকাওয়ালী চোখে পড়ে। পার্কে কিংবা একটু কম ব্যস্ত রাস্তায় প্রেমিকের গা ঘেঁষে ব'সে দিব্যি প্রেমালাপ করে বোরকাওয়ালীরা; অথচ ইসলামে অবিবাহিত নারী-পুরুষের মেলামেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমি দশ বছর আগেও রাস্তাঘাটে এতো বোরকাওয়ালী দেখি নি। শাশ্বতীদি বলে যে দেড় দশক আগে শহরাঞ্চলে প্রতি দশজন মুসলিম নারীর মধ্যে একজন বোরকা কিংবা হিজাব পরতো, আর এখন প্রায় অর্ধেক; জায়গা বিশেষে সেটা আরো বেশি; ঢাকার বাইরে কোথাও কোথাও দশজনে আটজন। এটা অবশ্য কোনো সংগঠনের জরিপ নয়, শাশ্বতীদির নিজের জরিপ। দিদি সেই অনার্স পড়ার সময় থেকেই এনজিওর কাজে সারা দেশ চষে বেড়ায়; রাস্তাঘাটে চলার সময় সে নিজেই জরিপ চালায়।

মুসলিম নারীদেরকে বোরকা পরানোর জন্য আজকাল ভেতরে ভেতরে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় পরকালের ভয়ভীতিসহ নানারকম ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং উপদেশের মাধ্যমে। শাশ্বতীদির বাসায় ঠিকা কাজ করে রোজিনা নামের বছর ত্রিশের এক নারী। রোজিনা মোহাম্মদপুরের একটা বস্তিতে থাকে রিক্সচালক স্বামী আর দুই সন্তানকে নিয়ে। সেখানে তাদের পাশের ঘরে এক তরুণ হুজুর দম্পতি উঠেছিল কিছুদিনের জন্য। হুজুর দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরেই থাকতো, কখনো কখনো একটানা আট-দশদিন বাসায় থাকতো না। হুজুরের স্ত্রী কখনো স্বামীর সঙ্গে বাইরে যেতো আবার কখনো একাই; তবে বাসায়ই বেশি থাকতো সে। হুজুর বস্তির পুরুষদেরকে ধর্মোপদেশ দিতো, নিয়মিত এবং সময়মতো নামাজ

পড়তে বলতো, বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসায় পড়ানোর পরামর্শ দিতো। হুজুরের স্ত্রীও বস্তির নারীদেরকে বোরকা পরতে এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বলতো, পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করতো। আমি রোজিনার মুখেই শুনেছি, 'কনছেন বাইয়া, আমি ঠিকা বুয়ার কাম করি, এবাসা-ওবাসায় ছুডাছুডি করতে অয়, আমার বোরকা পরনের সময় আছে নি? বোরকা পরতে আর খুলতেই তো দিনের অর্ধেক যাইবো গা, কাম করুম কহন! হেই বেডি এক্কেরে কাডালের আডার নাহাল নাছোড়বান্দা অইয়া লাগছে আমার পিছে। উঠতে-বইতে সালাম দিয়া বোরকা পরতে কয় আর পরকালের ডর দ্যাহায়। ব্যাডা-বেডি দুইজনেই আইসা আমাগো বুজায় পোলা-মাইয়ারে মাদ্রাসায় দেওনের লাইগা, হ্যারাই নাকি খাওন পরন দিবো, আমাগো এক পয়সা খরচ লাইগতো না। পোলা-মাইয়া মাদ্রাসায় পড়লে নাকি আমরা বেহেশতে যাইতে পারুম। খরচের কতা চিন্তা কইরা আমি খালি ওগো বাপরে একদিন কইছিলাম, "এতো কইরা কইতাছে দিবানি মাদ্রাসায়?"

হুইনা হ্যায় আমার ওপর খাঁড়া ধইরা উঠছে, "খাওন পরন দিতে না পারলে পোলা-মাইয়ারে গলা টিপ্প্যা মারুম, তাও মাদ্রাসায় পড়তে দিমু না। হুনতাছস না চারদিক কি অইতাছে, শ্যাষে জঙ্গি-মঙ্গি অইয়া পোলায় আমার র‍্যাবের গুলি খাইয়া মরবো!"

ব্যাডা আর বেডির জ্বালায় অহন বাসা ছাইড়া পালাইতে মন চায়! এইডা করা হারাম, ওইডা করা গুনাহ, সেইডা করা শিরক; দিনরাত কানের কাছে এইসব কইতে থাহে। আমি এক বৌদ্ধ বাসায় কাম করি, বেডি আমারে রোজ হেই কাম ছাড়তে কয়। কয় ব'লে যে, "বৌদ্ধরা তো মূর্তি পূজা করে, হ্যাগো বাসায় কাম করলে তোমার গুনাহ অইবো; দোজখে যাইবা। তাছাড়া তুমি যহন হেই বাসায় কাম করো বৌদ্ধ ব্যাডারা তোমার শরীরে কু-নজর দেয়; কোনো বিধর্মী কাফেরের বাড়িতে কাম করবা না। মুসলমানের বাসায় কাম করবা, বোরকা পইরা কামে যাইবা।" কতার ছিরি হুনলে হাসিও আহে, দুঃখও লাগে! বোরকা পইরা ব'লে আমি কামে যামু; ঘর মুছমু, কাপড় ধুমু, বাথরুম পরিষ্কার করমু বোরকা পইরা! বিধর্মীগো বাসায় কাম করতে নিষেধ করে, হুইন্যা দুঃখে গাও জ্বলে। আমার প্যাটে টিপ দিলে অহনও হিন্দুগো বাড়ির ভাত বাইর অইবো। আমার নানি আর আম্মায় জনমভর কাম করছে হিন্দুগো বাড়ি; মায় সাতসকালে কামে যাওনের সময় নিয়া আমারে গেছে, দিন ভইরা দেবুকাকার বাড়ির উঠোনে বইয়া হিন্দুপাড়ার মাইয়াগো লগে পুতুল খেলছি, ক্ষিদা লাগলে কাকিমায় মুড়ি-খই-নাড়ু খাইতে দিছে, দুপুরবেলায় মায়ের সাথে বইয়া ভাত খাইছি, বৈকালে ফেরনের সময় আবার মায়ের কোলে চইড়া নয়তো মায়ের পিছে পিছে আম-জাম-পেয়ারা খাইতে খাইতে বাড়ি ফিরছি। দেবুকাকার বড় মাইয়ার পুরোন জামা-কাপড় পইরা বড় অইছি। আর ব্যাডায় আর বেডি আমারে কয় বিধর্মীগো বাড়িতে কাম করা হারাম!'

এর কিছুদিন পরই নাকি হঠাৎ একদিন সকালে সেই হুজুর আর তার স্ত্রী লাপাত্তা হয়েছিল, আর দু-দিন পরই তাদের সন্ধানে বস্তিতে পুলিশ গিয়েছিল।

এই ধরনের প্রচার-প্রচারণা কেবল সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যেই চালানো হয় না, সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেও বোরকা পরার কিংবা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জোর প্রচারণা চালানো হয় এবং সাফল্যও আসে। যারা প্রচার চালায় সবাই যে জঙ্গিবাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এমন নয়। যেমন আমার চাচির কথাই বলি, চাচি তালিমের একটা গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা আমি কিছুদিন আগে জেনেছি আমার বন্ধু আবিরের কাছ থেকে। আবিরের বড়বোন মানে আমাদের নিত্রাদির মেয়ে আর আমার চাচাতো বোন সাবিহা দু'জনই সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত একটি স্কুলে পড়ে, দু-জনই ক্লাস সিক্সে, ডে শিফট এ। সেইসূত্রে আর আমার সূত্রে নিত্রাদি এবং চাচি দু'জনই দু'জনকে চেনেন। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিত্রাদি-ই বলেছে আবিরকে। স্কুলটিতে অভিভাবকদের বসার জন্য বেশ পরিপাটী একটি অপেক্ষাগার আছে, আর অপেক্ষাগারের সাথেই ছোট্ট একটি রুম আছে যেখানে ব'সে সাধারণত মায়েরা দুপুরের খাবার খায়। চাচি সাবিহাকে নিয়ে স্কুলে যান আর একবারে ছুটির পর ওকে নিয়ে বাসায় ফেরেন। তিনি এবং অপেক্ষাগারের আরো সাত-আটজন নারী মিলে তালিমের একটি দল গঠন করেছেন। তারা অন্যান্য নারীদেরকে বোরকা পরার পরামর্শ দেন, নারী-পুরুষে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন, নামাজ-রোজা রাখতে বলেন, এই ধরনের আরো নানারকম বিধিনিষেধ সম্পর্কে সবাইকে অবগত এবং ধর্মীয় বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই অন্যান্য মায়েরা এই গ্রুপটির প্রতি বিরক্ত হয় এবং এদেরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে; এমনকি যারা বোরকা বা হিজাব প'রে স্কুলে যায় এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করে তারাও! যেহেতু অপেক্ষাগারে দু-চারজন পুরুষও থাকে তাই এরা নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা এবং জিকিরের জন্য মায়েদের খাবারের ঘরটি দখল করে। কেউ সেখানে খেতে গেলে তারা এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ আর এমন ভাব প্রকাশ করে যে কিছুদিনের মধ্যেই অন্যরা সেখানে খেতে যাওয়া বন্ধ ক'রে দেয়। নিত্রাদি আর অন্য একজন মহিলা ওখানে খেতে গেলে চাচিরা তাদেরকে নিষেধ করে ওখানে খেতে। যাইহোক, কোনোভাবে হয়তো খবরটা প্রিন্সিপালের কানে যায়, কয়েকদিন পর তিনি নিজে এসে ওখান থেকে তালিমের দলকে তুলে দিয়ে পুনরায় মায়েদের দুপুরের খাবারের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। চাচিরা প্রিন্সিপালকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন, ধর্মীয় কথা-বার্তা ব'লে তাকে দূর্বল করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি, প্রিন্সিপাল কঠোর ভাষায় জানান যে এখানে কোনো তালিম চলবে না। এই ঘটনায় মর্মাহত চাচি আর তার সঙ্গীরা তাদের ভাষায় পথভ্রষ্ট প্রিন্সিপালের বিচারের ভার আল্লাহ্'র ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদেন আর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রিন্সিপাল একটা নাস্তিক, আওয়ামীলীগ করেন; তাদেরকে ঘর থেকে তাড়ানোর জন্য হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেনই! এখন নাকি চাচিরা স্কুল ভ্যানের মধ্যে ব'সে দ্বীনের চর্চা করেন। বাচ্চাদের স্কুলে ঢুকিয়ে স্কুলভ্যানে ব'সে বোরকাওয়ালীদের দ্বীনের চর্চা করা আমিও দেখেছি মিরপুর আইডিয়াল আর বিসিআইসি স্কুলের সামনে; কয়েকজন মিলে মোবাইলে ওয়াজ কিংবা ইসলামী গান শুনতে শুনতে তজবিহ্ গোনে আর ধর্মীয় আলাপ করে; আর চেষ্টা করে অন্যদেরকে দলে ভেড়ানোর।

বড়দের ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ অবলীলায় নদীর স্রোতের মতো ছোটদের ভেতরেও ঢুকে যায়। আমার চাচাতো বোন সাবিহা নিত্রাদির মেয়েকে একদিন বলেছে, 'তোমরা হিন্দুরা তো মূর্তি পূজা করো, তোমরা দোজখে যাবা।' আরেকদিন, টিভিনের সময় বলেছে, 'এই তোমরা গরু খাও না কেন? আমার আপুর এক হিন্দু ফ্রেন্ড গরু খায়। তুমি আমার কাছ থেকে খেতে পারো, একদিন খেলে কিছু হবে না।'

স্কুল থেকে একদিন ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল নভোথিয়েটারে। বাংলাদেশ বিষয়ক ডকুমেন্টারিতে ঢাকেশ্বরী আর বৌদ্ধ মন্দির দেখানোর সময় সাবিহাসহ আরো কয়েকজন আঁৎকে উঠে বলেছিল, 'হায় আল্লাহ্ এসব দেখায় কেন? এসব দেখা গুনাহ!'
বাসার গেট দিয়ে ঢুকে তালা লাগিয়ে দু-পা এগোতেই এরশাদুল ওর ঘরের সামনে হাজির, 'ভাইজান, কাম তো একখান ঘইট্যা গেছে। হুনছেন নি কিছু?'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই ওর দিকে, বাসায় আবার কিছু ঘটলো নাকি! অবশ্য ওর কথা বলার ধরনই এমন, দূর্ঘটনায় দশ-বিশজন মানুষ মরার দুঃসংবাদ জানানোর সময়ও বলে কাম তো একখান ঘইট্যা গেছে, আবার কারো সন্তানের জন্ম হ'লে কিংবা পরিচিত কাউকে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে রিঙয় দেখলে সেই সংবাদ জানানোর সময়ও বলে–কাম তো একখান ঘইট্যা গেছে! বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে এককথায় বলি, 'কী?'
'আমাগো বুয়া আসমার বইন কয়মাস আগে সৌদি আরব গেছিলো, সৌদির ব্যাডারা তো বহুত বজ্জাত, হ্যারা নাকি তারে মারধর আর কি জানি কি করে! হ্যায় অহন দ্যাশে আওয়ার লাইগা বাড়িতে ফোন দিয়া খালি কান্দে। কিন্তু অহন দ্যাশেও আইতে পারে না, যে কোম্পানি তারে সৌদি নিয়া গেছে তারা নাকি পাশপুট ফেরত দিতাছে না।'
'তোকে কে বললো?'
'বাজার দিতে ওপরে গেছিলাম, দেহি আসমা বড় চাচিরে কইতাছে আর কানতাছে।'
'আসমা বু তোর চেয়ে কম ক'রে হলেও দশ বছরের বড়, নাম ধ'রে ডাকিস কেন?'
'ও ছরি, ভুল অয়া গেছেগা।'

আমি পা বাড়াই সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির একধাপ উঠতেই ও আবার বলে, 'আসল মজার কতা তো কই-ই নাই! এদিকে কি অইচে জানেন? আসমা বু'র বইনের জামাই, হ্যায় নাকি কইয়া দিছে বউরে তালাক দিবো, বউ দ্যাশে ফির‍্যা আইলেও নাকি হ্যায় আর তারে ঘরে নিবো না!'
'এইটা কোনো মজার কথা হলো! একটা মেয়ে বিদেশে অসহায় অবস্থায় আছে, তার ওপর তার বর তাকে তালাক দেবে, এইটা শুনে কি তোর খুব মজা লাগছে?'

আমি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি। দরজা খোলা, বাসায় ঢুকে দেখি মা ড্রয়িংরুমের সোফায় ব'সে আছেন, উল্টোদিকের সোফায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছে ছোট আপু, আর কিছুটা দূরত্বে

মেঝেতে ব'সে তাদের কাছে দুঃখের ঝাঁপি খুলেছে আসমা বু; চোখে পানি নেই, তবে একটু আগে যে সে কেঁদেছে তা বোঝা যাচ্ছে।
খবরের কাগজের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছোট আপু বলে, 'রিপোর্ট কখন দেবে?'
'সন্ধ্যায়।'
আমি মায়ের পাশে বসি। মা বলেন, 'ডাক্তার আজই দেখাবি না?'
'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ আসমা বু'র কথা শুনি। তারপর বলি, 'সৌদি আরবের মতো একটা অসভ্য ইতরের দেশে তোমার বোনকে পাঠিয়েছ কেন?'
ছোট আপু খবরের কাগজের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকায়। আসমা বু বলে, 'আমরা কি এতো কিছু জানি নি!'
'জানবা কেমনে, সন্ধ্যা হলেই তো ভারতীয় সিরিয়াল দেখতে বসো টিভির সামনে, একটু খবর তো দেখবা না তোমরা। ঢাকা শহরে বাস করো, ঘরের মধ্যে টিভি আছে, তারপরও তোমরা জগতের কোনো খবর জানো না।'
'ভাবছিলাম নবীজির দ্যাশের মানুষ নবীজির মতোই দয়ালু, অহন দেহি নবীজির দ্যাশের মানুষ মহা খচ্চর।'
'তোমার নবীজির দেশের মানুষ নবীজির মতোই! এখন তোমার বোনকে বলো কোনোভাবে পালিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতে পারে কি-না, আর এখান থেকে তোমার বাবা আর বরকেও দূতাবাসে যোগাযোগ করতে বলো।'
মা বুঝেছেন যে তাদের প্রিয় নবীকে নিয়ে আরো দু-চারটা কথা ব'লে ফেলতে পরি, তাই আসমা বু'কে বলেন, 'যা, ঘরডা ঝাড়ু দে।'

আমি নিজের ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট খুলে গামছা পরি আর জামা-প্যান্ট রেখে আসি ময়লা কাপড়ের ঝুড়িতে, তারপর গোসলের উদ্দেশ্যে বাথরুমে ঢুকি। আলট্রাসনোগ্রাম করার সময় বুকে আর ইসিজি করার সময় বুকে-পেটে-হাতে-পায়ে আঠালো জেল মাখিয়েছিল, ঘা কেমন ঘিন ঘিন করছিল এতোক্ষণ।

গোসল করতে করতে আসমা বু'র বোন ঢুকে পড়ে আমার ভাবনায়। কোনো সন্দেহ নেই যে মেয়েটা সেখানে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গত চৌদ্দশো বছরে পৃথিবীর কতো পরিবর্তন হয়েছে; কতো জনপদ বিলুপ্ত হয়ে জন্ম হয়েছে নতুন জনপদের, কতো প্রমত্ত নদী ম'রে গিয়ে জন্ম হয়েছে নতুন নদীর, গরুর গাড়ি আর শকট ছেড়ে মানুষ আরোহণ করেছে বিমান আর রেলগাড়িতে, কুপির আলোর পরিবর্তে জ্বলেছে বিজলি বাতি, কতো গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ মহাকাশে-চাঁদে গেছে, খোঁজ শুরু হয়েছে প্রাণসমৃদ্ধ ভিনগ্রহের, কতো মনীষীর জন্ম হয়েছে আর তাদের বিস্ময়কর সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছে পৃথিবী; কিন্তু আরবের মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির খুব বেশি উন্নতি হয় নি, তারা অসভ্যই রয়ে গেছে; যার

অনেকটাই প্রবেশ করেছে অনারব মুসলমানদের মধ্যেও! আইনস্টাইন, নিউটন, চার্লস ব্যাবেজ, জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানভাবনা অতিক্রম ক'রে এরা আরো পিছনে গিয়ে বিজ্ঞান খোঁজে কোরানে; উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, লর্ড বায়রন, পাবলো নেরুদা, জীবনানন্দ দাশের কবিতার পংক্তির চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা ভাবে কোরানের প্রতিটি আয়াতকে; সক্রেটিস, প্লেটো, হিউম, কাল মার্ক্সের চেয়েও আরো গভীর মননশীল ও বাস্তববাদী দার্শনিক ভাবে মুহাম্মদকে; লালন, রবীন্দ্রনাথ, বেটোভেন, মোৎসার্ট, বব মার্লে, রবিশংকরসহ আরো অসংখ্য শিল্পীর সংগীতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সংগীত হিসেবে আখ্যা দেয় আজানকে! পৃথিবীর শত শত মনীষীকে পিছনে ফেলে শ্রেষ্ঠ মনীষীর সিংহাসনে বাসায় একজন অসভ্য, উন্মাদ, বর্বর, খুনি, নীপিড়ক, ধর্ষক ও সামাজ্যলোভী পুরুষ মুহাম্মদকে!

আধুনিককালে কাফেরদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় মাটির নিচে তেলের সন্ধান না পেলে আরবদের জীবন হয়তো এখনো রুটি আর খেঁজুরের ওপরই নির্ভরশীল থাকতো। বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ওরা কাফেরদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করলেও গ্রহণ করে নি কাফেরদের সভ্য সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সুশিক্ষা, শিষ্টাচার, মানবিকতা, মহানুভবতা। ওদের বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শন, আদর্শ ও জীবনাচার এখনো আবর্তিত হয় চৌদ্দশো বছর আগে জন্ম নেওয়া মুহাম্মদ এবং তার নাজিল করা গ্রন্থ কোরানকে কেন্দ্র ক'রে। এরা জীবনব্যবস্থার সকল তরিকা খুঁজে পায় কোরান-হাদিসে, এদের কাছে এখনো আদর্শ পুরুষ মানেই হযরত মুহাম্মদ! কী ভীষণ পশ্চাৎমুখী এক জাতি!

গোসল ক'রে বাথরুম থেকে বেরোতেই ক্ষিধেটা চাগাড় দিয়ে উঠে। এঙ্গরের প্রয়োজনে রাতে ম্যাগনেসিয়াম মিল্ক খেয়েছিলাম, সকালবেলা পুরো পেট খালি হয়ে গেছে। নাস্তা ক'রে চা বানিয়ে নিয়ে এসে টেবিলে বসি, কম্পিউটার চালিয়ে তিব্বতিয়ান মেডিটেশন মিউজিক ছেড়ে দিই। চায়ে চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ঘুরে ঘুরে মনছবিতে ভেসে ওঠে আসমা বু'র নির্যাতিত বোনের অদেখা অস্পষ্ট মুখ।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশেগুলোতে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে পুরুষের পাশপাশি অনেক নারী শ্রমিকও কাজ করতে যায়। সৌদি আরবের ভাষায় এই শ্রমিকেরা মিসকিন, বাংলাদেশকে তারা ভাবে মিসকিনের দেশ। তাদের ধারণা যে তারা দয়া ক'রে এদেশ থেকে মিসকিন নেয়, তাদের বাড়িতে-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ ক'রে মিসকিনেরা দেশে যে টাকায় পাঠায় তাই দিয়েই মিসকিনদের পরিবারের লোকজন খেয়ে-প'রে কোনোরকমে বেঁচে থাকে, মিসকিনদের দেশে তো তেলের খনি নেই! অসভ্য জাতি নিজেদের অতীত ইতিহাস সহজেই ভুলে যায়, আরবরাও ভুলে গেছে তেল আবিষ্কারের পূর্বে ওদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা, মুহাম্মদের নবুওতির পূর্বের আরব ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা; ওরা শুধুমাত্র মনে রেখেছে মুহাম্মদ আর তার বর্বর দর্শনের কথা, যার চর্চা ওরা এখনো করছে!

নির্বোধ এবং নির্দয় আরবরা মানবাধিকারের তোয়াক্কা না ক'রে তাদের প্রতিষ্ঠানে বা বাড়িতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর নানা পন্থায় শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায়। সভ্যদেশে অনেক আগেই ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও কোরানের নির্দেশনা আর মুহাম্মদের জীবনাচার অনুসরণ ক'রে আরবের মুসলিম পুরুষপুঙ্গবরা তাদের বেতনভুক্ত পুরুষ শ্রমিককে ক্রীতদাস আর নারী শ্রমিককে মনে ক'রে যৌনদাসী। ইসলামে একজন মুসলমানকে একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখার বৈধতা দেওয়া হলেও দাসী রাখার ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হয় নি। ফলে তারা বাড়িতে এক বা একাধিক নারী শ্রমিক রাখে, অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতে নারী শ্রমিকদেরকে যৌনদাসী হিসেবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম বা ধর্ষণ করে, বাধা দিলে মারধর করে। একজন নারী শ্রমিকের ওপর পরিবারের সকল পুরুষই যৌন নিপীড়ন চালায়!

মুহাম্মদের অনেক যৌনদাসী ছিল; যাদের মধ্যে অতি সুন্দরী কয়েকজনকে তিনি বিয়ে ক'রে উপপত্নীর মর্যাদা দেন। তিনি এবং তার বাহিনী বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন; আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধীকারীদের হত্যার পর বাকি পুরুষ এবং শিশুদেরকে ক্রীতদাস, নারীদেরকে যৌনদাসী এবং লুণ্ঠিত সম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেন। জুয়ায়রিয়া বিনতে আল হারিথ ছিলেন বানু আল-মুসতালিক গোত্র প্রধান আল-হারিস বিন আবু দেরার এর কন্যা এবং মুসাফির বিন সাফওয়ানের স্ত্রী; গনিমতের মাল হিসেবে তিনি একজন মুসলমান যোদ্ধার ভাগে পড়েন, যে যোদ্ধা উচ্চ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু অতোটা মুক্তিপণ দেবার সাধ্য জুয়ায়রিয়ার ছিল না; তাই তিনি মুহাম্মদের স্মরণাপন্ন হন যাতে তার মালিককে ব'লে মুহাম্মদ মুক্তিপণের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেন। তিনি যখন মুহাম্মদের বাড়িতে যান তখন মুহাম্মদের প্রিয় স্ত্রী আয়েশা তাকে দেখামাত্র বিচলিত বোধ করেন, কেননা তিনি ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী। আয়েশার বিচলিত হবার কারণ এই যে আল্লাহ্'র নবী জুয়ায়রিয়ার সৌন্দর্য দেখলে মুগ্ধ হবেন এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাইবেন। হয়েছিলও তাই, জুয়ায়রিয়া যখন মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা ক'রে তার মুক্তিপণ কমানোর অনুরোধ করেন তখন মুহাম্মদ তাকে জানান, 'আমি তোমার জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু করবো। তোমার মুক্তিপণ রদ ক'রে তোমাকে বিয়ে করবো।'

ক্রীতদাসী জুয়ায়রিয়ার হাতে এর চেয়ে ভাল কোনো বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়েই তিনি মুহাম্মদের প্রস্তাবে রাজি হন আর মুহাম্মদ তাকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন।

সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব; তিনি ছিলেন খায়বারের বানু নাদির গোত্রের ইহুদি নেতা কেনানা বিন আবু রাবিয়ার সতেরো বছর বয়সী সুন্দরী স্ত্রী। পূর্বে বানু নাদির গোত্রের বসতি ছিল মদিনায়, মুহাম্মদ তাদেরকে মদিনা থেকে উৎখাত করেন ৬২৫ সালে। খায়বারেও কয়েকবার ছোটো-খাটো অভিযানের পর অবশেষে ৬২৮ সালে ষোলশো জিহাদী

নিয়ে মুহাম্মদ নিজে চূড়ান্তভাবে খায়বার আক্রমণ করেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইহুদিরা পরাজিত হয়। বানু নাদিরের দলনেতা কেনানার বুকে আগুন রেখে নির্যাতন করার পর তাকে হত্যা করা হয়। ইহুদি যোদ্ধাদের হত্যার পর তাদের নারী এবং শিশুদেরকে গণিমতের মাল হিসেবে জিহাদীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জিহাদী দিহাইয়া বিন খলিফা আল-কালবি'র ভাগে পড়ে কেনানার স্ত্রী সাফিয়া। কিন্তু অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী সাফিয়ার সৌন্দর্য অবলোকন ক'রে দিহাইয়ার প্রতি ইর্ষান্বিত হয়েই হোক বা যে কারণেই হোক অপর এক জিহাদী মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সাফিয়ার রূপের প্রশংসা ক'রে বলে, 'বন্দীদের মধ্যে এমন সুন্দরী আর কাউকে দেখি নি, আল্লাহ্'র নবী-ই কেবলমাত্র তার যোগ্য হতে পারেন!'

সাফিয়ার রূপের প্রশংসা শুনে বিচলিত মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ দিহাইয়া এবং সাফিয়াকে তার নিকট নিয়ে আসার আদেশ দেন। সুন্দরী সাফিয়াকে দেখার পর তার রূপে মুগ্ধ হন তিনি। দিহাইয়াকে বঞ্চিত ক'রে সাফিয়াকে নিজের জন্য মনোনীত করেন, সাফিয়াকে তার পিছনে অবস্থান নিতে বলেন এবং নিজের গায়ের আলখাল্লা জড়িয়ে দেন সাফিয়ার গায়ে যাতে অন্য জিহাদীরা বুঝতে পারে যে সাফিয়া তার মনোনীত দাসী। এরপর তিনি দিহাইয়াকে নির্দেশ দেন অন্যান্য বন্দী দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিতে। নবীর বাসনার কাছে নিজের বাসনা বিসর্জন দিয়ে বঞ্চিত দিহাইয়া সাফিয়ার দু'জন চাচাতো বোনকে গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ সেই রাতেই নিজের তাঁবুতে সাফিয়ার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। আবু আয়ুব নামে এক জিহাদী তার প্রিয় রাসুলের জন্য চিন্তিত ছিল এজন্য যে রাসুলের নির্দেশেই সাফিয়ার স্বামী, বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে, অথচ রাসুল আজই সাফিয়ার সঙ্গে একই তাঁবুতে রাত্রিযাপন করছেন, সাফিয়া যদি ঘুমন্ত রাসুলের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে! তাই সারারাত তাঁবুর বাইরে পাহাড়ায় থাকে সে, যা মুহাম্মদ জানতে পারেন পরদিন ভোরে তাঁবু থেকে বেরোনোর পর। পরবর্তীতে খায়বার থেকে মদিনায় ফিরে মুহাম্মদ সাফিয়াকে বিয়ে করেন।

রায়হানা; বানু কোরায়জা গোত্রের সুন্দরী নারী। বানু কোরায়জা গোত্রের ওপর গণহত্যা চালানোর পর মুহাম্মদ গনিমতের মাল হিসেবে রায়হানাকে হস্তগত ক'রে ওই রাতেই তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেন, অর্থাৎ ধর্ষণ করেন। নিজের স্বজন এবং জ্ঞাতিদের হত্যার কারণে মুহাম্মদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা থাকায় সে ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয় নি। ফলে যৌনদাসী হিসেবেই সে মুহাম্মদের বাড়িতে জীবন অতিবাহিত করে।

মারিয়া আল-কিবতিয়া; মিশরের কপটিক খ্রিষ্টান সুন্দরী নারী। মিশরের রোমান শাসক আল-মুকাওকিস (ইসলামের ইতিহাসে মিশরের শাসকদের আল-মুকাওকিস বলা হয়) মুহাম্মদের কাছ থেকে হুমকিপত্র পাওয়ার পর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাকে খুশি করার জন্য খচ্চর, গাধা,

মূল্যবান পোশাক এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রীর সঙ্গে মাবুর নামে একজন নপুশংক দাস এবং মারিয়া ও তার বোন শিরীনকে দাসী হিসেবে উপহার পাঠান। মুহাম্মদ এই উপহার গ্রহণ করেন; তার অনুসারী হাসান বিন তাবিথের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠান শিরীনকে, আর সুন্দরী মারিয়াকে রাখেন নিজের জন্য। বলা হয়ে থাকে যে মারিয়ার গর্ভে ইব্রাহিম নামে মুহাম্মদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং জন্মের আঠারো মাসের মাথায় সে মারা যায়। যদিও এই পুত্র সন্তান মুহাম্মদের ঔরসজাত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে, কেননা খাদিজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ অসংখ্য স্ত্রী এবং দাসীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন, কিন্তু কারো গর্ভেই তার সন্তানের জন্ম হয় নি।

বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ জয়ের পর মুহাম্মদ গনিমতের মাল হিসেবে নিজের হিস্যাপ্রাপ্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতেন, তার অনুসারীদের বঞ্চিত ক'রে সুন্দরী দাসীদেরকে যেমনি নিজের জন্য নির্বাচন করতেন, তেমনি কখনো কখনো নিজের ভাগের অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী দাসীদেরকে উপহার স্বরূপ বণ্টন করতেন তার প্রিয় অনুসারীদের মধ্যে।

মুহাম্মদের যৌনজীবন আজও আরবের পুরুষদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তারা তাদের প্রিয় নবীকে অনুসরণ ক'রে নিজেদের হেরেমে একাধিক স্ত্রী এবং যৌনদাসী রাখে। মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীরা সাধারণত বিধর্মী নারীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত ক'রে তাদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করতেন, কিন্তু বর্তমানের আরব পুরুষরা যাদেরকে যৌনদাসী ভেবে নিপীড়ন করে তারা বংশ পরম্পরায় অনেক আগে থেকেই মুসলমান। তারপরও তারা এদের ওপর যৌন নির্যাতন চালায়। অথচ ইসলাম নাকি ভাতৃত্বের কথা বলে, নিজের উম্মতের নারীদের রক্ষার কথা বলে!

বাংলাদেশ থেকে যেসব নারী আরব দেশগুলোতে কাজ করতে যায় তারা সাধারণত গ্রামের দরিদ্র নারী, তারা যায় বাসা বাড়িতে কাজ ক'রে নিজের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য। আরবের মুসলমান সংস্কৃতি এবং মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে এরা অবগত নয়। তাছাড়া প্রিয় নবীর দেশের সবকিছুই এরা পবিত্র মনে করে, সেই পবিত্র দেশের মানুষের দর্শনলাভ এবং পবিত্র দেশের মাটি-পানি-বাতাসের স্পর্শ পাবার স্বপ্নও এদের অন্তরে থাকে। কিন্তু টাকা-পয়সা খরচ ক'রে নবীর দেশে পা দেবার কিছুদিনের মধ্যেই নবীর পবিত্র দেশ সম্পর্কে এদের ঘোর কাটে, নবীর পবিত্র ভূমিতে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে, মোহভঙ্গ হয়। এরা নবীর দেশে গৃহকর্ম করার উদ্দেশ্যে গেলেও অধিকাংশ-ই নবীর দেশের পবিত্র পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্ম করতে বাধ্য হয়। পিতা-পুত্র, চাচা-ভাতিজা, দাদা-নাতিসহ পরিবারের সকল পুরুষের একই নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হবার মতো ঘটনাও ঘটে; যৌনকর্মে বাধা দিলে জোটে অমানুষিক প্রহার! লোহার রড কিংবা খুন্তি পুড়িয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছেঁকা দেওয়া আরবদের কাছে অতি স্বাভাবিক শাস্তি; আর চুলের মুঠি ধ'রে কিল-ঘুষি, লাথি, বেত্রাঘাত এসব তো নিতান্তই মামুলি ব্যাপার, প্রায় রোজই এক-আধবার

জোটে! শাস্তি প্রদানে আরবদের গিন্নীরাও সিদ্ধহস্ত, এমনিতেই গিন্নীদের রাগ থাকে এইসব নারী গৃহকর্মীদের ওপর, কেননা না চাইলেও যে এরা গিন্নীদের স্বামীদের আদর-সোহাগের ভাগ পায়; ফলে পান থেকে চুন খসলেই গিন্নীদের হাতের মার খেতে হয়!

অভাবের সংসারের টাকা-পয়সা খরচ ক'রে যাওয়ায় বেশিরভাগ নারী-ই দেশে রেখে যাওয়া বাবা-মা, স্বামী-সন্তানের কথা চিন্তা ক'রে এই আত্যাচার মেনে নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়। অনেকে পালাবার পথ খোঁজে, কেউ পালিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে আশ্রয় নেয়, কেউবা কোনোভাবে লুকিয়ে বাংলাদেশে স্বজনদের কাছে ফোন দিয়ে কান্নাকাটি করে তাকে দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য। আজকাল অনেকেই দেশে ফিরে আসছে দেহ-মনে নবীর দেশের পবিত্র মানুষের নির্যাতনের ক্ষত নিয়ে; কিন্তু দেশে এসেই সমাজের মানুষের বিরূপ আচরণের শিকার হচ্ছে তারা, কপালে জুটছে অসতী হবার কলঙ্ক তিলক!

এতো যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, কিছু কিছু মিডিয়াতেও আসছে; তারপরও না সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছে, না সরকার আরব দেশগুলোতে নারী শ্রমিক পাঠানো বন্ধ করছে। আরব দেশগুলোতে নারী শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে, তাই দেশগুলোর দাবী অনুযায়ী সুসম্পর্ক বজায় রাখার খাতিরে বাংলাদেশ সরকার নিজের দেশের মা-বোনদের জীবন বিপন্ন ক'রে তাদেরকে সেখানে পাঠাচ্ছে। তাছাড়া এইসব নারী শ্রমিকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বলেও সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা এই বিষয়ে ছাফাই গাইছে এই ব'লে যে বিদেশে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। কর্তাদের এসব কথায় দেশের কিছু মানুষ আশ্বস্ত হলেও আদতে শ্রমিকদের জীবনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না; আর তা সম্ভবও নয়, কেননা কাজের লোককে যৌনদাসী মনে করে ধর্ষণ করা যে দেশের সংস্কৃতি, সেই দেশে নারী শ্রমিক পাঠিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করার কথা বলা ভীষণ অযৌক্তিক, কৌতুকজনক এবং বেদনাদায়ক। কেননা আরব দেশগুলিতে নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা কিছুটা নিশ্চিত করা তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক শ্রমিকের সঙ্গে একজন ক'রে গানম্যান পাঠানো হবে!

ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নারী শ্রমিক পাঠানো বন্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সহি দায়িত্ব মনে ক'রে এখনও অসভ্য আরবপুঙ্গবদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের নারীদের। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে ব'লে নারীদেরকে যৌনদাসত্বের মুখে ঠেলে দিতে হবে? নাকি বঙ্গবন্ধুর অজস্র স্বপ্নের মধ্যে এই স্বপ্নও ছিল যে তার দেশের দরিদ্র নারীরা প্রিয় নবীর দেশের পুরুষদেরকে যৌন সেবা করবে!

ফেসবুক খুলে স্ক্রল ক'রে নিচের দিকে নামতেই দেখি এক বড় ভাই কমেন্ট চেয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছে। মুসলিম মৌলবাদী ছাগুগুলো তার আইডিতে রিপোর্ট করেছে। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যাওয়ায় মুক্তমনা লেখকদের আইডিতে ছাগুদের

ভীষণ উপদ্রব শুরু হয়েছে। মুক্তমনা লেখকরা ধর্ম নিয়ে কিছু লিখলেই ছাগুরা তার পোস্ট শেয়ার দিয়ে রিপোর্ট করার আহব্বান জানায় আর বুঝে বা না বুঝে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই ধর্মান্ধরা রিপোর্টের বন্যা বইয়ে দেয়; ঢাকা শহরে বহুতল ভবনের এসি রুমে ব'সে অফিস করা স্যুটেড-বুটেড তথাকথিত ভদ্রলোক থেকে শুরু ক'রে বরগুনার সমুদ্র সৈকতে ব'সে ছেঁড়া জাল মেরামত করার ফাঁকে কোনো মাঝি কিংবা পঞ্চগড়ের সীমান্তে লাইন ক্লিয়ারের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকা কোনো চোরাকারবারি, ঈমানি দায়িত্ব ভেবে সকলেই রিপোর্ট ক'রে নেকি হাসিলের চেষ্টা করে!

আমি মন্তব্য করি, 'চাপাতিবাজরা চাপাতি হাতে পিছন থেকে মুক্তমনাদের ওপর হামলে পড়ে, আর ডিজিটাল চাপাতিবাজরা মুক্তমনাদের আইডিতে রিপোর্ট করে!'

এটাই কপি ক'রে অন্তত বিশ-পঁচিশটা মন্তব্য করি। তারপর স্ক্রল ক'রে নিচে নেমে দেখি শাশ্বতীদি জন্মান্তরের তৃতীয় পর্ব শেয়ার দিয়েছে। ব্লগের লিঙ্কে ক্লিক করি।



# জন্মান্তরঃ পর্ব-তিন

একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; মাখন-সাদা জানালার পর্দা ভেদ ক'রে আসা বিদ্যুৎ চমকের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে সারা ঘর, ফুল দিয়ে সাজানো খাট, আমাদের দুটো শরীর। ঘুমের ঘোরে আমার বর এখন আমাকে আরো আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ওর শীত লাগছে, শীত লাগলে ও এমন করে। ঘুম যাতে না ভাঙে তাই আমি খুব সতর্কতার সাথে এক হাত দিয়ে চাদরটা টেনে ওর শরীর ঢেকে দিলাম।

খাটটা ফুল দিয়ে সাজিয়েছে আমাদের দু'জনেরই ঘনিষ্ট কয়েকজন পাগলাটে ছোটো ভাই-বোন। ওদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আজকে, ওরা জানতো কেন এই নিমন্ত্রণ। তাই নিজেরাই ফুল কিনে নিয়ে এসে ঘর-খাট সাজিয়েছে বাসর ঘরের মতো ক'রে! নিজেরাই কেউ তরকারি কেটেছে, কেউ মসলা বেঁটেছে, কেউ করেছে রান্না। ওরা বিয়েবাড়ির মতো হই-হুল্লোর, গান-বাজনা করেছে। আমাদের দু'জনকে কোনো কাজ করতে দেয় নি। আমরা কোনো কাজে হাত দিতে গেলেই ওরা শাসন করেছে, 'তোমরা না জামাই-বউ, জামাই-বউকে কাজ করতে হয় না!' অপমান আর অবহেলা পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত আমি কি কোনোদিন

এমন ভালবাসার কথা ভাবতেও পেরেছিলাম! কি যে রহস্যময় জীবন, কখনো মাথা কুঁটে চাইলেও ভালবাসা পাওয়া যায় না, আবার কখনো না চাইতেই মিলে যায়!
আমার বর আমায় ছেড়ে এখন পাশ ফিরে শুয়েছে আমার সতীনকে জড়িয়ে ধ'রে! আমার সতীন, কোলবালিশ! সতীনের কাছে ওকে সঁপে দিয়ে আমি উঠে পড়ি, আমার ঘুম আসছে না, শুধুই ভাল লাগছে! বিছানা থেকে নেমে জল খেয়ে এখন বারান্দার চেয়ারে এসে বসেছি। বৃষ্টিছোঁয়া শীতল বাতাস এসে লাগছে গায়ে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা বৃষ্টি নিচ্ছি হাতে। যখন ভাল সময় আসে তখন সবকিছুই ভাললাগে, আর যখন খারাপ সময় আসে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল কিছুও ভাললাগে না। বৃষ্টি আমার বরাবরই ভাল লাগে, বৃষ্টি আমার সই! মনে হয় বৃষ্টিতে ভেজার মতো স্নিগ্ধ ব্যাপার আর কিছু নেই। তারপরও আমি বৃষ্টির ওপর একবার অভিমান করেছিলাম, অভিমানে প্রায় পুরো একটা বর্ষা আমি বৃষ্টিতে ভিজি নি, বৃষ্টিকে স্পর্শ করতে চাই নি! তখন আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ, রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি; কোচিং করছি, ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখন আমি আমাদের পাড়ার রায়হান ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, সে বড় একতরফা প্রেম। রায়হান ভাই কোনোদিনও জানতে পারে নি। সে তখন রাজেন্দ্র কলেজে অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। তার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হ'লে আগ বাড়িয়ে কথা বলতাম, পাড়ার গলিতে ক্রিকেট খেললে আমি তাকে দেখার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, মাঝে মাঝে খেলতামও। প্রেমিকার মতো আমি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আর মনে মনে ভাবতাম আমি কি তাকে আমার মনের কথাটি খুলে বলবো? কিন্তু শুনে যদি কষে গালে একটা চড় মারে! ভয় হতো, লজ্জাও করতো। ফলে তাকে কিছুই বলতাম না, বলতাম কেবল তুলি ভাবীকে; তুলি ভাবী তখন আমার সই, আমার সুখ-দুঃখের সাথী, আমিও তার তেমনি। কিন্তু তুলিভাবী আমাকে কোনো সমাধান দিতে পারতো না; শুধু সে কেন, কারো পক্ষেই এই সমাধান দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি যদি দৈহিকভাবেও মেয়ে হতাম তাহলে না হয় কথা ছিল, তুলি ভাবী আমাদের পত্রদূত হতে পারতো। কিন্তু আমি তো তা নই।

একদিন দুপুরে কোচিং থেকে বেরিয়ে রিক্সয় উঠেছি। রিক্স চলছে, হঠাৎ-ই পাশের রিক্সয় চোখ পড়তেই দেখি রায়হান ভাই আর তার সঙ্গে একটি মেয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আমার যে কি হয়ে গেল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইলো! মেয়েটির সঙ্গে রায়হান ভাইয়ের কি সম্পর্ক তা আমি তখনো জানি না, কিন্তু মেয়েটিকে দেখে ভীষণ ঈর্ষা হলো। জীবনে কখনো কাউকে ঈর্ষা করি নি আমি, সেই প্রথম ঈর্ষাতুর হয়ে কাউকে দেখলাম। ঈর্ষার আগুনে পোড়াতে লাগলাম মেয়েটিকে! আমার চোখে চোখ পড়তেই রায়হান ভাই জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় গিয়েছিলি?'
আমি ঈষৎ বাষ্পাকুল চোখে তার দিকে তাকিয়ে কোনো রকমে বললাম, 'কোচিংয়ে।'

আর এমন সময় ঝমঝমিয়ে শুরু হলো বৃষ্টি, রায়হান ভাই রিক্সয় হুড তুলে দিলো আর এদিকে আমার বুকে যেন আঘাত হানলো বজ্রপাত! আমি হুড তোলার কথা ভুলে গেলাম,

যখন মনে হলো তখন ভিজে গেছি। সারাপথ চোখের জলে আর বৃষ্টির জলে ভিজে একাকার হয়ে বাসায় ফিরলাম। কেন এলো বৃষ্টি? বৃষ্টির ওপর আমার ভীষণ অভিমান হলো, বৃষ্টি এলো বলেই তো আমাকে দেখতে হলো যে আমারই প্রিয় মানুষ রায়হান ভাই রিঞ্জয় হুড তুলে মেয়েটিকে নিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল! অভিমানে সেই বর্ষায় আর বৃষ্টিতেই ভিজি নি আমি! রায়হান ভাইয়ের হুড তুলে দেবার দৃশ্যটা বেশ কয়েকমাস বুকে বল্লমের মতো বিঁধেছিল!

সে-সব অল্প বয়সের অতুল আবেগের বহিঃপ্রকাশ, আজ মনে পড়লে কেবলই হাসি পায়। রায়হান ভাই আজ দুই সন্তানের পিতা, বিয়ে করেছে সেই মেয়েটিকেই। ঢাকাতেই থাকে, একদিন দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে; ভাবী আর বাচ্চাদের নিয়ে শপিংয়ে এসেছিল।

আমি স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নভঙ্গের যাতনায় পুড়েছিও। ঢাকা কলেজে অনার্সে ভর্তি হওয়ার বছর খানেক পর সম্পর্ক হয়েছিল দুই বছরের সিনিয়র একজনের সঙ্গে। আমার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে কতো স্বপ্ন সে দেখাতো আমায়; সারাজীবন আমরা একসাথে থাকবো, সমাজ কি ভাবলো না ভাবলো তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, দরকার হ'লে আমরা বিদেশে চ'লে যাব। আমি ওর মুখে এসব কথা শুনতাম আর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। কেননা তখন তো আমি বুঝতাম না যে ওসব ওর মন ভুলানো কথা, আমি জানতাম না যে বাফার এক নাচের ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চলছে, জানতাম না যে ধানমন্ডিতে এক চাকুরে দম্পতির ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া ছেলেকে প্রাইভেট পড়ায় আবার খালি বাসায় তাকে বিছানায় নিয়ে আদরও করে, আমার ভাবনায়ও ছিল না যে ও ইডেন কলেজের এক মেয়েকে নিয়ে কক্সবাজার-সিলেট ঘুরতে যায়! সম্পর্কটা পাঁচমাস স্থায়ী হয়েছিল। তারপর অনেকদিন কোনো সম্পর্কে জড়াই নি, তেমন কারো সাথে পরিচয় হয় নি আর বিশ্বাসও করতে পারি নি কাউকে।

আমি থাকতাম ইলিয়াস হোস্টেলে, রুমমেটদের কাছে আমি আমার নারীসত্তা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কেননা অন্যের গোপন কথা শোনা বা গোপন ব্যথা বোঝার মতো সংবেদনশীল মনে হয় নি ওদেরকে। আমার কিছুটা মেয়েলি স্বভাবের কারণে এমনিতেই ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো, কেউ কেউ আমার চলন-বলন আর কথা বলার ধরন অনুকরণ করতো। বললে এসবের মাত্রা আরো বেড়ে যেতো হয়তোবা, রুম থেকে বের ক'রে দেবার সম্ভাবনাও ছিল; তাতে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হতো, লেখাপড়ার ক্ষতি হতো।

তখন আমি থার্ড ইয়ারে, পহেলা বৈশাখের সকালে কয়েকজন বন্ধুর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সোহরওয়ার্দী উদ্যানে এক প্রেমিকযুগলকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম, অনেক জুটির ভেতরে ওই জুটিটা আমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো; একটা বকুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তার বাঁ-হাতে ধরা বড় একটি হাওয়াই মিঠাই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজে

খাচ্ছিল আর ছেলেটির মুখে তুলে দিচ্ছিল। ছেলেটি হাওয়াই মিঠাই মুখে নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু বলছিল আর মেয়েটি প্রাণ খুলে শব্দ ক'রে হাসছিল, হাসছিল ছেলেটিও। আমার দৃষ্টি জুড়িয়ে গেল দেখে! ছেলেটি আমার মুখচেনা, আমাদের কলেজের ছাত্র, কোন ডিপার্টমেন্টের তা না জানলেও বহুবার ওকে দেখেছি কলেজ ক্যাম্পাসে আর হোস্টেলের মাঠে ক্রিকেট খেলতে, পশ্চিম ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র। মেয়েটিকে দেখি নি কখনো। ছেলেটির পরনে বুকে লাল সুতোর কারুকাজ করা সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। মেয়েটির পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি, গায়ে লাল ব্লাউজ; মুখে হালকা মেক-আপ, কপালে লাল টিপ, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, পায়ে রক্তরাঙা আলতা, হাতে একগুচ্ছ চুড়ি। খোলা চুলের পিছন দিকে একগুচ্ছ বেলি ফুল, মাথায় ফুলের মুকুট। দু'জনকে দেখতে যেমনি সুন্দর লাগছিল, তেমনি মানিয়েছিলও বেশ! আমার দৃষ্টি তখন মেয়েটির দিকে, আগে কখনো না দেখলেও তাকে চিনতে আমার এতোটুকুও ভুল হলো না যে সেও আমারই মতো, অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী, দেহটা পুরুষের মনটা নারীর; আমি তাকে নারীই ভাবি! পহেলা বৈশাখে শাড়ি প'রে, মাথায় পরচুলা প'রে, ইচ্ছে মতো সেজেগুঁজে প্রেমিকের হাত ধ'রে উৎসবে শামিল হয়েছিল। মেয়েটিকে দেখে আমার একটুও ঈর্ষা হলো না, দেখে কি যে ভাল লাগলো তা ব'লে বোঝাবার নয়! আমার মনে হলো এই যে ওরা একে অন্যকে ভালবেসেছে, সেজেগুঁজে উৎসবে বেরিয়েছে, নিজেদের মতো হাসি-আনন্দে উৎসব উদযাপন করছে; তাতে সমাজের কী ক্ষতি হচ্ছে, কী ক্ষতি হচ্ছে ধর্মের? সমাজের অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পরচর্চা-পরনিন্দা সব মিথ্যে; সত্য কেবল ওদের অকৃত্রিম প্রেম-ভালাবাসা। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল, শ্রদ্ধায় আপনি-ই মাথা নত হলো ওদের প্রতি। ওরা বোধিবৈকল্য সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছে পূরণ করতে সাহস দেখিয়েছে, যা আমি পারি নি। ওদের মতো, ওই মেয়েটির মতো সবাই পারে না। আমারও তো আজ ইচ্ছে হয়েছিল ওর মতো শাড়ি প'রে, সেজেগুঁজে বের হতে; কিন্তু হোস্টেলে থাকি ব'লে পারি নি, আমাকে পুরুষের খোলোসেই আসতে হয়েছে; বড় যন্ত্রণাদায়ক খোলস। আমার মতো আরো অনেকেই হয়তো হোস্টেলে-মেসে থাকে, আর পরিবারের সাথে থাকলেও ওভাবে বের হবার সাহস পায় না। ওকে দেখে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আর আমার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে একদিন আমিও পারবো, নিজের ইচ্ছে মতো সেজেগুঁজে কোনো একদিন এই উৎসবে শামিল হবো; শামিল হবে আমার মতো সকল চৈত্তিক নারীরা। একসময় ওরা মেলার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল, কিন্তু আমার স্মৃতিতে ওরা রয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

এরপর কলেজে কিংবা হোস্টেলের মাঠে-পথে ছেলেটিকে দেখলে তাকিয়ে থাকতাম; ভদ্র-মার্জিত। কিন্তু ওর প্রেমিকাকে আর কখনোই ওর সঙ্গে দেখি নি। মাস ছয়েক পরে এক বিকেলে ছেলেটির সঙ্গে আমার দেখা, ও হোস্টেলের পুকুরঘাটের সিঁড়িতে ব'সে ছিল। আমিও পুকুরঘাটে বসার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম। বিকেলবেলা প্রায়ই আমি পুকুরঘাটে গিয়ে বসতাম, একা একা সময় কাটাতাম নিজের সঙ্গে। আমার পায়ের শব্দে ও পিছন ফিরে তাকালো, মুখটা কেমন গম্ভীর, সেই হাসিমাখা মুখ নয়। আগ বাড়িয়ে আমি-ই আলাপ

করলাম। জানলাম ওর নাম অরিত্র, ম্যানেজমেন্টে পড়ে, আমারই ইয়ারমেট। আলাপের এক পর্যায়ে মনে হলো মেয়েটা কেমন আছে জিজ্ঞেস করি। প্রথম আলাপেই এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে জানতে চাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু কেন যেন আমি কৌতুহল সামলাতে পারলাম না। বলেই ফেললাম, 'কিছু মনে না করলে একটা কথা বলবো?'
'বলুন।'
'গত পহেলা বৈশাখে আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে সোহরওয়ার্দী উদ্যানে দেখেছিলাম, আপনার বন্ধু কেমন আছে?'
ও নীরবে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো, চোখের ভেতর চিকচিক ক'রে উঠলো জল। তারপর পুকুরের দিকে শূন্য দৃষ্টি রেখে বললো, 'ও নেই।'
একটু বিরতি দিয়ে আবার বললো, 'তিনদিন আগে ও না ফেরার দেশে চ'লে গেছে।'

আমি স্তম্ভিত! 'ও নেই' শোনার পর ভেবেছিলাম, সম্পর্কটা টেকে নি; এরকম তো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়, আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। কিন্তু এ কি শুনছি আমি? অমন হাসি-খুশি প্রাণোচ্ছল মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই! আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মেয়েটির হাস্যজ্জ্বল মুখ, প্রিয়জনের মুখে হাওয়াই মিঠাই তুলে দেবার সেই নয়ন জুড়োনো দৃশ্য, যেটি এখন অব্দি আমার চোখে দেখা সেরা দৃশ্য; আর সেই দৃশ্যের একটি চরিত্র পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে!

আর এজন্যই ছেলেটি গম্ভীরমুখে মুখে একা ব'সে আছে পুকুরঘাটে। আমি ওর কাছে গিয়ে ব'সে পিঠে হাত রাখলাম, 'স্যরি, আমি না জেনে আপনার ব্যথাটা উস্কে দিলাম।'
ও নীরবে মাথা নাড়লো, টপ ক'রে একফোঁটা জল ঝ'রে পড়লো ওর বাঁ-চোখ থেকে। দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর বললাম, 'কীভাবে হলো?'
'ক্যান্সার।'

হায় জীবন! পৃথিবীটাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো, পৃথিবী কতো অযাচিত ভার বহর ক'রে চলেছে, কতো অশিষ্ট মানুষের ভার বহন ক'রে চলেছে যারা ক্রমাগত পৃথিবীর বুক ক্ষত-বিক্ষত করছে, আর একজন সহজ-সুন্দর মানুষের ভার সইতে পারলো না! হাজারো বঞ্চনার মাঝে দুটো মানুষের একসাথে বেঁচে থাকার এই সুখটুকু কেড়ে নিতে হলো!

এরপর থেকে প্রায়ই অরিত্র'র সঙ্গে আমার দেখা হতো, কথা হতো; পুকুরপাড়ে ব'সে আড্ডা হতো। অল্পদিনেই দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার সাথে আমার। পুকুরপাড়ে আড্ডা দেবার জন্য কখনো আমি ওর রুমে যেতাম ওকে ডাকতে, কখনো ও আমার রুমে আসতো আমায় খুঁজতে। ক্যাম্পাসের বাইরে কোথাও যাবার প্রয়োজন হ'লে কখনো কখনো ও আমাকে সঙ্গে যেতে বলতো, একইভাবে আমিও। এক সময় মনে হলো নানা বিষয়ে আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, একে অন্যের কাছে বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছি,

একে অন্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে শুরু করেছি। আমার বিষয় সমাজ বিজ্ঞান, সেকেন্ড ইয়ার থেকেই আমি বিভিন্ন এন,জি,ও'র প্রজেক্টে কাজ করতে শুরু করেছিলাম, ফিল্ডে যাবার আগে আমি ওর মুখে মন খারাপের ছায়া দেখতে পেতাম। ও জানতো আমি কবে ফিরে আসবো, তারপরও আমার রুমে গিয়ে রুমমেটদের কাছে খোঁজ নিতো আমি এসেছি কিনা। ফিরে আসার পর আমি ওর মুখে ছায়ার পরিবর্তে দেখতে পেতাম ঝলমলে রোদ্দুর। এভাবেই রোদ-ছায়ায় ফুরোতে লাগলো আমাদের দিন।

ওর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো, আমার তখনো একটা পরীক্ষা বাকি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও বাড়িতে না গিয়ে ও হলেই রয়ে গেল, আমার পরীক্ষা শেষের সন্ধ্যায় বললো, 'আমি বাড়ি যাব, চলো আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাই।'

আমি এককথায় রাজি। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো আমরা যতোই ধর্ম না মানি, আমি মুসলমানের আর ও হিন্দুর সন্তান, অনেক হিন্দু পরিবার খুব আচারনিষ্ট আর ভীষণ গোঁড়া হয়, মুসলমানদের ঘরে ঢুকতে দেয় না, মুসলমানের ছোঁয়া খায় না, ওদের পরিবারও যদি তেমন হয় তো গিয়ে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে নিজেও পড়বো, ওর পরিবারকেও ফেলবো। বললাম, 'কিন্তু...।'
'কিন্তু কী?'
'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় ঠাকুর-ঘর আছে...।'

শেষ করার আগেই ও এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলো আমার কথা, 'ধুর! ঠাকুর ঘরের জায়গায় ঠাকুর ঘর আছে, তুমি কি ঠাকুর ঘরে পুজো দিতে বসবে নাকি! আমাদের বাড়িতে এখন আর ওসব সংস্কার নেই, যতোদিন আমার ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন, ততোদিন ছিল। ইন্টারমিয়িটে থাকতে একবার ক'জন মুসলমান বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম, বন্ধুরা চ'লে যাবার পর ঠাকুমা বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন। বছর তিনেক আগে বুড়ি ম'রে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। এরপর তো ঢাকা থেকেই আমি আমার কতো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গেছি বাড়িতে। ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না।'

পরদিন রাতেই দু'জনে রওনা হলাম যশোরের উদ্দেশে, ওর বাড়িতে পৌঁছলাম তার পরদিন ভোরবেলায়। কী যে দারুণ কাটলো চারটে দিন ওর মা-বাবা, বড়বোন অবন্তী আর ছোটভাই পলকের অকৃত্রিম আতিথেয়তায়! মাসিমার কী অমায়িক ব্যবহার, আমার মনেই হলো না যে আমি ওদের বাড়িতে প্রথম গিয়েছি! টেবিলে খেতে বসলে নিজে এটা-ওটা পাতে তুলে দিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাবা-মা আর বুবুদের সম্পর্কে শোনলেন। সু-ব্যবহারে মনে হলো আমি তার ছেলের বন্ধু শাহিন নই, কোনো নিকট আত্মীয়ের ছেলে শ্যামল কিংবা অমল!

আমরা একদিন গেলাম সাগরদাঁড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থানে, আরেকদিন নড়াইলে চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের বাড়িতে। শিল্পী এবং কবির বাড়িতে দারুণ সময় কাটলো আমাদের। কবি এবং শিল্পী দু'জনের কেউ-ই স্ব-শরীরে পৃথিবীতে নেই, তবু মনে হলো তাঁরা আছেন, সর্বত্র আছেন! মাইকেল নয় বছর বয়সে সাগরদাঁড়ি থেকে কোলাকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন; আমি বাড়ির খাট, চেয়ার, সিন্দুকসহ নানান ব্যবহার্য জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম নিষেধ থাকা সত্তেও, কোথাও না কোথাও মধুর হাত নিশ্চয় পড়েছিল, সিন্দুকে কি চেয়ারে রাগত মধুর পায়ের দু-চারটা লাথি পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয় যায় না; তা পড়ুক, যে জিনিসে মধুর স্পর্শ লেগেছে তা আমি স্পর্শ করবো না তা কি হয়! আমার মনে হলো, সাগরদাঁড়ির সকাল-দুপুরটায় জড়িয়ে আছেন মধু; ওই তো কৃষ্ণবর্ণের বালক মধু মায়ের কোলে শুয়ে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনছে, জেঠিমাদের জ্বালাতন করছে, পাশের গ্রামের মৌলবীর কাছ থেকে ফারসি শিখে বই হাতে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে নিচু স্বরে গজল গাইতে গাইতে; ওই তো ডানপিটে মধু কপোতাক্ষের পারে বন্ধুদের সঙ্গে দৌঁড়-ঝাঁপ, হই-চই আর দুষ্টুমিতে মত্ত! মুমূর্ষু কপোতাক্ষ দেখে হতাশ হলেও ওই কপোতাক্ষকেই প্রমত্ত পদ্মার মতো মনে হলো যখন কপোতাক্ষের জলে হাত-পা-মুখ ভিজিয়ে উঠার সময় অরিত্র আমার দিকে ওর হাত বাড়িয়ে দিলো!

নড়াইলে চিত্রশিল্পী এসএস সুলতানের বাড়িতে গিয়েও মনে হলো ওই তো সুলতান চিত্রা নদীর পারে ব'সে ছবি আঁকছেন, বজরায় ভাসছেন চিত্রার বুকে, ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একা একা হাঁটছেন, পোষা প্রাণিগুলোর সাথে কথা বলছেন আর ওদেরকে খাওয়াচ্ছেন!

আসার আগেরদিন বিকেলে দু'জনে আড্ডা দিচ্ছিলাম ওদের এলাকার শ্মশানঘাটের একটা গাছের গোঁড়ার বাঁধানো বেঁদিতে। কিছু আগেও বাচ্চারা খেলাধুলা করছিল, দিনের আলো কমে আসায় ঘরে ফিরেছে ওরা। সুনসান শ্মশানে কেবল আমরা দু'জন। আমার ভেতরে বিদায়ের সুর বাজতে শুরু করেছে। রাত পোহালেই আমি চ'লে যাব ফরিদপুরের নিজের বাড়িতে, কিন্তু ওকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। ওকে ছেড়ে কাল চ'লে যাব ভাবতেই ভেতরটা যেন ভেঙেচুরে মুচড়ে যাচ্ছে! বিকেল মাথা এলিয়ে দিলো সন্ধ্যার কোলে কিন্তু আমাদের উঠবার নাম নেই; ঘনানো অন্ধকারে নীরব শ্মশানঘাটে ভয়ও নেই। শ্মশানের গাছগুলো মাথার ওপরে নীরব, যেন চুপিসারে শুনছে আমাদের কথা! আমি বললাম, 'ফেরার পথে তুমি ফরিদপুরে নামবে, আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকবে, তারপর দু'জন একসঙ্গে ঢাকা যাব।'

ও আমার কথায় রাজি হলো। একথা-সেকথা আরো কতো কথা দু'জনে বললাম, তবু যেন কি কথা থেকে গেল বাকি! ওর ভেতরেও যে বিদায়ের সুর বাজছে তা আমি বুঝতে পারলাম থেকে থেকে ওর উদাসীন হওয়া দেখে। একসময় ও বললো, 'চলো উঠি।'
বললাম, 'বসি আরো কিছুক্ষণ।'

‘শ্মশানে তোমার ভয় লাগে না?’
‘তুমি তো আছো, তুমি থাকলে কীসের ভয়!’
ও আবছা অন্ধকারে তাকালো আমার মুখের দিকে, আমি ওর চোখে-মুখে দেখতে পেলাম আমার বিশ্বাস আর নির্ভরতার প্রতিবিম্ব! মনে হলো যে কথাটার জন্ম হয়ে বৃক্ষের মতো একটু একটু ক’রে বেড়ে উঠেছে আমার ভেতরে, তা আর একা একা ব’য়ে নিয়ে যাবার দরকার কী? এখনই সময় ওকে বলবার। ওর ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে, চোখে চোখ রেখে বললাম, ‘অরিত্র, এই শ্মশানে কতো জীবন নিঃশ্বেষ হয়, আর আমরা যদি এখান থেকেই আমাদের নতুন জীবন শুরু করি!’

ও মুহূর্ত মাত্র সময় নিলো, তারপর কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, আমিও আঁকড়ে ধরলাম ওকে। যেন এই মুহূর্তটুকুর জন্য তৃষ্ণাতুর হয়ে আমরা দু’জনই অপেক্ষা ক’রে ছিলাম অনন্তকাল, আমরা একে অপরের বুকের খরা নিবারণ করলাম আলিঙ্গনছায়ায়-চুম্বনসুধায়! শ্মশান মানবজীবনের অন্তিম বিচ্ছেদের জায়গা হলেও আমাদের দু’জনের কাছে তা হয়ে রইলো মিলনস্থল।



বারান্দায় এসে চেয়ারে বসার পরপরই একটা কবুতর এসে রেলিংয়ে বসে, ওটাকে দেখে আসে আরেকটা। বারবার ঘাড় নেড়ে নেড়ে আমার মুখের দিকে তাকায় ওরা, এর অর্থ জানতে চায়–খাবার কই? ছাদ থেকে ওরা নেমে আসে খাওয়ার লোভে, প্রায়ই আমি এখানে ব'সে ওদেরকে চাল খাওয়াই; ওরা রেলিংয়ে ব'সে আমার হাত থেকে চাল খায়। আমি কৌশলে আস্তে আস্তে হাত টেনে আনলে ওরা গ্রিলের ফাঁক গলে আমার কোলের মধ্যে চ'লে আসে। আমি উঠে গিয়ে আমার খাটের নিচে ওদের জন্য রাখা মোটা চালের পাত্র থেকে একমুঠো চাল এনে ওদেরকে খাওয়াতে থাকি।

মনটা ভাল নেই, মেজাজটাও চ'ড়ে আছে; আর মন ভাল না থাকলে বা মেজাজ চ'ড়ে থাকলে আমি পশুপাখি-গাছপালা-নদীর সাথে সময় কাটাই; ওরা মন ভাল ক'রে দেয়। এই মন ভাল না থাকা আর মেজাজ চ'ড়ে থাকার কারণ সাতসকালে বাবার সাথে ঝগড়া হয়েছে, ঝগড়ার কারণ আমার একটি লেখা। গতকাল জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ফিহেনহাইমের একটি সিনেমা কমপ্লেক্সে মুখোশ পরা এক বন্দুকধারীর হামলায় পঞ্চাশজন আহত হয়েছে। জার্মানীতে এই হামলা নতুন নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার হামলা হয়েছে এবং যথারীতি হামলাকারী হয় আফ্রিকা নয়তো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান। কেবল জার্মানীতেই নয়; কিছুদিন পরপর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্রেও হামলা চালাচ্ছে ইসলামী জঙ্গিরা। এই তো সপ্তাহ দুয়েক আগেও মধ্যরাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় সমপ্রেমীদের একটি নৈশক্লাবে এক বন্দুকধারীর হামলায় ঊনপঞ্চাশ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়। গত বছর জানুয়ারিতে মুহাম্মদকে নিয়ে কার্টুন প্রকাশের কারণে ফ্রান্সের ব্যঙ্গাত্মক ম্যাগাজিন শার্লি এবদোর কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে বারোজনকে হত্যা করে আইএস জঙ্গিরা, এরপর থেকে

ফ্রান্সে অন্তত ডজনখানেক হামলা হয়েছে। শরণার্থী বা মুহাজির মুসলমানদের এই হামলা বিষয়েই আমি ব্লগে একটি লেখা প্রকাশ করেছি কালরাতে-
মুহাজিরদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকড় এবং ঐতিহাসিক সত্যতা

জার্মানীর ফিহেনহাইম শহরের সিনেমা কমপ্লেক্সে বন্দুকধারীর হামলায় পঞ্চাশজন নিরপরাধ মানুষ আহত হয়েছে আর এদিকে বাংলাদেশ নামক একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রের ফেসবুকীয় শান্তিকমিটি শান্তির বাণী প্রচারের মিশনে নেমেছে। যারা বলছেন এবং কু-তর্ক জুড়েছেন–ইসলাম এই ধরনের হামলা বা হত্যার অনুমোদন দেয় নি; ইসলাম শান্তির ধর্ম, মানুষ খুন করতে বলে নি; ইসলাম রক্তপাতে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি ধরনের মুখস্ত বুলি আওড়ে; এবং সবশেষে নিজের আসল রূপটিও প্রকাশ করছেন এই ব'লে যে এর জন্য পশ্চিমাদের মুসলিম বিদ্বেষ দায়ী; তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং বোধশক্তির প্রতি করুণা ক'রে তাদের জন্যই আমার এই লেখা। যে বন্দুকধারী জার্মানীতে হামলা চালিয়েছে বা যারা ইয়োরোপ-আমেরিকায় একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তারাই মুহাম্মদের প্রকৃত অনুসারী, আপনি বা আপনারা নন। গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেসব মুসলমান জীবন বাঁচাতে জল-স্থলের বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে ইয়োরোপে ঢুকেছে আমরা তাদের বলি শরণার্থী, ইসলামের ভাষায় মুহাজির। ইয়োরোপের অনেক দেশই যখন মুসলমানদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা চিন্তা ক'রে মুহাজিরদের জন্য দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে, নিজ নিজ দেশের সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে, সীমান্তের কোথাও কোথাও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মুহাজিরদের সংঘর্ষও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; তখন এই মুহাজিরদেরকে বিশ্বাস ক'রে এবং নিজ দেশের রক্ষণশীলদের সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে তাদের জন্য জার্মানীর দরজা খুলে দিয়ে মানবতার এক দারুণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে জার্মান সরকার। লক্ষ লক্ষ মুহাজিরকে তারা আশ্রয় দিয়েছে, খেতে-পরতে দিয়েছে। সাধারণ জার্মানরাও যে-যেভাবে পেরেছে সাহায্য করেছে মুহাজিরদের, স্কুলবালক-বালিকারাও তার পানির বোতলটি বাড়িয়ে দিয়েছে মুহাজির বালক-বালিকার দিকে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এই ভালবাসার বিপরীতে জার্মানরা মুহাজিরদের কাছ থেকে পেয়েছে আঘাত, অল্পদিনের মধ্যেই মুহাজিররা জার্মানদের জিনিসপত্র চুরি করতে শুরু করেছে! যদিও জার্মান সরকার তাদের ভরণপোষণ করছে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত করা যায় সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। মুহাজিররা শুধু চুরিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ব্যাপারটা না হয় মানা যেত, কিন্তু এরপর তারা যা শুরু করেছে তা কেবল কোনো বেঈমান-নিমকহারাম, বর্বর এবং নির্বোধ জাতি-ই করতে পারে। তারা জার্মানদের ওপর ছুরি চালিয়েছে, জার্মান নারীদেরকে যৌন নিপীড়ন করেছে, গুলি-বোমাবাজি ক'রে মানুষ মারতে শুরু করেছে। সঙ্গত কারণেই সাধারণ জার্মান নাগরিকরা এখন মুহাজিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তারা মুহাজিরদেরকে ঘৃণা করতে এবং সন্ত্রাসী ভাবতে শুরু করেছে; জার্মানদের বুকের ভেতরের ভালবাসার চারাগাছটি ডালডালা মেলে আরো বিস্তৃত হবার আগেই মুহাজিরদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষের প্রভাবে তা শুকিয়ে ম'রে যেতে শুরু করেছে।

ফ্রান্সের চিত্রও একই। আর এদিকে বহুদূরের বাংলাদেশে ব'সে হামলাকারীদের কওমের ভাই-বোনেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছে যে ইয়োরোপিয়ানরা বর্ণবিদ্দেষী-ইসলাম বিদ্বেষী, শেতাঙ্গদের বিদ্বেষের শিকার হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ হামলা চালাচ্ছে। আইএস হামলার দায় স্বীকার করলে সে-ব্যাপারে বাংলাদেশী কওমের ভাই-বোনেরা অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়, আবার অনেকে বলে এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, আল্লাহ্ বা নবী এমন হামলার আদেশ দেন নি! হামলাকারীদের এই কওমের ভাই-বোনেরা জেনে বা না জেনে অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক মিথ্যা বলে। সত্য হচ্ছে, আল্লাহ্ আদেশ দেন নি; কেননা আল্লাহ্'র কোনো অস্তিত্ব-ই নেই। যার অস্তিত্ব নেই সে কি ক'রে আদেশ দেবে? কোরান তো মুহাম্মদের প্রলাপ! আর মিথ্যা হচ্ছে, নবী আদেশ দেন নি; কিন্তু ইতিহাসের সত্য হচ্ছে নবী কোরানে আদেশ দিয়েছেন যা কওমের ভাই-বোনেরা সর্বদাই অস্বীকার করে। ফলে কওমের ভাই-বোনদের মিথ্যাচারের জবাব দিতে এবং মুহাজিরদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক শিকড় ও ইতিহাসের সত্যতা খুঁজতেই আমার এই লেখা। এই যে মুহাজির হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা ইয়োরোপ-আমেরিকার অধিবাসীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, এটা মুসলমানদের জন্য নতুন কিছু নয়; চৌদ্দশো বছর আগেই এর সূচনা হয়েছিল। চলুন কওমের ভাই-বোনেরা আমরা একটু চৌদ্দশো বছর আগের ইয়াসরিব নগর অর্থাৎ বর্তমানের মদিনা থেকে ঘুরে আসি। যেহেতু যুদ্ধবাজ মুহাম্মদের কু-কীর্তির কথা এই ছোট্ট লেখায় তুলে ধরা সম্ভব নয়, তাই শুধু মদিনায় মুহাজির হিসেবে অবস্থানের সময়ের কয়েকটি হামলার কথা তুলে ধ'রে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধটি খোঁজার চেষ্টা করবো।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তার হিজরতের আগে-পরে আরো কিছু নব্য মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে তার-ই প্ররোচনায়। মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীদেরকে মদিনার আনসার অর্থাৎ মদিনানিবাসী নব্য মুসলমানরা আশ্রয় দেয়। মুহাম্মদের মদিনায় হিজরতের ব্যাপারে মুসলমানদের আরেকটি মিথ্যাচার হচ্ছে, কোরাইশদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি মদিনায় পালিয়েছিলেন। কথাটা যে সত্য নয় তা কোরানের মধ্যেই নিহিত আছে-'আর যে-কেউ আল্লাহ্'র পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয় ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশে দেশত্যাগী হয়ে বের হয় আর তার মৃত্যু ঘটে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্'র ওপর। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (সুরা নিসা-৪:১০০)। মদিনায় হিজরতে অনিচ্ছুক মক্কার নব্য মুসলিমদেরকে বোঝাতেই মুহাম্মদকে এই আয়াত নাজিলের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া কোরাইশরা তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকলেও তারা সহিষ্ণু ছিল বলেই নবুওতির পর থেকে তেরো বছর মুহাম্মদ তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করা সত্ত্বেও তারা তাকে হত্যা করে নি। মুহাম্মদ তাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য কোরাইশদেরকে বারবার উত্যক্ত করেন, কাবাঘরের দখল চান, বহুশ্বরবাদী কোরাইশদের দেবদেবী এবং তাদের সনাতন রীতিনীতি নিয়ে কটাক্ষ করেন, তাদেরকে আল্লাহ্'র শাস্তির ভয় দেখান এবং তাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহ্'র শাস্তি ভোগ করছে ব'লে

জানান। ফলে অতিষ্ট হয়ে কোরাইশরা একদিন সমবেত হয়ে মুহাম্মদের দ্বারা তাদের এইসব উৎপীড়নের বিষয়ে আলোচনা করছিল। মুহাম্মদ পাশেই ছিলেন, তিনি তখন কোরাইশদের উদ্দেশে বলেন, 'হে কোরাইশগণ, আমি অবশ্যই সুদসহ এর প্রতিশোধ নেব।'

বিরক্ত কোরাইশরা মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে (৬১৭-৬১৯) নিষিদ্ধ করে, যা তারা দুই বছরের মাথায় তুলেও নেয়।

মুহাম্মদ মদিনায় হিজরত করেন স্বেচ্ছায়, তার প্রত্যাশা অনুযায়ী কোরাইশদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে না পেরে। তাছাড়া মুহাম্মদ এর পূর্বেও ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে একবার মদিনায় হিজরতের চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তখন মদিনার আনসাররা তাকে নিরস্ত করে এই ব'লে যে মদিনায় তার হিজরতের পরিবেশ এখনো তৈরি হয় নি; কেননা তখনো পর্যন্ত মদিনায় আনসারদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

মদিনায় হিজরতের পর মুহাম্মদ এবং অন্য মুহাজিররা গভীর সংকটের মুখে পড়ে। কারণ, তাদের না ছিল নিজস্ব আশ্রয় না ছিল রুটি-রুজির ব্যবস্থা; খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য তাদেরকে নির্ভরশীল থাকতে হতো আনসারদের ওপর, যারা কাজ করতো ধনী ইহুদিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষেত-খামারে। প্রথমদিকে মক্কা এবং মদিনার ইসলাম গ্রহণকারীদের সবাই ছিল বহুশ্বরবাদী, সমাজের নিচুস্তরের দরিদ্র এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মানুষ।

শুরুতে ইহুদিদের সঙ্গে মুহাম্মদের কোনো বিরোধ ছিল না, কেননা তিনি তখন মদিনায় নতুন এবং তার কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। বরং তিনি তখন ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ এবং রীতিনীতির প্রশংসা করতেন, যার প্রমাণ কোরানে আছে। নবুওতির আগে-পরে তিনি বহুবার ইহুদিদের মন্দির 'সিনাগগ' এ গেছেন, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ 'তাউরাত' শ্রবণ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় এবং ইহুদি রীতিনীতির ব্যাখ্যা জেনেছেন। তিনি মক্কায় থাকাকালীন খ্রিষ্টানদের বাইবেল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'বেথ-হা মিদ্রাস' এও যেতেন। ফলে তার চিন্তা-ভাবনায় ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব পড়ে। কেবল ইহুদি বা খ্রিষ্টান ধর্ম নয়, আববের বহুশ্বরবাদী বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের রীতিনীতি দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন এবং তা ইসলামে গ্রহণও করেন; যার প্রতিফলন মুসলমানদের জীবনাচারে এবং কোরানে দেখা যায়। বস্তুত কোরান অলৌকিক কোনো গ্রন্থ নয়, আরবের বিভিন্ন ধর্ম এবং গোত্রের রীতিনীতির মিশ্রণ, মুহাম্মদের কল্পনাপ্রসূত ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে তারই মুখনিসৃত বাণী সম্বলিত লৌকিক গ্রন্থ।

মুহাম্মদ মদিনার ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণ এবং নবী হিসেবে তাকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানালে কোরাইশদের মতো তারাও তা প্রত্যাখান করে। বর্তমানে আমাদের চারপাশেও তো কতো ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির কিংবা মানসিক রোগী ঘুরে বেড়ায়; যারা নিজেকে ঈশ্বর

বা আল্লাহ্'র খুব ঘনিষ্ঠজন মনে করে এবং আমাদেরকে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানায়, তাই ব'লে আমরা সবাই তো আর নিজেদের বিশ্বাস এবং আদর্শ ছেড়ে তাদের আদর্শ এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করি না; কেউ কেউ হয়তো করে। মদিনার ইহুদিরা তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো; ফলে কোথাকার কোন মুহাম্মদ নিজেকে আল্লাহ্'র নবী দাবী ক'রে ইসলাম নামক একটি নতুন ধর্মের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাতে তাদের কিছু যায়-আসে না। ইহুদিদের দলে ভেড়াতে কোরানের নতুন নতুন আয়াত নাজিল করলেও ইহুদিরা তা ভ্রান্ত মতবাদ ব'লে উড়িয়ে দেয় যেমনটা কোরাইশরা উড়িয়ে দিয়েছিল পাগলের প্রলাপ ব'লে। তবে মদিনার বহুশ্বরবাদীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে, বিশেষত এটা বহুলাংশে বেড়ে যায় নাখলা হামলা এবং বদরযুদ্ধের পর লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের লোভে।

মদিনায় মুহাম্মদ এবং তার অনুসারী মুহাজিরদের মাসের পর মাস কেটে গেলেও তারা কোনো সুবিধাজনক রোজগারের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, এভাবে মাসের পর মাস চলতে থাকলে মুহাম্মদের অনুসারীরা হতাশ হয়ে পড়ে এবং তার নবুওতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। মুহাম্মদ মক্কায় থাকতে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আল্লাহ্ তাদেরকে বহু আশ্রয় এবং প্রাচুর্য দেবে, কিন্তু বাস্তবতা হলো দুটো রুটির জন্যও তাদেরকে আনসারদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়; মুহাম্মদ আল্লাহ্'র কাছ থেকে তাদের জন্য কোনো অলৌকিক সুবিধা এনে দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মুহাম্মদ তখন আবার কোরানের আয়াত নাজিলের কৌশল অবলম্বন ক'রে অনুসারীদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনরত কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা ক'রে তাদের মালামাল লুণ্ঠন করবেন। তবে তার এই সিদ্ধান্তে অনুসারী মুহাজিররা আরো হতাশ হয়ে পড়ে এবং তারা কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা চালাতে অনীহা প্রকাশ করে, কেননা কোরাইশরা তাদেরই আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু চতুর মুহাম্মদ আবারো কোরানের আয়াত নাজিলের কৌশল অবলম্বন ক'রে তার অনুসারীদের রাজি করান এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। মদিনায় হিজরতের আট মাস পর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মুহাম্মদের নির্দেশে তার অনুসারীরা প্রথম হামলা চালায় কোরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলায়, কিন্তু হামলাটি ব্যর্থ হয়। এরপর তারা পর্যায়ক্রমে আরো পাঁচটি হামলা চালায়, যার সর্বশেষ তিনটির নেতৃত্ব দেন স্বয়ং মুহাম্মদ; কিন্তু তাদের পাঁচটি হামলাই ব্যর্থ হয়!

এর পরের বছর, অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুহাম্মদের নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাসের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি দল নাখলা নামক স্থানে নাটকীয় ছলনার মাধ্যমে কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা চালায়। পূর্বের হামলাগুলো ব্যর্থ হওয়ায় সতর্ক মুহাম্মদ গোপনীয়তা রক্ষার্থে হামলার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে জাহাসের হাতে একটা চিঠি দিয়ে জানান যে দু-দিনের পথ পাড়ি দেবার আগে সে যেন চিঠিটা না খোলে। জাহাস দু-দিন পর চিঠিটা খুলে দ্যাখে তাতে নাখলায় অবস্থান এবং

হামলার নির্দেশনা দেওয়া। নাখলা মদিনা থেকে নয় দিনের এবং মক্কা থেকে দুই দিনের দূরত্বের পথ। জাহাস তার দল নিয়ে নাখলায় পৌঁছে কোরাইশদের কাফেলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তখন রজব মাস, ওমরাহ্ পালনের সময়। আরব সংস্কৃতি অনুযায়ী রজব মাসে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ হলেও মুহাম্মদ তা উপেক্ষা করেই তার অনুসারীদেরকে পাঠান কোরাইশদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য। সময়টা যেহেতু ওমরাহ্ পালনের তাই জাহাসের দলের একজন মাথা ন্যাড়া করে যাতে কোরাইশরা তাদেরকে ওমরাহ্ পালনকারী মনে ক'রে বিভ্রান্ত হয়! হয়ও তাই, কাফেলাটি তাদেরকে ওমরাহ্ পালনকারী ধার্মিক দল ভেবে অসতর্কভাবে কাছে আসতেই তারা অতর্কিত হামলা চালায়। কাফেলার একজন পালিয়ে গেলেও জাহাস এবং তার দল বাকি তিনজনের একজনকে খুন এবং অন্য দু'জনকে বন্দী ক'রে মদিনায় নিয়ে আসে, সঙ্গে লুণ্ঠিত মালামাল। মুহাম্মদ এই বন্দী দু'জনের মুক্তিপণ বাবদ অর্থ আদায় করে কোরাইশদের কাছ থেকে। লুণ্ঠিত মালামাল এবং মুক্তিপণের অর্থ পেয়ে তিনি আর তার অনুসারীদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত এবং ইসলাম প্রচারে সুবিধা হয়। আধুনিককালে এটাকে বলা হয় ডাকাতি এবং অপহরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। অনেকটা এই ঘটনাটির মতোই একটি ঘটনা গতবছর আমাদের দেশেও ঘটে। আশুলিয়ার কাঠগড়া বাজারে একদল ডাকাত ব্যাংক ডাকাতি করতে যায়; ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, নিরাপত্তাকর্মী, গানম্যান এবং একজন গ্রাহককে গুলি ক'রে হত্যা এবং ব্যাংক লুঠ করে তারা; এরপর ডাকাতরা পালানোর সময় জনতা তাদের ধাওয়া করলে তারা এলোপাথারি গুলি এবং বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালানোর চেষ্টা করে, ডাকাতদের গুলি এবং বোমার আঘাতে চারজন নিহত হলেও জনতার হাতে দু'জন ডাকাত আটক হয় ও গণধোলাইয়ে একজন মারা যায়। এরপর আটকৃত দু'জনের তথ্যে ডাকাত দলের বাকি সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশি তদন্তে কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে আসে কেউটে! ডাকাতরা আসলে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন 'জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'র (জেএমবি) সদস্য; তারা নিজেদের জীবনযাপন এবং বাংলাদেশে শতভাগ ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ডাকাতি করতে যায়। এই ডাকাত দল অর্থাৎ জেএমবি সদস্যদের উদ্দেশ্য আর মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জেএমবি'র এই সদস্যরা তাদের নবীজির জীবন ও কর্ম থেকে থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই ব্যাংক ডাকাতি করতে যায়। কিন্তু দূর্ভাগ্য এই জেএমবি সদস্যদের যে তারা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যাঁতাকলে পড়েছে, ফলে গত মে মাসে তাদের ছয়জনের ফাঁসি, একজনের যাবজ্জীবন এবং দুই জনের তিনবছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত; যা মুহাম্মদের ক্ষেত্রে হয় নি।

নাখলা হামলার পর হয় সেই কুখ্যাত বদর যুদ্ধ, মুসলমানদের কাছে অবশ্য বিখ্যাত! কিন্তু সকল মানবতাবাদী, নিপীড়িত জনগণের পক্ষের মানুষের কাছে এটা কুখ্যাত যুদ্ধ-ই হওয়া উচিত। নাখলা হামলার দুই মাসের মাথায় অর্থাৎ মার্চ মাসে মুহাম্মদ জানতে পারেন যে মক্কার কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে বেশ বড় একটি বাণিজ্য

কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরছে। তখনই তিনি সেই কাফেলা আক্রমণ ক'রে মালামাল লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সাড়ে তিনশো অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে পানির কূপসমৃদ্ধ বদর নামক মরুদ্যানে কাফেলাটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরই মধ্যে কোনোভাবে আবু সুফিয়ানের কাছে মুহাম্মদের এই ষড়যন্ত্রের কথা পৌঁছে যায়। তিনি এই দুঃসংবাদটি জানিয়ে দমদম বিন আমর আল গিফারিকে দ্রুত মক্কার উদ্দেশে পাঠান, যাতে মক্কার কোরাইশরা এসে মুহাম্মদ ও তার বাহিনীর হাত থেকে কাফেলা রক্ষা করতে পারে। পরে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি কাফেলা নিয়ে বদরের পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের ধার দিয়ে সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে মক্কায় পৌঁছান। কিন্তু তার পৌঁছার আগেই দুঃসংবাদ শুনে মক্কা থেকে সাতশ (মতান্তরে হাজার) কোরাইশের একটি দল কাফেলাটি উদ্ধারের জন্য বদরের ভিন্ন পথে রওনা হয়ে যায়।

এদিকে বদরে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা মুহাম্মদ জানেন না যে আবু সুফিয়ান অন্য পথে মক্কা পৌঁছে গেছে। তিনি নিজের সৈন্যদের জন্য তাদের তাঁবুর কাছে একটি পানির কূপ রেখে অবশিষ্ট পানির কূপগুলো বালি দিয়ে বন্ধ ক'রে দেন যাতে কাফেলার কোরাইশরা পানি খেতে না পারে, ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত থাকে। সফল হয় মুহাম্মদের এই ধূর্ত ও নিষ্ঠুর পরিকল্পনা, মক্কা থেকে আগত কাফেলা উদ্ধারকারী দলটি মরুপথ পাড়ি দিয়ে যখন বদরে পৌঁছায়, তখন তারা ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত; পানির কূপ বালিপূর্ণ থাকায় তাদের তৃষ্ণা নিবারণের কোনো উপায় থাকে না। ভোররাতে মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানের কাফেলা মনে ক'রে ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত কোরাইশদের উদ্ধারকারী দলটির ওপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে। দু-পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, সংখ্যায় দ্বিগুণ কিংবা তারও বেশি থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণার্ত থাকায় কোরাইশরা যুদ্ধে হারতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে কোরাইশ গোত্রের পঞ্চাশজন নিহত হয় এবং আরো প্রায় পঞ্চাশজন হয় বন্দী, পরবর্তীতে মুহাম্মদের নির্দেশে বন্দীদের অনেককেই হত্যা করা হয়। অন্যদিকে এই যুদ্ধে মুহাম্মদের বাহিনীর মাত্র পনেরজন নিহত হয়।

এই যুদ্ধ মুহাম্মদকে দারুণ আত্মবিশ্বাসী ক'রে তোলে এবং তিনি তার অনুসারীদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন যে স্বয়ং আল্লাহ্'র ফেরেশতা তাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, নইলে এই যুদ্ধে কোনোভাবেই তারা কোরাইশদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। আর এরপরই তার এই আত্মবিশ্বাসের খড়্গ নেমে আসে মদিনার ইহুদিদের ওপর। প্রথমেই তিনি এক তুচ্ছ ঘটনায় পুরো বানু কাইনুকা গোত্রকে মদিনা থেকে উচ্ছেদ করেন। বানু কাইনুকা গোত্রের এক তরুণের বিরুদ্ধে মুসলিম এক মেয়েকে উত্যক্ত করার ওঠে, এমনও হতে পারে যে তরুণ মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করেছিল। ইসলাম ধর্মে তো প্রেমও নিষিদ্ধ! এই উত্যক্ত অথবা প্রেম নিবেদনের অপরাধে একজন মুসলিমের হাতে তরুণ খুন হয়। খুনি মুসলিমকে আবার খুন করে একজন ইহুদি। এই অপরাধে মুহাম্মদ পুরো বানু কাইনুকা গোত্রকে ঘেরাও করে, টানা পনেরদিন অবরোধের পর ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মুহাম্মদ ইহুদি

পুরুষদের বন্দী করার নির্দেষ দিলে ইহুদিদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন খাজরাজ গোত্রের প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মুহাম্মদ ওবাইয়ের প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রে ইহুদিদের হত্যার বদলে তাদেরকে ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধন-সম্পদ রেখে মদিনা ত্যাগের জন্য তিনদিনের সময় বেঁধে দেন; আর ইহুদিদের ধন-সম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেন।

মদিনায় ইহুদি উচ্ছেদের সেই শুরু, এরপর তিনি বানু নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ করেন; আর সর্বশেষ বানু কোরাইজা গোত্রের ওপর গণহত্যা চালিয়ে মদিনা ইহুদিশূন্য করেন। বানু কোরাইজা হত্যাকাণ্ড ছিল নির্মম, নৃশংস এবং রোমহর্ষক! বাজারের কাছে একটি পরিখা খনন ক'রে বানু কোরাইজা গোত্রের হাতবাঁধা আটশো থেকে নয়শো সাবালক পুরুষের শিরোচ্ছেদ ক'রে দেহগুলো পরিখার মধ্যে ফেলা হয়। মুহাম্মদ নিজে বানু কোরাইজার দু'জন নেতার শিরোচ্ছেদ করেন। উঠতি বয়সী ছেলেদের পরনের কাপড় খুলে তাদের গোপনাঙ্গের লোম পরীক্ষার মাধ্যমে সাবলকত্ব নির্ধারণ করা হয়। মুহাম্মদ এবং অন্য জিহাদীরা বানু কোরাইজার শিশু-নারী এবং ধন-সম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে নিজেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে নেয়।

বানু কোরাইজার গণহত্যা ১৯৭১ সালে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবি হত্যাসহ অন্যান্য গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। পাকিস্থানীরা বুদ্ধিজীবি, ধরা পড়া মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষকে ধ'রে এনে খনন করা গর্তের কাছে নিয়ে গুলি অথবা জবাই ক'রে লাশ গর্তের ভেতরে ফেলে দেয়। এছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে ট্রাকবোঝাই লাশ এনে গর্তের ভেতরে ফেলে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী। কোথাও মাটি ফেলে ভরাট করা হয় গর্ত, কোথাওবা ওভাবেই ফেলে রাখা হয়, পশু-পাখি আর শিয়াল-কুকুরের দল ঠুকরে-ছিঁড়ে খায় লাশগুলো! স্মরণ রাখা দরকার, একাত্তর সালের এই গণহত্যা চালানো হয় অখণ্ড মুসলমান রাষ্ট্র রক্ষার নামে, আল্লাহ্'র জমিন রক্ষার নামে, আল্লাহ্'র নামে!

আমাদের বাংলাদেশেও অনেক মুহাজির আছে এবং এখনো আসছে, এরা অতীতে রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং এখনো ঘটাচ্ছে। পাকিস্থান আমলে ভারত থেকে আগত বিহারী মুহাজিররা পশ্চিম পাকিস্থানের ইন্দনে হিন্দু নিধনযজ্ঞে নামে ১৯৪৮, ৫০ এবং ৬৪ সালে; অকাতরে তারা খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং বাস্তুচ্যুত করে হিন্দুদের। এরপর এই বিহারী মুহাজিররা আবার গর্জে ওঠে ১৯৭১ সালে, এবার আর শুধু হিন্দু নয়, স্থানীয় অনেক মুসলমানও রেহাই পায় নি তাদের হাত থেকে। মুহাজির সুন্নি মুসলমানদের হাতে স্থানীয় সুন্নি মুসলমান নিধনের ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম কিনা জানি না।

আজও আমাদের দেশে মুহাজিররা হামলা চালায়, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে আসা রোহিঙ্গা মুহাজির। চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজারে সুযোগ

পেলেই তারা হামলা চালায় আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির ওপর। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই তত্ত্বে বিশ্বাসী রোহিঙ্গা মুহাজির আর কিছু বাঙালি মৌলবাদী মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে চালায় আদিবাসী নিপীড়ন এবং উচ্ছেদ। আর অনেকক্ষেত্রেই এই উচ্ছেদ-নিপীড়নে ইন্দন জোগায় জনগণের টাকায় পোষা আমাদেরই সেনাবাহিনী। কেবল আদিবাসী নিপীড়ন নয়, সুযোগ পেলে এই মুহাজির রোহিঙ্গা-বাঙালি সম্মিলিত সাম্প্রদায়িক মুসলিম জোট হিন্দু-বৌদ্ধদের ওপরও হামলায় চালায়। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে এই সম্মিলিত সাম্প্রদায়িক মুসলিম জোট হামলা চালায় কক্সবাজারের রামু, উখিয়া এবং চট্টগ্রামের পটিয়ার বৌদ্ধমন্দির এবং বৌদ্ধপল্লীতে। এক ডজনের বেশি বৌদ্ধ মন্দির এবং অনেকগুলো বৌদ্ধপল্লীতে ভাঙচুর করে, আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়।

মুহাজিররা পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেখানেই গেছে, সেখানেই ধর্মের নামে কম-বেশি রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং এখনো ঘটিয়ে চলেছে। ফলে আজকে যে মুহাজিররা ইয়োরোপ-আমেরিকায়-অষ্ট্রেলিয়ায় হামলা চালাচ্ছে, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে হামলা চালাচ্ছে, এর শিকড় প্রোথিত সেই সুদূর অতীতে মদিনার জমিনে। মুসলমানরা স্বীকার করুক বা না করুক, ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে– এই হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নিপীড়ন, নিগ্রহ আর রক্তপতের বীজটি রোপন করেন কোটি কোটি ধর্মান্ধ মানুষের প্রাণের নবী স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ।

এই লেখাটি নিয়েই সাতসকালে বাবার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। বাবা ব্লগ-ফেসবুক ব্যবহার করেন না, ইন্টারনেট দুনিয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই; মা'রও না। সঙ্গত কারণেই আমি ব্লগ কিংবা ফেসবুকে কি লিখি তা তাদের জানার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমি ইসলাম ধর্ম নিয়ে যা-ই লিখি না কেন তার খবর তাদের কাছে চ'লে আসে; অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে লিখলে আসে না। শুধু যে ওপর ওপর একটা খবর আসে তা নয়; কী লিখি, কাকে নিয়ে লিখি, কখন পোস্ট করি এসব বিষয়ে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আসে। বেশ কয়েক মাস যাবৎ এই উপদ্রব চলছে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট করার জন্য। খবরগুলো এতো দ্রুত আর এতো নিখুঁতভাবে আসে যে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটা ছোট আপুর কাজ। পরে এই বিষয়ে ছোট আপুর সাথে কথা ব'লে নিশ্চিত হয়েছি যে বাসায় অশান্তি হবে জেনে ও একাজ করে না, তবে ও আমাকে অনুরোধ করেছে এসব বিষয়ে না লেখার জন্য। এরপর আমার সন্দেহ হয় ফাহাদ, মালিহা, রাইদাহকে নিয়ে। মালিহা করে না সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত হওয়ার পর রাইদাহ আর ফাহাদকে ব্লক করেছি; নাদিয়া আপু আর আবিদ ব্যতিত আমাদের সব আত্মীয়স্বজনকে আমি ব্লক করেছি। তারপরও বাসায় খবর আসে। আমার ধারণা চাচা-চাচীর কোনো ফেসবুক আইডি আছে, তারাই আমাকে ফলো করে আর তথ্য পাঠায় বাবা-মা'র কাছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, ফ্রেস হয়ে নাস্তা করতে বসতেই বাবা আমাকে চেপে ধরে লেখার প্রসঙ্গ তুলে। আমার তো অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। আমি লিখেছি কিনা, বাবার এই প্রশ্নের জবাবে বলি, 'হ্যাঁ লিখেছি।'

বাবা হুঙ্কার ছাড়েন, 'নবীজিকে নিয়ে উল্টা-পাল্টা কথা কেন লিখেছিস তুই?'

'বাবা, আস্তে কথা বলো, আমি তো বয়রা নই।'

'কেন আস্তে বলবো? তুই নবীজিকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা কেন লিখলি?'

চিবোনো পাউরুটি গলাধঃকরণ ক'রে আমি শান্তভাবে উত্তর দিই, 'আমি উল্টাপাল্টা কিছু লিখি নি বাবা। একটা লাইনও মিথ্যা লিখি নি, যা সত্য তাই-ই লিখেছি।'

'সত্য লিখেছিস, আমি পড়ি নাই কী লিখেছিস তুই! সব বানানো মিথ্যে কথা, নবীজি আর ইসলামকে হেয় করার জন্য তুই এসব লিখিস।'

নিজের ঘর থেকে দাদীর ফোঁড়ন, 'আল্লাহ্ আছে, আল্লাহ্ সব দ্যাখতাছে। নবীজিরে লাইয়া খারাপ কিছু কইলে আল্লাহ্'র হাত থেইকা কারো রেহাই নাই!'

বাবার উদ্দেশে বলি, 'বাবা, বাসায় তোমাদের কোনো বিষয়ে তো আমি অসুবিধা করি না, আমার লেখালেখি নিয়ে তোমরা কেন মাথা ঘামাও, এইসব খবর তোমাদেরকে কে দেয়?'

'সে যে-ই দিক, মিথ্যা তো দেয় নাই। তুই কেন করিস এসব? আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিবি না, তোকে জন্ম দিয়ে কী এতোই অপরাধ ক'রে ফেলেছি আমরা?'

'তুমি একটু ইসলামের ইতিহাস প'ড়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে যে আমি কিছুই বানিয়ে লিখি নি।'

'তুই পড় ওইসব কাফের কুলাঙ্গারদের লেখা, আমার পড়ার দরকার নাই। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে ইসলামকে হেয় করার জন্যে কাফেরা ওইসব ছাই-পাশ লেখে আর তোর মতো নির্বোধ গাধা সেগুলো পড়ে।'

'আমি যা লিখেছি তাতে নতুন কিছু নেই, আর তুমি যাদের কাফের বলছো সেই অমুসলিমরা ওসব কথা লেখে নি, তারা অনুবাদ করেছে মাত্র। মুহাম্মদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে ওইসব ইতিহাস লিখে গেছেন মুসলমানরাই।'

'কোনো মুসলমানের সন্তান এইসব মিথ্যা ইতিহাস লিখতে পারে না। আল্লাহ্'র আদেশ ছাড়া নবীজি কোনো কাজ করেন নি। নবীজির মতো দয়ালু আজ অব্দি পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি, কোনোদিন জন্মাবেও না।'

'বাবা, তুমি নিজেই মুহাম্মদের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু, আমি যদি মুহাম্মদের সময়ে তার সঙ্গে তার ধর্ম নিয়ে এভাবে তর্ক করতাম, তাহলে আমি তার পুত্র হলেও এতোক্ষণে তিনি আমার শিরোচ্ছেদ করতেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত তুমি আমাকে তো নয়ই, এমনকি কেউ যদি আমাকেও খুন করে, তুমি সেই খুনিকেও খুন করতে পারবে না।'

গর্জে ওঠেন বাবা, 'মুখ সামলে কথা বল, নবীজি কি বাজারের কসাই যে শিরোচ্ছেদ করবেন?'

‘কসাই পেটের দায়ে পশুহত্যা ক’রে বাজারে মাংস বিক্রি করে; কিন্তু কখনোই সে মানুষ হত্যা করে না। তোমাদের নবীজি কসাই ছিলেন না; কসাইয়ের চেয়েও অনেক বেশি নির্মম, নিষ্ঠুর আর হিংস্র ছিলেন। আর তিনি নিজহাতে শিরোচ্ছেদও করেছেন।’

আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র বাবা হুঙ্কার ছেড়ে টেবিলে রাখা জলপূর্ণ জগে ঘুষি মেরে মেঝেতে ফেলে দেন। ছিটকে কিছুটা জল আমার গায়ে পড়ে, জলে ভেসে যায় মেঝে আর জগ গড়াতে গড়াতে গিয়ে ধাক্কা খায় রান্না ঘরের পানি ফুটানো কলসিতে। আমি আর কোনো কথা না ব’লে অবশিষ্ট এক পিস পাউরুটি প্লেটে রেখেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক’রে দিই। আমি ঘরে আসার পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ সম্মিলিত কথার ঝড় বইয়ে দেন বাবা, মা আর দাদী। একটু আগেই ঝড়টা থেমেছে।

বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রতিনিয়ত আমাকে অবাক করে! কিছু মুসলমান আছে যারা মুসলমানদের ইতিহাস পড়ে, জানে; কিন্তু এই বিষয়ে একেবারেই বোবা হয়ে থাকে। আর আমার বাবার মতো মুসলমানরা কখনো ইতিহাস পড়েন না, ইতিহাসের সত্য জানার চেষ্টা করেন না, সত্য ইতিহাস স্বীকারও করেন না; সত্য ইতিহাস তুলে ধরলে এরা অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। অথচ এই বইগুলো লিখে গেছেন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আল-তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি, মুহাম্মদ আল-ওয়াকেদি’র মতো মুসলিম লেখকেরা; যারা গর্বের সঙ্গে মুহাম্মদের বীরত্বগাঁথা প্রকাশ করতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কেবল অমুসলিমরাই নন, অনেক মুসলিম লেখকও ইতিহাসের এই সত্য স্বীকার ক’রে এইসব গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশের মুসলিমরা সর্বদাই এইসব ইতিহাস লুকোতে চায় এবং অস্বীকার করে। এমনকি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইসলামী আগ্রাসনের যে নৃশংস অধ্যায়, তাও এরা লুকোতে চায়। আমি নিশ্চিত এরা এটা করে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আদর্শের মানুষের কাছে ইসলামের লজ্জা ঢাকবার জন্য; কিন্তু এরা বোঝে না যে তাদের এই প্রচেষ্টা ইসলামের কলঙ্কজনক ইতিহাস ঢাকবার এক ছেঁড়াফোঁড়া ব্যর্থ আবরণ মাত্র! তাছাড়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটা কলঙ্কজনক হলেও ইসলামের ইতিহাসে এটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, এই ইতিহাস লুকোতে চাওয়া মানে মুসলিম বীরদের অশ্রদ্ধা করা এবং ইসলামী আদর্শচ্যুত হওয়া। আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যসব মুসলিম দেশগুলো এমনটা করে কিনা তা আমার জানা নেই।



ক্লাস নেই, ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। সকালে উঠার তাড়া না থাকলেও দেহঘড়ি যথাসময়েই জাগিয়ে দিয়েছে। আলসেমি ক'রে বিছানায় শুয়ে না থেকে সকালটা প্রাতঃভ্রমণ আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটানোর জন্য উঠে পড়ি। বেশিরভাগ ছুটির দিনেই প্রাতঃভ্রমণে যাই বোর্টানিক্যাল গার্ডেনে, বাসা থেকে রূপনগরের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে একুশ-বাইশ মিনিট লাগে।

ছয়টা দশ বাজে। বাবা বাদে বাকিরা সেহেরি খাওয়ার পর নামাজ প'ড়ে আবার ঘুমিয়েছে, বাবা নামাজ পড়ার পর আর ঘুমান না। আমি ট্রাউজার আর সাদা টি-শার্টটা প'রে মানিব্যাগ থেকে শ'খানেক টাকা পকেটে নিয়ে ব্যাগে এক বোতল ঠাণ্ডা জল ঢুকাই, তারপর কেডস্ এ পা গলিয়ে ব্যাগটা পিঠে ফেলে বাবাকে দরজা লাগাতে ব'লে নিচে নামি।

জনশূন্য গলি। একটুও বাতাস নেই, ওপর থেকে নিচে নামতেই ঘেমে গেছি। সেই রোজার প্রথমদিন বিকেলে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর থেকে আবার টানা খরা চলছে। রোজার প্রথমদিন বৃষ্টি হওয়ায় আমার মা আর ফুফু আলাপ করছিলেন আল্লাহ্'র কুদরতের কথা নিয়ে। মা বলেন, 'আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ দরদী; নইলে এতোদিন বৃষ্টির দেখা নাই, আর রোজার প্রথম দিনেই রোজদারদের কষ্টের কথা চিন্তা কইরা তিনি উদার হস্তে পানিবর্ষণ করলেন। গরমে কষ্ট দিয়ে তিনি তার বান্দাগো পরীক্ষা নেন।'

ফুফু মায়ের কথায় সায় দেন, 'আল্লাহ্'র ঠিকই দয়া আছে, মানুষই তারে ডাকার মতো ডাকতে পারে না।'
মা ভবিষ্যৎবাণী করেন, 'আর বেশি গরম পড়বো না দেইখো। আল্লাহ্ তার বান্দাগো আর কষ্ট দিবো না। বৃষ্টিও অইবো।'
রোজার দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই আবার সেই আগের মতো গরম পড়তে শুরু করেছে। ফ্যানের নিচে ব'সে থাকলেও গা থেকে দরদর ক'রে ঘাম ঝরে। দয়ালু আল্লাহ্'র কুদরত বটে!

বাজাররোড ধ'রে উত্তরদিকে হাঁটতে শুরু করি। রোজার মাসের সকালবেলার রাস্তার চিত্র অন্য সময়ের চেয়ে ব্যতিক্রম। স্কুল-কলেজ বন্ধ। রান্নার ঝামেলা নেই ব'লে মানুষও একটু দেরি ক'রে ঘুম থেকে ওঠে, রাস্তায়ও এর প্রভাব পড়ে। অন্য সময়ে গলিগুলোতে যারা প্রাতঃভ্রমণ করে এ মাসে তাদেরও দেখা যায় না। রাস্তার পাশের ছোট ছোট হোটেলগুলো এতোক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; বাতাসে ভেসে আসে পরোটা, ডিমভাজা আর পোড়া তেলের মিশ্রিত গন্ধ; কিন্তু রমজান মাস হওয়ায় এখনো হোটেলগুলো খোলাই হয় নি।

বাজাররোড পেরিয়ে মিল্কভিটা রোডে পৌঁছে বাঁ-দিকের চলন্তিকা মোড়ের দিকে হাঁটতে থাকি। ১১ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু ক'রে ৬নং এবং ৭ নং সেকশনকে বিভক্ত ক'রে চলন্তিকা মোড়ের কাছে এসে ঈষৎ বেঁকে প্রশিকা মোড় হয়ে শের-এ-বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে মিরপুর রোডের ২ নং বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে মিল্কভিটা রোড। চলন্তিকা মোড় থেকে ৭ নং সেকশনের ভেতর দিয়ে যে এক লেনের রাস্তাটা চ'লে গেছে সেটার নামও মিল্কভিটা রোড। পণ্যের নামে রাস্তার নাম হয় কি ক'রে বুঝি না! অথচ একাত্তর সালে এই মিরপুরেই কতো রক্তাক্ত-বিয়োগান্তক ঘটনার জন্ম হয়েছে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু ক'রে মুক্তিযোদ্ধা-বুদ্ধিজীবিদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, বদ্ধভূমিও আছে মিরপুরে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বা বুদ্ধিজীবিদের নামে মিরপুরে রাস্তার নামকরণ খুব বেশি চোখে না পড়লেও মিল্কভিটার নামে দু-দুটো রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

চলন্তিকা মোড় থেকে ৭ নং সেকশনের এক লেনের মিল্কভিটা রোডে ঢুকেই রাস্তায় দাঁড়ানো একটা পুলিশভ্যান চোখে পড়ে। পিছনে বসা চারজন পুলিশ বেঘোরে ঘুমোচ্ছে, চালকও ডানদিকে মাথা এলিয়ে দিয়ে অচেতন। জনগণকে রক্ষা করবে কি এরা? এখন তো নিজেদের রক্ষা করার অবস্থায়ও নেই! এখন যদি জঙ্গিরা এসে অতর্কিত হামলা চালায় তো জেগে উঠার পরিবর্তে মহাঘুমের দেশে পাড়ি দেবে এরা। আজকাল পুলিশ-সেনাবাহনীর সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা করছে জঙ্গিরা। কিছুদিন আগে মিরপুর বেড়িবাঁধে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করে আর বাকিরা তাকে ফেলে যার যার জীবন নিয়ে পালায়। কচুক্ষেতে একজন সেনাসদস্যকে কুপিয়ে আহত করে। এরকম ঘটনা এখন হরহামেশাই ঘটছে। সেনা সদস্যদের চেয়ে বেশি বিপদে আছে পুলিশ কনস্টেবলরা। কারণ তাদেরকে বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় রাস্তায় ডিউটি করতে হয়, কিছু বুঝে উঠার আগেই মোটরবাইকে এসে হামলা ক'রে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। কিন্তু এই ঘুমন্ত পুলিশদের দেখে কে বলবে যে দেশ এখন এক ক্রান্তিকাল পার করছে আর তারা নিজেরাও অবস্থান করছে বিপদসীমায়!

পরশুদিন সন্ধ্যায় দেখলাম ১৩ নম্বর সেকশনের রাস্তার মোড়ের একটা বেঞ্চে পাঁচজন পুলিশ ব'সে আছে আর একজন দাঁড়িয়ে। মেহগনি গাছের সঙ্গে অস্ত্র ঠেকিয়ে রেখে এই ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই মোবাইল ঘাটছে। উঁকি দিয়ে দু'জনের মোবাইল স্ক্রীনে তাকিয়ে দেখি তারা

ফেসবুকিং করছে। এভাবেই তারা জঙ্গিদের আক্রমণের কাজটি আরো সহজ ক'রে দিচ্ছে আর বিপন্ন করছে নিজেদের জীবন।

এদেরকে জাগিয়ে সতর্ক করাও বিপদ। নানা প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে কি প্যাঁচ লাগাবে কে জানে! আমি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে; একজন তো রীতিমতো নাক ডাকছে, অন্য একজন তার পাশের জনের কাঁধে প্রেমিকের মতো মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। পুলিশভ্যান পাশ কাটিয়ে আমি এগোই আমার পথে।

মিল্কভিটা রোড ছেড়ে বাঁ-দিকে রূপনগরের ৫ নং রোডে ঢুকে পড়ি। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানগুলোতে যে ছোট ছোট জটলা চোখে পড়তো তা এখন নেই। আবাসিক মোড়ে এসে অফিসযাত্রী মানুষের কিছুটা ব্যস্ততা চোখে পড়ে, যাত্রীর অপেক্ষায় বাসগুলো গজরায়। মুদিদোকান, ফ্লেক্সিলোডের দোকানসহ কিছু দোকান খুলেছে। সাতসকালে যেসব দোকানে ক'দিন আগেও বাজতে দেখেছি হিন্দি কিংবা অন্য বাংলা গান, সেসব দোকান থেকেই এখন ভেসে আসছে ওয়াজ কিংবা ইসলামী গানের সুর; অধিকাংশ দোকানদারের মাথায়-ই টুপি, দোকানে একটা সহি আবহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা!

আবাসিক মোড় থেকে ডানে এগিয়ে বাঁ-দিকের ২৩ নং রাস্তায় ঢুকে পড়ি। এমন পাকা রাস্তার চেয়ে মাটির রাস্তাও ভাল; পিচ নেই বললেই চলে, লাল ইটের বুক বেরিয়ে আছে; জায়গা বিশেষে গভীর প্রশস্ত গর্ত, বর্ষায় হাঁটুজল হয় এখানে, সামান্য বৃষ্টিতেও প্যান্ট গুটাতে হয়। পায়ের তলাটা বাদ দিলে এই রাস্তাটা আমার ভাল লাগে, সুনসান, গাছপালাও আছে বেশ। গলি ধ'রে এগোলেই বোর্টানিক্যাল গার্ডেনের আভাস অনুভব করা যায় শরীরে। রাস্তা লাগোয়া আলিশান মসজিদটা থেকে ভেসে আসা সুরে কান পাতি হাঁটতে হাঁটতেই, একজন হুজুর কোরান শরীফ পড়ছে। এই রাস্তার শেষ মাথায় রূপনগর খাল, খালের ওপর পুল, পুল পেরোলেই নিচু পথ ধ'রে মিনিট খানেক এগোলেই বোর্টানিক্যাল গার্ডেনের গেট। খালের এপাশে রাস্তার দু-দিকে দুটো মাদ্রাসা এবং এতিমখানা। বাঁ-দিকে বিল্ডিংয়ের নিচতলায়, জামিয়া আশরাফিয়া ঢাকা মাদ্রাসা ও এতিমখানা; আর ডানদিকে রাস্তার ঢালে নিচু জায়গায় ইটের গাঁথুনির ওপর টিনের ছাউনি দেওয়া নূরুল কুরআন মাদ্রাসা ও এতিমখানা। এখানে এসে বরাবরই আমি কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াই; ডানে-বায়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি দু-পাশের মাদ্রাসার ছেলেগুলোকে। ওরা সামনে-পিছনে মাথা এবং শরীর দুলিয়ে ওদের প্রিয় সহি কিতাব পড়ে। কওমি মাদ্রাসার বইয়ে সুক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতা, অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক জিহাদী চেতনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়; ক্লাসে পড়ানোর সময় হুজুররা এই বিষয়গুলো আরো বিশদে এবং খোলামেলাভাবে আলোচনা করে; ছোট থেকেই হুজুররা শিশুদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ, অন্য ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ভিন্নমত নির্মূলের ফজিলত এবং প্রয়োজনে জিহাদের মাধ্যমে নিজের জীবন উৎসর্গ করার বীজমন্ত্র। মাদ্রাসায় অলিখিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত নিষিদ্ধ, ছাত্ররা জাতীয় সঙ্গীতের দুটো লাইনও

গাইতে পারে না; দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা প্রায় কিছুই জানে না, জানে ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে!

মাদ্রাসার বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই তাদের পড়তে দেওয়া হয় না, ইসলামী গানের বাইরে অন্য কোনো গান শুনতে দেওয়া হয় না, খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হয় না; সৃজন-মননের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে পশুর মতো তাদেরকে গ'ড়ে তোলা হয় মানুষরূপী বিশেষ ইতরপ্রাণি হিসেবে! এখন দেশের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর একজন মাদ্রাসায় পড়ে, মানে এক তৃতীয়াংশ, যা বিপুল সংখ্যক জনশক্তির অপচয়। অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লে এরা হতো দেশের সম্পদ, কিন্তু হয়ে উঠছে বিপদ!

একেকটি শিশু-কিশোরের দিকে তাকাই আর আমার বুক থেকে ঝ'রে পড়ে দীর্ঘশ্বাস। কি মায়ামাখা নিষ্পাপ ওদের চেহারা, কি সরল ওদের চাহনি, কি নিষ্ঠা ওদের পাঠে; অথচ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাকে গলা টিপে মেরে ওদের জীবনের কি বাজে অপচয়! এমন সাদা পাতার মতো ওদের হৃদয়, এমন সুন্দর কোমল ওদের মুখ, এমন নরম ওদের হাত; অথচ ওই সাদা পাতা একদিন ভ'রে উঠবে বিদ্বেষ এবং হিংস্রতার কদর্য দাগে, ওই কোমল মুখে ফুটে উঠবে নিষ্ঠুরতার কঠোর-কঠিন রেখা, ওই নরম হাতের আঙুল আজ আদর বুলিয়ে চলেছে ভিনদেশী বর্ণমালার ওপর কিন্তু একটু পোক্ত হলেই ওই বর্ণমালার প্রভাবে আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরবে রক্তলোলুপ চাপাতি, মানুষ হত্যা করতে ওদের বুক একটুও কাঁপবে না!

ওদের দিকে তাকালে আমি এক অদ্ভুত ঘোরে ঢুকে আমার শৈশবে ফিরে যাই, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওদের প্রত্যেকের ভেতরে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। যেন আমার ছেড়ে আসা শৈশবের জরাজীর্ণ খোলসে ঢুকে ব'সে আছে ওরা, কিন্তু আমার মতো বেরিয়ে আসতে পারছে না। আমার জীবনও তো ওদেরই মতো বাজে খরচের খাতায় লেখা হয়েছিল, সারাটা জীবন হয়তো অপচয় হতো যেমনি হচ্ছে ওদের ওই বয়স্ক হুজুরের। আমাকে মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনের একটা আলিশান মাদ্রাসায় ভর্তি ক'রে রেখে এসেছিলেন আমার চাচা। উহ্, সে কী দুঃসহ জীবন! টিভিতে কার্টুন দেখতে পারতাম না, ক্রিকেট খেলা দেখতে পারতাম না, গলির মধ্যে ক্রিকেট খেলতে পারতাম না, সাইকেল চালাতে পারতাম না, যখন-তখন আইসক্রিম কিংবা পছন্দের কোনো খাবার খেতে পারতাম না, মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে পারতাম না! ঘুমে চোখ খুলতে না চাইলেও ভোর চারটেয় জোর ক'রে তুলে দিতো হুজুররা। হাতমুখ ধুয়ে, ওযু ক'রে দল বেঁধে নামাজ পড়তাম। তারপর দল বেঁধেই পড়তে বসতাম। আমি ছোটবেলায় বেশ চুপচাপ ধরনের ছিলাম বিধায় চিৎকার ক'রে সবার সঙ্গে পড়তে আমার খুব কষ্ট হতো, কানে যেন তালা লেগে যেতো। নিজের পড়ার কথা ভুলে আমি অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর সেই অপরাধে হুজুর স্যার আমার দু-হাতের তালুতে বেত দিয়ে বারি দিতো। আর পড়বো কী! প্যাচানো আরবি ভাষা সহজে আমার মাথায় ঢুকতো না, বারবার ভুলে যেতাম। একদিন ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখেছিলাম যে

আরবি বর্ণগুলো সাপ হয়ে আমাকে পেঁচিয়ে ধ'রে আমার মুখের কাছে জিভ নাড়ছে আমাকে খাবার জন্য, আর আমি সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছি না। শেষে একসময় 'মা' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠি।

বাবা-মা আমাকে দেখতে গেলে আমি তাদের সঙ্গে বাসায় ফেরার জন্য কান্নাকাটি করতাম মাকে আঁকড়ে ধ'রে। মায়ের বোরকা কামড়ে-খাঁমচে ধ'রে কাঁদতাম; কিন্তু কোনো ফল হতো না, আমাকে রেখেই বাবা-মা ফিরে আসতেন। আমি কথা একটু কম বলতাম ব'লে কারো সঙ্গে আমার তেমন বন্ধুত্ব হয় নি, আমি কেবলই মুক্তির আশায় ছটফট করতাম কিন্তু মুক্তি মিলতো না।

বিকেলে যখন মাদ্রাসার ছেলেরা মাঠে হই-হুল্লোর করতো তখন আমি মনমরা হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমাকে একলা থাকতে দেখে হাফিজুদ্দিন হুজুর একদিন ডেকে বলে, 'তুমি এমন মনমরা হইয়া থাকো কেন? যাও ওগো সাথে খেলা করো।'

আমি না-সূচক ঘাড় নাড়ি। একদিন হাফিজুদ্দিন হুজুর আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যান তার ঘরে। কোলে বসিয়ে আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'বাড়ির লাগি পরান দাপায়?'
'আমি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ি।'
'আল্লার পথে থাকতে হ'লে এট্টু কষ্ট তো অইবোই। তয় যহন বেহেশতে যাইবা তহন আর কোনো কষ্ট থাকবো না। খালি সুখ আর সুখ। পরকালের সেই সুখ পাইতে অইলে ইহজগতে এই কষ্ট করন লাগবো। শোনো, তোমারে যদি কেউ কিচ্ছু কয়, কেউ যদি তোমারে মারে আমারে কইবা। আমি তারে চরম শাস্তি দিমু।'
আমি ঘাড় নাড়ি। হুজুর কেমন ক'রে যেন আমার গায়ে হাত বুলায়, চুলে হাত বুলায়, মুখে আঙুল বুলায়। আমার পেটের কাছে হাত দিয়ে তার কোলের আরো কাছে টেনে নেয়।
'বড় বালা পোলা তুমি। আরেকটু বড় অইলে তুমি অইবা আমার প্রিয় গেল..., সেবক অইবা সেবক। তোমার কিছু দরকার অইলে আমার কাছে চাইবা।'
আমি প্রশ্ন করি, 'সেবক কী হুজুর?'
'সেবক অইলো গিয়া হুজুরের প্রিয় বালক, হুজুর যা কইবে সেবকরে তাই শুনতে অইবে। হুজুরের সব কতা মাইন্য করলে সেবক বেহেশতে যাইতে পারবে। তুমি আমার সেবক অইলে বেহেশতে যাইতে পারবা। তারপর বেহেশতে যাইয়া তুমিও সেবক পাইবা, যাহারা তোমার সেবা করিবে।'

বলে আর আমার মাথায় মুখ ঘষে হুজুর। আমি মনে করি হুজুর স্যার আমাকে আদর করছে, আমার বাবা-মাও তো কোলে বসিয়ে আমাকে আদর করেন। হুজুরের গরম নিঃশ্বাস পড়ে আমার মাথায়, ঘাড়ে, গালে; তার বুক ঘনঘন ওঠা-নামা আর দুই উরু অস্বাভাবিক নড়াচড়া করে। হুজুর আমার পিঠের সাথে তার বুক আর কোলের সাথে পাছা চেপে ধরে। একহাত

দিয়ে আমার মাথায় আদর বুলায় আরেক হাত আমার পাঞ্জাবির নিচে ঢুকিয়ে পেটে আদর করতে করতে গালে চুমু খেয়ে বলে, 'বড় বালা পোলা তুমি, বড় সুন্দর পোলা। তোমারে বালা কইরা পড়া শিহামু, তুমি যা চাইবা আমি তোমারে তাই দিমু।'

একসময় হুজুর আরো জোরে তার শরীরের সঙ্গে আমাকে চেপে ধরে, তারপরই তার দুই উরু শান্ত হয়, তার বুকের ঘনঘন ওঠানামা ক্রমশ থিতিয়ে আসে, কিছুক্ষণ পর আমাকে তার কোল থেকে নামিয়ে শেষবারের মতো আমার কপালে চুমু খেয়ে বলে, 'যাও, অহন খেলা করো গিয়া। বড় বালা পোলা। কুনো দরকার পড়লে আমার কাছে চইলা আইবা। আর তুমি যে আমার সেবক অইবা এই কতা কাউরে কইবা না, সেবক হওনের খবর কাউরে জানাইলে ফেরেশতা বেজার হন, সে আর বেহেশতে যাইতে পারে না।'

ব'লে আমার গাল টিপে দেয় হুজুর। আমি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নেড়ে চ'লে আসি। এরপর আরো কয়েকদিন আমাকে এভাবে আদর করেছিল হুজুর। আমি তখন তার সেই আদরের মানে বুঝি নি, তবে এ ধরনের আদর আমার ভাল লাগতো না। বিশেষ ক'রে হুজুর যখন আমার পাঞ্জাবির নিচে হাত ঢুকিয়ে বুকে-পেটে তার হাত ঘষতো আর আমার গালে চুমু খাওয়ার সময় হুজুরের তারের মতো শক্ত দাড়ির খোঁচা লাগতো মুখে, তখন খুব অস্বস্তি লাগতো।

এরপর একদিন রাতে আমি প্রসাব করতে বেরিয়ে দেখি সপ্তম শ্রেণির এক বড় ভাই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে সিঁড়ির রেলিংয়ের আড়ালে চ'লে যায়। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এতো রাতে কোথায় যায় সে? ছাদে? কিন্তু ছাদের দরজায় তো তালা দেওয়া থাকে যাতে ছাত্ররা উঠতে না পারে! নাকি ছাদের দরজা খুলে দিয়েছে কিন্তু আমি জানি না? ভাবতে ভাবতে আমি প্রসাবখানায় ঢুকে প্রসাব করি। বের হয়ে আবার তাকাই সিঁড়ির দিকে, তাকে দেখতে পাই না। নাকি ভুল দেখেছি আমি? কোনো জিন নাতো? হুজুররা তো ব'লে যে আমাদের চারপাশে গায়েবী জিন ঘুরে বেড়ায়! এমনটা হওয়া কি সম্ভব যে জিন বড় ভাইয়ের রূপ ধারণ করেছে? কী জানি! ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আমি দ্রুত ঘরে এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি। অন্ধকারে অন্যদের দিকে তাকাই, সবাই ঘুমে অচেতন। আমি জিনকে ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করি, তবু মনের আয়নায় ভেসে ওঠে যে জিন বড় ভাইয়ের রূপ ধ'রে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে!

সেই ঘটনার পর থেকে মাঝরাতে প্রসাব চাপলে আমি চেপে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কতোক্ষণ আর চেপে রাখা যায়, আমাকে বের হতেই হতো। ভয়ে ভয়ে আমি বের হয়ে কোনো রকমে প্রসাব করেই প্রায় দৌড়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। কিছুদিন পর একরাত্রে আমি প্রসাব করতে উঠেছি, বারান্দায় পা রাখতেই দেখি বড়ভাই তাদের ঘর থেকে বের হয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি আমার শরীরটা ঘরের ভেতরে নিয়ে এসে কেবল মুখটা বের ক'রে উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে থাকি। জিন হ'লে ঘর থেকে বের হবে কেন?

ভয়ও লাগে আবার কৌতুহলও জাগে। বড়ভাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে মিলিয়ে গেলে আমি বারান্দায় বের হয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে প্রসাবখানায় যাই। প্রসাবখানা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াই। ওপরে উঠে দেখবো কি দেখবো না ভাবতে থাকি। বুকের মধ্যে ধুকপুক করে, তবু সাহস ক'রে ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি। পিছনে তাকিয়ে দেখি কেউ আমাকে দেখছে কিনা; না, কাউকে দেখতে পাই না। সিঁড়ির অর্ধেক উঠে ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে আমি তো অবাক, দরজা খোলা! অথচ দরজা লাগানো থাকে যাতে ছাত্ররা ছাদে উঠতে না পারে। আমি আবার ধীর পায়ে সিঁড়ির বাকি অর্ধেক উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই আর তখনই অস্পষ্ট নিচু গলার স্বর আমার কানে ভেসে আসে। আমি শরীরটা ভেতরে রেখে মুখ বাড়াই ছাদের দক্ষিণদিকে, হালকা চাঁদের আলোয় আমি প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাই ছাদের ওপর পাতা একখানা কাপড়ের ওপর দু'জন মানুষের সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর, একজনের শরীর বড় আর আরেকজনের ছোট; ছোট মানুষটা দুই হাঁটু আর দুই হাত ছাদে ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড় সামান্য উঁচু ক'রে আছে আর হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গিতে বড় মানুষটা দুই হাতে ছোট মানুষটার কোমর ধ'রে পাছার কাছে নিজের কোমর প্রবলভাবে নড়াচড়া করছে! হামাগুড়ি দেওয়া মানুষটা মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে কেমন যেন শব্দ করছে, মানুষ ব্যথা পেলে যেমন শব্দ করে অনেকটা সে-রকম; আর বসার ভঙ্গিতে থাকা মানুষটা শব্দ করছে বেশি ঝাল খাওয়ার পর মানুষ যেমনি শোষায়, ঠিক তেমনি।

আমার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হামাগুড়ি দেওয়া ছোট মানুষটা বড় ভাই। কিন্তু বড় মানুষটা কে? বড় মানুষটা হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে চাপাস্বরে বলে, 'চিৎ অইয়া শোও।' স্বর শুনে আমি চমকে উঠি! বড় ভাই চিৎ হয়ে শুলে বড় মানুষটা তার শরীরের ওপর উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে! বড় ভাইয়ের ছোট শরীর, অমন বড় একটি শরীরের চাপে সে 'উরে মা...উহ্' ব'লে নিচুস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠতেই বড় মানুষটা তার মুখ চেপে ধ'রে বলে, 'আস্তে, দাঁতে দাঁত চাইপ্পা ধইরা রাখো সোনার চান!'

তারপর আদুরে গলায় আবার বলে, 'বড় বালা পোলা তুমি, আমার প্রিয় গেলমান, প্রিয় সেবক তুমি; নিশ্চয় তুমি বেহেশতে যাইবা!'

বড় ভাই তবে হুজুরের সেবক! সেবক শব্দের মানে কিছুটা আন্দাজ পেরে আমি শিউরে উঠি, হুজুর তো আমাকেও বলেছে যে আরেকটু বড় হ'লে সে আমাকে তার সেবক বানাবে! ঘেন্নায় আমার পেট গুলিয়ে উঠে। আমি প্রায় নিঃশব্দে যেমনি উঠেছিলাম তেমনি নেমে আসি বারান্দায়। তারপর দ্রুত ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি, তাড়াতাড়ি আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইলেও ঘুম আর আসতে চায় না। চোখের সামনে কেবলই ভাসতে থাকে হুজুর আর বড় ভাইয়ের ওই দৃশ্যটি। দৃশ্যটা সারাক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে। আমি মাদ্রাসা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে থাকি।

এরপর ঈদের ছুটিতে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলে আমি রীতিমতো চিৎকার আর কান্নাকাটি শুরু করি মাদ্রাসায় না যাবার জন্য। আমার কান্না দেখে মায়ের মন গলে, দাদারও। দাদা বাবাকে নির্দেশ দেন আমাকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবার জন্য। চাচা আপত্তি তোলেন এই ব'লে যে বংশের বড় ছেলে আল্লাহ্'র পথে থাক। কিন্তু দাদা চাচার কথা কানে তোলেন নি। এরপর আমাকে বিসিআইসি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। আমি এক দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পাই।

মাদ্রাসা ছেড়েছি অনেক বছর, কিন্তু বড় ভাই আর হুজুরের সেই দৃশ্যটি আমি আজও ভুলতে পারি নি। এখনো মাদ্রাসা দেখলেই সেই দৃশ্যটি আমার মনের ভেতরে চাগাড় দিয়ে ওঠে। বারো-তেরো বছরের কোনো মাদ্রাসা ছাত্রকে দেখলেই তার ভেতরে আমি সেই বড় ভাইকে দেখতে পাই, সাত-আট বছরের কোনো ছাত্রকে দেখলেই তার ভেতরে খুঁজে পাই নিজেকে। এখন সেই বড় ভাইও হয়তো হুজুর হয়েছে, হাফিজুদ্দিন হুজুরের মতো বেহেশতের লোভ দেখিয়ে সে-ও কি কোনো বালককে গেলমান বা সেবক রেখেছে? কী জানি!

মাদ্রাসা দুটো অতিক্রম ক'রে আমি রূপনগর খালের পুলের ওপর উঠি, ময়লা-পচা-কালো জল থেকে দূর্গন্ধ ভেসে আসে নাকে। পুলের বাঁ-দিকে একটা রুটি-পরোটার দোকান, এন অবশ্য বন্ধ। ডানদিকে পাশাপাশি দুটো চায়ের দোকান; দুটো চায়ের দোকানেই সাতসকালে মানুষের জটলা থাকে, টেলিভিশনে ভারতীয় সিরিয়াল কিংবা বাংলা সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে চা-সিগারেট সহযোগে চলে নানান রকম আলোচনা, এরা প্রাতঃভ্রমণকারী নয়, আশপাশের নিম্নবিত্ত মানুষ। এখন অবশ্য দুটো দোকানের চারটা বেঞ্চে মোটে তিনজন মানুষ, তিনজনের মাথায়ই টুপি। টেলিভিশন বন্ধ, দোকানের সামনে পর্দা দেওয়া, বেঞ্চে বসা একজনের মোবাইলে বাজছে ইসলামী গান-

আল্লাহ তুমি অপরূপ
না জানি কতো সুন্দর
তোমায় আমি সঁপেছি প্রাণ
সঁপেছি এই অন্তর...।

আল্লাহ্ অপরূপ! কেমন তার রূপ? তবে যে মুমিন মুসলমানরা নিরাকার আল্লাহ্কে ডাকে, আলিশান মসজিদ বানালেও তাতে আল্লাহ্'র কোনো আকার থাকে না! আমি দোকান থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে পুলের ঢাল বেয়ে নেমে ইটের এবং মাটির রাস্তা ধ'রে পৌঁছে যাই বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেটে। গেট বলতে চিড়িয়াখানা রোডের মাথার ১ নং কিংবা গড়ান চটবাড়ির দিকের ২ নং গেটের মতো নয়; এখানে দেয়ালের নিচের অংশে ইটের গাঁথুনি নেই। ওপরে দেয়াল, তার নিচ দিয়ে মাথা নিচু ক'রে ঢুকতে হয়। সাড়ে ছয়টার দিকে রাস্তার পাশে চেয়ার পেতে চোয়াড়ে গোছের এক লোক ব'সে সামনের ছোট্ট টেবিলে রাখা টিকিটের

ওপর সিগারেটের প্যাকেট আর মোবাইল চাপা দিয়ে, মাঝে মাঝে তার পরিবর্তে একজন বৃদ্ধকেও দেখা যায়।

গেটের কাছে পৌঁছতেই লতা-গুল্ম এবং গাছপালার মিলিত গন্ধ ভেসে আসে নাকে; গন্ধটা মনকে সজীব ক'রে তোলে। মাথা নিচু ক'রে গেটের ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে পূর্বদিকের দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ, এই আষাঢ় মাসেও কয়েকটি শাখায় থোকা থোকা লাল ফুল নিয়ে গর্বিণী গাছটি ঈষৎ মাথা দুলিয়ে চলেছে। আমি অবশ্য অন্য প্রাতঃভ্রমণকারীদের মতো পিচঢালা পথে হাঁটি না, যদি না রাতে বৃষ্টি হয়। এই নাগরিক অরণ্যের ভেতরেও আরেকটা অরণ্য আছে, সেটার রূপ-রস-গন্ধ-স্বাদ নিতে নিতে যাই আমি। গেট থেকে একটু এগোলেই পিচঢালা সরু পথ ছেড়ে ডানদিকের বাঁকা লেকের ধার ঘেঁষে দু-পাশের নুয়ে থাকা লতা-গুল্মের ভেতর দিয়ে চ'লে গেছে একটা পায়ে চলা পথ, আমি লাল মাটির এই পথেই হাঁটি। পায়ে চলা পথটি কোথাও সরু আবার কোথাও বেশ চাওড়া, তবে অসমতল। বাঁকা লেকের ধার দিয়ে প্রচুর হিজলগাছ, হিজলগাছের প্রাণ বড় শক্ত, জলের তলায় কয়েকমাস থাকলেও মরে না; এজন্যই লেকের ধার দিয়ে হিজলগাছ লাগানো, কেননা বর্ষায় লেকের জল বেড়ে গেলে হিজলগাছের গোড়া তলিয়ে যায়। এখন ফুল ফোটার মৌসুম। হিজলের লম্বা লম্বা বোটায় অজস্র ফুল দোল খাচ্ছে হালকা বাতাসে, আর তলায় তো ঝরা ফুলের উৎসব! অজস্র ঝরাফুল ছেয়ে আছে লালমাটি, লতা-গুল্মের ঝোপ, ছোট ছোট সবুজ গাছের পাতা আর জলের ওপর। তিন ধরনের হিজল ফুল আছে এখানে; মাখন সাদা, গোলাপী আর লালচে। কোথাও লেকের পানির ওপর চিৎ-উপুড় হয়ে মৃদু ঢেউয়ের দোয়ায় দুলছে রাশিরাশি ফুল, আবার কোথাও লেকের কোনার দিকে পানির ওপর ভাসতে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ কচুরিপানার বিছানায় আয়েশি ভঙ্গিতে অচঞ্চল; তার-ই মধ্যে গাছের পাতা ভেদ ক'রে ঢুকে পড়েছে লম্বা দু-এক ফালি রোদ। পায়ে চলা পথটি ছেড়ে লেকের ধার দিয়ে অসমতল মাটি আর গাছের শিকড়-বাকড়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি হিজল ফুলের সৌন্ধর্য অবলোকন করতে করতে; একেক জায়গায় ফুলের প্রাচুর্যে বিস্ময়ে পা থেমে যায়; জড়াজড়ি ক'রে থাকা মাখন সাদা, লালচে, আর গোলাপি ফুলের দৃষ্টি জুড়োনো সম্মিলিত সৌন্ধর্য আর রাশি রাশি ফুলের মাদকতাময় মিষ্টি গন্ধের সম্মোহন বাণে আমি ধরাশায়ী হই! গাড়ির শব্দ নেই, মানুষের কথা নেই; কেবল গাছগাছালিতে বিচরণরত বিচিত্র সব পাখির কণ্ঠস্বর, বসন্তকাল নয় তবু থেকে থেকে কানে আসে একটা-দুটো কোকিরের ডাক; আষাঢ়ের পরে আর কোকিলের ডাক শোনা যায় না, তখন ওরা কোথায় থাকে কে জানে। আমি বুক ভ'রে লম্বা শ্বাস নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেতরে রেখে তারপর ত্যাগ করি তপ্ত নিঃশ্বাস, এভাবে বেশ কয়েকবার করি।

চারদিকে তাকালে কেবল গাছপালা আর লেকের জল এবং জলজ উদ্ভিদ চোখে পড়ে; মনে হয় যেন কোনো এক অপার্থিব জগতে এসে পড়েছি! সময়ের হিসেব লুপ্ত হয়, আমি যেন পাঁচ হাজার বছর আগের কোনো এক কিরাতপুত্র, তবে পৈত্রিক ধর্ম-কর্ম বর্জন ক'রে পশু-পাখি শিকার করার বদলে তাদের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, কল্পনা করি পশু-পাখির

দল আমাকে দেখে পালিয়ে যাবার বদলে বিশ্বাস ক'রে ভালবেসে কাছে আসছে, পশুরা গা ঘেঁষে বসছে আর পাখিরা ভালবেসে গান শোনাচ্ছে! একটা গুঁইসাপের চলার শব্দে আমার সম্মোহন লুপ্ত হয়, পশু কোথাও নেই, বৃক্ষশাখায় কেবল পাখির কলকাকলি। হালকা বাতাস এসে উস্কানি দেয় যৌবনে! নিঃসঙ্গতা চাগাড় দিয়ে উঠে হঠাৎ। ইচ্ছে করে তলা থেকে এক আঁজলা ফুল কুড়োই, কুড়িয়ে....! মনে পড়ে, ভীষণ মনে পড়ে...! কিন্তু কী করবো ফুল কুড়িয়ে? কোথায় রাখবো? ফুল কুড়োনোর ইচ্ছেটা ম'রে যায়!। ফুলগুলো তলাতেই ভাল আছে, তলাতেই থাক। গুঁইসাপটা আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে জলে ঝাঁপ দেয়, ওর পানিতে ঝাঁপ দেবার শব্দে চাপা প'ড়ে যায় আমার বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস! আমি আবার হাঁটতে শুরু করি।

রোজার কারণে গার্ডেন বলতে গেলে ফাঁকা। মাত্র পাঁচ-ছয়জন মানুষ চোখে পড়ে, অথচ অন্য সময়ে বহু মানুষ প্রাতঃভ্রমণে আসে, কোথাও দলবদ্ধভাবে ব্যায়াম করে, কোথাওবা খেলে ফুটবল। আজ একেবারেই সুনসান। আমি কিছুক্ষণ ফ্রি-হ্যান্ড এক্সরসাইজ করি, তারপর বেঞ্চে ব'সে বিস্কুট খেয়ে পানি পান করি। এরপর নির্জন অরণ্যে বেশ উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হাঁটতে শুরু করি গড়ান চটবাড়ির শক্তিসাগর পুকুরপাড়ের উদ্দেশে।

গোলাপ বাগানের কাছে এসে বেঞ্চে বসা একজনকে দেখতে পাই, লোকটা মুখ চেনা। মোবাইলে পুরনো দিনের বাংলা গান ছেড়ে তাকে হাঁটতে বা বসে থাকতে দেখেছি বহুদিন। অন্য সময়ে তার মাথায় টুপি না থাকলেও আজকে মাথায় সাদা টুপি পরা। বদলে গেছে মোবাইলের গানও–
'আল্লাহ্, ওগো আল্লাহ্
ক্ষমা ক'রে দাও
মাফ ক'রে দাও
যতোদিন এই জীবনবীণা বাজিবে
সুপথে চালাও মাফ ক'রে দাও।'

আমি মনে মনে হাসি, বেচারা, জীবনে এমন কি অপরাধ করেছে যার জন্য এতো মাফ চাওয়া!

গার্ডেনের গড়ান চটবাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে বেড়িবাঁধের রাস্তায় উঠে দাঁড়াই, দু-দিক থেকেই গাড়ি যায়-আসে। গাড়ি এলে আসতেই থাকে, একপাশ ফাঁকা হয় তো আরেক পাশ থেকে আসে পিঁপড়ার সারির মতো গাড়ি, এরই মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই দু-দিকে সতর্ক চোখ রেখে রাস্তা পার হতে হয়। বেড়িবাঁধের বিভিন্ন পয়েন্টে ফুটওভারব্রিজ খুবই প্রয়োজন। এই রাস্তায় প্রায়ই অ্যাকসিডেন্ট হয়, পনেরদিন আগেও রাস্তার ওপাশের শক্তি সাগর পুকুরের পাড়ে একটা ট্রাক উল্টে গিয়েছিল। স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের আমলে নির্মিত হয়েছে

এই বেড়িবাঁধ। তারপর অনেকবার সংসদ নির্বাচন হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কোনো সরকারই এক লেনের এই রাস্তাটিকে আরো চওড়া এবং একাধিক লেন করার কথা ভাবে নি, অথচ এটি ভীষণ ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। গাড়ির চাপ একটু বাড়লেই বিভিন্ন পয়েন্টে জ্যাম লেগে যায়। রাস্তাটা দুই লেন হ'লে অ্যাকসিডেন্ট যেমন কমবে, তেমনি মিরপুর থেকে অফিসযাত্রীরা কম সময়ে এবং নিরাপদে উত্তরা, চন্দ্রা, শফিপুর, জিরানিতে যাতায়াত করতে পারবে।

একটু ফাঁকা হতেই আমি রাস্তা পার হয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে হাঁটতে শুরু করি, আমার ডানদিকে শক্তি সাগর পুকুর আর বামদিকে দুটো দোকান। রাস্তার ঢাল লাগোয়া পরোটা, সিঙ্গারা, পুরির দোকান; দোকানের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে পাটকাঠি আর তাঁবুর ছাউনি দিয়ে কয়েকটি বেঞ্চ আর টেবিল পাতা; দোকানের পিছনে আলাদা একটা ছাপড়া রান্না করার জন্য; যেখানে সিঙ্গারা এবং নাস্তার তরকারি রান্না করে দোকানদারের স্ত্রী। দোকানদার বেঞ্চে আর তার স্ত্রী দোকানে ব'সে আছে, রোজার কারণে কোনো খরিদ্দার না থাকায় তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। এই দোকানের পরেই আরেকটি দোকান, চা-বিস্কুট-সিগারেটের; প্রাতঃভ্রমণকারীদের উপস্থিতি না থাকার কারণেই হয়তো এখনো খোলে নি। আমি এই দোকান দুটো পেরিয়ে পরিত্যাক্ত একটি দোকানের চাঙায় কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসি। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছি। এখন দারুণ আরাম লাগছে তুরাগ নদীর বুক পেরিয়ে আসা অবাধ হাওয়ায়।

শক্তিসাগর পুকুরের পাড় আর তার নিচের এই ঢালু জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সব মিলিয়ে আট-দশটি দোকান ছিল আগে। এখন চালু আছে মাত্র দুটি; কয়েকটি দোকানঘর ভেঙে নিয়ে গেলেও পরিত্যক্ত তিনটে ঘর আর তার সামনের কয়েকটি চাঙা এখনো রয়ে গেছে, উইপোকায় খাচ্ছে বাঁশ-কাঠ। শক্তিসাগর পুকুর আর তার পাড়ের সার্ধশতবর্ষী বটগাছকে কেন্দ্র ক'রে জায়গাটা ছোটোখাটো একটা পর্যটন কেন্দ্রের রূপ নিতে শুরু করেছিল, কিন্তু মুকুরেই তা বিনষ্ট করেছে প্রশাসন। রোজকার যান্ত্রিক জীবনযাপনের চাপে ক্লিষ্ট মানুষ ছুটির দিনগুলোতে বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবার-পরিজন নিয়ে একটু ভিন্ন স্বাদ নিতে এখানে আসতো, অনেকে সার্ধশতবর্ষী বটগাছ দেখতে আসতো। কেবল ছুটির দিনগুলোতে নয়, অন্যান্য দিনগুলোতেও আসতো ছাত্র-ছাত্রী এবং ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা। কিছুটা গ্রাম্য পরিবেশে টঙ দোকানে ব'সে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতো, মন চাইলে নৌকায় চ'ড়ে তুরাগের বুকেও ঘুরতো। দর্শনার্থীদের জন্য ছই দেওয়া অনেকগুলো ডিঙ্গিনৌকা ছিল; সেই নৌকাগুলোর বেশিরভাগই এখন ছইহীন, চিৎ-উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে ডাঙায়। এখন সচল আছে কেবল জেলেদের মাছ ধরা দুটো নৌকা, যা সব সময় এখানে থাকেও না; আর গার্ডেন লাগোয়া রাস্তার ওপাশের মহল্লার মানুষের নিত্যদিনের কাজ যেমন ঘাস কিংবা কচুরিপানা সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত দুটো নৌকা; আর একটা নৌকা আছে আফজাল ভাইয়ের, সেটাও ছইহীন। আফজাল ভাই একটা ছাতা আর বৈঠা নিয়ে ব'সে থাকে, কখনো নৌকাভ্রমণে ইচ্ছুক কোনো

ভ্রমণপিপাসু বা প্রেমিকযগুল এলে তাদেরকে নৌকায় ঘুরিয়ে আনে। কদাচিৎ পুলিশ এলে আস্তে ক'রে কেটে পড়ে। এখন অবশ্য সে নেই, তার নৌকাটি মাটির গভীরে পুঁতে রাখা লোহার শিকের সঙ্গে শিকল বেঁধে তালা দিয়ে রাখা।

দর্শনার্থীদের ভিড় বুঝে আশপাশে বেড়িবাঁধ সংলগ্ন কয়েকটি পার্ক এবং রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছিল; যার কয়েকটি এখনো আছে; আর কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে দর্শনার্থীর অভাবে। ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিয়ে যারা আসতো বা সংখ্যায় কম হলেও এখনো যারা আসে, তারা পার্কে কিংবা রেস্টুরেন্টে সময় কাটাতো বা এখনো কাটায়। শোনা যায় পার্ক এবং রেস্টুরেন্টগুলোর মালিকেরা বিত্তবান এবং প্রভাবশালী, পুলিশ তাদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়, যে কারণে ওগুলো টিকে আছে। কিন্তু যারা রিজয় এসে নদীর পারে বসতো, নৌকায় ঘরতে ঘুরতে কিংবা টঙ দোকানে ব'সে চা খেতে খেতে গল্প করতো, পুলিশ তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করতো; এখনো করে। কেবল হয়রানি নয় প্রতারণাও করে। শাহ্ আলী থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা রিজয় আসা তরুণ-তরুণীদের পথেই আটকে দেয়, থানায় আটকানোর ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে রিজ ফিরিয়ে দেয়; কখনো কখনো থানায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়। ফলে এই ধরনের হয়রানি-প্রতারণার ভয়ে দশনার্থীরা এখন বলতে গেলে আসেই না। পুলিশি হয়রানির ব্যাপারটা না জেনে এখনো যারা আসে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো হয়রানি বা প্রতারণার শিকার হয়। এই এলাকা নিয়ে পুলিশের অভিযোগ যে এখানে অসামাজিক-অবৈধ কার্যকলাপ হয়। অসামাজিক বা অবৈধ কার্যকলাপ বলতে যা তুলে ধরা হয় তা হলো– যুবক-যুবতীরা এদিকে এসে নদীর ধারের বিভিন্ন খোলা জায়গায়-নৌকায় ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। নৌকায় বা খোলা জায়গায় কতোটা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সম্ভব? কোনো প্রেমিক যুগল যদি একজন আরেকজনের হাত ধ'রে গল্প করে, একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন বোনে, একজন আরেকজনের কাঁধে কি বুকে মাথা রেখে কথায় কি মৌনতায় সময় পার করে কিংবা একে অন্যের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে পান করে চুম্বনসুধা, তা কী অপরাধ? এগুলো কি অসামাজিক সম্পর্ক কিংবা সমাজের মানুষ এইসব সম্পর্কে আবদ্ধ নয়? সমাজের মানুষও তো তার প্রিয়জনের ঠোঁটে চুম্বন করে। এই যুবক-যুবতীরাও তো সমাজেরই মানুষ। আর অবৈধ সম্পর্ক? কেউতো কাউকে বাড়ি থেকে জোর ক'রে তুলে এখানে নিয়ে এসে তার ঠোঁটে চুমু খেতো না, তারা আসতো স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায় কেউ সম্পর্কে জড়ালে সেই সম্পর্ক কি ক'রে অবৈধ হয়? এখানে মুক্ত পরিবেশে তারুণ্যের প্রেমের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু খোদ ঢাকা শহরেই শতশত হোটেল-অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশি ছত্রছায়ায় জমজমাট মাদক এবং দেহব্যবসা চলছে!

পুলিশের এই ধরনের হয়রানি বা তোলাবাজি যে এখন এখানেই চলে তা নয়, স্বীকৃত পর্যটন এলাকাতেও এসব চলে। আমার এক সহপাঠী কিছুদিন আগে ওর গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে কুয়াকাটা গিয়েছিল ঘুরতে। সন্ধ্যায় বিচ থেকে ফেরার সময় পুলিশ ওদেরকে ধরে। জানতে চায় ওরা বিবাহিত কিনা। ওরা হ্যাঁ বলার পরও সম্ভবত ওদের বয়সের কারণে পুলিশের

সন্দেহ হয়, সেজন্য ওরা যে বিবাহিত তার প্রমাণ দেখাতে বলে। বিবাহের নথিপত্র নিয়ে তো আর কেউ ঘুরতে যায় না, তাই পুলিশ ওদের বাড়িতে ফোন ক'রে অবিভাবকের সাথে কথা বলতে চায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ছাড়া পায় ওরা।

যে দেশে তরুণদের প্রেমের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, সে দেশে তরুণরা জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ সহ নানা ধরনের অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডে তো জড়াবেই। সুস্থ এবং অপরাধমুক্ত সমাজের জন্য চাই তারুণ্যের নির্বিঘ্ন প্রেমের অধিকার। আমাদের দেশে গলিতে-গলিতে মসজিদ, অথচ কারাগারে ঠাঁই নাই ঠাই নাই অবস্থা; পুরাতন কারাগার ভেঙে নতুন কারাগার নির্মাণের পরও ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ অপরাধী রাখতে হয়! আর নেদারল্যান্ডে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাও চুটিয়ে প্রেম করে, মানুষ প্রকাশ্যে চুমু খেতে পারে; অথচ অপরাধীর অভাবে নেদারল্যান্ডের কারাগারগুলো বন্ধ ক'রে দিতে হচ্ছে!

এই যে এখানে তারুণ্যের প্রেমের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, এর পিছনে অন্য কালো হাতের প্রভাব থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। কারণ প্রেম ব্যাপারটাই তাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই শক্তিসাগর পুকুরপাড়ের সার্ধশতবর্ষী বটবৃক্ষটিকে অনেক আগে থেকেই হিন্দুরা পূজা করে। আর এই শক্তিসাগর পুকুর এবং প্রাচীন বটবৃক্ষের সৌন্ধর্য ম্লান ক'রে বটবৃক্ষটির খুব কাছেই নির্মাণ করা হয়েছে একটি দ্বিতল ভবনের মসজিদ ও মাদ্রাসা; নিচতলায় বায়তুল আমান হামিদিয়া জামে মসজিদ, দোতলায় মাবিয়া ইক্করা হাফিজিয়া নূরানি মাদ্রাসা ও এতিমখানা। এই স্থানটির খুব কাছে মুসলিম বসতি নেই, মুসলিম বসতি এখান থেকে পায়ে হেঁটে অন্তত সাত-আট মিনিটের দূরত্বে। ফলে এখানে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার; প্রথমত হিন্দুদের পূজায় ব্যাঘাত ঘটানো এবং বন্ধ করা, দ্বিতীয়ত তারুণ্যের প্রেমের জোয়ারে স্থায়ী বাঁধ দেওয়া। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুরাগ এবং গার্ডেনের জায়গা দখল ক'রে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে; কেননা বাংলাদেশে এটা একটা পরিচিত দৃশ্য যে একটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সরকারি খাস জমি, নদী, খেলার মাঠ এসব দখল ক'রে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই গ'ড়ে তোলে মসজিদ এবং মাদ্রাসা। ধর্ম যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয় তাই সরকারী জায়গা দখল ক'রে ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ চুপ থাকে এই জন্য যে বাধা দিতে গেলে যদি এলাকার লোকজন প্রতিরোধ করে, সরকারের গায়ে ধর্মবিরোধী তকমা লেগে যায়! আর অবৈধভাবে জায়গা দখল ক'রে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করলে যেহেতু পার পাওয়া যায়, সরকারের দায়িত্বশীল মহলও এসব বিষয়ে মাথা ঘামায় না; এই সুযোগটাই নেয় ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। বাংলাদেশে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের টাকা জিনে যোগায়, মধ্যপ্রাচ্যের জিন; সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার ইত্যাদি দেশের সহি জিন! মধ্যপ্রাচ্যের জিনের টাকায় বাংলাদেশের জিনভক্ত মুমিন ভৃত্যরা যত্র-তত্র ভূমি দখল ক'রে গ'ড়ে তোলে মসজিদ এবং মাদ্রাসা; নিবিড়ভাবে চাষ হয় জঙ্গিবাদের, ফলনও আশাতীত! আজকাল জিনভক্ত মুমিন ভৃত্যরা টার্গেট করছে নির্জন নদীর পার সহ এমন সব জায়গা যেখানে বিনোদন কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে বা উঠছে বা গ'ড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে। এমন সব জায়গায় মসজিদ বা মাদ্রাসা

নির্মাণ ক'রে বিনোদন কেন্দ্রকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছে। উদ্দেশ্যও থাকে তাই যাতে বেশরিয়তী বিনোদন কেন্দ্রগুলো বিকশিত হতে না পারে। এরা যে ভূমি দখল ক'রে কেবল মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে তাই নয়, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ এদের প্রাথমিক প্রক্রিয়া, এরপর আশপাশের জমি দখল ক'রে ঈদগাহ বানায়, কালক্রমে সেই ঈদগাহ্ হয়ে ওঠে বাজার। আর মধ্যপ্রাচ্যের জিনদের পাঠানো টাকার সাথে বাজারের দোকান ভাড়ার টাকা যোগ হওয়ার পর একতলা বা দোতলা মসজিদ-মাদ্রাসা ধাই ধাই ক'রে বেড়ে বহুতল হয়, তখন বহুতলের একতলা-দোতলা সুপার মার্কেট হিসেবে ভাড়া দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসার কার্যক্রম চালানো হয় ওপরের তলাগুলোতে। তখন কোনো কারণে মধ্যপ্রাচ্যের জিনের টাকা পাঠানো বন্ধ হলেও তেমন অসুবিধা হয় না, দোকান ভাড়ার টাকায়-ই চলতে পারে মসজিদ-মাদ্রাসা এবং জঙ্গি কার্যক্রম। যেমনটা হয়েছে আমাদের মহল্লার মসজিদ-মাদ্রাসার ক্ষেত্রে; ঈদগাহ্ এখন মাছ-মুরগী আর সবজির বাজার, একতলা-দোতলা সুপার মার্কেট।

তবে এখানকার এই মসজিদ এবং মাদ্রাসাটি জমি দখল ক'রে নয়, নিজের জায়গাতেই নির্মাণ করেছে; ভবন নির্মাণ এবং মাদ্রাসা চালানোর খরচ মধ্যপ্রাচ্যের জিনের থেকে প্রাপ্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর নিজের জায়গায় ভবন নির্মাণ করলেও এরই মধ্যে ভবনের সামনের গার্ডেনের কিছু জায়গা দখল করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো জায়গা যে দখল করবে সে ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত থাকা যায়, কেননা এই মসজিদ থেকে বেরোতে হয় গার্ডেন অথবা তুরাগের জায়গা দিয়ে, বেড়িবাঁধে উঠার জন্য মসজিদের নিজস্ব কোনো রাস্তা নেই। সতরাং ভবিষ্যতে জায়গা দখল ক'রে এখানেও তথাকথিত ঈদগাহ্ এবং মার্কেট নির্মাণের সম্ভাবনা প্রবল।

মসজিদ-মাদ্রাসা ভবনটি যে ব্যক্তিগত জায়গায় নির্মিত সেটা আমি জেনেছি এক জেলের কাছ থেকে। প্রৌঢ় জেলের নাম ইয়াসিন মিয়া, বটগাছের নিচে ব'সে বিশ্রাম করছিলেন। একথা-সেকথার পর তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'এখানে তো কেউ খুব একটা নামাজ পড়তে আসে না, আশপাশে কোনো মুসলমানের বাড়িও নেই; তাহলে এখানে মসজিদ নির্মাণ করলো কেন?'
'হাউস জাগছে তাই করছে। ট্যাহা থাকলে মানুষ সোনার জামা পিন্দে, আর এতো মসজিদ!'
'মসজিদ কি নিজের জায়গায় করছে না জায়গা দখল ক'রে?'
'নিজের জায়গায়-ই করছে।' এরপর মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বলে, 'তয় হ্যার বিচার আছে না? বিচারও করছে!'
'কিসের বিচার?'
'আল্লাহ্ কন আর ভগবান কন, সে তো একজনই, আমরা তারে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাহি; সেই একজনের বিচার। এই যে দ্যাকতাছেন বটগাছ, এই বটগাছরে হিন্দুরা বহুকাল আগে থেইকাই ত্যাল-সিঁন্দুর-ধান-দূর্বা দিয়া পূজা করে। এইহানে যে মসজিদ বানাইছে, মসজিদ বানানোর আগে হ্যারে স্বপ্ন দ্যাহাইছিল, হ্যায় যাতে এইহানে মসজিদ না বানায়।'
'কে স্বপ্নে দেখাইছিল?

'বুঝতাছেন না?' আবারো আকাশের দিকে তর্জনী তোলে, 'ঐ যে, উপরে একজন আছেন তেনায়। স্বপ্ন দ্যাহানোর পরও হ্যায় কতা হুনে নাই, মসজিদ বানাইবার লাগছে; তারপর আবারো হ্যারে স্বপ্ন দ্যাহাইছে মসজিদ বানান বন্ধ করনের লাইগ্যা। হ্যায় কুনো কতাই কানে নেয় নাই, গায়ের জোরে মসজিদ বানাইছে। কয়দিন পরই হ্যায় মরছে। আর তার মরণের কিছুদিন বাদেই মরছে তার এট্টা পোলা।'
'কী বলেন! এসব সত্যি?'
'মিছা কতা কইলে বাপের জন্মই না! কাছে-কিনারের মানুষরে জিগায় দ্যাহেন যে মসজিদ বানানোর পর হ্যারা বাপ-বেটায় মরছে কিনা? হুনেন হিন্দু হোক, মুসলমান হোক আর খিরিশটান; কারো ধর্মরে হেলা করতে নাই। যার যার ধর্ম তার তার, আর সবার উপরে তেনার বিচার।'

ইয়াসিন মিয়া এরপর তার জীবনে দেখা এরকম আরো অলৌকিক ঘটনার কথা বলতে থাকে। আমি আর তাকে বলি না যে, চাচা, আমি রোজ রোজ আপনার আল্লাহ্ আর ভগবানের বিরুদ্ধে লিখি; কই আল্লাহ্ বা ভগবান আমাকে তো মারে না! তাছাড়া ভারতবর্ষের মাটিতে বহু মন্দির ভেঙে মুসলমানরা মসজিদ আর খানকাহ্ নির্মাণ করেছে, আওরঙ্গজেব মসজিদে উঠার সিঁড়ির ধাপের নিচে রেখেছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, যাতে মুসল্লিরা তা মাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। এখনো সেসব মসজিদের অনেকগুলোই বহাল তবিয়তে টিকে আছে এবং মুসল্লিরা নামাজ পড়ছে। স্বয়ং মুহাম্মদ কাবাঘরের মূর্তি ভাঙায় অংশ নিয়েছিলেন, কাবাঘরে পূজিত কাঠের ঘুঘুটি তিনি ভেঙেছিলেন; পৃথিবীতে এখনো মুহাম্মদের ধর্ম টিকে আছে আর কাবাঘর এখনো মুসলমানের দখলে, কোটি কোটি মুসল্লি সেখানে হজ করতে যায়। কোরাইশ কিংবা হিন্দুদের ঈশ্বর রেগে গিয়ে মুসমানদের মসজিদ ধ্বংস করে নি বা পৃথিবী থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্নও করে নি!

ইয়াসিন মিয়াকে ব'লে আঘাত দিতে চাই না যে চাচা পৃথিবীটা ঈশ্বরের নয়; মগজের ধার এবং পেশিশক্তি বেশি যার, পৃথিবীটাও তার; অতএব এই মসজিদও এখানে টিকে যাবে, এবং ভবিষ্যতে আশপাশে বসতি গ'ড়ে উঠলে জমজমাট ধর্ম ব্যবসাও হবে।

যে লোক মসজিদ নির্মাণ করেছে, সে আর তার ছেলে হয়তো প্রকৃতির নিয়মেই মারা গেছে; হয়তো অসুস্থ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটাকে হিন্দুদের পূজিত বটবৃক্ষের কাছে মসজিদ নির্মাণের শাস্তি হিসেবে দেখেছে, এমনকি মুসলমানরাও! হয়তো যুগে যুগে বিশ্বাসী মানুষদের দ্বারা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে মিথ্ আর তা মুখে মুখে ছড়িয়েছে মানুষের মধ্যে, এক প্রজন্ম থেকে আরে প্রজন্মে!

এখানকার বন্ধ হয়ে যাওয়া টঙ দোকানগুলোর মালিক এবং নৌকার মাঝিরা ছিল দরিদ্র, হয়তো দোকান আর নৌকাই ছিল তাদের রুটিরুজির একমাত্র মাধ্যম। দোকান আর নৌকা

চালানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে নিশ্চয় তারা বিপদে পড়েছিল। তারা কে কোথায় আছে জানি না। জানি কেবল একজনের কথা, পুলিশি হয়রানির সম্ভাবনা আর অল্প রোজগার সত্ত্বেও যে এখনো পেশা পরিবর্তন করে নি। কখনো নৌকায় শুয়ে-ব'সে, আবার কখনোবা ছাতা আর বৈঠা নৌকায় রেখে এসে বটতলার নিচের একটা বাঁধানো বেঁদিতে কিংবা এই পরিত্যক্ত দোকানের চাঙায় ব'সে নৌকাভ্রমণেচ্ছু দর্শনার্থী অথবা প্রেমিক যুগলের জন্য অপেক্ষা করে। মানুষ পেলে গল্প করে, আবার কখনো গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে, 'নদী ভরা ঢেউ বোঝো না তো কেউ, কেন মায়ার তরী বাউ বাউ বাউ রে' অথবা 'নড়ে নড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না, কে কথা কয়রে দেখা দেয় না'। সে কিছু খুঁজে পাক বা না পাক আমি খুঁজে পেয়েছি তাকে। গেল বর্ষার আগের বর্ষায় তার সঙ্গে আমার পরিচয় এখানেই। সেদিন ছিল শ্রাবণের মেঘলা দিন। বর্ষার জল বেড়ে শক্তিসাগর পুকুরের পাড়ের কাছে এসে পড়েছিল। আমি পাড় ধ'রে এগোচ্ছিলাম বটগাছতলার উদ্দেশে, বড় বকফুল গাছটির কাছে আসতেই চোখে পড়ে গাছের শিকড়ে বাঁধা ঢেউয়ের দোলায় দোলায়িত নৌকায় শুয়ে মাথার নিচে দু-হাত রেখে বছর চল্লিশের একজন মানুষ চোখ বুজে গাইছে–
'মুখে মুখে সব মুসলমান কাজের বেলায় ঠনঠনা
শোনো মওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ থাকে না।'

আমি বেশ চমকে যাই! কী দুঃসাহস, সামান্য দূরত্বে মসজিদ-মাদ্রাসা, ওখানকার কেউ শুনতে পেলে একে আস্ত রাখবে! গানটি আমি আগে কখনো শুনি নি, লাইন দুটোর আগে-পরে কি আছে জানি না। কিন্তু সুরে সুরে এক সত্য এবং সাহসী উচ্চারণ শুনে আমি দাঁড়িয়ে যাই তার দিকে তাকিয়ে। বেশ সুরেলা গলা, নিশ্চয় গাওয়ার অভ্যাস আছে। লাইন দুটো দ্বিতীয়বার গাওয়ার সময় সে হঠাৎ চোখ খোলে আর আমার চোখে চোখ পড়তেই গান থামিয়ে ধড়মর ক'রে উঠে বসে, বুঝিবা খানিকটা ভড়কে গিয়ে কিছুটা জড়োসরো হয়েই তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

সে যে কিছুটা ভয় পেয়েছে তা তার চোখ-মুখ দেখেই বুঝি। তাকে আশ্বস্ত করতে মৃদু হেসে বলি, 'ভাই থামলেন কেন? গাইতে থাকুন।'

তবু সে অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা মানুষ বিশ্বাসী হয়ে এসেই তো চালিয়ে দেয় অবিশ্বাসের ছুরি! আমি ধারণা করি লোকটা নিশ্চয় হিন্দু সম্প্রদায়ের, রাস্তার ওপাশের হিন্দুপল্লীতে তার বাড়ি; আমাকে মুসলমান ভেবে ভয় পাচ্ছে। তাকে অভয় দিয়ে বলি, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? আমাকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনার গান ভাল লাগছিল তাই দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।'

তার মুখ কিছুটা উজ্জ্বল হলেও সন্দেহ পুরোপুরি যায় না। জিজ্ঞাসা করি, 'কী নাম আপনার?'

'আফজাল।'

এবার আমার বিস্মিত হবার পালা! মাঝারি গড়নের হালকা-পাতলা একজন মানুষ, মুখে চার-পাঁচদিন না কামানো খোঁচাখোঁচা দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে বহুবার ধোয়া সাদা-মাটা একটা চেক জামা, নৌকার ওপর চিৎ হয়ে দু-হাত মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে গান গাইছে। দেখে মনে হয় না অ্যাকাডেমিক শিক্ষাও খুব বেশিদূর, তবে চোখে-মুখে বুদ্ধিদীপ্তির ছাপ আছে, আছে সারল্যও। এরকম একজন মানুষ অমুসলিম হ'লে তার মুখে 'শোনো মওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লা থাকে না' গানটি বেশি মানাতো এবং স্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু এর নাম যে আফজাল, একে নাস্তিক ভাবা অসম্ভব, নাম শুনে সাধারণভাবে একে মুসলমান ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক! যেখানে এই বয়সের এবং এই শ্রেণির অনেক মুসলমানকে রোজার দিনে টুপি পরা অবস্থায় দেখতেই আমার চোখ অভ্যস্ত, সেখানে রোজার দিনে সে কিনা গাইছে ইসলাম বিরোধী গান! আফজাল সম্পর্কে দারুণ কৌতুহল জাগে আমার।

তাকে আরো সহজ করতে বলি, 'আফজাল ভাই আপনার কণ্ঠটা বেশ সুরেলা আর ভরাট।'
প্রশংসা শুনে তার চোখে-মুখে লাজুক ভাব পরিস্ফুট হলেও ভেতরের সন্দেহ পুরোপুরি দূর না হওয়ায় সে বলে, 'আপনারে তো আগে দেকিনি?'
'আমি প্রত্যেক শুক্রবার সকালে গার্ডেনে হাঁটতে এসে এখানে বসি।'
'ও, আমি আজকাল এট্টু বেলা ক'রে আসি, তাই বোধ হয় আপনারে দেকিনি। বাগানে হাঁটতি আসে একানে যারা বসে তারা প্রায় সকলেই আমার চেনা।'
'আপনি কী করেন?'
'এই যে ভাবের ঘাটের মাঝি!'
নাম জিজ্ঞাসা করলে মোহাম্মদ আফজাল না ব'লে শুধু আফজাল বলে, পেশা জিজ্ঞাসা করলে জানায় ভাবের ঘাটের মাঝি! কোনোটাই সহি ইসলামী উত্তর নয়!
'আপনি আমাকে দেখে ভড়কে গেলেন কেন?'
'ভাবলাম গান শুনে আপনি যদি রাগ করেন। কিছু মনে না করলি এট্টা কতা জিজ্ঞেস করি?'
'হ্যাঁ করেন।'
'আপনি হিন্দু না মোছলমান?'
'আমি মানুষ।'
এবার সে উৎফুল্ল, 'জয়গুরু, এতোদিনে একজন মানুষির দেকা পালাম এই ঘাটে। খালি হিন্দু-মোছনমান দেকতি দেকতি চোখ বড় কিলান্ত!'
আরে, এ যে অন্য মানুষ! রাস্তা-ঘাটে প্রতিনিয়ত যেসব আফজাল-তোফাজ্জল-মোফাজ্জল দেখি এতো তেমন নয়; ভিড়ের ভেতরে থাকলেও এ ভিড়ের লোকজন নয়, মানুষ।
'আফজাল ভাই, আপনি যে গানটি গাইছিলেন, এটা কার লেখা?'
'মাতাল রাজ্জাক দেওয়ানের লেখা।'

মাতাল রাজ্জাক দেওয়ানের গান আমি শুনেছি। বাংলাদেশে খুব কম মানুষই আছে যারা তার লেখা গান শোনে নি! রেডিও, টেলিভিশনে, মাইকে, হাট-বাজারের দোকানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে; ঢাকা শহর থেকে শুরু ক'রে আঁজো পাড়াগাঁয়েও শুনতে পাওয়া যায় তার লেখা 'আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিলো গো মরার কোকিলে' গানটি। অধিকাংশ মানুষই হয়তো জানে না এই গানের গীতিকার কে, মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান নামটি মানুষের কাছে না পৌঁছালেও তার গান ঠিকই পৌঁছে গেছে। গানের এই এক দারুণ শক্তি! এ সময়ের শিল্পীরা রেডিও-টেলিভিশনে কিংবা মঞ্চে এই গানটি গাইতে গাইতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে! কিন্তু এরা কখনোই গায় না 'শোনো মওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না' গানটি!' গাইলে শিল্পী যেমনি অসুবিধায় পড়বে, তেমনি টিকে থাকার সংকটে পড়বে ওই রেডিও বা টেলিভিশনও। ফলে রেডিও-টেলিভিশনে খণ্ডিত মাতাল রাজ্জাকের চর্চা হয়, যেমন হয় খণ্ডিত নজরুল কিংবা বেগম রোকেয়ার চর্চা। ভবিষ্যতে হয়তোবা তসলিমা নাসরিনের গায়েও মুসলমান ট্যাগ লাগিয়ে তার সাহিত্যের খণ্ডাংশের চর্চা করা হবে! তথাকথিত মডারেট বাঙালী মুসলমান সমাজে ইসলামের প্রকৃত এবং নির্মম সত্যের ওপর সমকালীন সমাজ-সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যায় সততার একটা আবরণ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়; একটা মিথ্যা বা ভুল ইতিহাসকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কারার চেষ্টা, চর্চা ও প্রচার করা হয়; এর অসংখ্য প্রমাণ আছে। আমার বড় আপু কমার্সের ছাত্রী ছিল। ক্লাস নাইনের 'ব্যবসায় শিক্ষা' বইয়ে টাঙ্গাইলের দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল। বড়আপু যখন জোরে জোরে রণদাপ্রসাদ সাহার জীবনী পড়তো তখন আমরাও শুনতে পেতাম। আমার ছোট মনেও দারুণ প্রভাব ফেলেছিল সেই গল্প; কয়লা বিক্রি ক'রে জীবন শুরু করা ছেলেটির একদিন ধনপতি হয়ে ওঠা, তারপর সমাজসেবা করা, বিভিন্ন দাতব্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা আর একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তার করুণ মৃত্যু। রণদাপ্রসাদ নামক অদেখা মানুষটির প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধা জন্মায় তখনই, মনে হয় বড় হয়ে যদি আমিও এমন হতে পারতাম! বড় আপুর পড়া শুনে বালকসুলভ কৌতুহল থেকেই একদিন চাচাকে রণদাপ্রসাদ সাহা সম্পর্কে এটা-ওটা প্রশ্ন করি। দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার পর চাচা বলেন, 'রণদাপ্রসাদ তো হিন্দু, রণদাপ্রসাদের চেয়েও বড় একজন মুসলমান দানবীর ছিলেন; তার নাম হাতেম তাই, দানবীর হাতেম তাই।' তারপর চাচা দানবীর হাতেম তাইয়ের গল্প শোনান আমাকে, পরে বইয়ে আমিও হাতেম তাইয়ের গল্প পড়েছি। আমি আরো বেশ কয়েকজনকে গদগদ হয়ে হাতেম তাইয়ের কথা বলতে শুনেছি। হাতেম তাই আজ মুসলমানদের গর্ব, বাংলাদেশের মুসলমান আজ বুক ফুলিয়ে একজন মুসলমান হাতেম তাইয়ের গল্প বলে; কিন্তু তারা এই সত্যটা বলে না যে স্বয়ং মুহাম্মদ হাতেম তাইয়ের গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ ক'রে তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করেন আর জোরপূর্বক হাতেমের সন্তানদেরকে ধর্মান্তরিত ক'রে মুসলমান বানান।

আমি আফজাল ভাইকে অনুরোধ করি, 'আপনি পুরো গানটা গেয়ে শোনাবেন?'

'শোনাবোনা ক্যান! আসেন, নৌকায় উঠে আসেন।'

আমি কেড্স খুলতে গেলে সে বলে, 'জুতো খুলতি হবিনানে, অমনেই আসেন।'

নৌকায় উঠতে উঠতে বলি, 'আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়?'

'কুষ্টিয়া।'
'আপনি তো লালনের পড়শি!'
খুশির রোদ ঝিলিক দিয়ে উঠে তার চোখে-মুখে, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে সাঁইজির পূণ্যভূমিতে জন্ম নিতি পারিছি।' বলেই দু-হাত এক ক'রে বুঝিবা লালনের উদ্দেশে প্রণাম করে, 'সব সাঁইয়ের কৃপা, জয়গুরু।'
'আপনি লালন ফকিরের আখড়ায় গেছেন?'
'কতো! দিন-রাত প'ড়ে থাকিছি, একনো যাই মাঝে মাঝে।'
'শোনান দেখি গানটা।'
আফজাল ভাই মসজিদ-মাদ্রাসার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, তারপর জানতে চায়, 'ভাইডির হাতে কী সময় আছে?'
'হ্যাঁ, অফুরন্ত। কেন?'
'তালি চলেন নৌকা নিয়ে দূরি যাই। আমি তো একা একা গুনগুন ক'রে গাচ্ছিলাম, গলা খুলে গান না গালি না গায়ে জুত পাওয়া যায়, না শুনে মর্ম বুজা যায়! কিন্তু গলা খুলে যে গাব, ওই দ্যাহেন না...শুনলি ঘাড়ের ওপর এট্টা কোপ মারবিনি, দ্যাশগাঁয়ে যা শুরু অয়চে!'
চোখের ইশারায় মসজিদ-মাদ্রাসা দেখায় সে। বলি, 'আপনার তো ক্ষতি হবে, এর মধ্যে যদি খ্যাপ মিস হয়ে যায়?'

বাতাসের মুখের বকফুলের শুকনো পাতার মতো সে উড়িয়ে দেয় আমার কথা, 'ধুর! আফজাল ভাবের ঘাটের মাঝি ভাইডি, ওই খ্যাপখুপ নিয়ে ভাবিত নয়। জীবনের সবচেয়ে বড় খ্যাপই তো মানুষসঙ্গ; কিন্তু জানেন ভাইডি, আমরা নিত্যদিন লোভ-লালসার এতো ক্ষ্যাপ মারি যে জীবনের আসল খ্যাপ মারতি-ই ভুলে যাই! সাঁইজি বলেছেন-মানুষ ছেড়ে খ্যাপা রে তুই মূল হারবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।'

মানুষসঙ্গ, মন্দ বলে নি তো! আমাদের নাগরিক জীবনে মানুষসঙ্গের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে, নাগরিক জীবনে এখন রমরমা চলছে অঙ্গসঙ্গ আর মেকি সৌজন্য! বুঝি যে আফজাল ভাই আবেগ-ভাবাবেগে ভরপুর অন্য এক মানুষ। বকফুল গাছের শিকড় থেকে নৌকার শিকল খুলে সে বৈঠা চালায় জলের বুকে।
একটা খালি কার্গো লঞ্চ পেট ভরার উদ্দেশে আমাদের সামনে দিয়ে চ'লে যায় গাবতলীর দিকে। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি আফজাল ভাইয়ের মুখে, 'এখন তো এদিকটায় মানুষ আসা কমে গেছে, আয়-রোজগারও নিশ্চয় কমে গেছে, অসুবিধা হয় না?'
'দুনিয়াডাই তো এট্টা অসুবিধার জায়গা! তয় যার চালানোর সেই-ই চালায়।'

আমি মনে মনে ভাবি উপরওয়ালার কথা বলছে, বেশিরভাগ মানুষই যেমন বলে। পরমুহূর্তেই খোলাসা হয় তার কথায়, 'বউ-ই সংসার চালায়, বাড়িতে দর্জির কাজ করে সে। আমার আয়ে সংসারের কিছুই অয় না।'

আফজাল ভাইয়ের কিছু বাক্য এরই মধ্যে আমার ভেতরে নাড়া দিয়েছে–'ভাবের ঘাটের মাঝি', 'জীবনের সবচেয়ে বড় খ্যাপই তো মানুষসঙ্গ', 'দুনিয়াডাই তো এট্টা অসুবিধার জায়গা'। বাক্যগুলোর মধ্যে একটা বৃহত্তর ব্যাপার আছে।

আমরা তুরাগ পেরিয়ে জলে ভাসা মাঠটাতে পৌঁছে যাই। মাঠে অথৈ জল। শুকনো মৌসুমে জল নেমে গেলে এখানে ধান চাষ করা হয়। আরো কিছুদূর যাবার পর আফজাল ভাই বৈঠা রেখে নৌকার জল সেচার জন্য রাখা গামলাটা হাতে নিয়ে পাঁটাতনে এসে বসে। তারপর গামলায় আঙুল ঠুকে গাইতে শুরু করে–

আলেম গেছে জালেম হইয়া, কোরান পড়ে চণ্ডালে,
সতী-সাধুর ভাত জোটে না, সোনার হার বেশ্যার গলে।
মুখে মুখে সব মোসলমান কাজের বেলায় ঠনঠনা
শোনো মাওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না।

যদি মক্কায় গেলে খোদা মিলতো নবী মিলতো মদিনায়,
দেশে ফিরে কেউ আইতো না হজ করিতে যারা যায়।
কেউ যায় টাকা গরমেনে, কেউ যায় দেশ ভ্রমণে,
ধনী যায় ধনের টানে আনিতে সোনাদানা
ওরে মাওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না।

হজ করিতে মক্কায় গিয়া খরচ করলি যে টাকা
বলি, এই টাকা গরীবরে দিলে গরীব আর থাকে কেঠা?
তোর ঘরের ধন খায় পরে, দেশের লোক না খাইয়া মরে,
সত্য কথা বললে পরে দেশে থাকতে পারি না।
ওরে মাওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না।

দ্বীনহীন রাজ্জাকে বলে, মানুষে মানুষ রতন
বলি, এই মানুষকে ভালোবাসো বেঁচে আছো যতোক্ষণ।
মানুষ চিনতে করিস ভুল তবে হারাবি দুই কূল
ওরে মূল কাটিয়া জল ঢালিলে ঐ গাছে ফুল ফোটে না
শোনো মাওলানা, মসজিদ ঘরে আল্লাহ্ থাকে না।

আফজাল ভাইয়ের মুখে গানটির মাঝখানের দুটো লাইন শুনে আমার ভেতরে যে আশার ফুল ফুটেছিল, গানটির প্রথম দুই লাইন শোনার পরই আশার সে ফুলটি মলিন হয়ে যায়! এক কলসি দুধের মধ্যে দুই ফোঁটা চনা পড়লে পুরো কলসির দুধ যেমনি নষ্ট হয়ে যায়, প্রথম

দুটো লাইনও তেমনি পুরো গানটিকে নষ্ট করেছে, জোরালো ও সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যকে খাটো করেছে। গানটি মানবতাকে জয় করতে পারে নি, মানবতার কথা বলতে গিয়েও পুরনো চিন্তার বাঁকেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। 'মানুষ চিনতে করিস ভুল তবে হারাবি দুই কূল' এই লাইনটি দ্বারা লোককবি মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান যা বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সাথেও একমত নই। কিন্তু এই লাইনটা গানটিকে কলঙ্কিত করে নি, যেটা করেছে প্রথম দুই লাইন। তবে আফজাল ভাই গানটি গেয়েছে ভাল। তার গায়কীর প্রশংসা ক'রে বলি, 'আপনি দারুণ গেয়েছেন আফজাল ভাই। কিন্তু গানটির দুটো লাইন আমাকে খুব আশাহত করেছে।'

প্রথম বাক্য শোনার পর তার মুখে যে রোদের আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয় বাক্য শোনার পর তা ছায়াময় হয়ে যায়, 'ক্যান? গানে তো সত্য কতাই বলেছে।'
'হ্যাঁ মসজিদ, মক্কা, হজ, খোদা এসব নিয়ে যা বলেছে; তা সত্য। কিন্তু প্রথম লাইনে বলেছে, "আলেম গেছে জালেম হইয়া, কোরান পড়ে চণ্ডালে"। এখানে চণ্ডাল শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে খারাপ অর্থে। তাতে চণ্ডালদেরকে হেয় করা হয়েছে, জাত্যাভিমান ফুটে উঠেছে। যতো মূল্যবান বা যে গ্রন্থই হোক তা পড়ার অধিকার পৃথিবীর সকল মানুষেরই আছে; হোক সে চণ্ডাল, মুচি, মেথর। আবার দ্বিতীয় লাইনে বলেছে, "সতী-সাধুর ভাত জোটে না, সোনার হার বেশ্যার গলে।" এখানেও বেশ্যা শব্দটি খারাপ বা মন্দ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ছোট করা হয়েছে দেহোপজীবিনীদেরকে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ দেহোপজীবিনী পরিস্থিতিরি চাপে প'ড়ে দুটো খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকার জন্য অথবা পুরুষের প্রতারণার শিকার হয়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়; তার দেহ বিক্রি করার জন্য দায়ী আমাদের এই সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ। আর দেহ বিক্রি করে বলেই যে সে মানুষ হিসেবে খারাপ তা নাও হতে পারে। সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষের মধ্যেও যেমনি ভাল-মন্দ আছে, তেমনি এদের মধ্যেও তাই। তাই সমাজের আর পাঁচটা পেশার নারীদের মতোই সমাজ এবং রাষ্ট্রের সব কিছুতে এদেরও সামান অধিকার আছে। কিন্তু মাতাল রাজ্জাক দেহোপজীবিনীদের অধিকাররের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, অসম্মান করেছেন তাদেরকে। চণ্ডাল এবং দেহোপজীবিনীদেরকে তিনি নিচু স্তরের খারাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমি কী ভুল বললাম আফজাল ভাই?'
আফজাল ভাই কয়েক মুহূর্ত দম ধ'রে থেকে বলে, 'কতা সত্যি, আপনি ঠিকই বলিছেন। এমন ক'রে তো ভাবি নাই।'

মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান একজন স্বশিক্ষিত লোক কবি-শিল্পী। অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। একাত্তরে দেশপ্রেমের গান লিখেছেন, বেহালা বাজিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। তিনি লেখাপড়া বেশি না জানলেনও গভীর নিমগ্নতায় পড়েছেন সমাজ, সমাজের বিশালতা-ক্ষুদ্রতা; সমাজের মানুষের উদারতা, ভণ্ডামী, বৈষম্য, কপট ধর্মপরায়ণতা ইত্যাদি। তার লেখায় এসব বাস্তবচিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু সচেতন

শিক্ষার অভাবে হোক বা তার অসচেতনতার কারণেই হোক সমাজের কিছু গোঁড়ামি এবং সংস্কার থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি, বরং তা তিনি লালন করেছেন। ফলে একজন প্রতিবাদী-মানবতাবাদী লোককবি হয়েও সমাজের আর পাঁচজন আটপৌরে সংকীর্ণমনা মানুষের মতোই চণ্ডাল এবং দেহোপজীবিনীদেরকে খারাপ ভাবতে এবং তাদেরকে ঘৃণা করতে শিখেছেন। আবার 'কোরান পড়ে চণ্ডালে' এই বাক্যটির মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে আর পাঁচজন ধার্মিক মুসলমানের মতো তিনিও কোরানকে উচ্চমার্গের ধর্মগ্রন্থই মনে করেন, ফলে বাক্যটির মধ্যে তার আক্ষেপও ধরা পড়ে। আমার ধারণা তিনি কখনোই কোরান পড়েন নি অথবা পড়লেও ভাসা ভাসা, কোরান সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি তার ছিল না। তিনি যদি গভীরভাবে কোরান পড়তেন তাহলে হয় তিনি ধার্মিক হয়ে যেতেন এবং ওই গানটি তো বটেই ইসলামী গান ব্যতিত অন্য কোনো গানই লিখতেন না, আর না হয় তিনি কোরানকে ঘৃণা করতেন। কেবল তিনি নন, অনেক লোককবি, বাউল-ফকিরদের মধ্যেই এই ধরনের বিভ্রান্তি আছে।

নৌকা স্রোতের টানে একাই ভেসে যায়, জমে ওঠে আমাদের আড্ডাও। আফজাল ভাইকে বলি, 'আফজাল ভাই, আপনার কথা শুনে বুঝেছি মুসলমান পরিচয়ের চাইতে মানুষ পরিচয়ই আপনার কাছে মূখ্য; তবু আপনার ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ে জানতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।'
'না না, কি মনে করবো? আপনি বলেন কী জানতি চান।'
'আপনি কী নামাজ পড়েন?'
'না।'
'ঈদের নামাজও না?
'না।'
'বাড়িতে ঈদ পালন করেন না?'
'আগে করতাম, একন আর করি না।'
'ভাবী?'
'সেও তো আমারই মতো। আমরা হলাম গিরিহী বাউল। লতা দুডোর জন্যেই একজাগা প'ড়ে থাহে সংসার করতিছি।'
'লতা মানে?'
'ও, আপনি তো আবার এসব কতা বোজবেন না, বাউল-ফকিরি ভাষায় লতা মানে সন্তান। লতা দুডে বড় হলি ওগের বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার ওগের হাতে বুজায়ে দিয়ে আমরা বুড়ো-বুড়ি গুরুর আখড়ায় চ'লে যাব, ভজন-সাধনে মন দেব।'
'আমার গুরুর আখড়া কোথায়?'
'মেহেরপুর।'
'আচ্ছা, আপনি কি কোরান-হাদিস এগুলো বিশ্বাস করেন?'

'আমরা তো শরিয়তী জীবন-যাপন করিনে, মওলানাগের মতো দ্যাকনদারি ধর্মকর্মেও আমাগের আস্থা নাই। নামাজ বলেন আর রোজা, গানই আমাগের সব। তয় ছোটবেলার তে কোরান-হাদিসের প্রতি সব মুসলমান সন্তানের যেমন ভক্তিছোদ্ধা থাকে, আমারও তেমন ছিল। আপনারে খুলেই কই ঘটনাডা। বছর দুই আগে, ওই যেদিন মতিঝিল শাপলা চত্বরের দখল নিছিল হেফাজতে ইসলাম। তার ভিতরে আমি শনির আখড়ায় ভায়রার বাসায় যায়ে আটকা পড়ে গেলাম। মতিঝিল-পল্টন এলাকা তকন রণক্ষেত্তর। তার ভিতরে শালী আমারে কোনোভাবইে ছাড়লো না, বউও ফোন ক'রে আসতি নিষেধ করলো, তো থাকলাম আর টিভিতি দ্যাকলাম ওগের তাণ্ডব; আট থেইকে আশি, সব বয়সের মুছল্লিরা ভাঙচুর করতিছে, আগুন দেচ্ছে, কী না করতিছে; কী যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়ছে তা নিশ্চয় আপনি দেকিছেন, নতুন ক'রে আর কী কব!'

আমি আফজাল ভাইয়ের চোখের ভেতর দেখতে পাই মতিঝিল, পল্টন, বিজয়নগর, শান্তিনগর, বংশাল, গুলিস্থান, ফুলবাড়িয়াসহ আরো কিছু এলাকায় হেফাজতে ইসলামের উন্মত্ত হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আট-দশ ঘণ্টাব্যাপী সেই তাণ্ডব; যা ঘটানো হয় নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তি এবং ধর্ম অবমাননাকারীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাসসহ ১৩ দফা দাবিতে আল্লামা শফির ডাকে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালনের নামে। সারা দেশের কওমি মাদ্রাসা থেকে তাদেরকে একত্রিত করা হয়। 'আল্লাহু আকবর' স্লোগানে মুখরিত ক'রে তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোয় মতিঝিলের দিকে, ককটেল-হাতবোমা ফাটায়, বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল ছোড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে; মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত আল্লাহ্'র জিহাদীরা পুলিশের জলকামান, টিয়ার গ্যাসের শেল কিংবা রাবার বুলেটকেও পরোয়া করে না; তারা তো জীবন দিতেও প্রস্তুত; তারা জেনেছে মরলে শহীদ, নিশ্চিত বেহেশ্‌ত; আর বেহেশ্‌ত মানেই তো বাহাত্তর হুরি, বালক গেলমান, মদের নহর, চাওয়ামাত্র ফলফলাদি আরো কতো কী! ইসলামের জন্য জিহাদ করতে করতে জীবন দেওয়ার চেয়ে পবিত্র কাজ একজন মুসলমানের জন্য আর কী হতে পারে! জিহাদে মৃত্যু মানেই বেহেশ্‌ত, এমন সুযোগও তো আর সচরাচর মেলে না। বেহেশ্‌তের নেশা তাদের রক্তের মধ্যে চলকে ওঠে, মরণের নেশা তাদের মগজের মধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝলকায়, ধ্বংসের নেশায় তারা হিংস্র-উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হাতের লাঠি এবং বাঁশ দিয়ে তারা শতশত যানবাহন ভাঙচুর করে, বায়তুল মোকাররম মার্কেটসহ বিভিন্ন মার্কেটে হামলা চালিয়ে দোকানপাট ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে; বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির অফিস মুক্তিভবন, ট্রাফিক পুলিশের কার্যালয়সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে; গাড়ি-মোটর সাইকেল পোড়ায়, ফুটপাতের রেলিং-ডিভাইডার ভাঙে, ঢিল ছুড়ে বিভিন্ন ভবনের গ্লাস ভাঙে, ফুটপাতের হকারদের শত শত দোকানের মালামাল আর তাদের বেঞ্চ-টুল-টেবিল-চৌকি রাস্তায় এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়; সমগ্র এলাকার বিভিন্ন রাস্তা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে, রাতের অন্ধকার পালিয়ে যায় আগুনের লেলিহান শিখায়। নারী সাংবাদিকসহ অনেক সাংবাদিককে বেধরক পিটিয়ে তাদের ক্যামেরা ভাঙচুর

করে, তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না ডিভাইডারের গাছ এবং ল্যাম্পপোস্টও। যেন ইসলাম রক্ষার এক মহাযুদ্ধ! ভীত মানুষ ঘরে অবরুদ্ধ, জনজীবন বিপর্যস্ত; আমরা তো নয়ই, আমাদের আগের প্রজন্মও বোধ হয় ১৯৭১ ব্যতিত ঢাকায় এমন তাণ্ডব কখনো দ্যাখে নি।

আফজাল ভাই বলেই চলে, 'পরদিন ভোররাতেই তো র‍্যাব-পুলিশের লোকেরা হায়েনাগুলোরে শাপলা চত্ত্বর থেকে তাড়ায়ে দিলো। তারপর বেলা নয়টার দিক আমি ভায়রার বাসার থেকে রওনা দিলাম। মতিঝিল দিয়ে বাস তখনও ঢুকতি পারতিছে না। আমি রাজধানী সুপার মার্কেটের কাছে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। মনে হলো রাস্তা তো না যেন যুদ্ধ শ্যাষের কারবালা! রাস্তাভরা খালি ইট-পাটকেল, আগুনে পুড়া-ভাঙচুর করা ফুটপাতের দুকানপাট; পুড়া কাপড়-চোপড়, বইপুস্তক, পুড়া বাঁশ-কাঠ, পুড়া মোটর সাইকেল, বিল্ডিং আর গাড়ির ভাঙা কাঁচ, ভুর ভুরি ছাই, কী নেই সেকানে! অবলা গাছও ওগের হাত থকে রেহাই পায় নি, কিছু গাছ কাটেছে আর কিছু উপড়ায়ে ফ্যালেছে।'

আফজাল ভাইয়ের এই কথায় আমার মনে পড়ে মুহাম্মদ এবং তার শিষ্যদের দ্বারা মদিনার ইহুদি বানু নাদির গোত্রকে অবরোধের কথা। মুহাম্মদ এবং তার জিহাদী বাহিনী বানু নাদির গোত্রের বসতি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে, এরপর তারা পামগাছ কেটে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অন্য কোনো উপায় না থাকায় শেষ পর্যন্ত বানু নাদির গোত্র নির্বাসনে যাবার শর্তে মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পন করে এবং নির্বাসনে চ'লে যায়। মুহাম্মদ তাদের ফেলে যাওয়া ধনসম্পদ নিজে এবং জিহাদীদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেন।

আফজাল ভাই বলতেই থাকে, 'বাইতুল মোকাররম মসজিদের কাছে এসে সর্বস্ব হারানো ফুটপাতের দুকাদারগের বুক চাপড়ায়ে কান্দা দেকে চোখ ফাটে পানি চ'লে আসলো আমার। হায়রে মোছলমান! মোছলমান-মোছলমান নাকি ভাই ভাই, কোনো ভাই নাকি ভাইয়ের দুকান অমনে পুড়াতি পারে! আমি দেকি আর তাজ্জব ব'নে যাই; দুকানদাররা পুড়া-আধপুড়া কাপড়-চোপড়, বই-পুস্তক, নানারকম জিনিসপত্তর দুই হাতে তুলে মানষিরে দেকাতিছে আর হাউমাউ ক'রে কাঁনতিছে। ভাইডি, আর এরপর যা দ্যাকলাম তা আমি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নাই! দেকি কি পুড়া-আধপুড়া কুরান-হাদিসসহ নানান রকম ধর্মীয় বইপুস্তক! বুকের মইদ্যে য্যান ঘা লাগলো! এক দুকানদার আগুনে পুড়া কুরান-হাদিসের পাতা নিয়ে আহাজারি করতিছে আর মানুষরে দেকাতিছে, সাংবাদিকগের দেকাতিছে। আমার মুখি আর কোনো কতা নেই, আমি তাকায়ে দেকি কুরান-হাদিসের পুড়া পাতার আরবি অক্ষর; দেকি আর ভাবি এরা কেমন মোছলমান যে নিজেগের ধর্মগ্রন্থও আগুনে পুড়ায়ে ছাই ক'রে দেয়! আমি কয়ডা পুড়া পাতা উল্টায়ে-পাল্টায়ে দেকি, তারপর ছাইয়ের গাদার মইদ্যে একখান কুরান পালাম, ওপরের মলাট আর দুই-তিন পাতা মাত্র পুড়িছে। ছাই-টাই ঝাড়ে-ঝুড়ে কুরানখান আর অর্ধেক পুড়া একখান সহি বোখারী শরীফ নিয়ে আসলাম। ভাবলাম, জীবনে তো টাকা দিয়ে কিনে কুরান-হাদিস পড়ি নাই, ফাউ পায়ে এট্টু প'ড়ে দেকি। কুরান-হাদিস দুইখান

লালসালুতে মুড়াইয়ে যত্ন ক'রে রাকে দিলাম ঘরে। মাঝে-মইদ্যে পাতা উল্টায়ে-পাল্টায়ে পড়তাম। ভাইডি বললি বিশ্বেস করবেন না, একদিন রাত্তিরি কিছু আয়াত পড়ার পর আমার কান দিয়ে য্যান ধুমো বাইর হতি লাগলো! নিজেরে বিশ্বাস করাতিই আমার কষ্ট হতিছিল যে এসব কতা কি কুরানে লেকা! কোনো ধর্মগ্রন্থে কি এসব কতা লেকা থাকতি পারে! সেই রাত্তিরি আমি ঘুমালাম না, খালি পড়তিই লাগলাম আর পড়তিই লাগলাম। হাদিসের কিছু পাতাও প'ড়ে দ্যাকলাম। কি সব ভয়ংকর কতা; আল্লাহ্ ইসলামে অবিশ্বাসীগেরে ঘাড়ের ওপর কোপ মারতি বলছে, অবিশ্বাসীগের ধনসম্পদ আর নারী লুঠ করতি বলছে! এমন ধারার আরো কতো কতা লেকা! অস্বীকের করবো না যে কিছু ভাল কতাও লেকা নাই না, কিন্তু কি করবো আমি অমন ভাল কতা দিয়ে যদি আপনি মানুষ হয়ে নির্দোষী মানুষরে মারতি কন, ধন-সম্পদ-নারী লুঠ করতি কন! রাত অর্ধেকের বেশি পার হলি এট্টুখানি চোখ বুজলাম, তারপর ভোরবেলায় উঠে কাউরে কিছু না ব'লে লালসালু মুড়ানো কুরান আর হাদিসখান নিয়ে ঘরের থেকে বাইর হলাম। ঘাটে আসে নৌকা খুলে মাঝনদীতে আসলাম, তারপর কুরান-হাদিস ছুড়ে দিলাম নদীর পানিতে। য্যান বুক থেকে একটা পাথর নামায়ে হাঁফ ছাড়ে বাঁচলাম, দরকার নাই আমার অমন ধর্মগ্রন্থ, যে ধর্মগ্রন্থ মানুষ খুন করতি বলে! ঘরে কুরান-হাদিস রাখে আমি তো মরেও শান্তি পাতাম না, ছাওয়ালদুডো যদি ওই কুরান-হাদিস প'ড়ে খুনোখুনি শেখে! গান-বাজনা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে আছি বাইডি, তাই নিয়েই থাকতি চাই। উপরওয়ালা থাকলি আছে, না থাকলি নাই। কারো দুই পয়সা মারে খাই নাই, চুরি-চামারি করি নাই, কারো গলায় ছুরিও ধরি নাই; মরার পর যা হয় হবি, আমার মরণ ব'লে কোনো ভয়-ডরও নাই।'

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি আফজাল ভাইয়ের দিকে, তার লেখাপড়া বেশি নয়, আধ্যত্মিক চিন্তা-ভাবনার মানুষ; কিন্তু কোরান-হাদিসের সহজ কথাটা সে সহজভাবেই বুঝেছে যা আমাদের তথাকথিত দেশ-বিদেশের ডিগ্রিধারী শিক্ষিতরাও বুঝতে পারে না কিংবা বুঝেও বুঝতে চায় না!

শ্রাবণের আকাশভরা মেঘ, জলের বুকে মেঘের চঞ্চল প্রতিবিম্ব; নৌকায় বসা আমরা স্রোতের বাইরের দুটি মানুষ, ভেসে চলেছি ভাটির দিকে। আধ্যাত্মিকতা আমার পথ নয়, আবার নাস্তিকতার পথও আফজাল ভাইয়ের নয়; তবু আমার মনে হয় যে আমরা কেউ কাউকে শারীরিক এবং মানসিক পীড়ন না ক'রে একই নৌকায় এভাবে পাড়ি দিতে পারবো মহাকালের অনন্ত পথ, চলতে চলতে জলের বুকে একটা ঢ্যাপ পেলেও দু'জনে ভাগ ক'রে খেতে পারবো।

শ্রাবণের সেই মেঘলা দিনটি থেকেই আফজাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার সখ্যতার শুরু, এরপর বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় হয়েছে, হয়েছে গভীর নৈকট্য। আপনির ব্যবধান ঘুচিয়ে আমরা একে অপরকে তুমি সম্বোধন করি। প্রায় প্রতি শুক্রবারেই আফজাল ভাইয়ের সঙ্গে এখানে কিছুক্ষণ

আড্ডা দিই, নাস্তা করি, আবার আড্ডা দিই; তারপর বাসায় ফিরি। আর এখন কেবল আমার সঙ্গেই নয়; শাশ্বতীদি, পরাগদা এবং আবিরের সঙ্গেও আফজাল ভাইয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ তৈরি সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে।

বেড়িবাঁধের ওপাশে আফজাল ভাইয়ের বাড়িতে আমি তিনবার গিয়েছি; প্রথমবার একা, দ্বিতীয়বার আবিরের সঙ্গে, তৃতীয়বার শাশ্বতীদি-পরাগদা-আবিরের সঙ্গে।

শ্বশুরবাড়ি হলেও ওটাই এখন তার নিজের বাড়ি; দুই কাঠা জমির ওপর ইটের গাঁথুনি দেওয়া টিনের দুটো ঘর, আরেকটা ছাপড়া; মাঝখানে এক চিলতে উঠোন। আফজাল ভাইয়ের শ্বশুর নেই, শাশুড়ি আছেন, তাদের সাথেই থাকেন। শ্বশুরের দুই মেয়ে; একজন তার স্ত্রী, আরেকজন বরের সাথে থাকে শনির আখড়ায়; মাসে এক-দুবার আসে বেড়াতে।

প্রথমবার বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তের স্মৃতিটা দারুণ! আফজাল ভাইয়ের ছয় বছর বয়সী বড় ছেলে স্কুল থেকে ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্যান্ট খুলছিল, পাশেই ছিল সবে হাঁটতে এবং আধো আধো কথা বলতে শেখা ছোট ছেলে, সে বড় ভাইকে ন্যাংটা দেখে দু-পা এগিয়ে টপ ক'রে টাকি মাছ ধরার মতো বড় ভাইয়ের শিশ্ন ধ'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করতে বলে, 'নুনু...নুনু...বাই নুনু...!'

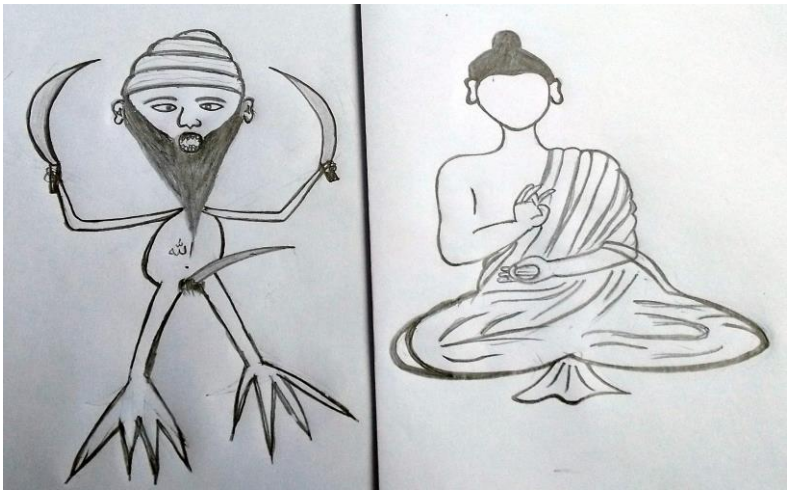
বিয়ের আগে আফজাল ভাই ছিল কুষ্টিয়ায় তার নিজের বাড়িতে, সেখানেও সে নৌকা চালাতো গড়াই নদীতে। আয়-রোজগার মন্দ হতো না। তখন থেকেই তার যাতায়াত লালনের আখড়ায়, নানান জায়গা থেকে আগত বাউল-ফকিরদের সঙ্গে তখন থেকেই তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রায়ই তার রাত ভোর হতো আখড়ায়, সন্ধের আগে ঘাটে নৌকা বেঁধে ছুটতো আখড়ায়, কলকেয় টান দিয়ে বাউল-ফকিরদের সঙ্গে গান গাইতো, গভীররাতে ওখানেই ঘুমে এলিয়ে পড়তো। সকালে দু-হাতে রক্তচক্ষু ডলতে ডলতে ফিরতো ঘাটে। আফজাল ভাইয়ের ভাষায়, 'সে কী সুখের দিন ছিল ভাইডি, তা তুমারে ব'লে বুজাতি পারবো না!'

আফজাল ভাইয়ের এই সুখে ছেদ পড়ে তখন, যখন গড়াই নদীতে ব্রিজ হয়। ব্রিজ হওয়ার পর খেয়া নৌকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর বেকার আফজাল ভাইয়ের প্রয়োজন হয় অন্য কোনো কাজ জুটিয়ে দুটো খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকার। এলাকার পরিচিত একজন আফজাল ভাইকে ঢাকায় এনে ঢুকিয়ে দেয় মিরপুরের মাজার রোডের একটা স'মিলে কাঠ চেড়াইয়ের কাজে। খোলা হাওয়া গায়ে মেখে গড়াই নদীতে স্বাধীনভাবে নৌকা চালানো আফজাল ভাই হঠাৎ যেন বদ্ধ কুঠুরিতে ঢুকে পড়ে! খেয়াঘাটে রোজ কতো মানুষ দেখতে পেতো সে, কতো মানুষের সাথে পরিচয় হতো, বৈঠা বাইতে বাইতে সে মানুষের কথায় কান পাততো, বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কথা, দূর-দূরান্তের কতো অদেখা মানুষের খবরও জানতে পারতো মানুষের মাধ্যমে, প্রতিদিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ভরপুর হতো তার জীবন! সেই মানুষ এসে পড়ে

ঢাকা শহরের এক স'মিলে, কাঠ চেড়াইয়ের মতো ভীষণ শ্রমসাধ্য কাজে। রাস্তা দিয়ে কতো মানুষ আসতো-যেতো, কিন্তু তাদের দিকে তাকানোর ফুসরত তার কোথায়! খেয়াঘাটের মতো না সে তাদের কথা শুনতে পেতো, না পারতো বলতে। ভেতরটা ছটফটিয়ে মরতো। সন্ধ্যার দিকে কখনো-সখনো সময় পেলেই সে শাহ আলির মাজারে যেতো, মাজারে ব'সে ব'সে মানুষ দেখতো, আগ বাড়িয়ে কথা বলতো তাদের সঙ্গে, মনে পড়তো লালনের মাজারের কথা, এ মাজার লালনের মাজারের মতো তার প্রাণের ক্ষুধা মিটাতে না পারলেও এসে ব'সে থাকতো মানুষের সঙ্গ পাবার লোভে; আবার সময় পেলেই চ'লে যেতো তুরাগের দিকে, তুরাগকে দেখে গড়াইয়ের কথা মনে প'ড়ে জল আসতো চোখে।

শিলাভাবী বিয়ের আগে বেড়িবাঁধ থেকে লেগুনায় উঠে স'মিলের সামনে নেমে গার্মেন্টেসে কাজ করতে যেতো। হঠাৎ বাবা মারা যাবার পর তাকে গার্মেন্টস এ কাজ নিতে হয়েছিল। শিলাভাবীকে রোজ দেখতে দেখতেই ভাল লেগে যায় আফজাল ভাইয়ের; প্রথমে প্রস্তাব, তারপর প্রত্যাখান এবং শেষ পর্যন্ত প্রণয়; চিরায়ত পন্থাতেই তাদের পরিণয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আফজাল ভাই স'মিলের কাজ ছেড়ে নৌকা চালানো শুরু করে, তখন নৌকা চালিয়ে ভাল রোজগার হতো তার। আর প্রথম সন্তান পেটে আসার পর শিলাভাবীও গার্মেন্টস এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে নিজে দর্জির কাজ করতে শুরু করে।

এখন দু'জন থেকে চারজন হয়েছে, সংসারের খরচ বেড়েছে; সংসারে বিলাসিতা না থাক, সুখের অভাব নেই। আফজাল ভাইয়ের সকল উদাসীনতা-উন্নাসিকতা শিলাভাবী ভালবেসে মেনে নিয়েছে! শুধু কি মেনে নিয়েছে? সে নিজেও ডুবেছে তার ভাবসলিলে!
আফজাল ভাইকে ফোন দিই, 'আফজাল ভাই কোথায় তুমি?'
'ভাইডি, তুমি আসে পড়িছ?'
'হ্যাঁ।'
'এইতো আমি একনই বাইর হচ্ছি। ঘুম থেকে উঠতি দেরি ক'রে ফেলিছি। এট্টা ভাল খবর আছে।
'কী খবর।'
'বসো, আসে বলতিছি।'
'ঠিক আছে আসো।'
কী ভাল খবর দেবে আফজাল ভাই? আমি মানুষ-প্রকৃতি আর তুরাগের বুকে ভেসে চলা কার্গো লঞ্চ- নৌকা দেখতে দেখতে তার এবং ভাল খবরের অপেক্ষায় থাকি।



চানরাতের আগের রাতে আমরা বান্দরবান যাব, সন্ধ্যায় কল্যাণপুর থেকে বাসের টিকিট কিনে আবির আর আমি রিজয় উঠি মিরপুর ২ নম্বরের উদ্দেশে। আবির বাড়িতে গিয়েছিল, আজ-ই এসেছে; কচুক্ষেতে নিত্রাদির বাসায় যাবে। কেবল আমরা দু'জনই নয়; পরাগদা, শাশ্বতীদি আর আফজাল ভাইও বান্দরবান যাবে। আবিরের গার্লফ্রেন্ড প্রিয়তিও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারিবারিক প্রয়োজনে ও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। কয়েক বছর যাবৎ আমি ঈদের সময় ঢাকায় থাকি না; বান্দরবান, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাই। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর দুটো ঈদ আমি বাড়িতে ছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা সুখের নয়। প্রথমবার ঈদের নামাজ পড়ার জন্য জোরাজুরি করেছিল বাসার সবাই, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। আমার পাঁচ-ছয় বছর বয়সের পর সেই প্রথম বাবা আমাকে ছাড়া ঈদের নামাজ পড়তে যান গম্ভীরমুখে। মা ব্যথিত মুখে রান্নাবান্না করেন। দাদী একবার মাকে শুনিয়ে বলেন, 'হের লাইগাই পোলাপান বেশি নিতে অয়, পাঁচ-ছয়ডা থাকলে একটা-দুইডা গোল্লায় গেলে তার কপাল নিয়া যাইবো! পোলা বেশি থাকলে কি আর একটার দিকে চাইয়া থাহন লাগে!'

ঈদের দিন আমি পাঞ্জাবি-পাজামা পরিনি, নামাজও না। খাবার সময় হ'লে আমাকে খেতে ডাকে, বাড়িতে কোনো নতুন অতিথি এলে যেমন গুটিয়ে থাকে, তেমনি সবার সাথে ব'সে খাই। দুপুরের পর থেকেই বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসতে শুরু করে, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি কিন্তু ইতিমধ্যে তারা আমার নাস্তিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ায় তাদের কথায়-আচরণে আগের আন্তরিকতার ঘাটতি লক্ষ্য করি, আবার এমনও হতে পারে বাসার পরিস্থিতি আমার প্রতিকূলে থাকায় আমার অমন মনে হয়েছিল; তবে কেউ কেউ আমাকে জ্ঞানদান পূর্বক আল্লাহ্'র পথে ফেরার পরামর্শ দিতে ভুল করে নি। আমার মনে হয়েছিল আমি যেন

মলিন পোশাক পরিহিত এক ভিখারি, অযাচিতভাবে ঢুকে পড়েছি সকলের অভিজাত আনন্দযজ্ঞে! মনে হয়েছিল এ বাড়ির মানুষ আর আত্মীয়-স্বজনকে আমি চিনি না, দেখি নি কোনোদিন। সেই প্রথম আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে আমি ভুল বাড়িতে জন্মেছি, আমার তো এ বাড়িতে জন্মানোর কথা নয়! আর তার পর থেকে যখনই বাড়ির সবাই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে তখনই এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় আমার। ঘরের ভেতর একা ব'সে থাকলে গা ছমছমে ভাব হয়। চারপাশে বিদ্যমান সবকিছুর অস্তিত্ব ভুলে আমি যেন এক নতুন জনপদে পৌঁছে যাই আর খুঁজতে থাকি আমার মা-বাবা, স্বজনদের। মনে হয় সেই নতুন জনপদেই আছে আমার মা-বাবা আর স্বজনরা, যারা আমারই মতো ধর্ম আর সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী, যারা শান্ত-সৌম্য; কখনো মতের অমিল হ'লে বা তুচ্ছ কারণে রেগে যায় না, চিৎকার ক'রে কথা বলে না। আমি খুঁজতে থাকি, খুঁজতেই থাকি তাদেরকে।

বাড়ির অস্বস্তিকর দমবন্ধ পরিবেশ থেকে রেহাই পেতে বিকেলে বাসা থেকে বেরোই একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে, কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। যাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায় তারা সবাই ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে। আমি রাস্তায় রাস্তায় একাই ঘুরি আর ঈদ উদযাপনকারীদের দেখতে থাকি। অধিকাংশ মানুষের কাছে ঈদের আনন্দ মানে বাসা থেকে ভরপেট খেয়ে পার্কে আর রাস্তার ফুটপাতে ব'সে আড্ডা দেওয়া। যদিও মুহাম্মদ রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছেন, আর রাস্তায় বসলেও রাস্তার হক আদায় করতে বলেছেন। হক আদায় মানে– দৃষ্টি সংযত রাখা, উৎপীড়ন করা থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। অথচ অধিকাংশ তরুণেরা ঈদের দিন রাস্তায় ব'সে আড্ডা দেয়, হারাম হলেও অনেকে গীটার বাজিয়ে দলবদ্ধভাবে গান গায়, কেউ মেয়ে দেখলে শিস বাজায় বা ইভটিজিং করে। আমার কিছু সহপাঠী ঈদের কয়েকদিন আগেই চাঁদা তুলে মদ আর বিয়ারের কার্টুন কিনে স্টক ক'রে রাখে ঈদ উদযাপন করার জন্য! আর আমাদেরই মহল্লার আমার স্কুল-কলেজের কিছু সহপাঠী আরো অভিজাতভাবে ঈদ উদযাপন করে। ওরা আমাকেও একবার প্রস্তাব করেছিল ওদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে, উদযাপনের ধরন শুনে আমি হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলাম। ওদের মদের স্টক তো থাকেই, সেই সঙ্গে থাকে কলগার্ল! ঈদের সময় পরিবারের সবাই গ্রামের বাড়িতে ঈদ করতে যাওয়ায় ওদের কারো না কারো বাসা ফাঁকা থাকেই। সেই ফাঁকা বাসায় ওদের সাত-আটজনের জন্য দু-তিনজন কলগার্ল ভাড়া ক'রে নিয়ে আসে। তারপর সারারাত চ'লে ঈদ উদযাপন, ওদের ভাষায় সেক্সপার্টি! অভিনব ঈদ উদযাপন বটে!

সেদিন বাসায় ফিরি অনেক রাতে, আত্মীয়-স্বজন চ'লে যাওয়ার পর। পরপর অস্বস্তিকর দুটো ঈদ বাড়িতে কাটানোর পরই আমি সিদ্ধান্ত নিই ঈদের সময় আর বাড়িতে থাকবো না, কোথাও ঘুরতে যাব। এরপর থেকেই আমি ঘুরতে যাই, নিজেও বিব্রত হই না, অন্যদেরকেও বিব্রত করি না।

আবির আর আমি মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পিছনদিকের গেটের বিপরীতে এসে রিক্স থেকে নামি, তারপর হেঁটে পাশের সরু গলি দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকের একটা বটগাছের গোড়ার বাঁধানো বেঁদিতে বসি। জায়গাটা নিরিবিলি; মাঝে মাঝে দু-চারজন মানুষ থাকে, এখন নেই; হঠাৎ হঠাৎ গাছের পাখিরা পায়খানা করে, কখনো কখনো তা গায়েও পড়ে, আমরা বিরক্ত হই না! একদিন পড়েছিল আমার কপালের ডানদিকে; তবু এখানে আসি কারণ জায়গাটা নিরিবিলি, আর গাছ থাকলে পাখি থাকবেই, পাখি থাকলে পায়খানাও করবে, প্রাকৃতিক ব্যাপার।

ভীষণ গরম। জলতৃষ্ণা পেয়েছে। আবিরকে বলি, 'তোরা ব্যাগে জল আছে?'
'আছে, তবে এ জল আমাদের পেটে সহ্য হবে না।'
'কেন?'
ও শব্দগুলো টেনে প্রলম্বিত ক'রে বলে, 'মহাপবিত্র গঙ্গা-পদ্মাজল!'
'মানে?'
গলায় কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, 'সে এক বিরাট রগড় রে বাপু, তোর মতো নরাধম নাস্তিক তা বুঝবে না!'
'আরে ব্যাটা রহস্য না ক'রে খুলে বল।'

'আমার জেঠিমা, কিছুদিন আগে তীর্থে গিয়েছিলেন গয়া, কাশী, বৃন্দাবন; ওখান থেকে আর কিছু আনুন বা না আনুন বড় দুই বোতল গঙ্গাজল নিয়ে এসেছেন। পাড়ার লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটুখানি গঙ্গাজল নেবার জন্য। তীর্থ থেকে আনা গঙ্গাজল, কাউকে না দিলে যদি পাপ হয়! তাই আমার জেঠিমা সকলকেই একটু একটু ক'রে গঙ্গাজল বিতরণ করেছেন। আর তীর্থ থেকেই ফিরেই তিনি পাড়ার সবাইকে, মানে প্রায় দুশো-আড়াইশো মানুষকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছেন। বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেলে ফিরে এসে নাকি মানুষকে অন্নভোজন করাতে হয়, নইলে পূণ্য হয় না। আমি জেঠিমাকে বললাম, "জেঠিমা, তোমার এই অন্নভোজনের পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা আমাকে দাও, আমি লোকজনের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে আরো কিছু টাকা এর সঙ্গে যোগ ক'রে পাড়ায় একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করি। তোমার পূণ্য হোক বা না হোক, তুমি যেদিন লোকজনকে খাওয়াবে তার পরদিন সকালেই তোমার পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকায় মানুষের টয়লেট নিশ্চয় পূর্ণ কবে! এতে কারো কোনো উপকার হবে না, কিন্তু একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে মানুষের উপকার হবে।" জেঠিমা আমাকে কী বললো জানিস?'
'কী?'
'বললো, দূর হ লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া!'

পুরো ঘটনা আর আবিরের বলার ধরনে আমি এমনিতেই মিটিমিটি হাসছিলাম, এবার বেশ জোরেই হেসে উঠি।

আবির আবার শুরু করে, 'এদিকে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ির গোত্রের দূর-সম্পর্কের একজন লোক মারা গেছে, তার সঙ্গে দিদিদের সম্পর্কের ব্যাপারটা মনে কর এইরকম হবে আর কি– জামাইবাবুর দাদুর বাবার কাকাতো ভাইয়ের বংশধর। তাও যে লোকটা মারা গেছে সে থাকতো পশ্চিবঙ্গের হাওড়ায়। দিদি-জামাইবাবু তাকে কোনোদিন দেখা তো দূরের কথা মনে হয় নামও শোনে নি। অথচ দিদিরা এখন অশৌচ পালন করছে, ওদের নিজেদের গা-গতর থেকে শুরু ক'রে ঘর-দোর সবই নাকি অশৌচ! দু-একদিনের মধ্যেই সেই লোকের শ্রাদ্ধ, তাই ওদের ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে অশৌচ দূর করতেই আমাকে গঙ্গাজল নিয়ে আসতে বলেছিল। জেঠিমা দিদির জন্য একটা ছোট বোতলে গঙ্গাজল দিলো, আমিও ব্যাগের বাইরের এই পকেটে রাখলাম। লঞ্চ থেকে নামার আগে দেখি জলের বোতল হাওয়া, তলায় খুঁজলাম নেই! নদীর ওপারে বাসের ঝাঁকিতে ব্যাগের পকেট থেকে প'ড়ে গেছে নাকি লঞ্চ থেকে কেউ নিয়ে খাবার জল মনে ক'রে খেয়ে ফেলেছে তা জানি না। জল না পেলে তো দিদি আমাকে আচ্ছা ঝাড় দেবে। হঠাৎ মাথাটা খুলে গেল, একটা ছোট বোতল কিনে সেই বোতলের জল খেয়ে খালি বোতলে পদ্মার ভ'রে নিয়ে এসেছি!'
'তাদের বিশ্বাস তাদের কাছে, তাই ব'লে তুই মিথ্যা বলবি?'
'এই তোর ভূগোলের জ্ঞান কি আমার জেঠিমার মতো! তুই জানিস না যে গঙ্গা-ই বাংলাদেশে ঢুকে পদ্মা হয়ে গেছে! ঐ গঙ্গাদ্বারেও যে জল, আমাদের পদ্মায়ও সেই একই জল।'
'তা তো জানি!'
'তাহলে আমি তো মিথ্যা বলছি না, এটাও তো গঙ্গারই জল! এটাই দিদিকে দেব।'
আমি হেসে বলি, 'তুই পারিসও!'

'বহু বছর আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ বর্তমানের ভাগীরথী-হুগলি নদীর খাত দিয়ে বইতো, কিন্তু কালের আবর্তে ভূমিরূপের পরিবর্তনের ফলে গঙ্গার মূল প্রবাহ গড়ায় পদ্মা দিয়ে। আগের দিনের মানুষের ভূগোলের জ্ঞান ছিল না, তাই দেশভাগের আগে পদ্মাপারের মানুষ গঙ্গা হয়ে আসা পদ্মার জলে রোজ স্নান করার পরও পূণ্যের লোভে দল বেঁধে ঘটা ক'রে নদীয়া-কলকাতার হুগলি নদীতে গঙ্গাস্নান করতে যেতো গরুর গাড়ি-ঘোড়ার গাড়িতে চেপে, পায়ে হেঁটেও যেতো অনেকে; পথে অনেকে মরেও যেতো। কিন্তু এখন তো সেই দিন নেই, সব গ্রামেই শিক্ষিত মানুষ আছে, ইন্টারনেট আছে, গুগোল ম্যাপে চোখ বুলালেই জানা যায় যে গঙ্গার আর পদ্মার জল একই। অনেকে জানেও, তবু মানষের অন্ধ বিশ্বাস, গঙ্গার জলের প্রতি অন্ধ ভক্তি। ফলে ঘরের কাছে পদ্মায় গঙ্গাজল রেখে টাকা খরচ ক'রে গঙ্গাস্নান করতে যায় দূরে। অতীতে কতো মানুষ এই গঙ্গাজল খেয়ে ডায়রিয়া-কলেরায় মরেছে তা কে জানে!'

গঙ্গা-পদ্মার জলে আমাদের অরুচি, তাই আপাতত জল কিনে এনে তৃষ্ণা মিটাই আমরা। এরই মধ্যে শাশ্বতীদির ফোন।
'হ্যালো দিদি...'
'টিকিট পেয়েছিস?'
'হ্যাঁ, পেয়েছি।'
'আবির কোথায়?'
'আমরা একসাথেই আছি।'
'তোরা কী এখনো কল্যাণপুরে?'
'না, ২ নম্বরে।'
'শোন, বাইরে থাকিস না, বাসায় চ'লে যা। গুলশানে জঙ্গি হামলা হয়েছে।'
'বলো কী! কখন?'
'এই তো টিভিতে লাইভ দেখাচ্ছে। গুলশানের হলি আর্টিজান নামের একটা রেস্টুরেন্টে জঙ্গিরা ঢুকে মানুষকে জিম্মি করেছে।'
'মানুষ মারা গেছে?'
'ভেতরে কি হচ্ছে কেউ বলতে পারছে না। র‍্যাব-পুলিশ ঘিরে রেখেছে রেস্টুরেন্ট। বাইরে থেকে পুলিশ ঢুকতে গিয়েছিল, জঙ্গিদের ছোড়া গ্রেনেড আর গুলির আঘাতে দু'জন পুলিশ মারা গেছে, আহত হয়েছে আরো কয়েকজন। শুনছি এধরনের জিম্মি কিংবা হামলার ঘটনা আরো হতে পারে, তোরা বাসায় চ'লে যা।'
'ঠিক আছে দিদি, আমরা একটু পরই চ'লে যাচ্ছি, তুমি চিন্তা কোরো না।'
'আর পরশুদিন তোরা দু'জনই বাসায় আসছিস তো?'
হ্যাঁ, আসবো।'
'আচ্ছা, রাখছি।'
'আচ্ছা।'
আমি আবিরকে ঘটনাটা বলি। এরই মধ্যে আমার বাসা থেকে মা ফোন করে, আবিরকে ফোন করে নিত্রাদি। আরো জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় দু'জনকেই তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার আদেশ জারি হয়। আমরা আসছি ব'লে ইসলামী জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে থাকি। কিছুক্ষণ পর বাসা থেকে আবারো মায়ের ফোন, '২ নম্বর থেকে আসতে তোর এতোক্ষণ লাগে?'
'এই তো আসছি মা।'
'জলদি বাসায় আয়, তোর বাবা রাগারাগি করছে।'
'আচ্ছা, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'
ফোন রেখে আবিরকে বলি, 'চল আজ উঠি, নইলে আবার ফোন দিয়ে রাগারাগি করবে।'

আবিরকে ২ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরি, সবাই ড্রয়িংরুমে ব'সে টেলিভিশন দেখছে, আমি ফেরায় বাসার সবাই যেন স্বস্তি পায়। গুলশানের

ঘটনাটি সরাসরি দেখাচ্ছে চ্যানেলে, জঙ্গিরা হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টের ভেতরে দেশি-বিদেশি মানুষকে জিম্মি ক'রে রেখেছে । জিম্মিকারীদের হাতে বন্দী মানুষের কথা ভেবে র‍্যাব-পুলিশ বাহিনী কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছে না, তারা ভবনটি ঘিরে রেখেছে আর জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।

আমি গোসল ক'রে সবার সঙ্গে ভাত খেয়ে আবার ড্রয়িংরুমে বসি টিভি চালিয়ে। নিরাপত্তাজনিত কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্দেশে এখন আর সরাসরি দেখাচ্ছে না কোনো চ্যানেল। কয়েকজন ইতালিয়ান, জাপানী, একজন ভারতীয় নাগরিকসহ বাংলাদেশি নাগরিকও ভেতরে জিম্মি রয়েছে; কিন্তু ঠিক কতোজন ভেতরে জিম্মি রয়েছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা দিতে পারছে না আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

চ্যানেল ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ দেখি সিএনএন সরাসরি দেখাচ্ছে। বাবা আর ছোট আপুও এসে বসে টিভির সামনে, রান্নাঘরের কাজ সামলে একটু পর মাও আসে। তাদের সবার মুখে ওই একই কথা, কোরানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এদেরকে বিপথগামী করা হয়েছে। আমি তাদের কথা শুধু শুনি, কিছুই বলি না। কি বলবো? এক কথা আর কতোবার বলা যায়! আমি টিভির পর্দায় তাকিয়ে ভাবতে থাকি ভেতরে জিম্মি থাকা মানুষগুলো আর তাদের পরিবারের মানসিক অবস্থার কথা। ভেতরের মানুষগুলো জীবিত আছে নাকি জঙ্গিরা তাদেরকে মেরে ফেলেছে তা অজানা, কী ভীষণ যন্ত্রণায়-উৎকণ্ঠায় পার করছেন জিম্মিদের পরিবারের মানুষেরা। সবাই নিশ্চয় আশায় বুক বেঁধে আছেন যে মানুষগুলো জীবিত-ই ফিরবে।

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'বাবা, অনার্স শেষ হ'লে আমি আমেরিকা বা ইয়োরোপিয়ান কোনো কান্ট্রিতে চ'লে যাব। এই দেশে আর থাকবো না।'
মা, বাবা, ছোট আপু, তিনজনই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়।
বাবা বলেন, 'অনার্স আগে শেষ হোক তারপর দেখা যাবে।'
মা বলেন, 'তুই বিদেশ গেলে আমাগো কী অইবো?'
'তোমাদেরও নিয়ে যাব। নাকি কাফেরদের দেশে থাকতে তোমাদের অসুবিধা হবে? এই দেশ ক্রমশ আফগানিস্থান হবে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নাই। কোনোভাবেই ওদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। আর তালেবান-আইসিস মার্কা দেশে আমি থাকতে পারবো না, আগে থেকেই তোমাদের জানিয়ে রাখলাম। অনেক রক্ত ঝরানোর পর হয়তো এই দেশ সভ্য হবে, কিন্তু তা আরো এক-দুই শতাব্দী পর।'
বাবা-মা চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে।
আমি টেলিভিশনের পর্দায় দৃষ্টি ফেরাই। সারাবিশ্বের মানুষ দেখছে এই ঘটনা, জানছে যে বাংলাদেশ একটি জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র, সেখানে বিদেশীরা নিরাপদ নয়! ছিঃ, বাংলাদেশের জন্য এটা কী ভীষণ লজ্জার! সব সরকার জঙ্গি তোষণ করতে করতেই আজ দেশটাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। সরকার জঙ্গিদের অর্থের উৎস বন্ধ করছে না। জঙ্গিদের ব্যবসা এবং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেয়ে গেছে দেশ। জঙ্গিবাদী কার্যক্রম এবং ইসলামের প্রসারে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে ওরা। অর্থনীতি এবং লোকবল, দুটোতেই ওরা ভীষণ শক্তিশালী। আছে শক্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। আর ওদের বড় শক্তি ওরা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এবং লক্ষ্যে অবিচল। সেই একাত্তরের পরাজয়ের পর থেকে পুনরায় বিজয়ের লক্ষ্যে খুব সন্তর্পণে এক পা এক পা ক'রে এগিয়েছে ওরা, সামরিক শাসনের সময় থেকে নির্ভয়ে হাঁটতে শুরু করেছে, আর এখন হিংস্র থাবা উঁচিয়ে দাপটের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে। কে বাঁচাবে এই দুর্ভাগা দেশটাকে?

রাত বাড়ে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী কোনো আশার কথা শুনাতে পারে না; তারা কেবল চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট। বাবা-মা আর ছোট আপু, একে একে সবাই ঘুমাতে চ'লে গেছেন। দাদী অনেক আগেই ঘুমিয়েছেন। ড্রয়িংরুমে আমি একা, একসময় টিভি বন্ধ ক'রে আমিও উঠে পড়ি, মশারি টাঙিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি; কিন্তু ঘুম আর আসে না। শুয়ে শুয়েও মাথার ভেতরে একই চিন্তা, মানুষগুলো জীবিত ফিরবে তো? কি দ্রুত দেশটা আফগানিস্থান, ইরাক, সিরিয়ার পথে হাঁটছে। আগে যখন ওইসব দেশে এই ধরনের ঘটনার খবর দেখতাম টিভিতে, তখন ভাবতাম যে ওইসব দেশে মানুষ থাকে কীভাবে? আর থাকেই বা কেন, অন্য দেশে চ'লে যেতে পারে না? এখন বুঝি যে তারা কীভাবে থাকে, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই থাকতে বাধ্য হয়। একান্ত নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ নিজের এবং পরিবারের জীবন বিপন্ন ক'রে ঝুঁকি নিয়ে জলপথে ইয়োরোপে যাবার চেষ্টা করে; কেউ সফল হয়, কেউবা হয় না। ইয়োরোপিয়ানরা মুসলমানদেরকে তাদের দেশে ঢুকতে দিতে যায় না। ইসলামী সন্ত্রাসের বীজ কে-ই বা পুঁততে চায় নিজের শান্তিপূর্ণ দেশে? ভাবতে ভাবতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। প্রসাবের চাপে পৌনে ছয়টার দিকে ঘুম ভাঙে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখি বাবা নিউজ চ্যানেল চালিয়ে ব'সে আছে। টিভি স্ক্রলে কোনো সুসংবাদ নেই; র‍্যাব, পুলিশ, সেনাবাহিনী এখনো চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে রেস্টুরেন্ট, কোনো অপারেশান চালায় নি। আমি নিজের ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। উঠে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখি বাবা, মা আর ছোট আপু টিভি দেখছে। সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটে 'অপারেশান থান্ডারবোল্ট' নামের অভিযান চালিয়ে ছয় জঙ্গিকে হত্যা ক'রে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। উদ্ধার করেছে বিশটি লাশ; যাদের নয়জন ইতালিয়ান, সাতজন জাপানী, তিনজন বাংলাদেশী ও একজন ভারতীয়। তাদেরকে কুপিয়ে-জবাই ক'রে হত্যা করা হয়েছে। তেরোজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, যাদেরকে জঙ্গিরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এদের বেশিরভাগই হলি আর্টিজানের কর্মী, আর কয়েকজন নাকি হলি আর্টিজানের কাস্টমার। সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে ডিবি কার্যালয়ে।

ছয়জন তরুণ জঙ্গির লাশ বারবার দেখাচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায়। অপরের তো বটেই নিজের জীবনও এদের কাছে কি তুচ্ছ! কি অবলীলায় ধর্মের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেয় এরা! এতো সুন্দর পৃথিবীতে দীর্ঘদিন বাঁচার সাধ জাগে নি; সাধ জেগেছে যে জগত সে দ্যাখে নি, আজ অব্দি কেউ দ্যাখে নি, যে জগতের কোনো অস্বিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি, সেই জগতে বাঁচার! চৌদ্দশো বছর আগে একজন মানসিক রোগী-প্রতারক এক মিথ্যে অলৌকিক জগতের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছে, আর সেই জগতে যাবার জন্য একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অন্যের জীবন কেড়ে এভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে, চোখ বুজে ভাবলে কেমন অবিশ্বাস্য লাগে, মনে হয় এসব রূপকথার গল্প! কিন্তু চোখ খুললেই চোখের সামনে উপস্থিত নিষ্ঠুর বাস্তবতা; সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য মুসলিম যুবক বেহেশেতের মাদকে মত্ত হয়ে প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও প্রতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দেবার মতো ঝাঁপ দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে! ধর্ম মাত্রই এক ধরনের মাদক, আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে তীব্র বিষাক্ত এবং ভয়ংকর মাদক ইসলাম; যা দিনকে দিন অন্যদের জীবনও বিষময় ক'রে তুলছে।

আর কী দেখবো! নিজের রুমে গিয়ে বিছানা গুছিয়ে বাথরুমে যাই। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা ক'রে চা বানিয়ে নিয়ে এসে কম্পিউটারের সামনে বসি। ফেসবুক খুলে দেখি নিন্দার ঝড় বইছে। অনেকেই স্ট্যাটাস দিয়েছে জঙ্গিদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানিয়ে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মানুষের স্ট্যাটাসে চোখ বুলাই। মহা ধার্মিক মুসলমানও নিন্দা জানিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছে। এইসব গোবেচারাদের জন্য আমার করুণা হয়, এরা না জানে ইসলামের ইতিহাস না পড়ে কোরান-হাদিস। নিজের অজান্তেই এরা ইসলাম বিরোধী স্ট্যাটাস দেয়, এই বিপুল সংখ্যক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের প্রতি করুণা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি! কি স্ট্যাটাস দেব আমি? যদি সত্য কথাটা লিখি যে মুহাম্মদের আদর্শ ধারণ ক'রে ছয়জন প্রকৃত মুসলমান ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; ব্যাস, তাহলেই আমার মুণ্ডপাত শুরু হবে। আমার গায়ে ইসলাম বিদ্বেষী তকমা লাগিয়ে দেবে তথাকথিত মডারেট মুসলিমরা, পূর্বেও লাগিয়েছে। এরা বুঝতে চায় না যে ইসলাম আর পাঁচটা ধর্মের মতো নয়, ইসলামের এই রক্ত পিপাসা জন্মলগ্ন থেকে। অন্যান্য ধর্মে এখন রক্তপাত নেই বললেই চলে। অধিকাংশ ধর্ম প্রবর্তকদের মনে মুহাম্মদের মতো সম্পদ ও নারী লুণ্ঠন, জবরদস্তিমুলক ধর্মান্তর এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসা ছিল না, তাঁরা মুহাম্মদের মতো হত্যার উস্কানি দিয়ে কোনো গ্রন্থ নাজিল করেন নি; প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রতি বিরক্ত-বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা প্রচার করেছেন তাদের নতুন দর্শন ও চিন্তা, এক্ষেত্রে তারা যে সনাতন সংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত ছিলেন তা নয়। তবে নিজের দর্শন ও চিন্তার প্রসারে তারা মুহাম্মদের মতো সন্ত্রাসের পথ বেছে নেন নি। যদিও পরবর্তীকালে কোনো কোনো ধর্ম প্রবর্তকের উত্তরসুরী অবিশ্বাসীদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে; তবে বর্তমানে সেটাও কমে গেছে। কিন্তু ইসলামের অনুসারীরা জন্মলগ্ন থেকে আজ অব্দি একইভাবে বিশ্বব্যাপী রক্তের হোলি খেলছে কোরান-হাদিস আর মুহাম্মদের জীবন অনুসরণ ক'রে।

এইসব অমানবিক ঘটনা আমাকে ব্যথিত করে, বিচলিত করে। ভেতরে ক্ষোভ জন্মায়, হাত নিশপিশ করে কিছু লেখার জন্য, শব্দরা জালে জড়িয়ে আমাকে টানে, জলবিম্বের মতো ঠেলে ওঠে ভাবনা। ওয়ার্ডে নতুন একটি পেজ খুলি, ফেসবুকে স্ট্যাটাস নয়, ব্লগের জন্য একটি নিবন্ধ লিখবো। না চাইলেও এখন জোর ক'রে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে বিশজন মানুষকে শিরোচ্ছেদ করার নির্মম দৃশ্য, গরম রক্ত ছিটকে-গড়িয়ে যাবার বীভৎস দৃশ্য! নিরপরাধের রক্ত শব্দ হয়ে বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মতো ধেয়ে আসছে আমার চৈতন্যে, কী-বোর্ডে আঙুল স্পর্শ করতেই শব্দগুলো আছড়ে পড়ে–

ইসলাম: ধর্ম বা দর্শনের প্রচলিত প্রথা ভেঙে হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক এবং সন্ত্রাসী মতবাদ

সনাতন ধর্ম লোকাচার, লোকসংস্কৃতি; বহু বছর ধ'রে মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তা, খাদ্যাভাস, কর্ম, বিশ্বাস, যৌনাচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে এই লোকাচার-লোকসংস্কৃতি। আদিম মানুষ যখন স্বাদ-গন্ধ নিতে শিখেছে, বনের ফল কুড়িয়ে খেতে শিখেছে, পাথরে আঘাত পেলে ব্যথা অনুভব করেছে, একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময় করতে শিখেছে, একে অন্যের শরীরের গন্ধ-উত্তাপ অনুভব এবং যৌনসঙ্গম শুরু করেছে, একটি ফল দু'জন বা অধিক লোকে ভাগ ক'রে খেয়েছে, সন্তান ভূমিষ্ট হ'লে তাকে লালন-পালন করেছে, বৃষ্টি পড়লে গুহার ভেতরে কিংবা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে শিখেছে, শীত লাগলে গাছের বাকল গায়ে জড়াতে শিখেছে, অরণ্যে দাবানল শুরু হ'লে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচতে শিখেছে; তখন থেকেই সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতির যাত্রা শুরু। এই মানুষেরাই দাবানল দেখে ভীত হয়ে আগুনকে, প্রখর দাবদাহ থেকে রেহাই পেতে সূর্যকে, বরফ পড়ার সময় তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচতে বরফকে দেবতা জ্ঞান ক'রে পূজা করেছে। এসব পূজা তারা এই বিশ্বাস থেকে করেছে যে তাহলে আগুন হয়তো তুষ্ট হয়ে তাদের অরণ্যে দাবানল সৃষ্টি করবে না, সূর্য হয়তো তাদেরকে একটু কম দগ্ধ করবে, বরফ হয়তো শীতে একটু কম কষ্ট দেবে। এরাই একসময় পাথরের অস্ত্র তৈরি ক'রে পশু শিকার করতে শিখেছে, পশুর হাড় দিয়ে অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতে শিখেছে, দাবানলে পোড়া মাংসের স্বাদ পেয়েই বুঝিবা পাথরে পাথর ঘষে আগুন আবিষ্কার করেছে, তীর-ধনুক বানিয়ে পাখি শিকার করতে শিখেছে, জঙ্গল কেটে ছাপ ক'রে কৃষিকাজ করতে শিখেছে, তামা-লোহা আবিষ্কার এবং এর ব্যবহার শিখেছে, এইসব আদিম মানুষদেরই বংশধর আমরা আজকের এই আধুনিক মানুষেরা।

কালের আবর্তে আদিম মানুষেরা যতো সামনে এগিয়েছে তাদের সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতির রীতি-পদ্ধতিও একটু একটু ক'রে পরিবর্তিত হয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের মানুষেরা পুরাতন রীতি-পদ্ধতির কিছু বাদ দিয়ে যোগ করেছে নতুন কিছু রীতি-পদ্ধতি, নতুন-পুরাতনের সংমিশ্রণে সনাতন ধর্ম সামনে এগিয়েছে। মানুষ যতো সামনে এগিয়েছে ততো তার চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটেছে, বিচরণ ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে, একদিকে যেমনি হয়ে উঠেছে পূর্বের

চেয়ে অধিকতর চৌকষ অন্যদিকে তেমনি হয়ে উঠেছে পূর্বের চেয়ে অধিকতর ধূর্ত এবং স্বার্থান্বেষী। কালক্রমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পুরোহিততন্ত্র, নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে সনাতন ধর্মে সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন উদ্ভট সব রীতি-পদ্ধতি, করেছে গোষ্ঠীভেদ-বর্ণভেদ। নতুন নতুন সব আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-পদ্ধতি আর জটিল সব তত্ত্বের ভারে সহজ-সরল আদিম মানুষের সহজ-সরল সনাতন ধর্ম যেমনি জর্জরিত হয়েছে, তেমনি জর্জরিত হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন। লোহা আবিষ্কারের পর কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও মুষ্টিমেয় মানুষের ধর্মীয় শোষণ-শাসনে সমাজে বাড়তে থাকে বৈষম্য। ধর্মীয় অনুশাসনে শাসকশ্রেণি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো এমনভাবে তৈরি করে যাতে সম্পদ তাদের হাতে কুক্ষিগত হয় আর তারা যুগ যুগ ধ'রে শোষণ করতে পারে সাধারণ মানুষকে। এর ফলে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই শক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো পুরনো রীতি-পদ্ধতি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে না। আবার বংশ পরম্পরায় প্রচলিত বিশ্বাসও তাকে পিছু টানে, ফলে তারা শোষিত হয়েও প্রচলিত বিশ্বাসের পথেই হাঁটে। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে কেউ না কেউ পুরনো সমাজ সংস্কারের জন্য জেগে ওঠেই, অধিকাংশ-ই হয়তো ব্যর্থ হয়, কিন্তু কেউ কেউ কম-বেশি সফলও হয়।

সনাতন ধর্ম ব্যতিত বেশিরভাগ ধর্ম বা দর্শন-ই একেকটি প্রতিবাদ তৎকালীন সনাতন ধর্মীয় রীতি, নীতি-নির্ধারক এবং সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে; তা ভারতবর্ষে উদ্ভূত বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শিখ প্রভৃতি ধর্ম এবং বার্হস্পত্য বা বাউল দর্শনের ক্ষেত্রে যেমনি সত্য; তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম নেওয়া ইহুদি, খ্রিষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। মানব সভ্যতার উন্মেষকালের পর থেকে পৃথিবীজুড়ে এরকম আরো অনেক ধর্ম বা দর্শনের জন্ম হয়েছে স্ব স্ব সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি, অনাস্থা, বিতৃষ্ণা এবং প্রতিবাদের ফল স্বরূপ; আবার বিনাশও হয়েছে অনেক ধর্ম এবং দর্শনের, পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে চিরতরে, মানুষ এখন সে-সব ধর্ম বা দর্শনের নামও জানে না। এই যে স্ব স্ব সমাজের প্রতি এইসব ধর্ম প্রবর্তক বা দার্শনিকদের প্রতিবাদ, একে আমি স্বাগত জানাই। আমি শ্রদ্ধা জানাই তাদের মানসিকতাকে এজন্য যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত পুরনো অন্ধ বিশ্বাস এবং কু-সংস্কারকে তারা অস্বীকার করতে পেরেছিলেন এবং এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের বোধ জাগ্রত হয়েছিল নতুন দর্শনের সন্ধানে।

প্রথমত তারা লড়াইটা করেছিলেন নিজের সঙ্গে; বংশ পরম্পরায় প্রচলিত বিশ্বাসকে অস্বীকার করাটা সহজ কাজ নয়, এর জন্য নিজের সঙ্গে অনবরত লড়াই করতে হয়; বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে খুব কম মানুষই এই লড়াইয়ে জিততে পারে। এইসব ধর্ম বা দর্শনের প্রবর্তকেরা নিজের সঙ্গে করা এই লড়াইয়ে জিততে পেরেছিলেন। এর পরের লড়াইটা তাদের করতে হয়েছিল পরিবার এবং সমাজের মানুষের বিরুদ্ধে; যারা পুরোনো প্রথাতেই সন্তুষ্ট ছিল এবং পুরনো পথকেই মুক্তির একমাত্র পথ ব'লে মনে করতো। নিজের সঙ্গে তাদের লড়াইটা

কিন্তু কখনোই শেষ হয়ে যায় নি, অবিরাম চিন্তা করেছেন, নতুন দর্শনের সন্ধান করেছেন; মানুষের অদম্য কৌতুহল আর রাশি রাশি প্রশ্নের চাপ বহন করেছেন; লব্ধ দর্শন দিয়ে নির্বাপিত করেছেন মানুষের কৌতুহল, দিয়েছেন রাশি রাশি প্রশ্নের উত্তর। তাতে হয়তো কেউ কেউ সন্তুষ্ট হয়েছে, কেউবা হয় নি। হয় নি বলেই নতুনের পাশাপাশি পুরনো সনাতন ধর্ম আজও টিকে আছে।

স্ব স্ব ধর্ম ও সমাজের প্রতি ধর্মপ্রবর্তক বা দার্শনিকদের এই প্রতিবাদী মানসিকতার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। শ্রদ্ধাশীল সমাজের সেইসব মানুষের প্রতিও যারা এইসব নতুন ধর্ম বা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন নি কিন্তু মুকুলেই বিনষ্ট না ক'রে বেড়ে উঠতে দিয়েছেন। যদিও সর্বদা ধর্ম প্রবর্তক বা দার্শনিকদের পথ মসৃণ ছিল না। সেই সমাজের সেইসব মানুষকে ধন্যবাদ জানাতেই হয় এজন্য যে তারা যদি ধর্ম বা দর্শন প্রচারের শুরুতেই বুদ্ধ, পার্শ্ব কিংবা মহাবীর, বৃহস্পতি লৌক্য, যীশু, মুহাম্মদ, গুরু নানকসহ অন্যান্যদেরকে হত্যা করতো; তবে নতুন ধর্ম ও দর্শনের উদ্ভবই হতো না। নতুন চিন্তা, নতুন দর্শনের পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। নতুন দর্শনের পথ যেমনি রুদ্ধ করা যাবে না, তেমনি পেশিশক্তির প্রয়োগে পুরনো দর্শনকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাও ত্যাগ করতে হবে। পুরনো এবং নতুন উভয় দর্শন-ই থাকবে, যার যে দর্শন ভাল লাগবে সে সেটাই গ্রহণ করবে; গ্রহণ করা বা না করা ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। পৃথিবী বৈচিত্র্যময়; একই সময়ে কোথাও তীব্র দাবদাহে দগ্ধ হচ্ছে অরণ্য-জনপদ, আবার কোথাও তুষারপাত হচ্ছে, কোথাও মেঘাচ্ছন্ন কিংবা ঝলমলে রৌদ্রজ্জ্বল পরিবেশ, কোথাওবা হচ্ছে ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাত। প্রত্যেক মানুষ দেখতে একই রকম নয়; কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ খাটো, কেউবা লম্বা। জাতি বা গোষ্ঠীভেদে খাদ্যাভাস আলাদা; এমনকি একই গোষ্ঠীর মানুষ হলেও কেউ মাংস খেতে ভালবাসে, কেউ ইলিশ মাছ কিংবা কই মাছ, কেউবা নিরামিষাশী। সকলে একই রকম বা একই রঙের পোশাক পরে না; কেউবা পোশাক পরেই না, নগ্ন থাকতে ভালবাসে; যেমন-ভারতবর্ষের নাগা সন্ন্যাসী কিংবা আন্দামান-নিকোবর দীপপুঞ্জের বিভিন্ন আদিবাসী, জৈন ধর্মের মহাবীরের আদর্শে আস্থাশীল ভদ্রবাহু'র অনুগামী যারা দিগম্বর নামে পরিচিত; আফ্রিকা কিংবা ব্রাজিলের আদিবাসী। আমাদের দেশে কতো পাগল নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, অশালীনতার দোহাই দিয়ে আমরা তাদের হত্যা করতে পারি না। প্রত্যেকের ভাললাগা-মন্দলাগা ভিন্ন ভিন্ন।

কোনো একটি দর্শন বা তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষ যদি তাদের দর্শনকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ক'রে পৃথিবীর বাকি সব দর্শন এবং দর্শনের মানুষকে ধ্বংসের প্রয়াস চালায়, তাহলে একদিকে যেমনি পৃথিবী তার বৈচিত্র্য হারাবে অন্যদিকে লজ্জিত হবে মানবাধিকার; ওই একটি দর্শন তখন আর দর্শন থাকে না হয়ে ওঠে সন্ত্রাসী মতবাদ, আর সন্ত্রাসী মতবাদের কাছে হেরে যায় মানবতা। কিন্তু কোনো মতবাদ বা দর্শন নয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ; দর্শনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই দর্শন।

আমরা যদি একটু পিছন ফিরে প্রাচ্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে ঋগ্বৈদিক যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ) বৈদিক ধর্মের শোষণ-শাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বেদকে অস্বীকার পূর্বক বস্তুকে চরম সত্য জ্ঞান ক'রে বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার করেন বৃহস্পতি লৌক্য। কিন্তু তিনি নিজের দর্শন প্রচারে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেন নি, যুক্তিতর্কের পথ বেছে নেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০- খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ) পুরোহিততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের (ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূর্ববর্তীরূপ বৈদিক ধর্ম এবং পরবর্তীরূপ হিন্দু বা সনাতন ধর্ম) শোষণ-শাসন এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক আচার-সর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি অনেক মানুষ বিরক্ত এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এসময় এবং এর কিছু পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করে অনেক ধর্মীয় মতবাদ বা দর্শন; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, আজীবিক ধর্ম।

এ যুগেই বৈদিক ব্রাহ্মণ ঋষি আর পুরোহিতদের চিন্তা এবং আধিপত্যে প্রবলভাবে ধাক্কা মারে চার্বাক দর্শন। যে যুগে ব্রাহ্মণরা ছিল প্রবল প্রতাপশালী, ধূর্ত ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ ও অন্যান্য বর্ণের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 'কর্মফলবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদ' নামে নতুন এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উন্মেষ ঘটায় এবং এই তত্ত্বের প্রচার ক'রে মানুষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় পরকালের ভয়। সেই যুগে দাঁড়িয়ে চার্বাকরা উচ্চারণ করেন বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রকৃতির ভূমিকাই মূখ্য; ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর ব'লে কিছু নেই; মৃত্যুর পর মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। বেদবিশ্বাসী মানুষের মাঝে তারা এই নাস্তিক দর্শন প্রচার করেন। মুলত চার্বাকরা বৃহস্পতি লৌক্য'র মতানুসারী, বৃহস্পতি লৌক্য-ই চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক। বৃহস্পতি লৌক্য'র মতোই চার্বাকরাও তাদের দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে সহিংসতার পথ অবলম্বন ক'রে হাতে তরবারি তুলে নেন নি, নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মণ বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষকে হত্যা করেন নি। তারা বেদজ্ঞ ঋষিদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় আত্মপ্রকাশ করে বৌদ্ধধর্ম, এর প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৬- খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দ)। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় সন্তান, পূর্বে তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তার পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর শাক্য নামে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধান। শাক্যরীতি অনুযায়ী সিদ্ধার্থও শৈশবেই অস্ত্রশিক্ষা, অশ্ব ও রথচালা শেখেন। বিয়ে করেন যশোধরাকে। কিন্তু বৈভবের জীবন তার অন্তরে প্রশান্তি এনে দিতে পারে নি। উনত্রিশ বছর বয়সে যেদিন তার পুত্র রাহলের জন্ম হয় সেদিনই স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ ক'রে পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিয়ে পথে পা বাড়ান। নিজের ভেতরে রাশি রাশি প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন জায়গায়, সাধু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন, কৃচ্ছ্রসাধন করেন, কিন্তু মেলে নি তার প্রশ্নের

উত্তর। একসময় উপলব্ধি করেন যে কৃচ্ছ্রসাধনে কেবল দেহ ক্ষয় হয়; দুঃখ লাঘব হয় না, অন্তরের প্রশান্তি মেলে না। এক পর্যায়ে সকল সঙ্গ ত্যাগ ক'রে একা একা ঘুরতে থাকেন আর খুঁজতে থাকেন নিজের প্রশ্নের উত্তর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব গ্রামে পিপল্ গাছের নিচে উনপঞ্চাশ দিন ধ্যান করার পর তার আত্মোপলব্ধি হয়, নিজেই খুঁজে পান নিজের প্রশ্নের উত্তর। অনুধাবন করতে পারেন মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ এবং তা থেকে মুক্তি উপায় সম্পর্কে। এরপরই তিনি তার আদর্শ এবং দর্শনের প্রচার শুর করেন। অনেকেই তার নতুন দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে তার ধর্মে দীক্ষিত হয়। মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় তার ধর্মের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের মাঝে নিশ্চয় তিনি তার ধর্ম প্রচারে কিছু বাধার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কখনোই উগ্রতার পথ বেছে নেন নি, তিনি বেছে নেন অহিংসার পথ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেখানে যজ্ঞের নামে অবাধে গো-হত্যা ক'রে চাষাবাদ তথা কৃষি এবং বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছিল, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণদের গো-হত্যার বিরুদ্ধাচারণ ক'রে জীবের প্রতি অহিংসার বাণী প্রচার করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে সুদের বিনিময়ে অর্থলগ্নির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সুদের ব্যবসা ছিল ঘৃণিত এবং সুদ গ্রহীতাদের হাতে ব্রাহ্মণদের অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ থাকলেও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধ বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থলগ্নিকে খারাপ চোখে দ্যাখেন নি। বাণিজ্যের প্রয়োজনে তখন বণিকদের সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও বৈদিক গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ থাকায় ব্রাহ্মণরা সমুদ্রযাত্রার স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু বুদ্ধ তার ধর্মে এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি। বৈদিক ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণরা যেখানে নারীদের ওপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে তাদের পায়ে শিকল পরিয়েছি, বুদ্ধ সেখানে নারীদের জন্য পৃথক মঠ স্থাপন ক'রে নারী স্বাধীনতার এক বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সংঘ বা বিহার পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিহারগুলোর অন্তর্ভূক্ত ভিক্ষুদের ভোটের মাধ্যমে বিহারের সভাপতি নির্বাচিত হয়। এমনকি ভিক্ষুদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে উপসমিতি গঠন করা হয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকাশে বিহারগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উত্তরকালে এই বিহারগুলোকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যার একটি বিহারের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল জ্ঞানপীঠ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রাচ্যবাসীর, সভ্যতার কলঙ্ক মুসলিম আগ্রাসন ধ্বংস করে সমস্ত জ্ঞানপীঠ।

তৎকালীন সময়ে যেখানে সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ব'সে ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে গৌতম বুদ্ধের এই অহিংস ধর্ম প্রচার এবং সমাজ সংস্কার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। যেখানে ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের নামে বিবিধ যাগযজ্ঞে ব্যস্ত; সেখানে বুদ্ধ ঈশ্বরকে অস্বীকার করার কথা বলেন, অন্যথায় 'মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু' এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়। যেখানে ব্রাহ্মণরা আত্মা-জন্মান্তর ইত্যাদি জুজুর ভয় দেখিয়ে স্বার্থসিদ্ধিতে রত; সেখানে বুদ্ধ আত্মাকে নিত্য অস্বীকার করার কথা বলেন, নইলে

নিত্য একরস মানলে তার পরিশুদ্ধি বা মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে ব্রাহ্মণদের কাছে জীবনাচার-ধর্মাচারের ক্ষেত্রে বেদ-ই একমাত্র প্রমাণ্য গ্রন্থ এবং বেদ বাক্যই শেষ কথা; সেখানে বুদ্ধ কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ হিসেবে স্বীকার না করার উপদেশ দেন, অন্যথায় বোধবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে সাহসী এবং সত্য বাণী উচ্চারণ করেন, আজ এতোকাল পরেও সেই একই ভূমির বিপুল সংখ্যক মানুষ ওই সাহসী এবং সত্য বাণীর মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ! আর ব্যর্থ বলেই আজও ধর্মের নামে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে প্রাচ্যভূমি।

বিজ্ঞানের এই অগ্রসর যুগে বুদ্ধের কোনো কোনো মতের সঙ্গে অনেকের ভিন্নমত থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তৎকালীন সময়ে সমাজ সংস্কারে তার ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞানের অনগ্রসর সেই যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শোষণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ মানব সভ্যতাকে আলোর পথ দেখান। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখান মানুষকে, যদিও সবাই যে পুরোনো প্রথা ঝেড়ে ফেলে বুদ্ধের দেখানো পথে আসে তা নয়; যারা আসে তারা সাহসী। কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই অন্তর্দন্দ্বের ফলে বৌদ্ধধর্মে অবক্ষয় শুরু হয়। কালক্রমে অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং ফিরে আসে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার, যা একদা বুদ্ধ বর্জন করেন।

বুদ্ধের আদর্শ এবং নতুন দর্শনে মুগ্ধ হয়ে অনেক নৃপতি, ধনী বণিক এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; তিনি তাদেরকে প্ররোচিত ক'রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উৎখাত এবং নিজের ধর্ম বিস্তারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালাতে পারতেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নির্মূল করার জন্য ব্রাহ্মণদেরকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারতেন; নৃপতিদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারতেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী রাজ্যসমূহ আক্রমণ ক'রে সম্পদ ও নারী লুণ্ঠন, ক্রীতদাস সংগ্রহ এবং রাজ্যের দখল নিতে; কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি কেবল সত্য, ন্যায় এবং অহিংস পথে তার ধর্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্মের মতো জৈন ধর্মও আত্মপ্রকাশ করে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায়। পার্শ্বনাথকে জৈনধর্মের তেইশ তম তীর্থঙ্কর বলা হলেও তার পূর্বের বাইশজন ঐতিহাসিক চরিত্র নন। পার্শ্বনাথকেই জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পার্শ্বনাথ ছিলেন বেনারসের রাজা অশ্বসেনের পুত্র। তিনি বিবাহিত ছিলেন। ত্রিশ বছর গৃহে থাকার পর তিনি কঠোর তপস্যার পথ বেছে নেন। জৈন ধর্মের প্রসারে তিনি খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন নি। বাংলার সম্মেত পর্বতে তার মৃত্যুর হয়। তার মৃত্যুর আড়াইশো বছর পর জৈন ধর্মের চব্বিশতম এবং শেষ তীর্থঙ্কর হিসেবে আবির্ভাব হয় মহাবীরের। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে মহাবীর বৈশালীর কুণ্ডগ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের পিতার মতো তাঁর পিতা সিদ্ধার্থও ছিলেন কুণ্ডগ্রামের জ্ঞাতৃক নামক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রধান আর তার মাতা ত্রিশলা

ছিলেন লিচ্ছবী নৃপতি চেতকের বোন। যৌবনে তিনি যুবরাজ হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ এবং যশোদা নামে এক নারীকে বিয়ে করেন; তাদের এক কন্যা সন্তান হয়। গৌতম বুদ্ধের মতো তিনিও সংসারে প্রশান্তি খুঁজে পান নি। ফলে তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর বয়েসে তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে তপস্যার জীবন বেছে নেন, প্রথম দিকে বস্ত্র পরিধান করলেও তপস্যা শুরুর তেরো মাস পর থেকে বাকি জীবন নগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নেন। বলা হয়ে থাকে যে তিনি তপস্যার ত্রয়োদশ বছরে বর্ধমান কৈবল্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নির্বাণ লাভ করেন। কৈবল্যজ্ঞান লাভের মাধ্যমে তিনি সুখ-দুঃখ জয় করেন, এজন্য তাকে জিন এবং তার অনুসারীদেরকে জৈন বলা হয়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন জনপদে পরিব্রাজন এবং তার ধর্মমত প্রচার করেন। মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে মহাবীর তিনটি পথের নির্দেশ দেন যা ত্রিরত্ন হিসেবে পরিচিত-সৎ জ্ঞান, সৎ বিশ্বাস, সৎ আচরণ। জৈন ধর্মও অহিংস, বৌদ্ধ ধর্মের মতোই জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নৃপতি, বণিক এবং বহু সাধারণ মানুষ জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। তথাপি মহাবীর ধর্ম প্রচারের জন্য তাদেরকে জবরদস্তিমূলক বা নৃশংসপথে চালিত করেন নি; ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি নিজে যেমনি উগ্রপন্থা অবলম্বন না ক'রে অহিংস পথ বেছে নেন, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও উগ্রপথে ঠেলে না দিয়ে অহিংস পথই দেখান।

ভারতবর্ষের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম–বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্ম। দুটো ধর্মই একেশ্বরবাদী-ভক্তিবাদী। পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বৈদিক দেবতাদের মধ্য থেকে বিষ্ণুকে বেছে নেন সর্বশক্তিমান একেশ্বর হিসেবে। বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারীরাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে উৎখাতের চেষ্টা করে নি; বৈষ্ণবরা অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া দূরে থাক, অন্য ধর্মের ধ্বংস কামনা ক'রে কোনো প্রকার উস্কানিমুলক বক্তব্য সম্বলিত পুস্তকও লিপিবদ্ধ করে নি। তারা অহিংসভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করে।

শৈব ধর্মের অনুসারীরা শিবের উপাসক। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে পূজিত হচ্ছে শিব। শৈব ধর্মাবলম্বীরাও তাদের ধর্ম প্রসারের জন্য জোরপূর্বক অন্য কোনো ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত বা হত্যার পথ অবলম্বন করে নি।

উপরোক্ত ধর্ম ও দর্শন সমূহ ছিল প্রচলিত ধর্ম এবং প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ, কিন্তু এর প্রচার ও প্রসারে ধর্ম প্রবর্তক এবং দার্শনিকগণ ছিলেন অহিংস। নিজের ধর্ম এবং দর্শন প্রচারে তাঁরা কেউ-ই হাতে অস্ত্র তুলে নেন নি। আবার তাদের ধর্মগ্রন্থ কিংবা দর্শনের কোথাও বলা নেই যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অথবা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত বা মতান্তরিত করতে হবে; অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। প্রাচ্যের কোনো ধর্মগ্রন্থে বলা হয় নি যে–ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা অবিশ্বাসীদেরকে তুমি মারছো না, মারছে ঈশ্বর; তুমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। কোনো ধর্মগ্রন্থে অনুসারীদের উদ্দেশে লেখা নেই যে ভিন্নধর্মাবলম্বীদেরকে পরাজিত ক'রে তাদের নারী, শিশু ও ধন-সম্পদ ভোগ করবে, এগুলো ঈশ্বর তোমাদেরকে দান করেছেন

উপহারস্বরূপ; বরং নারীদের সম্মান করার কথা, নারীসঙ্গ ও সম্পদ বর্জনের কথা বলা হয়েছে কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে। প্রাচ্যের কোনো ধর্ম প্রবর্তক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে স্ব-ভূমি থেকে উৎখাত করতে উদ্যোগী হন নি বা তাদের ধ্বংস কামনা করেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন নি।

মধ্যপ্রাচ্যেও ইহুদি কিংবা পৌত্তলিকদের আচার অনুষ্ঠান আর রীতি-পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, সমাজব্যবস্থা ও জীবনাচারে সত্য এবং নৈতিকতার ঘাটতি দেখে, সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারে উদ্যোগী হন যীশু।

মুহাম্মদও বহুশ্বরবাদী কোরাইশদের পৌত্তলিকতা এবং সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং উপলব্ধি করেন মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে। তার মতো পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ এক নিরক্ষর অন্তর্মুখী বালক; যার বাল্যকাল কেটেছে অনাদরে-অবহেলায় দরিদ্র চাচার আশ্রয়ে, উটের রাখাল হিসেবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী সময় অতিবাহিত হয়েছে অবলা উটের সঙ্গে রুক্ষ মরুভূমিতে; শৈশব থেকেই যিনি কোরাইশদের পূজা-পার্বণের সঙ্গে পরিচিত, পাম বাগানে পাথরের দেবী ওজ্জাকে কেন্দ্র ক'রে বৃত্তাকারে ঘুরে পূজা করা দেখে অভ্যস্ত; অভ্যস্ত আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে সুখ, সমৃদ্ধি ও মুক্তির আশায় কাবাঘরের বিভিন্ন মূর্তি এবং কৃষ্ণপাথরকে কেন্দ্র ক'রে বৃত্তাকারে ঘুরে পূজা দিতে দেখে; শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনে তিনি নিজেও এসব পূজায় অংশ নেন, দেব-দেবী সমৃদ্ধ কাবাঘর প্রদক্ষিণ করেন; এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষ জীবনের একটা পর্যায়ে স্বগোত্রীয়-সনাতন চিন্তা ঝেড়ে ফেলে উপলব্ধি করেন যে পাথরের দেব-দেবীকে পূজা করা অসারতামাত্র; নিঃসন্দেহে এটা তার চেতনার উত্তরণ এবং প্রগতিশীল মনস্কতার পরিচয়, যা প্রশংসনীয়।

এমন নয় যে আরব সমাজে তখন পৌত্তলিকতা বিরোধী বা একেশ্বরবাদের ধারণা ছিল না; ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্ম তো ছিলই, এছাড়াও আদ গোত্রের হুদ নবী, মিদিয়ান গোত্রের শুয়েব নবীও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। আরবের অনেক কবি ছিলেন; যেমন-কবি কাসা বিন সায়িদা আল ইয়াদি, কবি আমর বিন ফজল, কবি লবীদ; এরা সকলেই পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন, মূর্তিপূজার কুসংস্কার থেকে মানুষকে বের ক'রে আনার জন্য পৌত্তলিকতা বিরোধী কবিতা লিখতেন এবং সেসব কবিতা ওকাজের মেলার কবিতা সম্মেলনে আবৃত্তিও করতেন। কিন্তু এজন্য পৌত্তলিকরা তাদেরকে হত্যা করে নি, আবার তারাও মূর্তি পূজার অপরাধে পৌত্তলিকদেরকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন নি।

মুহাম্মদ মূর্তিপূজার মতো সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কুসংস্কার জীর্ণ পোশাকের মতো পরিত্যাগ ক'রে নতুন পথের অনুসন্ধানে নামেন। বাল্যকালে তিনি একবার তার চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান, মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এবং আলোকিত সিরিয়ার মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা বালক মুহাম্মদের ভেতরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যৌবনে তিনি আবারো সিরিয়া

ভ্রমণ করেন, এসময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এবং মতের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। মক্কাতেও তিনি দূর-দূরান্ত থেকে আগত সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যলাভ করেন। ইহুদিদের সিনাগগ এবং খ্রিষ্টানদের গীর্জায় গিয়ে যাজকদের সঙ্গে ধর্মীয় আলাচনা করেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এসময়েই তার মধ্যে পৌত্তলিকতার বিরোধীতা এবং একেশ্বরবাদের ধারণা দৃঢ় হয় ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং আরবের অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম ও ব্যক্তির প্রভাবে।

তিনি মক্কা থেকে রুক্ষ-শিলাময় তিন মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় যেতেন একাকী ধ্যান করার জন্য, অনেক একেশ্বরবাদী বা হানিফ মতাদর্শীও তখন হেরা পর্বতে ধ্যান করতে যেতো। তিনি খাদ্য এবং পানি নিয়ে যেতেন আর তা না ফুরোনো পর্যন্ত বাড়ি ফিরতেন না, বাড়ি ফিরে খাদ্য এবং পানি নিয়ে আবার যেতেন। কখনো কখনো সকালে যেতেন আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি তার প্রথম স্ত্রী খাদিজাকে জানান যে তিনি ফেরেশতার দেখা পেয়েছেন, ফেরেশতা তার হৃদয়ে এক আশ্চর্য কিতাব স্থাপন করেছেন। আর এর পর থেকেই নিজের বক্তব্যকে আল্লাহ্'র বাণী আর নিজেকে আল্লাহ্'র নবী ব'লে প্রচার করেন, মক্কার কোরাইশদেরকে মূর্তিপূজা বর্জন ক'রে তার প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হবার আহব্বান জানান।

ফেরেশতার দেখা পাওয়া এবং হৃদয়ে কিতাব স্থাপন করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে তার মানসিক বিভ্রান্তি। দীর্ঘদিন গভীর চিন্তমগ্ন হয়ে কল্পনার জগতে বাস করার ফলে মানুষের এ ধরনের সাময়িক মানসিক বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়, অথবা তিনি সচেতনভাবেই প্রতারণার আশ্রয় নেন।

বস্তুত তার নতুন পথের অনুসন্ধান শেষ হয়ে যায় হেরা পর্বতের গুহাতেই, সনাতন প্রথা আর কুসংস্কার পিছনে ফেলে তার ভেতরে যে উন্নত চেতনার সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল তার মৃত্যু হয় হেরা পর্বতের গুহার ভেতরেই, কুসংস্কারের একটি বদ্ধ ডোবা থেকে মুক্তি পেতে তার চিত্ত লুপ্ত হয় আরেকটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ ডোবায়! হেরা পর্বতের গুহায় আত্মমগ্ন থেকে তিনি সামনে এগোবার রাস্তার পরিবর্তে খুঁজে পান পিছনে ফিরে যাবার ভিন্ন রাস্তা। প্রথা ভাঙতে গিয়ে পুরনো প্রথার নাগপাশেই বাঁধা পড়েন। আরবের বহুশ্বরবাদী বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্রের কিছু কিছু প্রচলিত বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠান যেমনি ইসলামে গ্রহণ করেন; তেমনি ইহুদি, খ্রিষ্টান, জরথুষ্ট্র, সাবিয়ান প্রভৃতি একেশ্বরবাদী ধর্ম দ্বারাও প্রভাবিত হন। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের বহুশ্বরবাদী পৌত্তলিকরা কাবাঘরে যেতো হজ ও ওমরাহ পালন করতে, ইসলামী যুগের মুসলমানরাও হজ এবং ওমরাহ পালন করতে যায়; প্রাক-ইসলামী যুগে বহুশ্বরবাদী পৌত্তলিকরা কৃষ্ণপাথরকে প্রদক্ষিণ করতো সুখ-সমৃদ্ধি-মুক্তির আশায়, ইসলামী যুগের মুসলমানরাও কাবাঘরের পাথর প্রদক্ষিণ করে একই আশায়; প্রাক-ইসলামী যুগে বহুশ্বরবাদী পৌত্তলিকরা পশু কোরবানি করতো দেবদেবীর উদ্দেশে যা এখনো হিন্দুরা ক'রে থাকে, আর ইসলামী যুগে মুসলমানরা কোরবানি করে আল্লাহ্'র উদ্দেশে। একেশ্বরবাদের অনেক প্রচলিত

বিশ্বাস আর প্রথাও মুহাম্মদ ইসলামে গ্রহণ করেন। বেহেশত এবং দোজখের ধারণা গ্রহণ করেন জরথুষ্ট্রবাদ থেকে; খৎনা করা, ওজু করা, ঋতুবতী নারী বর্জন প্রভৃতি তিনি গ্রহণ করেন ইহুদি প্রথা থেকে; নেস্টোরিয়াবাদ (একটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়) থেকে গ্রহণ করেন প্রাণির কিংবা মানুষের ছবি অঙ্কন আর মূর্তি নিষিদ্ধের প্রথা; কোরানের আয়াতেও যীশুর বাণীর ব্যাপক প্রভাব আছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য চিন্তা এবং প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হন তিনি, পুরোনো পথের আরো অনেক মসলা দিয়েই তৈরি করেন ইসলাম নামক নতুন পথ। আর প্রথা ভাঙার দোহাই দিয়ে তিনি এমন সব নীতি বহির্ভূত কাজ করেন আরব সমাজে যার প্রচলন ছিল না, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের প্রচলন করেন তিনি। নিজের পালক পুত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করেন, বিয়ে করেন আপন চাচীর বোনকে, চাচাতো বোন উম্মে হানিকে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখাত হন চাচার কাছে এবং পরবর্তীতে উম্মে হানির স্বামীর অকালমৃত্যু হ'লে তার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক স্থাপন করেন। পুরোনো সব প্রথাই যেমনি খারাপ বা বর্জনীয় নয়, তেমনি পুরোনো প্রথা ভাঙার নামে নৈতিকতাহীন প্রথার প্রচলন করাও কাম্য নয়।

হেরা পর্বত থেকে ফিরে এসে নিজেকে আল্লাহ্'র নবী দাবী ক'রে কোরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো পর্যন্ত তার কার্যক্রম মেনে নেওয়া যায়, এতে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় নি। কিন্তু এরপর থেকে তিনি কোরাইশদের ওপর জোর করতে থাকেন তার প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য। অনর্গল নিজের বক্তব্যকে আল্লাহ্'র বাণী হিসেবে মিথ্যা প্রচার করেন আর মক্কায় তার নতুন ধর্ম ইসলাম প্রচারে ব্যর্থ হয়ে নবুওতি প্রাপ্তির বারো বছর পর মদিনায় হিজরাত করেন, সেখানে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে না পেরে এক পর্যায়ে বেছে নেন সন্ত্রাসের পথ। কোরাইশ, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং আরবের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করেন; নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা করেন, সম্পদ লুণ্ঠন করেন, জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরিত করেন, নারীদের যৌনদাসী আর পুরুষ এবং বালকদের বানান ক্রীতদাস, যৌনদাসী এবং ক্রীতদাস বেচাকেনা করেন। আর এখানেই তিনি অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তকদের থেকে ব্যতিক্রম এবং প্রথাবিরোধী; তার ভেতরের ধর্মীয় চেতনার চূড়ান্ত মৃত্যু ঘটে সেদিনই, যেদিন তিনি প্রথম হামজার নেতৃত্বে ত্রিশজন মুহাজিরকে পাঠান কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার জন্য।

জীবনের শেষ দশ বছরে তার নির্দেশে বা পরিচালনায় ৭০ থেকে ১০০ টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৭ থেকে ২৯ টি তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পরিচালনা করেন। এইসব যুদ্ধে তার নির্দেশে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে খুন করেছে জিহাদীরা, লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও শিশুকে করেছে ক্রীতদাস, লক্ষ লক্ষ নারীকে করেছে যৌনদাসী। তিনি নিজেও তরবারি হাতে শিরোচ্ছেদ করেন, সেবার জন্য ক্রীতদাস রাখেন, যৌনদাসীকে ধর্ষণ করেন। কোরানের শত শত আয়াতে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাসভূমি থেকে উৎখাত, শাস্তি, হত্যা এবং ধ্বংস করার কথা বলেন; বিধর্মীদের পরাজিত ক'রে তাদের ধন-

সম্পদ লুণ্ঠন করা, নারীদের যৌনদাসী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানানোর কথা বলেন; যা তার অনুসারীরা আজ এতো বছর পরেও অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে চলেছে।

প্রচলিত ধর্মের প্রথা ভেঙে তিনি বেছে নেন সন্ত্রাসবাদের পথ। ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ক'রে সমগ্র আরবকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য এবং তাতে তিনি ও তার উত্তরসুরীরা সফলও হন। যুদ্ধবাজ ইসলামী জিহাদীরা একের পর এক যুদ্ধাভিযান চালিয়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র দখল করে, সেইসব রাষ্ট্রের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় ইসলাম ধর্ম, পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করে অসংখ্য ধর্ম ও মতবাদ।

মৃত্যুশয্যায়ও মুহাম্মদের ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠস্বর থেকে উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক আকাঙ্খা ও বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য, 'হে প্রভু, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করো। প্রভুর ক্রোধ তাদের ওপর প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক। সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্ম না থাকুক।'

ফলে তার প্রতিষ্ঠিত ইসলাম নামক ধর্মটি প্রচলিত আর পাঁচটা ধর্মের মতো নেহাত ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; ধর্মের প্রচলিত প্রথা ভেঙে, মানবতা পদদলিত ক'রে তা হয়ে উঠেছে উগ্র রাজনৈতিক এবং সন্ত্রাসী মতবাদ।

গত বছর নিউইয়র্কের একটি আদালত প্রায় আড়াই হাজার বছর পর দার্শনিক সক্রেটিসকে নির্দোষ প্রমাণ ক'রে রায় দিয়েছে, এথেন্সের আদালতেও শীঘ্রই রায় ঘোষণা করা হবে; আমি আশাবাদী যে এথেন্সের আদালতেও সক্রেটিস নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। আমার ধারণা অনাগতকালে সক্রেটিসের বিপরীত ঘটনা ঘটবে মুহাম্মদের ক্ষেত্রে। মুহাম্মদ একজন মানবতা লঙ্ঘনকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী, ক্রীতদাসের কারবারি, ধর্ষণ ও গণহত্যার খলনায়ক। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আলোয় মানুষ যখন বর্তমানের চেয়ে অধিক সভ্য এবং মানবতাবাদী হবে, আরো অধিক সংখ্যক মানুষ ধর্মত্যাগ করবে; তখন পৃথিবীর সভ্য দেশের আদালতে মুহাম্মদের বিচার হবে এবং দোষী প্রমাণিত হবেন বিশ্বের জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধী নবী মুহাম্মদ।



আধো ঘুমের মধ্যে গুনগুন সুরের গান কানে ভেসে এলে মনে হয় আমি কোথায়? রাতে কি কম্পিউটার কিংবা মোবাইলে গান চালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি? আর তারপরই ঘুমের কুয়াশা কাটে যখন পিঠের নিচের অনভ্যস্ত বিছানা আর মাথার নিচের বালিশটাকে অনুভব করি। চোখ বুজে থাকলেও অধোচেতন থেকে পুরোপুরি চেতনে আমি। গানের সুর ছাড়াও কানে ভেসে আসে পাখপাখালির কিচির-মিচির, মোরগের বাগ, ক্ষণে ক্ষণে হাতি আর সিংহের ডাক! এখান থেকে চিড়িয়াখানা খুব কাছেই, তাই চোখ বুজে কান পাতলে অরণ্যে উপস্থিতির অনুভূতি হয়। ভাল ঘুম হয় নি আমার, আসলে নতুন জায়গায় আমি ভাল ঘুমাতে পারি না, ঘুম গভীর হয় না, আর মাঝে মাঝেই ভেঙে যায় ঘুম। চোখ খুলে মাথার কাছের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই, এখন প্রায় সকাল, এখানে-ওখানে ঘাপটি মেরে থাকা অন্ধকার উবে যাচ্ছে ক্রমশ। দৃষ্টি গুটিয়ে আনি বিছানায়, আবির ঘুমোচ্ছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে গুনগুন সুরে গাওয়া আরশাদ ফকিরের গান। আমরা ঘুমিয়েছি মাঝরাতের পর, অথচ এতো সকালে উঠে পড়েছেন তিনি! গভীর রাতে ঘুমোলেও বাউল-ফকিরদের দেহঘড়ি কী ভোরবেলায় জাগিয়ে দেয়? কি জানি!

সেদিন আফজাল ভাই আমাকে যে ভাল খবরটি শোনাতে চেয়েছিল তা হলো তার গুরু আরশাদ ফকিরের আসার খবর। তিনি কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলেন, শিষ্যের পীড়াপীড়িতে ফেরার সময় তার বাড়িতে চরণধুলি দিতে রাজি হন। খবরটি শোনার পর থেকেই আমি মুখিয়ে ছিলাম তার আসার অপেক্ষায়। সরাসরি বাউল-ফকিরদের গান অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কখনোই সংসারত্যাগী কোনো বাউল-ফকিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করার সুযোগ হয় নি আমার; সে কারণেই আমার আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। শাশ্বতীদি, পরাগদা আর আবিরকেও বলেছিল আফজাল ভাই। কিন্তু শাশ্বতীদি অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে আর সকালে পরাগদার কলেজে পরীক্ষা থাকায় আসতে পারে নি। এসেছি আমি আর আবির। পরশু সন্ধ্যায় হলি

আর্টিজানে জিম্মি ঘটনার পর থেকেই মনটা বেশ বিচলিত ছিল, জঙ্গিদের হাতে জিম্মিদের নৃশংস হত্যার খবর জানার পর থেকে কাল সারাটা দিন মন খারাপের মেঘে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। এমনিতেই আজকাল রাস্তায়-চলতে ফিরতে আতঙ্কে থাকি যে কখন পিছন থেকে চাপাতি নেমে আসে ঘাড়ে! আর এই ধরনের ঘটনা আশঙ্কা আরো বাড়িয়ে দেয়। নিজের কথা ভেবে যেমনি বিচলিত বোধ করি, তেমনি খারাপ লাগে খুন হওয়া মানুষের কথা ভেবে, তাদের পরিবারের কথা ভেবে। সেই মন খারাপ নিয়েই কাল সন্ধেয় এসেছি আফজাল ভাইয়ের বাড়িতে। আফজাল ভাইয়ের গুরু আরশাদ ফকিরের সান্নিধ্য পেয়ে মন খারাপের মেঘ কখন যে ভেসে গেছে তা নিজেও টের পাই নি, যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করেছিলাম কাল! সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অব্দি দুই ভাগে গান আর তত্ত্ব আলোচনা শুনে দারুণ কেটেছে! প্রথম ভাগ সন্ধ্যা থেকে তারাবি নামাজের আগ পর্যন্ত আফজাল ভাইয়ের বাড়িতে; তখন আফজাল ভাইয়ের গুরু আরশাদ ফকির আর গুরু মা'কে কেন্দ্র ক'রে আমি, আবির আর আফজাল ভাইয়ের পরিবার ছাড়াও ছিল আশপাশের কয়েকজন সঙ্গীত পিপাসু মানুষ। আর দ্বিতীয় ভাগ খাওয়া-দাওয়ার পর তুরাগের বুকে নৌকায় ভাসতে ভাসতে; আরশাদ ফকিরকে কেন্দ্র ক'রে আফজাল ভাই, আমি আর আবির।

আমি আর আবির যে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী তা নয়, আমরা দু'জনই ভিন্ন চিন্তার জগতের বাসিন্দা হলেও এসেছি গান আর কিছু তত্ত্বকথা শুনতে, একজন বাউলকে কাছ থেকে দেখতে, বাউল দর্শন সম্পর্কে কিছু জানতে। আমরা বাউল-ফকির দর্শনের খুব যে ভক্ত তাও নয়, বরং অন্যান্য ধর্মের মতোই বাউল-ফকিরদের কিছু কুসংস্কার আমরা অপছন্দ করি। বাউল-ফকির দর্শন সম্পর্কে আমি কিছু কিছু পড়াশোনা করেছি, যদিও পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে বাউল-ফকির দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে জানা একেবারেই অসম্ভব। এটা কেবল দিনের পর দিন বাউল-ফকিরদের সঙ্গলাভ আর প্রত্যক্ষভাবে তাদের জীবনাচার অবলোকন করার মাধ্যমেই সম্ভব। তা ব'লে ইদানিং কালের অধিকাংশ যুবকদের মতো শুধুমাত্র হুজুগে গা ভাসিয়ে গানের তালে উদ্দাম নাচতে বা দেহ দোলাতেও আসি নি। বই প'ড়ে আর আফজাল ভাইয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের বারিবিন্দুর মতো হলেও বাউল-ফকিরি ভাষা কিছু রপ্ত করেছি। আগে তো গানের কথায় অমাবস্যা শব্দটি শুনলে চোখের সামনে ভাসতো আমাদের গ্রামের বাড়ির ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বাঁকা নদী বলতে বুঝতাম গড়ান চটবাড়ির কাছে বাঁক নেওয়া তুরাগ। কিন্তু এখন অমাবস্যা মনে বিস্ময় জাগায়, বাঁকা নদী শরীরে জাগায় শিহরণ!

অনেক বাউল গানের অন্তর্গত দর্শন বা চিন্তার সঙ্গে আমি একমত না হলেও কিছু গান ভাল লাগে, হৃদয় স্পর্শ করে। আবার অনেক গান আমি বুঝিও না। কেননা বাউল গানের শরীর দেখে অন্তর বোঝা যায় না। শব্দের আস্তিনে লুকোনো থাকে গুপ্ত অর্থ। আজকাল শহরের তথাকথিত আধুনিক যুবকদের মধ্যে বাউল গানের প্রতি এক কৃত্রিম উন্মাদনা দেখতে পাই; অনেকে যে আগ্রহ নিয়ে ডিজে পার্টিতে যায় সেই একই আগ্রহ নিয়ে যায় বাউল গানের

আসরে, অর্থ না বুঝেই বাউল গানের বহিরঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ নাচায় দুদ্দাড়। আমার ধারণা এদের বেশিরভাগই কিছু কিছু বাউলগানের গূঢ় অর্থ যদি জানতে পারে তাহলে হয়তো নাক সিঁটকাবে, মওলানাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গালমন্দও করবে বাউলদের! আজকাল শহরে বাউল গানের কৃত্রিম শ্রোতা যেমনি তৈরি হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বাউলও। কৃত্রিম শ্রোতা তৈরিতে কৃত্রিম বাউলরা অগ্রণী ভূমিকা পালন ক'রে থাকে।

পুঁথিগত বিদ্যা আর আফজাল ভাইয়ের মাধ্যমে বাউল দর্শন সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছি, তাতে অপছন্দের অনেক কিছুই আছে, আবার পছন্দের বিষয়ও আছে, আছে বিস্ময়েরও।

আবির পাশ ফিরে শোয়। ওকে আমার ঈর্ষা হয়, ওর মতো যদি ঘুমাতে পারতাম! আরশাদ ফকির গান থামিয়ে কথা বলছেন। আফজাল ভাইও এতো সকালে উঠে পড়েছে? নাকি আরশাদ ফকির একা একাই কথা বলছেন! সম্ভবত তিনি ফোনে কথা বলছেন, আর একটু পরই তিনি আফজাল ভাইয়ের নাম ধ'রে ডাকতে থাকেন। কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর আবার আরশাদ ফকিরের কণ্ঠ, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা। তোমার মারে ডাকো। আমাদের এক্ষুনি রওনা হতি হবি।'
তার কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাই, কণ্ঠে অকৃত্রিম বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আফজাল ভাই বলে, 'কী অয়ছে বাবা?'
'রাততিরি কারা যেন আখড়ায় আগুন দিয়েছে, ছেলেপেলেগুলোকে মেরেছে!'
'হায় কপাল!' বলেই আফজাল ভাই নীরব, নীরব আরশাদ ফকিরও।
'তোমার মা'রে ডাকো বাবা, এক্ষুনি রওনা হই।'

আফজাল ভাই ভাবীকে ডাকে। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে থম মেরে তাকিয়ে থাকি টিনের চালের দিকে, কিন্তু অন্তরচক্ষুতে দেখতে পাই দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকা আখড়া, আরশাদ ফকিরের শিষ্যদের মার খাওয়া, তাদের আহাজারি-আর্তনাদ। অদ্ভুত সুন্দর একটি রাত পার করার পরই যে সকালটা এমন বিষন্নতায় ভ'রে উঠবে তা কে ভেবেছিল! সুস্বাদু মিষ্টি খাবার পরই মুখে ভীষণ তেতো স্বাদ পেলে যে অনুভূতি হয়, হৃদয় আপ্লুত করা রাতের পর আমার হৃদয়েও তেমনি বিপরীত অনুভূতি হচ্ছে এখন।

আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে পড়ি, একবার ভাবি আবিরকে ডাকবো কিনা, তারপর মনে হয় থাক বেচারা আরেকটু ঘুমাক, উঠলেই তো খবরটা শুনে মনের শান্তি নষ্ট হবে। আমি দরজা খুলে বারান্দায় যাই, আরশাদ ফকির ব'সে আছেন খুঁটিতে হেলান দিয়ে, তার পাশেই আফজাল ভাই বসে। ঘুম থেকে উঠেই দুঃসংবাদ শুনে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আফজাল ভাইয়ের গুরুমা আর ভাবী।
আফজাল ভাই ভাবীকে তাড়া দেয়, 'জলদি দুডে ফ্যানাভাত চড়ায় দাও।'

আরশাদ ফকির বলেন, 'এখন আর মুখে কিছু যাবিনানে বাবা, খাতি গিলি দেরি হয়ে যাবিনি।'
'হাত মুখ ধুতি ধুতি হয়ে যাবিনি বাবা। তুমি যাও।' ভাবীকে আবার তাড়া দেয় আফজাল ভাই। ভাবী রান্নাঘরের দিকে ছোটে।

আফজাল ভাই আমার উদ্দেশে বলে, 'সর্বনাশ অয়ে গেছে ভাইডি। বাবার আখড়া আগুন দিয়ে পুড়ায়ে দিছে। গুরু ভাইদের মারধর করিছে।'
আমি আরশাদ ফকিরের কাছে গিয়ে বসি। তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকান, দু'চোখ তার সংযত জলের কুয়ো!

আরশাদ ফকির, তার সাধনসঙ্গিনী আর আফজাল ভাইকে গাবতলী থেকে মেহেরপুরের বাসে তুলে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমরাও ফেরার বাসে উঠে বসি। আমার চোখে ভাসে আরশাদ ফকিরের জল ছলছল দু'টি চোখ, কানে বাজে তাদেরকে সিটে বসিয়ে বাস থেকে নামার সময় আমাদের উদ্দেশে বলা তার কথা, 'ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তাতে কি হয়ছে, গাছতলা তো আছে, গাছতলা আর তিনতলা সবই আমাদের কাছে সমান, সবই আমাদের আনন্দধাম; তবে কি জানো বাবা, প্রাণে বড় আঘাত লাগে মানুষের এই সহিংসতা দেখে; একবার যেও তোমরা দু'জন ওই গাছতলাতেই!'

বাউল-ফকিরদের ওপর এই হামলা, তাদেরকে উৎখাত করার কিংবা চুল-দাড়ি কেটে বা নিগ্রহের মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সমাজে ফিরিয়ে নেবার অপচেষ্টা নতুন নয়; বহুকাল ধরেই এই অপচেষ্টা চলছে। কেবল বাউল-ফকির নয়, ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যখনই যে নতুন ধর্ম বা উপধর্মের জন্ম হয়েছে কিংবা যে বা যারা ধর্মগুলির হাল ধরতে চেয়েছে তাদের সবাইকেই কম-বেশি শারীরিক কিংবা মানসিক নিপীড়ন সইতে হয়েছে। চতুর্দশ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসারকালে শ্রী চৈতন্যকে কেবল মুসলমানদেরই নয়, ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু সমাজপতিদেরও প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। ব্যঙ্গ ক'রে তাকে বলেছে, 'ন্যাকা চৈতন্য'; তার মাথার টিকির নাম দিয়েছে 'চৈতনটিকি'; নানাভাবে উত্যক্ত এবং ঠাট্টা-মশকরা করেছে। এতেও ক্ষান্ত হয় নি বিরোধীরা, চৈতন্যের পক্ষে এমন জনজোয়ার তৈরি হয় যে নিরামিষাশী চৈতন্যের দুর্নাম রটাতে ব্যঙ্গাত্মক গান লিখেও প্রচার করছে–

'কেহো বোলে, "এগুলা সকল নাকি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ–দ্বার না ঘুচায় ॥"
কেহ বোলে–"সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্টপ্রহর ॥"
কেহ বোলে–"আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥"

বন্য প্রাণির মধ্যে শিয়াল যেমনি ধূর্ত, মানুষের মধ্যে তেমনি ব্রাহ্মণ! শত বাধা সৃষ্টি করেও যখন তারা চৈতন্যের অগ্রযাত্রা রোধ করতে ব্যর্থ হয়, যখন দ্যাখে যে বৈশ্য-শূদ্ররা মেনে নিয়েছে চৈতন্যকে; তখন তাদের একটা অংশ একটু একটু ক'রে এগোতে থাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিকে। এ বিষয়ে লোকগীতিকার লেখেন–

'মহাপ্রভুর বিজয়ের কালে
যতো দেশের বিটলে বামুন
তারে পাগল আখ্যা দিলে।
মানুষ অবতার গোঁসাই
সাত্ত্বিক শরীরে উদয়
দেখে তাই পামর সবাই
ভির্মি রোগী বলে ॥
যখন দেখে মিথ্যা কিছু নয়
বৈষ্ণব এক গোত্রসৃষ্টি পায়
দেশের বামুন মিলে সবাই
শাস্তর লিখে নিলে॥'

তারপরও চৈতন্যবিরোধীতা ছিলই। ফলে অভিমানে হোক, আর যে কারণেই হোক, জীবনের শেষ আঠারো বছর চৈতন্য গৌড়বঙ্গে পা রাখেন নি। চৈতন্যের মৃত্যুর পরই বৈষ্ণব হওয়া ব্রাহ্মণরা ঝামেলা পাকাতে শুরু করে। নিত্যানন্দ চৈতন্যের আদর্শ অনুসারে জাতপাতহীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কথা বললেও এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা জোটবদ্ধ হতে থাকে 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব' নামে, আর নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ পুরোপুরি ফিরে আসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা নতুন বিধান দেয় যে কেবলমাত্র তারাই সকল বর্ণের বৈষ্ণবদের দীক্ষা দিতে পারবে; বৈশ্য-শূদ্র বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণদেরকে দীক্ষা দিতে পারবে না, তারা সমবর্ণ বা নিচুবর্ণের বৈষ্ণবদের দীক্ষা দিতে পারবে। বর্ণবাদের যাঁতাকলে ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে নিচু বর্ণ থেকে আসা বৈষ্ণবরা, ফলে বাধ্য হয়েই তারা বেছে নেয় সহজিয়ার পথ। অর্থাৎ জাতপাতহীন একটি উদার ধর্মকে ধর্ষণ করে ব্রাহ্মণরা।

শীতকালে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেই দেখি কোথাও না কোথাও চব্বিশ, বত্রিশ, আটচল্লিশ বা ছাপ্পান্ন প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়, আর সেখানে ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চ বর্ণের মানুষদের উপস্থিতিই শুধু থাকে না, আয়োজক কমিটির হর্তা-কর্তাও তারাই থাকে। বাওন-বাওনীরা সব ঊর্ধ্ববাহু হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে চোখের জলে কপোল ভাসায়! দেখে আমার ভীষণ হাসি পায়, একদিন এদের পূর্বপুরুষরাই ব্যঙ্গাত্মক গান লিখে সকালবেলার টহল কীর্তন 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ'র সুর নকল করে গাইতো–

'নবদ্বীপের বাঁধাঘাটে
নিত্যানন্দ পাঁঠা কাটে



ইস্টিশন ইবুক

নিমাই চাপিয়া ধরে ঠ্যাং!'

আঠারো শতকের শেষদিকে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ অনেক উপধর্ম জেগে ওঠে; যেমন-কর্তাভজা, দরবেশ, সাঁই, গোপ বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, টহলিয়া বৈষ্ণব, গুরুদাসী বৈষ্ণব, বৈরাগী, ফকিরদাসী, সাহেবধনী, কবীরপন্থী, কুড়াপন্থী, বলরামী, চরণদাসী প্রভৃতি; এধরনের আরো অনেক উপধর্ম। ধর্মগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমানের মাথা ব্যথার কারণ। ফলে এদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন বাড়তে থাকে, এটা বহুলাংশে বেড়ে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কোনো কোনো ধর্ম এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ব্রাহ্মণ-মওলানাদের রুটি-রুজি হুমকির মুখে প'ড়ে যায়। যেমন কর্তাভজা; জাতিভেদহীন সমন্বয়বাদী এই ধর্মটির প্রতি এমন জনজোয়ার সৃষ্টি হয় যে অপেক্ষাকৃত উদার ব্রাহ্মধর্মের অনুসারীরাও এই ধর্মটির বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাতে শুরু করে। এসময়ে অন্যান্য উপধর্মের মতো বাউল-ফকির দর্শনের প্রতিও শুরু হয় জনজোয়ার। অসংখ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান বাউল-ফকিরদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে। ফলে এইসব দর্শন বা উপধর্মগুলি সম্পর্কে নোংরা ভাষায় কুরুচিপূর্ণ কুৎসা রটিয়ে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে ব্রাহ্মণ-মওলানারা। শ্রী রামকৃষ্ণের মতো বদ্ধ উন্মাদ ধার্মিক 'যতো মত ততো পথ'র মতো উদার বাণীর মাধ্যমে অনেকের সম্ভ্রম আদায় করলেও উপধর্ম সাধনাকে তিনি আখ্যা দেন বাড়িতে ঢোকার পায়খানার পথ হিসেবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই উপধর্মগুলিও পুরোনো বোতলে নতুন মদ পরিবেশনেরই নামান্তর; মূল হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মতোই অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার আর কাল্পনিক মিথে ঠাসা! তা হলেও ধর্ম পালনের অধিকার সকলেরই আছে, কে কি ধর্ম পালন করবে না করবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার; কাউকে ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া মানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা।

হিন্দুরা মুখে মারলেও মুসলমানরা তাদের পরম্পরাগত-সহজাত পথেই বেছে নেয় সহিংসতার পথ। আলেমদের নির্দেশে তারা বাউল-ফকির নিধনে নামে। আখড়া পুড়িয়ে দেওয়া, একতারা-দোতারা ভেঙে মারধর করা, দাড়ি-গোঁফ কেটে মাথা মুণ্ডন করা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণভয়ে অনেক বাউল-ফকির নিজে থেকেই চুল-দাড়ি কেটে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। আগুনে ঘি ঢালেন মীর মোশাররফ হোসেন; যাকে 'প্রথম সার্থক মুসলমান সাহিত্যিক' বলতে বলতে এযাবৎ মুসলমানদের মুখে টনটন গ্যাঁজলা উঠেছে, লিখতে লিখতে মণ মণ কালি আর না জানি কতো সহস্র দিস্তা কাগজ ফুরিয়েছে! তিনি লেখেন–

'ঠ্যাঁটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকির
এরা আসল শয়তান কাফের বেঈমান।'



ইস্টিশন ইবুক

তিনি কতোটা সার্থক মুসলমান, কতোটা সার্থক মুসলমান সাহিত্যিক ছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এই লেখাটির মাধ্যমে তিনি যে অন্ধ আলেম আর তার সাহিত্যিক সত্তার ভেদ ঘুচিয়ে দেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই! জানি না তার এই উস্কানিতে কতো বাউল-ফকিরের আখড়ায় আগুন জ্বলেছে, কতো বাউল-ফকিরের মাথায় একতারা-দোতারা আর লাঠির বারি পড়েছে, কতো বাউল-ফকিরের চুল-দাড়ি কেটে তাদের হৃদয় রক্তাক্ত করা হয়েছে!

মুসলমানদের এই বাউল-ফকির বিরোধী অভিযান চলতে চলতে ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম ক'রে পৌঁছোয় বিশ শতাব্দীতে। বাউল-ফকির নির্মূলে রংপুরের মৌলানা রেয়াজুউদ্দিন আহমেদ লেখেন 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' নামক বই; যা কট্টরপন্থী মুসলমান সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং বাউল নিধনে মানুষকে বিপুল উৎসাহ যোগায়। পাকিস্থান আমলে ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে পূর্ব-পাকিস্থানের বাউলদের ওপর। তারপর দেশ স্বাধীন হয়, গণতন্ত্র নামক এক গালভরা অভিজাত নাম যুক্ত হয় আমাদের সংবিধানে, ওই গণতন্ত্রের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে বাউল নিপীড়ন এসে পৌঁছায় এই একবিংশ শতাব্দীতেও। বাংলাদেশে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গেও অতীতের মতো ব্রাহ্মণদের এখন আর তেমন প্রভাব নেই, শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা তারা মানুষকে অতীতের মতো বেঁধে রাখতে পারছে না। উল্টোদিকে আলেম এবং ধর্মান্ধ মুসলমানের সংখ্যা এবং প্রভাব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ফলে ভিন্নমতের ওপর নিরন্তর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে তারা। আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়ার মুসলিম অধ্যুসিত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের হাতে প্রতিনিয়ত নিগ্রহের শিকার হচ্ছে বাউল-ফকিররা।

দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমানোর আগে আফজাল ভাইকে ফোন দিই, তারা এখনো পৌঁছায়নি আরশাদ ফকিরের গ্রামে। ফোন রেখে শুয়ে পড়ি; রাতে ভাল ঘুম হয় নি, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে কিন্তু মাথার ভেতরে আখড়া পোড়ানোর অদেখা ছবি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার কিছু আগে। ঘুম ভাঙতেই আবারো মাথায় চাগাড় দিয়ে ওঠে আখড়া পোড়ানোর ছবিটাই। ফোন হাতে নিয়ে দেখি আফজাল ভাই আমাকে ফোন করেছে দু-বার; সাইলেন্স থাকায় বুঝতে পারি নি। আফজাল ভাইকে ফোন ক'রে জানতে পারি, আখড়ার একটা ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আরেকটার অর্ধেক পুড়েছে। তিনজন বাউলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে, একজনের অবস্থা খুব খারাপ।

বিষাদে ভ'রে যায় মনটা, যার অবস্থা বেশি খারাপ সে বাঁচবে তো? বাঁচলেই ভাল। এতোদিন লেখক-বাউল-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর একের পর এক হামলা হলেও সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে নি, সরকার হেফাজতে ইসলামের মন রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। এখন আর এটা কোনো লুকোনো ব্যাপার নয় যে হেফাজতে ইসলামের প্রধান শফি হুজুরের কওমি মাদ্রাসা জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত, বানের জলের মতো দেশের আনাচে-কানাচে বেড়েছে এই

মাদ্রাসা, চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিবাদ; শফি হুজুর নিজেও জঙ্গিবাদী বক্তব্য দিয়েছে বহুবার, তারপরও সরকার গ্রেফতার করার পরিবর্তে তাকে তুষ্ট করতে এবং তাদের আন্দোলন দমিয়ে রাখতে দান করেছে সত্তর কোটি টাকার সরকারী জমি, দিয়েছে নানান সুযোগ-সুবিধা।

হলি আর্টিজানে জিম্মি এবং হত্যার পর সরকার কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে, আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে আর দেশি-বিদেশী সংবাদ মাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে দেখাতে জঙ্গি ধরপাকড় শুরু করেছে। এ থেকেই জঙ্গিদের ব্যাপারে সরকারের আপোষকামী মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। এসব জঙ্গিদের আগে কেন ধরে নি সরকার? এই প্রশ্ন এখন জনমনে।

ফোন ক'রে শাশ্বতীদি আর পরাগদাকে আরশাদ ফকিরের আখড়া আক্রান্ত হওয়ার দুঃসংবাদটি জানাই। ওরাও আমারই মতো ব্যথিত। আমার ঘরের দরজায় কেউ নক করছে। উঠে দরজা খুলে দেখি মা টেবিলে ইফতার সাজাচ্ছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ইফতার দেব তোরে?'
'আমি মুখ ধুয়ে পরে খাব।'

বাবা ডাইনিং টেবিলে এসে চেয়ার টেনে বসার সময় একবার তাকান আমার দিকে। আমি দরজা খোলা রেখেই বিছানায় এসে বসি। একটু পরই মসজিদের মাইকে বেজে ওঠে মুয়াজ্জিনের কর্কশ স্বর, আর আমার চৈতন্যে বেজে ওঠে আফজাল ভাইয়ের কণ্ঠে শোনা একটি গানের সুর–

মনপাখি চায় মনের আকাশে উড়িতে
মৌলবী চায় তারে শরিয়তের খাঁচায় পুরিতে
শরিয়তের জটিল-কুটিল ফাঁদে
মনপাখি বিষম জ্বালায় কাঁদে
দিবানিশি মনপাখি মনের মানুষ খোঁজে
অন্ধ মৌলবী সে কথা নাহি বোঝে।



এখন অনেক রাত, চারপাশ ঝিমিয়ে পড়েছে। কারেন্ট না থাকায় বারান্দার চেয়োরে এসে বসতেই হঠাৎ সন্ধ্যায় দেখা বাসের লোকটির কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর আবির আর আমি বান্দরবান ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ আর টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে শাশ্বতীদির বাসায় গিয়েছিলাম ভ্রমণ সংক্রান্ত শলাপরামর্শ করতে। মিরপুর থেকে যাবার সময় আমার পাশের সিটে বসে এক বৃদ্ধ, বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে জিকির শুরু করে। লোকটা মাথা দুলিয়ে জিকির করার ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকায়, তার মুখের পান-সুপারি-জর্দা পচা গন্ধে গুলিয়ে ওঠে আমার পেট। একবার চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকালে জিকিরের শব্দ এবং গতি আরো বেড়ে যায়। মুখের দূর্গন্ধে টিকতে না পেরে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে নিজেই উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পাবলিক বাস যে জিকির করার জায়গা নয়, সেটা বোঝাতে গেলেই হয়তো বাসের অধিকাংশ যাত্রী আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যেতো, ফলে আমি নিজেই স'রে যাই অন্যখানে। এটাও সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর এক ধরনের নিপীড়ন, কিন্তু তা বোঝার মতো বোধ অধিকাংশ সংখ্যগুরুর নেই।

মোবাইলে ফেসবুকে ঢুকে দেখি আরশাদ ফকিরের আখড়ায় হামলার প্রতিবাদে আবির একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে। কে আরশাদ ফকির, কোথাকার আরশাদ ফকির, এই সমাজের কয়জনই বা তার আখড়া পোড়ানোর খবরে বিচলিত হয়! অধিকাংশ মানুষ-ই ফেসবুকে ব্যস্ত মুখ বিকৃত ক'রে তোলা বাহারি সব সেলফি শেয়ার আর লাগামহীন আত্মপ্রচার করায়। সামাজিক অবক্ষয় তাদের চেতনায় নাড়া দেয় না, কিন্তু অবক্ষয় এমনই সংক্রামক যে ক্রমান্বয়ে সকলকেই ক্ষয় করে।

আবিরের স্ট্যাটাস পড়ার পর নিচের দিকে নামতেই দেখি শাশ্বতীদি জন্মান্তরের শেষ পর্ব শেয়ার দিয়েছে। যথারীতি গালির বন্যা বইয়ে দিয়েছে ছাগুর দল, আছে অসময়ের বৃষ্টির মতো ছিটেফোঁটা প্রশংসাও। পল্লবী লিখেছে, 'আমার কী ঈর্ষা হচ্ছে? না, কান্না পাচ্ছে। বেঁচে থাকার অক্সিজেন পেলাম দিদি।'

শাশ্বতীদির বাসাতেই পল্লবীর সঙ্গে আমার সামনাসামনি পরিচয়, তবে তার আগে থেকেই ওকে নামে চিনতাম। শাশ্বতীদি-ই বলেছিল ওর কথা, দিদির ফেসবুক স্ট্যাটাসেও ওকে মন্তব্য করতে দেখতাম মাঝে মাঝে। পল্লবীর জৈবলিঙ্গ পুরুষের হলেও মনোলিঙ্গ নারীর। ওর পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত নাম আনোয়ার হোসেন, পল্লব নামে ডাকতো সবাই। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ও পুরোপুরি নারীর বেশ ধারণ ক'রে সারাফ আতিকা পল্লবী নামে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করে। প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের দু'জনের জন্যই খানিকটা তেতো। তখন শাশ্বতীদি আমাদের জন্য খাবার বানাচ্ছিল। ড্রয়িংরুমে ছিলাম আমি, পরাগদা, পল্লবী আর ওর বান্ধবী।

আমি পল্লবী'র আগে সহি শব্দদ্বয় 'সারাফ আতিকা' নামের অর্থ জানতে চাইলে ও বেশ ভাবের সঙ্গে বলে, 'গানরত সুন্দরী!'
'বা, খুব ভাল নাম তো! কে রেখেছে, আপনি নিজেই না অন্য কেউ?'
মুখে গর্বের হাসি ছড়িয়ে বলে, 'আমিই!'
'সারাফ আতিকা আরবি কিংবা ফারসি শব্দ, আপনার এই নাম গ্রহণের কোনো বিশেষত্ব আছে কী?
পরিস্থিতি আগাম আঁচ করতে পেরেই কিনা কে জানে পরাগদা শাশ্বতীদির কাজের অগ্রগতির খোঁজ নিতে কিচেনের দিকে চ'লে যায়।
পল্লবী বলে, 'না তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই, নামটা আমার পছন্দ হয়েছে তাই।'
'এই আরবি কিংবা ফারসি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ভাষার নাম আপনার পছন্দ হলো না কেন?'
'আসলে আরবি নাম রাখা তো ইসলামী রেওয়াজ, তাই।'
'কিন্তু ইসলামে তো সুন্দরীদের গান গাওয়াই নিষেধ!'

‘কে বললো আপনাকে?’
‘কোরান-হাদিস বলেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনি কোনো মওলানাকে জিজ্ঞেস ক’রে দেখবেন।’
‘ওগুলো তো এক নম্বর হারামি! আমি ওদের কথা বিশ্বাস করি না, ওরা ভণ্ড, ভেক ধ’রে থাকে আর মিথ্যা কথা বলে, আকাম-কুকাম করে!’
আমি মৃদু হেসে বলি, ‘আপনি আল্লাহ্-নবী-ইসলাম এসবে বিশ্বাস করেন?’
‘অবশ্যই করি।’
‘আপনার আল্লাহ্’র নবী আপনার মতো মানুষদেরকে কী করতে বলেছেন জানেন?’
‘কী?’
‘ঘর থেকে বের ক’রে দিতে বলেছেন, নির্বাসনে পাঠাতে বলেছেন।’
‘এসব মিথ্যে কথা।’
‘সত্য কথা।’
‘ইসলামে এসব থাকতেই পারে না, কোনো ধর্মেই না।’

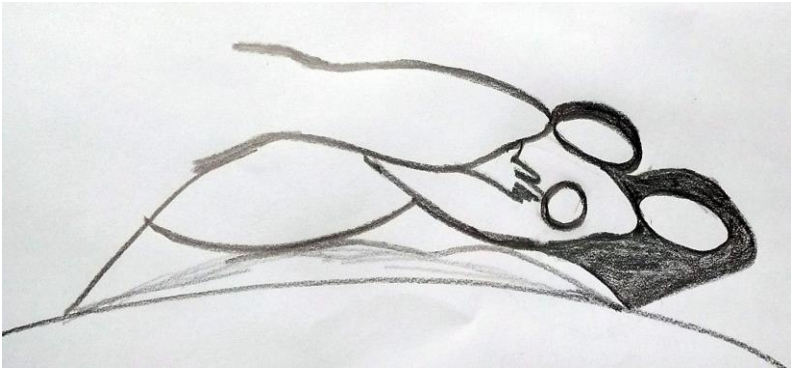
ও বেশ উত্তেজিত। ওকে কিছুক্ষণ ধর্মের ছাফাই গাওয়ার সুযোগ দিই। ওর বান্ধবীও বলতে শুরু করে। ওরা বেশ জ্ঞানগর্ভ কথা বলে আর আমি শুনি। তারপর বলি, ‘আমি যদি আপনাদেরকে প্রমাণ দেখাই, তাহলে বিশ্বাস করবেন?’
‘আপনি দেখান প্রমাণ।’

ততোক্ষণে খাবার নিয়ে পরাগ আর শাশ্বতীদি চ’লে এসেছে। আমি মোবাইলে রাখা বোখারি শরিফের পিডিএফ ফাইল খুলে পল্লবী আর ওর বান্ধবীকে দেখাই যে হিজড়া কিংবা ছেলেদের মতো আচরণ করা মেয়ে অথবা মেয়েদের মতো আচরণ করা ছেলেদের সম্পর্কে ওদের পেয়ারের নবী কি বলেছে!

ওরা হাওয়া বের করা বেলুনের মতো চুপসে যায়, বিশেষত পল্লবী! সেদিন সন্ধ্যায় আমার সামনে ওরা আর স্বতস্ফুর্ত হতে পারে নি। কয়েকদিন পরেই ফেসবুকে দেখি সারাফ আতিকা ছেটে ফেলে ও শুধু পল্লবী হয়ে গেছে। আর আমকে পাঠিয়েছে এক বার্তা–‘সেদিন আপনার সঙ্গে তর্ক করার জন্য দুঃখিত। আসলে ধর্ম সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। আমার জানা ততোটুকুই যতোটুকু শুনেছি বড়দের মুখে। তবে সেদিনের পর থেকে ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করেছি। আবার দেখা হবে, শুভরাত্রি।’

তারপর আমাদের মধ্যে ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, একই বয়সী হওয়ায় আপনি’র ব্যবধান ঘুচিয়ে আমরা এখন তুই সম্বোধন করি। অনেকবার শাশ্বতীদির বাসায় আমাদের আড্ডা হয়েছে। আমরা একবার একসাথে ঘুরতেও গেছি গাঢ় পাহাড়ে। জেনেছি ওর ভেতরের গোপন ব্যথার কথা। ওর বাবা-মা ওকে বাড়ি থেকে বের ক’রে দেন নি ঠিকই, কিন্তু ওর প্রতি

তাদের আচরণ খুব একটা সুখকর নয়। বিশেষত ওর ভাই-বোনেরা ওর প্রতি খুবই বিরূপ, তারা সমাজে ওর পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। সামাজিক, ধর্মীয় বা যে-কোনো ধরনের অনুষ্ঠানে তারা ওর সঙ্গে যায় না। কৈশোরে ওকে অনেকবার ধর্ষণ করেছে ওর মামাতো-খালাতো ভাইয়েরা। ওর দ্বিগুণ বয়েসের এক মামাতো ভাই ঘন ঘন ওদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো, যেহেতু বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর ছিল না, তাই মামাতো ভাই এলেই ওর সঙ্গে শুতো আর নানান রকম প্রলোভন দেখিয়ে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করতো। ভয়ে-লজ্জায় ও সে-সব কথা কাউকেই বলতে পারে নি। ওর সেই মামাতো ভাই এখন দাড়ি রেখে, টুপি-পাঞ্জাবি প'রে হুজুর হয়েছে; এলাকার মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। কারেন্ট এসে গেছে। ঘরে গিয়ে কম্পিউটার চালিয়ে শাশ্বতীদির ব্লগে ঢুকি।



# জন্মান্তর: শেষ পর্ব

অনার্সের রেজাল্ট হওয়ার পরপরই আমি ফুলটাইম চাকরিতে ঢুকে পড়লাম–এনজিও'তে, আর অরিত্র একটা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলো। পড়াশোনার ক্ষতি হবে ব'লে অরিত্র'র বাড়ি থেকে ওর বাবা-মা ওকে মাস্টার্স শেষ করার পর চাকরি করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু ও চাকরি ছাড়ে নি। আসলে তখন আমরা আর হলে থাকতে চাইছিলাম, বাসা নিয়ে নিজেদের মতো থাকতে চেয়েছিলাম, ফলে টাকার প্রয়োজন ছিল আমাদের। আমরা দুই রুমের ছোট্ট বাসা ভাড়া নিলাম আজিমপুরে; একটা আমাদের থাকার ঘর, আরেকটা বসার। একটু একটু ক'রে আমরা সবকিছু নিজেদের রুচি মতো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু দুই মাসের মাথায় আমাদেরকে বাসা ছাড়তে হলো। পহেলা বৈশাখে আমি শাড়ি-চুড়ি প'রে সেজেগুঁজে বেরিয়েছিলাম অরিত্র'র সঙ্গে, সেই প্রথম আমি নারীর বেশে প্রকাশ্যে ওর সঙ্গে বের হলাম। আমি লালপাড় সাদা শাড়ি আর লাল ব্লাউজ পরেছিলাম, নববর্ষ উপলক্ষে চাঁদনী চক থেকে কিনে অরিত্র আমায় উপহার দিয়েছিল। সেই প্রথম আমার নিজের একটা শাড়ি হলো, একদম নিজের! এর আগে আমি বাড়িতে বেশ কয়েকবার দরজা বন্ধ ক'রে মায়ের শাড়ি লুকিয়ে পরেছিলাম, তুলিভাবীও কয়েকবার তার শাড়ি আমাকে পরিয়ে দিয়েছিল, সে-ও বদ্ধ ঘরে! নববর্ষের আগের রাতে আমি শাড়িটা হাতে নিয়ে বারবার গন্ধ শুকেছিলাম, ভীষণ উত্তেজনায় ছিলাম এই ভেবে যে কাল আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে, কাল আমি আমার প্রিয়জনের উপহার দেওয়া শাড়ি প'রে তার হাত ধরেই ঘুরতে যাব। আমিও অরিত্রকে উপহার দিয়েছিলাম পাঞ্জাবি আর পাজামা। দু'জন দু'জনের উপহার দেওয়া পোশাক প'রে নববর্ষের সকালে বেরিয়েছিলাম; চাঁদি ফাটানো রোদে সারাটা দিন টিএসসি, সোহরওয়ার্দী উদ্যান, চারুকলায় ঘুরে আর নিজেদের পছন্দ মতো খাবার খেয়ে কী যে ভাল কেটেছিল আমাদের সময়! অরিত্র তো আগেও বেরিয়েছে ওর আগের প্রেমিকাকে নিয়ে, কিন্তু আমি তো

প্রথম, তাই আমার উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধ ভাঙা! সারাটা দিন অতুল আনন্দে কাটিয়ে বাসায় ফেরার দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সারাদিনের আনন্দ মাটি করতে হাজির হলো বাড়িওয়ালা, আমাদের বাসা ছেড়ে দিতে হবে!

আমি তখন ভেতরের ঘরে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ফুলের মালা খুলছিলাম। কিন্তু আমার কান অরিত্র আর বাড়িওয়ালার কথায়। অরিত্র বললো, 'আংকেল, আমরা গতমাসে উঠলাম, আর এখনই আমাদের বাসা ছেড়ে দিতে বলছেন কেন?'
'এমনিই, আমার এক আত্মীয়রে তুলুম।'
'আপনার আত্মীয়কে তুলবেন বেশ ভাল কথা, তাহলে শুধু শুধু দুই মাসের জন্য বাসা ভাড়া দিয়ে আমাদেরকে হয়রানি করলেন কেন? কী হয়েছে বলেন তো?'
'কিছু অয় নাই, তোমরা বাসা ছাইড়া দ্যাও।' বাড়িওয়ালার কথাবার্তা শুরু থেকেই রুক্ষ।
'বাসা ছাড়তে হলেও এ মাসে ছাড়তে পারবো না, তিনমাস সময় দিতে হবে।'
'না, তোমাগো এই মাসেই বাসা ছাড়তে অইবো।'

অরিত্র বেশ চড়া গলায় বললো, 'আপনি বললেই হলো! আজকে মাসের চৌদ্দ তারিখ, চৌদ্দ তারিখে আপনি কোনো ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিতে পারেন না। কথা ছিল আমরা বাসা ছাড়লে পাঁচ তারিখের মধ্যে বলতে হবে, আবার বাসা ছাড়তে হ'লে আপনিও আমাদেরকে পাঁচ তারিখের মধ্যে বলবেন।'

বাড়িওয়ালাও গলা চড়ালো, 'বাসা ভাড়া নেওনের সময় তোমরাও তো কইছিলা যে তোমরা দুই বন্ধু, অহন তো দেখতাছি তোমার লগেরডা হিজড়া; মাইয়াগো মতো কাপড় পইরা ঘর থেইকা বাইর অয়!'
শুনে আমি তো থ! শাড়ির আঁচলটা বিছানায় ফেলে সবে কোমর থেকে কুঁচিগুলো বের করেছি; থমকে গেল আমার হাত।
অরিত্র বললো, 'একজন মানুষ নিজেকে ছেলে ভাবে না মেয়ে ভাবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে শাড়ি প'রে বাইরে যাবে নাকি জিন্স প'রে বাইরে যাবে, সেটাও তার ব্যক্তিগত ব্যাপার; আমি বা আপনি তার পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক ক'রে দিতে পারি না।'
'আমার বাসা আমি কারে ভাড়া দিমু আর কারে দিমু না সেইডাও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার বাড়িতে আমি হিজড়া ভাড়া দিমু না।'

আমি হাতে ধ'রে থাকা কুঁচিগুলো পুনরায় কোমরে গুঁজে, আঁচলটা বিছানা থেকে কুড়িয়ে কাঁধে ফেলে দু'জনের বাক-বিতণ্ডার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাড়িওয়ালা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা বলছিল আর তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে অরিত্র। বাড়িওয়ালা আমাকে দেখে আমার দিকে আঙুল তুলে বললো, 'অয় তো একটা হিজড়া, অস্বীকার করতে পারবা? অস্বীকার করো তো পাঁচজনরে ডাক দিয়া দ্যাহাই, দেহুক সবাই অয় হিজড়া কিনা!'

অরিত্র'র চোখ-মুখ রক্তবর্ণ, বাড়িওয়ালা আবার বললো, 'অ্যাদ্দিন ওরে প্যান্ট পইরা ঘুইরা বেড়াইতে দেখছি, আইজ আবার পরছে কাপড়; ব্যাটা মানুষ আবার কাপড় পরে নি! ওরে তো আমি দাড়িও কামাইতে দেখছি, মাইয়া মাইনষের মুহে দাড়ি গজায় এই কতা বাপের জন্মে কেউ কোনোদিন হুনছে? পরথমে বুঝি নাই, অহন তো কিলাশ টুয়ের বাচ্চাও ওরে দেইখা বুঝবো যে অয় একটা হিজড়া!'
অরিত্র বললো, 'পুরুষের দেহ নিয়ে জন্মালেও নিজেকে ও মেয়ে-ই মনে করে।'
'আস্তাকফিরুল্লাহ্! কয় কী, কোনো পোলায়নি নিজেরে মাইয়া ভাবে, হিজড়া কুনহানকার একটা!'
'আপনি ভদ্রভাবে কথা বলেন, অসভ্যের মতো কথা বলবেন না।'
'একটা হিজড়ারে নিয়া হুইয়া থাহো, আবার আমারে ভদ্রতা শেহাও!'
'আমি কাকে নিয়ে শুয়ে থাকবো সেটা আপনি ঠিক ক'রে দেবেন?'
আমি বললাম, 'আংকেল আমি একজন নারী, কেন আমি নারী সেই ব্যাখ্যা আপনাকে দিতাম যদি তা বোঝার মতো নূন্যতম সু-শিক্ষা আপনার থাকতো; কিন্তু আপনার সেই সু-শিক্ষা নেই, সুতরাং আপনাকে বলেও কোনো লাভ নেই।'
'কি মনে করছো তোমরা, আমি অশিক্ষিত? ছিয়াত্তর সালে বি এ পাশ করছি। তহন তোমাগো জন্মও অয় নাই!'
'আপনি খেটেখুটে একটা অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট বগলদাবা করেছেন, কিন্তু সু-শিক্ষা পান নি।'
'তুমি চুপ থাহো, বেহায়া হিজড়া কুনহানকার!'
অরিত্র আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারলো না, বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো বললো, 'আপনি যান, আমরা এই মাসেই আপনার বাসা ছেড়ে দেব, আপনার মতো অসভ্য ইতরের বাসায় আমার আর ভাল ঘুম হবে না।'
'মুখ সামলাইয়া কথা কও বেয়াদ্দপ, চিনো আমারে!'
অরিত্র বাড়িওয়ালার চোখে রক্তচক্ষু রেখে আঙুল তুলে বললো, 'আপনি যে চ্যাটের বাল হরিদাস পাল-ই হন, আপনারে বাল দিয়েও পোছার টাইম নাই আমার! বলছি বাসা ছেড়ে দেব, আর একটা কথাও বাড়াবেন না, আমার সামনের থেকে বিদায় হন।'
'মুখ সামলাইয়া কতা কও, বেয়াদ্দপ পোলা! আমার বাসার থাইকা তুমি আমারে বাইর ক'রে দেওনের ক্যাডা?'
'আপনার বাসায় মাঙনা থাকি না, টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়েছি, আপনি অসভ্যতা করলে আপনাকে বের ক'রে দেবার রাইট আমাদের আছে।'

দু'জনের তর্ক-বিতর্ক শুনে বাড়িওয়ালার মেয়ে এবং স্ত্রী আমাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারাও পিছন থেকে টুকরো টুকরো বাক্য নিক্ষেপ করতে লাগলো। আমি অরিত্র'র কাছে গিয়ে বললাম, 'বাদ দাও, আর একটা কথাও বলবে না।'
বাড়িওয়ালার উদ্দেশে বললাম, 'আপনি যান, আমরা এক তারিখে বাসা ছেড়ে দেব।'

বাড়িওয়ালা আমার দিকে তাকালোও না। অরিত্র'র দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি চাইলে এই মুহূর্তে তোমাগো ঘাড় ধইরা বাড়ি থেইকা বাইর কইরা দিতে পারি।'
নারাচের বিপরীতে অরিত্রও পাল্টা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলো, 'ঢাকা কলেজের হল থেকে আমার নাম এখনো কাটা যায় নাই, আপনার বাড়ি শ্মশান বানাইতে আমার ত্রিশ মিনিটও লাগবে না!'

ব্রহ্মাস্ত্রে যে কাজ হলো তা বুঝলাম বাড়িওয়ালার মুখাবয়বের আকর্ষিক পরিবর্তন দেখে, কিন্তু তিনি মুখে হারতে চাইলেন না, 'আমারে হলের গুণ্ডা পোলাপাইনের ভয় দ্যাহাও! তোমারে কি করতে পারি জানো?'
'আপনি যা পারেন, কইরেন; তারপর আমিও দেখাবো আমি কি করতে পারি!'
বাড়িওয়ালার মেয়ে পিছন থেকে তার হাত ধ'রে টানলো, 'আব্বু চ'লে আসো, হোস্টেলের এইসব ছেলেরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।'

বাড়িওয়ালাকে তার মেয়ে ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে গেল। এরই মধ্যে সিঁড়ির কাছে অন্য ভাড়াটিয়ারা জড়ো হয়েছে। নিচের দিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন বললো, 'ছি ছি, ভদ্রলোকের বাসায় এসব কী! দুনিয়ায় এ কী শুরু অইলো, কেয়ামতের আর দেরি নাই!'
লোকটাকে কিছু বলার জন্য অরিত্র দরজার দিকে এগোতেই আমি ওর হাত ধরলাম, আমার হাত ছাড়িয়ে দরজার বাইরে গিয়ে ও লোকটার উদ্দেশে বললো, 'ওই তুই কোন বালের ভদ্রলোকরে, পিছন থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলিস ক্যান, সামনে এসে কথা বল তোর কেয়ামত এক্ষুনি দেখায়ে দেই!'

কোনো কথা না ব'লে লোকটা সুড়সুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, অন্য ভাড়াটিয়ারাও স'রে পড়লো। বাড়িওয়ালা, তার স্ত্রী আর মেয়ে গজগজ করতে করতে চ'লে গেল। অরিত্র ক্ষোভের সাথে শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ করলো।

ওইদিনের আগে আমি ওকে কখনোই রাগ করতে দেখি নি, ও যে ওভাবে রেগে যেতে পারে তা আমি ভাবতেও পারি নি। ও আমার অপমান হজম ক'রে বাড়িওয়ালার সাথে পুতুপুতু ভাষায় কথা না ব'লে জোর গলায় প্রতিবাদ করেছিল, এমনকি স্ল্যাং-ও ব্যবহার করেছিল; এটা যে কি ভাল লেগেছিল আমার তা বলার নয়, ওর জন্য গর্বে বুকটা ভ'রে উঠেছিল! সেদিন আমি আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, ওকে ভালবেসে আমি একটুও ভুল করি নি, প্রয়োজনে ও আমার জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না; ও আমার জীবনের এক অমূল্য প্রাপ্তি!

পরের মাসেই আমরা মোহাম্মদপুরে নতুন বাসায় উঠলাম। নতুন ভাবে নিজেদের মতো ক'রে সাজালাম বাসাটা। তবে আমি আর শাড়ি প'রে বাইরে বের হতাম না নতুন কোনো ঝামেলার আশঙ্কায়, এ ব্যাপারে অরিত্রও আমাকে কিছু বলতো না।

এরপরই আরেক আঘাত পেলাম আমার বাড়ি থেকে। আব্বা-আম্মা আমার জন্য আগে থেকেই পাত্রী ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আব্বার ফুফাতো বোনের মেয়ে। তারা কাবিন ক'রে রাখতে চায়, তারপর দু-এক বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বউকে বাড়িতে আনা হবে। শুনে আমি অবাক হই নি, কেননা আমি জানতাম যে কোনো একদিন আমাকে এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু নিজে থেকে কি ক'রে আব্বা-আম্মাকে খুলে বলি! আমি খুলে বললে আব্বার যে উগ্র প্রতিক্রিয়া হবে, আম্মার যে বেদনাতুর নীরবতা আর কান্না আমাকে দেখতে হবে, সেই পরিস্থিতি আমার জন্য মোটেও সুখের হবে না। তাই তুলিভাবীর স্মরণাপন্ন হলাম, তুলিভাবী আগে বাড়িতে বলুক, আব্বা-আম্মা আগে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাক তারপর আমি তাদের মুখোমুখি হবো। তুলিভাবী আমার আর অরিত্র'র ব্যাপারে আগেই সব জানতো, অরিত্রকে সে দেখেছেও। সেই যে আমি যশোর থেকে চ'লে এলাম, তারপর কথা মতো ঢাকায় ফেরার পথে অরিত্র আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তিনদিন ছিল। আমার আব্বা-আম্মা আর বুবুরা ওকে আমার বন্ধু হিসেবে খুব পছন্দ করেছিল। তখনই অরিত্র'র সঙ্গে তুলিভাবীর পরিচয় করিয়ে দিই, তাকে সব খুলে বলি, আর তখন থেকেই ওর সঙ্গেও তুলিভাবীর দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে; যা আজো অটুট। তুলিভাবী সম্পর্কে সব কথা আমি আগেই বলেছিলাম অরিত্রকে। শ্মশানঘাটে আমাদের নতুন জীবন শুরুর আগে থেকেই আমরা দু'জন দু'জনের অতীতের সকল কথা জানতাম।

তুলিভাবী বাড়িতে বলার পর আব্বা আমাকে ফোন দেন নি, আমার তিন বুবু, দুই দুলাভাই আর মা ফোন দিয়েছিলেন; ছোটবুবুর তখনো বিয়ে হয় নি। আম্মা ফোন দিয়ে রীতিমতো কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমি তাদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমার শরীর যা চায়, মন যা চায়, তার ওপর তো আমি জোর করতে পারি না; তোমরা আঘাত পাবে বলেই আমি এতোদিন একথা কাউকে বলি নি বা মেয়ের মতো জীবন-যাপন করি নি; কিন্তু নিজেকে আমি মেয়ে বলেই মনে করি। তারা আমায় বাড়ি যেতে বললেন, পরদিনই গেলাম বাড়িতে। বাড়ি যাবার আগে অরিত্র আমাকে বারবার বোঝালো যে আমি যেন কোনোভাবেই রেগে না যাই, সবাইকে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাই। বাড়ি গিয়ে ঘরে ঢোকামাত্র আম্মা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে হাউ-মাউ ক'রে এমনভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যেন আমার কোনো মৃত্যুরোগ হয়েছে! ছোটবুবু নীরবে চোখের জল ফেললো অদূরে দাঁড়িয়ে। সেদিন বিকেলেই বড় বুবু এলো ছোটো ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে, কাজ থাকায় বড় দুলাভাই আসতে পারলেন না; সন্ধ্যায় এলো মেজো বুবু আর মেজো দুলাভাই। আব্বার সাথে একবার মুখোমুখি দেখা হলেও আমার সাথে কথা বললেন না। আব্বা আমার কাছ থেকে লুকোতে চাইলেন, কোথায় যেন গেলেন, রাতের আগে আর বাড়ি ফিরলেন না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বসার ঘরে সবাই আমাকে নিয়ে বসলেন, ভাগ্নেকে অন্যঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই। সকলেই উদ্বিগ্ন, সেটা স্বাভাবিক; কেননা আমি সবার ছোট এবং সকলেরই আদরের; সবাই যেখানে অপেক্ষায় আছে আমার একটা লাল টুকটুকে বউ দেখার, সেখানে আমি নিজেই কিনা আরেকজনের বউ হতে চাই! যদিও তুলিভাবী আব্বা-আম্মাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে, তবু সকলেই আমার মুখ থেকে বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন। আব্বার সামনে আমার বলতে লজ্জা লাগলেও আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম মনোলিঙ্গ-জৈবলিঙ্গ সম্পর্কে; বোঝালাম যে আমার দেহটা পুরুষের হলেও মনটা নারীর; নিজেকে আমি নারী-ই মনে করি।'
আব্বা বিষন্ন-শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'পুরুষ মানুষের লিঙ্গ থাকলি সে কখনো মেয়ে হয় না।'
আমি আব্বার দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'আব্বা হয়। এটা বৈজ্ঞানিকভবেও প্রমাণিত।'
'বিজ্ঞান যদি সবকিছু প্রমাণ করবার পারতো, তালি তো হায়াত-মউত সব বৈজ্ঞানিকরাই নিয়ন্ত্রণ করতো। মানুষ আর আল্লারে না ডাকে বৈজ্ঞানিকদের আল্লাহ্'র জায়গায় বসাতো।'

আমার আব্বা অশিক্ষিত নন, শিক্ষিত এবং সরকারী চাকুরে। তাকে বেশি বোঝাতে গেলে তিনিও হয়তো আমাকে বলবেন যে তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝো, আমি অমুক সালে বিএ পাশ করেছি, তোমার জন্ম দিয়েছি! এরা বিজ্ঞান মনস্ক নয়, আল্লাহ্ মনস্ক! সেন্ট মার্টিন থেকে সাঁতরে অষ্ট্রেলিয়া যাওয়া আর এদেরকে বিজ্ঞান বোঝানো একই কথা! আমি অসহায়ের মতো কথা খুঁজতে লাগলাম, কীভাবে আব্বাকে বোঝাবো তা ভাবতে লাগলাম। জীবনে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি কখনো হই নি।

তারপর আমার ওই অসহায় অবস্থার মধ্যেই আব্বা যা বললেন তা শুনে আমি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলাম! আব্বা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আমি ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলছি। তিনি বলছেন যে ওর তো পুরুষ লিঙ্গ আছে, যার পুরুষ লিঙ্গ আছে সে কখনো মেয়ে হয় না। ওর ওপর জ্বীনের আছর পড়ছে, ঝাড়ফুঁক করলি-ই সব ঠিক হয়ে যাবেনে।'

আমি হাঁ হয়ে তাকালাম আব্বার দিকে। আব্বা আবার বললেন, 'কাল রাততিরি ইমাম সাহেব দোয়া-দরুদ প'ড়ে ঝাড়ফুঁক করবার আসপেনে।'
আমি প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, 'আব্বা জ্বীন-ভূত ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই, ঝাড়ফুঁক ক'রে জগতের কোনো রোগই নিরাময় করা সম্ভব নয়। আর আমার কোনো রোগ হয় নি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'
'জ্বীনের আছর লাগা রোগী কখনো নিজের রোগ বোঝে না। কাল ইমাম সাহেব ঝাড়ফুঁক করবার আসপি, এইটাই আমার শেষ কথা।'
আমি মেজো দুলাভাই আর বুবুদের উদ্দেশে বললাম, 'বুবু তোমরা চুপ ক'রে আছো কেন, দুলাভাই আপনি কিছু বলেন, আব্বা এসব কী বলে!'
বড় বুবু বললো, 'আব্বা তো ঠিকই ক'তেছে, ঝাড়ফুঁক ক'রে দ্যাহা যাক ঠিক হয় কি-না!'

'বুবু আমি তো অসুস্থ নই।'
'অসুস্থ না হলি তুই নিজেরে মেয়ে ভাবিস ক্যান?'
'বুবু আমি তো তোমাদের বুঝিয়ে বললাম। কিছু মানুষের প্রকৃতি-ই এমন, পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের জৈবলিঙ্গ আর মনোলিঙ্গ এক নয়; আমারও তাই।'
'বাপের জন্মে এমন আজগুবি কথা শুনি নাই!'

মেজো বুবু বললো, 'শোন, তুই আমাদের একটা ভাই, তোরে নিয়ে আমাদের কতো আশা। তাছাড়া তুই যদি এখন নিজেরে মেয়ে ভেবে মেয়েদের মতো কাপড়-চোপড় প'রে ঘুরে বেড়াস, আব্বা-আম্মার মান-সম্মান থাকবে! আমরাই কি সমাজের মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবো!'

আমি তীব্র স্রোতে ভেসে খড়কুঁটো আঁকড়ে ধরার মতো মেজো দুলাভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বললাম, 'দুলাভাই, আপনি কিছু বলেন, আপনি এদেরকে বোঝান।'

আমার কলেজ শিক্ষক মেজো দুলাভাই অন্যদের বোঝাবে কি, উল্টো তিনি আমাকেই বোঝালেন, 'অনেকক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা বিয়ের পর ঠিক হয়ে যায়! ইমাম সাহেব যখন ঝাড়ফুঁকের কথা বলেছেন, উনি এসে ঝাড়ফুঁক করুক। আর পাত্রী তো রেডি-ই আছে, খুব দ্রুতই বিয়েটা ক'রে ফেলো। বিয়ের পরও যদি একই ধরনের সমস্যা ফিল করো, তাইলে আমি নিজে ভারতে নিয়ে গিয়ে তোমার ট্রিটমেন্ট করিয়ে আনবো। ট্রিটমেন্ট করালে এ ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

আব্বা মেজো দুলাভাইয়ের উদ্দেশে বললেন, 'ভারতে নিয়ে ডাক্তার দ্যাহানোয় আমার কোনো আপত্তি নাই। তয় ইমাম সাহেব যহন নিজে মুখে ঝাড়ফুঁক করার কথা বলিছেন, ঝাড়ফুঁক ক'রে দেখা যাক। আর এর মইদ্যে তুমি তোমার আর ওর পাসপোর্ট-ভিসার ব্যবস্থা করো, কোলকাতায় যাও আর দিল্লী-বোম্বাই যেহানে যাবার যাও, চিকিৎসা করায়ে আনো। টাকা-পয়সা যা লাগে লাগুক, দরকার হলি জমি বেচে চিকিৎসা করাবো।'

মাথা নিচু ক'রে বললাম, 'আব্বা, আমার তো কোনো অসুখ হয় নি যে চিকিৎসা করাতে হবে। আমার মনের ওপর জোর কোরো না, তোমরা যদি আমার পিছনে টাকা ব্যয় করতেই চাও তো লিঙ্গ রূপান্তর ক'রে আমি শারীরিকভাবেও মেয়ে হয়ে যাই।'

আব্বা প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্, আল্লারে এই ছিল আমার কপালে!'
আম্মা কাঁদতে লাগলেন, বুবুদের চোখে জলের আভাস। অনেক কথার পর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হলো যে হয় আমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে নয়তো সমাজের মান-সম্মানের কথা চিন্তা ক'রে আমাকে আব্বার ফুফাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে ক'রে পুরুষ হয়েই সংসার করতে

হবে। আমি সবার সব কথা শুনলাম, তারপর আমার কথাটি বললাম, 'তোমরা আমার মনের ওপর জোর কোরো না, হয় আমার লিঙ্গ রূপান্তরের ব্যবস্থা করো, নয়তো আমি যেমন আছি তেমনই থাকি; কিন্তু বিয়ের জন্য আমাকে জোর কোরো না। আর কালকেই আমি ঢাকা যাব, পরশু আমার অফিস আছে।'

ব'লে আমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম; শুয়েই রইলাম কিন্তু ঘুম আর এলো না চোখে। আমাকে ঘিরে আব্বা-আম্মা, বুবু, দুলাভাই সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন; তাদের সেই স্বপ্নে হঠাৎ বজ্রাঘাত হয়েছে, তারা তো তাদের স্বপ্ন বাঁচানোর শত চেষ্টা চেষ্টা করবেনই। শুধু কি স্বপ্ন বাঁচানোর চেষ্টা? তাদের কাছে এটা সম্মান রক্ষার চেষ্টাও। কেননা আমি নারী হতে চাইলে তারা যে সমাজে বাস করে সেই সমাজে একটা ঘাই লাগবে আর হাজারো বুদবুদের মতো ফুটতে থাকবে কথা, সমাজের মানুষ আড়ালে হাসি-তামাশা করবে, ঠোঁটকাটা কেউ কেউ শুনিয়ে দেবে সুচের মতো তীক্ষ্ণ কথা; যা তাদের কাছে অপমানের-অসম্মানের। তবে আমারও তো মন আছে, স্বপ্ন আছে; তাদের কাছে এটা মান-সম্মানের ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে তো জীবনের। আমি জানি যে আমাদের এই সমাজে একজন পুরুষ কতোটা সুবিধা ভোগ করে, ঘরে-বাইরে নারীর চেয়ে পুরুষ এই সমাজে অধিক স্বচ্ছন্দ-নিরাপদ, পুরুষ হয়ে জন্মানো এখানে সৌভাগ্যের প্রতীক! তারপরও আমি এই সুবিধা এবং সৌভাগ্য স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে পায়ে ঠেলে দিচ্ছি, কেননা প্রতিনিয়ত অনুভব করি যে আমি পুরুষ নই, নারী। পরিবারের কথা মেনে পুরুষের ভেগ বিয়ে-সংসার করলে নিজের সঙ্গে তো বটেই অন্য একটি মেয়ের সঙ্গেও প্রতারণা করা হবে। সমাজের কিছু অন্ধ মানুষের কথা ভেবে তো আমি আমার এবং অন্য একটি মেয়ের জীবন তো নষ্ট করতে পারি না; দুটো জীবনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি না। তাই মনকে শক্ত ক'রে আমাকে কঠিন হতেই হয়।

পরদিন সকালে আমি ঢাকায় আসতে গেলে, সকলেই বাধা হয়ে দাঁড়ালো; কিছুতেই তারা আমাকে ঢাকায় ফিরতে দেবে না, কেননা রাতে ইমাম আমাকে ঝাড়ফুঁক করবে। আমিও নাছোড় বান্দা, ঢাকায় আসবোই। সেই সকালেই প্রথম আমি আব্বার মুখে মুখে তর্ক করলাম। এক পর্যায়ে আব্বা বললেন, 'হয় তুমি আমাদের ছেলে হয়ে বিয়ে-থা ক'রে ঘর-সংসার করবা, নয়তো চির জীবনের জন্য তুমি এই বাড়ি থেকে চ'লে যাবা, তোমার সঙ্গে আমাদের কারো কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমরা জানবো যে আমাদের ছেলে ম'রে গেছে!' জলভরা চোখ নিয়ে সে-ই যে আমি বাড়ি ছেড়েছি, আর আমার বাড়িতে ফেরা হয় নি। তবে বাড়ির সব খবরই আমি পাই তুলিভাবীর কাছ থেকে। তুলি ভাবী তার কথা রেখেছে, সে এখনো আমার সই হয়েই আছে, ফোনে কথা হয় প্রায়ই। সে এখন দুই সন্তানের জননী। ইকবাল ভাই দেশে ফিরে ফরিদপুরে ব্যবসা করছেন। ইকবাল ভাই তুলিভাবীর স্বামী, যথার্থ প্রভু; বন্ধু হতে পারে নি। বাংলাদেশের আরো অসংখ্য নারীর মতো তুলিভাবীও সমাজের কথা ভেবে, সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে মানিয়ে নিয়ে জীবনটা পার ক'রে

দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই সে তার দুঃখের ঝাঁপি খোলে আমার কাছে। আমি আর নতুন ক'রে কি দুঃখের ঝাঁপি খুলবো, আমার মতো বরভাগ্য ক'জনের হয়! আমি ফেলি আমার হারানো শিকড়ের জন্য দীর্ঘশ্বাস!

আব্বা তো অবসর নিয়েছেন সেই কবেই। এখন আব্বা-আম্মার দায়িত্ব ছোটবুবু আর দুলাভাইয়ের ওপর, ওরা আমাদের বাড়িতেই থাকে। ছোটবুবুর বিয়ে আমি দেখি নি, আমাকে জানায় নি কেউ। আমিই তুলি ভাবীর কাছ থেকে শুনে বাড়িতে ফোন করেছিলাম, আমার ফোন কেউ ধরে নি। বড়বুবুকে ফোন করেছিলাম, বড়বুবু বলেছিল, 'তুই আসলি বড়পক্ষের কাছে আমরা তোর কি পরিচয় দেব, শ্যাষে না বিয়েটাই ভাঙে যায়! আমাগের মান-সম্মান যা নষ্ট করার তা তো করছিসই, নতুন ক'রে আর নষ্ট করার জন্যে তোর আসার দরকার নাই।'

হায়, আমাকে বোন ব'লে পরিচয় দিতে বুবুদের লজ্জা করবে, আমাকে মেয়ে ব'লে পরিচয় দিলে বাবা-মায়ের সম্মান নষ্ট হবে! আমি এখন তাদের কাছে ছেলেও নই, মেয়েও নই; আমি এক মানহানিকর আজব জীব! আসলে আমাকে তো তাদের আর প্রয়োজন নেই, যে প্রয়োজন বা চাহিদার জন্য তারা আমাকে বড় করেছেন, আমি তাদের সেই চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি; তাহলে তারা আর শুধু শুধু আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন কেন? তাদের ছেলের প্রয়োজন ছিল, তিন মেয়ে জন্মানোর পরও তাই তারা আবার সন্তান নিয়েছিলেন, দৈহিকভাবে একটি ছেলে সন্তান পেয়ে তারা দারুণ খুশি ছিলেন। স্বপ্ন বুনেছিলেন আমাকে নিয়ে–ছেলে বড় হবে, বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবেন, নাতি-নাতনি হবে, বংশ রক্ষা হবে, আরো কতো স্বপ্ন! তাদের সেই স্বপ্নে আমি জল ঢেলে দিয়েছি; আসলে আমি তো ঢালি নি, ঢেলেছে প্রকৃতি। কিন্তু তারা তো সেটা বোঝেন নি, বুঝতে চানও নি, তারা শুধু বুঝতে চেয়েছেন আমি পুরুষ; তাদের পুত্রবধু চাই, নাতি-নাতনি চাই। আমি এসবের কিছুই তাদেরকে দিতে পারি নি। তাদের কাছে আমি এখন এক উটকো ঝামেলা, ঝামেলা তো দূরে থাকাই ভাল! তাছাড়া ছোটবুবুর বিয়েতে আমি গেলে তাদের পুরনো ব্যথা যেমনি চাগাড় দিয়ে উঠতো, তেমনি অনুষ্ঠান বাড়িতে আমাকে দেখে লোকেও নতুন ক'রে আলোচনার রসদ পেতো। কে জানে, ছোটবাবুর শ্বশুরবাড়ির মানুষের কাছে হয়তোবা আমার কথা গোপনই রেখেছেন! হয়তো জানিয়েছেন যে তাদের তিন মেয়ে, আর কোনো সন্তান নেই। এতসব মাথায় রেখেই আমার তারা হয়তোবা আমাকে উপেক্ষা করেছেন।

আমাদের মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হলো, রেজাল্টও হলো, অরিত্র ফার্স্টক্লাস আর আমি পেলাম সেকেন্ড ক্লাস। মাস্টার্স রেজাল্টের কিছুদিন পর অরিত্র ভাল একটি কলেজে জয়েন করলো, আমিও অন্য একটি এনজিও'তে ঢুকলাম। দু'জনের রোজগার আরো বাড়লো, আমরা বাসা বদল ক'রে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে আরও ভালো একটি বাসা নিলাম লালমাটিয়ায়।

এই বাসা নেবার সময় থেকেই আমি পুরোপুরি নারীর বেশ ধারণ ক'রে শাশ্বতী নামে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলাম।

আমার তো বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন, তবু আমি একবার আব্বার নামে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম, টাকা ফেরত এসেছিল। অরিত্র প্রতিমাসে তিন হাজার ওর বাবা-মাকে আর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমার দেবর অলককে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতো। এসব খরচ বাদেও আমাদের দু'জনের বেতনের প্রায় অর্ধেক টাকা বেঁচে যেতো, ব্যাংকে দু'জন একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুললাম, টাকা জমতে লাগলো। অরিত্র আমাকে প্রায়ই বলতো, 'আমাদের অনেক টাকা দরকার।'

আমি বলতাম, 'আমরা যা বেতন পাই তাতে তো আমাদের দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, ব্যাংকেও জমছে, অতো চিন্তার কি আছে?'

ও শুধু বলতো, 'দরকার দরকার।'

এর বেশি কিছু ভেঙে বলতো না।

আমাদের গভীর প্রণয়ের কথা ওর বাড়ির কেউ জানতো না, জানতো যে আমি ওর বন্ধু, একসঙ্গে থাকি। অলক কিংবা আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যখন ঢাকায় আসতো, তখন আমি আমার এক বান্ধবীর বাসায় চ'লে যেতাম। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে ও জানাতো যে এনজিও'র কাজে আমি ঢাকার বাইরে। এই লুকোচুরি খেলতে খেলতে অনেকদিন কাটলো। ওর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কের কথা জানতো কেবল ওর পিসতুতো ভাই তনয়। তনয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, থাকতো তাঁতীবাজার। ও অনেক উদার, আমাদের সম্পর্কটাকে সহজভাবেই নিয়েছিল। মাসে দু-তিনদিন আমাদের বাসায় আসতো, এখানো আসে।

এরপর একসময় অরিত্র'র বাড়ি থেকে ওকে বিয়ের জন্য জোরাজুরি করতে শুরু করলো। ও 'এখন নয় এখন নয়' ব'লে কালক্ষেপণ করতো, কিন্তু এক পর্যায়ে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি রীতিমতো উঠে-প'ড়ে লাগলেন ওর বিয়ের জন্য; পাত্রীদের বায়োডাটাও সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। আমাদের দু'জনের সামনেই তখন কঠিন বাস্তবতা। আমার বাবা-মা আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, আমি চাইতাম না ওর ক্ষেত্রেও তাই হোক। আমরা দু'জন পরামর্শ ক'রে অলককে ঢাকায় আসতে বললাম, অলক এলো; তনয় আগে থেকেই বাসায় ছিল। তনয়কে সামনে রেখে অলককে সব খুলে বললাম আমরা। অরিত্র ওদেরকে বললো, 'আমরা টাকা জমাচ্ছি, যদি বাবা কিছু সাহায্য করতে পারে তাহলে শীঘ্রই সেঙ চেঞ্জ ক'রে ও দৈহিকভাবেও নারী হবে। বাবা-মা চাইলে তখন না হয় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করবো।'

অরিত্র যে আমাকে নিয়ে এতোকিছু ভেবে রেখেছে এর আগ পর্যন্ত সত্যিই আমি তা জানতাম না। এজন্যই ও বলতো যে আমাদের অনেক টাকার দরকার। আমার ইচ্ছে থাকলেও কখনো

ওকে বলি নি যে আমি সেঙ চেঞ্জ করতে চাই, কেননা আমি জানি যে সেই সামর্থ আমাদের এখনো হয় নি। কিন্তু আমি যে আমার বাড়ির সবাইকে বলেছিলাম "তোমরা যদি চিকিৎসা ক'রে আমার পিছনে টাকা ব্যয় করতেই চাও, তাহলে লিঙ্গ রূপান্তর ক'রে আমি শারীরিকভাবেও মেয়ে হয়ে যাই।" সে-কথা অরিত্রকে বলেছিলাম, ও যে সে-কথা মনে রেখে টাকা জমানোয় মন দিয়েছিল তা আমি বুঝতে পারি নি।

ওর মুখ থেকে সেঙ চেঞ্জের কথা শুনে আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল, ইচ্ছে করলো তখনই ওকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি, পাগলের মতো চুমু খাই, কামড়ে ওর গাল লাল ক'রে দিই! কিন্তু তনয় আর অলক সামনে থাকায় তখনকার মতো আর তা সম্ভব হলো না, সম্ভব হলো আরও ঘন্টা দুয়েক পরে!

যাইহোক, তারপর আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে বুঝিয়ে বলার জন্য তনয় আর অলককে পাঠালাম যশোর। অলকের মুখ দেখেই আমি ওর মনের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে আঁচ করতে পারলেও অরিত্রকে কিছু বললাম না। ওরা যেদিন যশোর গেল সেদিন রাতেই আমার শাশুড়ি অরিত্রকে ফোন করলেন শীঘ্র বাড়িতে যাবার জন্য, এর বেশি কিছু তারা অরিত্রকে বলেন নি অথবা বললেও ও আমাকে বলে নি। বুঝলাম যে অলকের মতো তারাও অসন্তুষ্ট, তবু আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম যে তারা আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন। অরিত্র দু'দিন পরই বাড়িতে গেল, ওর যাবার সময় আমার খুব কান্না পেলো, ওকে জড়িয়ে ধ'রে আমি কাঁদলাম এই আশঙ্কায় যে ওকে যদি আমি হারিয়ে ফেলি? ও আমার কপালে চুমু খেয়ে আদর ক'রে বললো, 'তুমি ভয় পেয়ো না। যে করেই হোক আমি বাবা-মাকে রাজি করাবো।'

আমিও এই আশায় বুক বাঁধলাম যে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সমাজের কথা ভেবে প্রথমে অরাজি থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় রাজি হবেন। আমার পরিবার আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সামাজিক এবং ধর্মীয় কারণে। ইসলাম ধর্মে সমপ্রেমী বা সমকামী এবং রূপান্তরকামীর কোনো স্থান নেই। ইসলামে সমকামীদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে ইসলামী দেশগুলোতে অসংখ্য সমকামীকে পাথর নিক্ষেপ, শিরোচ্ছেদ, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হাদিসে বৃহন্নলাদের তো বটেই এমনকি মেয়েদের মতো আচরণ করা ছেলে কিংবা ছেলেদের মতো আচরণ করা মেয়েদেরকেও নির্বাসিত করার কথা বলা হয়েছে। ফলে মসজিদের ইমাম প্রভাবিত আমার আব্বা ধর্মীয় কারণে এবং সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে আমাকে নির্বাসিত করেছেন। দেশে ইসলামী শাসন চালু থাকলে নিশ্চিত ইমাম আমাকে হত্যার নির্দেশ দিতেন!

সেই তুলনায় বহু সংস্কৃতি ধারণ করা হিন্দুধর্ম অনেকটাই উদার। ধর্মটির আইন-কানুন যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে; ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কখনো উদারতার পরিচয় দিয়েছে আবার কখনো নিষ্ঠুরতার। ব্রাহ্মণদের দ্বারা ধর্মটির বিপুল ক্ষতি হয়েছে, উদারতার জায়গাগুলো

ক্রমশ হয়েছে সংকুচিত। মনুসংহিতায় নারী সমকামিতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, কোনো বয়স্কা নারী যদি অপেক্ষাকৃত কম বয়সী নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে বয়স্কা নারীর মস্তক মুণ্ডন ক'রে এবং দুটি আঙুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরাতে হবে। দুই কুমারীর মধ্যে দৈহিকসম্পর্ক স্থাপিত হ'লে তাদের শাস্তি হিসেবে দুইশত মুদ্রা জরিমানা এবং দশটি বেত্রাঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে দু'জন পুরুষ অপ্রাকৃত কাজে লিপ্ত হ'লে তাদেরকে জাতিচ্যুত করা হবে এবং জামা প'রে তাদেরকে জলে ডুব দিতে হবে।

তবে মনুর এই বিধান একপাশে সরিয়ে রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের দিকে তাকালে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দেব-দানব-মানবদের মধ্যে বিষমকামিতা ছাড়াও সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মতো বিচিত্র যৌনাচার লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পশুকামিতাও! ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরের গায়ের টেরাকোটাতেও যৌনতার বৈচিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়, এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাচীন প্রত্নসামগ্রীতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচিত্র যৌনাচারের প্রমাণ মিলেছে। সেই কারণেই আমি ভীষণ আশাবাদী হয়েছিলাম যে সেঙ চেঞ্জ করলে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী আমার শ্বশুর-শাশুড়ি নিশ্চয় আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন। পুরাণ অনুসারে বিষ্ণু নিজেই তো কতোবার নারীতে রূপান্তর হয়েছেন, সন্তানও জন্ম দিয়েছেন! সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত পাওয়া গেলে সেই অমৃত নিয়ে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে দন্দ্ব বাধে, দন্দ্ব নিরসনে স্বয়ং বিষ্ণু মোহিনী মায়ায় স্ত্রী-রূপ ধারণ ক'রে দানবদের কাছে গেলেন, দানবরা বিষ্ণুর মোহিনী রূপ দেখে মোহিত হয়ে তাকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর হাতে অমৃত সমর্পণ করে। মোহিনীরূপী বিষ্ণু দেবতা এবং দানবদের শ্রেণিবদ্ধভাবে বসিয়ে উভয়ের মধ্যে অমৃত সমবণ্টন করার নামে ছলনা ক'রে তিনি কেবল দেবতাদেরকেই অমৃত পান করাচ্ছিলেন আর অসুরদেরকে পান করাচ্ছিলেন সোমরস। দানব রাহু মোহিনীরূপী বিষ্ণুর এই ছলনা ধরতে পেরে চুপিসারে দেবতাদের মধ্যে গিয়ে ব'সে পড়লো আর মোহিনীরূপী বিষ্ণুও রাহুকে দেবতা মনে ক'রে অমৃত দান করলেন। চন্দ্র এবং সূর্য রাহুকে চিনতে পেরে মোহিনীরূপী বিষ্ণুকে ব'লে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অমৃত রাহুর পেটে চ'লে যাওয়ায় মুণ্ড আর ধড় বিচ্ছিন্ন হলেও সে অমরত্ব লাভ করলো। আর তখন থেকেই চন্দ্র এবং সূর্যের সঙ্গে তার চিরশত্রুতার শুরু, রাহুর চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ। রাহুর মুণ্ডচ্ছেদের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ত্যাগ ক'রে স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

দূর্গা মহিষাসুর বধ করার পর মহিষাসুরের বোন মহিষী বদলা নেবার শপথ ক'রে ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করে। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে সে বললো, 'কেউ যেন আমাকে যুদ্ধে হারাতে এবং বধ করতে না পারে।'
বিব্রত ব্রহ্মা জানালেন, 'তা কি ক'রে সম্ভব! তুমি অন্য বর চাও।'
কিন্তু মহিষী অটল, সে তার অভীষ্ট বর-ই চায়।

তখন ব্রহ্মা তাকে এই বর দিলেন, 'দু'জন পুরুষের মিলনে উৎপন্ন সন্তান ব্যতিত অন্য কেউ তোমাকে পরাজিত বা বধ করতে পারবে না।'

মহিষী মহা খুশি! কেননা সে জানে যে দু'জন পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মানো অসম্ভব, ফলে তাকে বধ করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মহিষী স্বর্গ আক্রমণ ক'রে দেবতাদের বিতাড়িত করলো। সংকট নিরসনে দেবতারা ছুটে গেল শিবের কাছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব মন্ত্রণায় বসলেন কি উপায়ে মহিষীকে বধ করা যায়। তখন বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে মিলিত হলেন শিবের সঙ্গে। মোহিনীরূপী বিষ্ণু আর শিবের মিলনে জন্ম হলো অয়প্পানের। অয়প্পান মহিষীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে বধ করলেন।

বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে অর্জুন এবং নাগরাজকন্যা উলুপীর পুত্র ইরাবানকে বিয়ে ক'রে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অর্জুনপুত্র হওয়ায় স্বভাবতই ইরাবান কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি প্রতিদিন যুদ্ধে যাবার আগে কালীপূজা করতেন এবং কালীও ভক্তকে ভবিষ্যতবাণী করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তম দিনে কালী ভবিষ্যতবাণী করলেন যে আগামীকাল অর্থাৎ যুদ্ধের অষ্টম দিনে ইরাবানের মুত্যু হবে। মৃত্যু আসন্ন জেনে বিচলিত-ব্যথিত ইরাবান অর্জুনকে সব জানালেন। পুত্রের মৃত্যু আসন্ন জেনে অর্জুন দুঃখ পেলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে জানতে চাইলেন, 'পুত্র তোমার শেষ ইচ্ছা কী?'
'পিতা আমি যুবক, এখনো বিবাহ করি নি; কখনো নারী সংস্পর্শ পাই নি। মৃত্যুকালে এই অতৃপ্তি আমার থেকে যাবে।'

অর্জুন তখনই দিকে দিকে দূত পাঠালেন পুত্রের জন্য পাত্রীর সন্ধানে। কিন্তু দূতরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো, ইরাবানের মৃত্যু আসন্ন জেনে কোনো পিতাই তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত নয়। অর্জুন চিন্তায় পড়লেন, তবে কী পুত্রের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হবে না! তখন শ্রীকৃষ্ণ সব জানতে পেরে এই সংকট থেকে তাঁর সখাকে উত্তরণ করলেন নিজে মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে ইরাবানকে বিয়ে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়ে। তৃপ্ত ইরাবান পরদিন অর্থাৎ যুদ্ধের অষ্টম দিন যুদ্ধে গেলেন, প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন; এক পর্যায়ে রাক্ষস অলম্বুষের হাতে তার মৃত্যু হলো। ইরাবানের মৃত্যুর পর মোহিনীরূপী কৃষ্ণ শাস্ত্র অনুযায়ী বৈধব্য দশা পালন করেন।

কৃষ্ণসখা অর্জুনও অপ্সরী উর্বশীর শাপে মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাসের এক বছর নপুংসক হয়ে ছিলেন। নারীবেশ ধারণ ক'রে বৃহন্নলা নাম নিয়েছিলেন তিনি। এই এক বছর তিনি মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা উত্তরা এবং তার সখিদেরকে নৃত্য-গীত-বাদন শিখিয়েছিলেন।

একদা মৃগয়ায় গিয়ে ইন্দ্রের ছলনায় মোহিত রাজর্ষি ভঙ্গাসন অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত হয়ে এক সরোবরে অবগাহন করামাত্র স্ত্রীরূপ পেয়েছিলেন। অতঃপর এক ঋষির ঔরসে তার গর্ভে শতপুত্রের জন্ম হয়েছিল।

বাহ্লীকদেশে ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। একবার অনুচরবর্গ সহ মৃগয়া করতে গিয়ে কার্তিকেয়র জন্মস্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহাদেব এবং পার্বতী ক্রীড়া করছিলেন, আর তাদের মনোরঞ্জনের জন্য ভগবান ঋষভরাজ তখন স্ত্রী-রূপে ছিলেন, সেই কাননে তখন যতো প্রাণি ছিল সবাই স্ত্রীত্ব পেয়েছিল। রাজা ইল এবং তার অনুচরবর্গও উক্ত স্থানে পৌঁছামাত্র স্ত্রীত্ব পেলেন, ইল হলেন ইলা। দুঃখভারাক্রান্ত ইলা মহাদেবের শরণাপন্ন হ'লে মহাদেব তাকে বললেন, 'পুরুষত্ব ব্যতিত তুমি অন্য বর চাও।'
ইলা তখন পার্বতীর শরণাপন্ন হলেন। পার্বতী তাকে বললেন, 'মহাদেব তোমাকে অর্ধ বর দিয়েছেন, অপর অর্ধ আমি দিচ্ছি।'
ইলা তখন বর চাইলেন, 'দেবী আমি যেন একমাস স্ত্রী-রূপ এবং একমাস পুরুষরূপ পাই।'
পার্বতী বললেন, 'বেশ, তুমি যখন পুরুষরূপে থাকবে তখন স্ত্রীভাব তোমার মনে থাকবে না, আবার যখন তুমি স্ত্রী-রূপে থাকবে তখন পুরুষভাব ভুলে যাবে।'
এভাবেই মহারাজ ইল একমাস পুরুষরূপে ইল এবং একমাস স্ত্রী-রূপে ইলা হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। সরোবরে তপস্যারত চন্দ্রপুত্র বুধ ইলার সৌন্ধর্যে মুগ্ধ হলেন, তিনি ইলার গর্ভে পুরুরবা নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন।

এতো গেল রূপান্তরকামিতার গল্প, সমকামিতার গল্পও দূর্লভ নয়। রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের প্রপৌত্র দিলীপ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে বংশরক্ষার সংকট উপস্থিত হলো। শিব তখন দিলীপের দুই বিধবা স্ত্রীকে দৈহিক মিলনের আদেশ দিলেন। দুই বিধবা রানির মিলনের ফলে অস্থিহীন এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো, ঋষি অষ্টাবক্রের বরে সেই অপূর্ণাঙ্গ দেহের পুত্র পূর্ণাঙ্গ দেহ লাভ করলো। তার নাম রাখা হলো ভগীরথ। ভগীরথের বংশধরই উত্তরকালের বিখ্যাত রামচন্দ্র।

যে ধর্মের দেব-দেবীগণ সমকামিতা-রূপান্তরকামিতায় বিশ্বাসী, যে ধর্মের দেব-দেবী এবং তাদের আশির্বাদপুষ্ট মানুষেরা সমকামী-রূপান্তরকামী, যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যারা সন্তান উৎপাদনও করেছেন; সেই ধর্মের মানুষ কি আমাদের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন? নিশ্চয় নয়। আমাদের সম্পর্ক অস্বীকার করলে তো স্বয়ং দেবতাদের সম্পর্কই অস্বীকার করা হয়। আর ধর্মপ্রাণ মানুষ কি কখনো দেবতাদের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন? নিশ্চয় নয়! অরিত্র বাড়িতে যাবার পর এমনিভাবেই নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছি যে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি নিশ্চয় আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন; আশায় বুক বেঁধে স্বপ্ন দেখেছি যে আমি বধূবেশে তাদের বাড়িতে পা রেখেছি, তারা আমায় বরণ ক'রে নিচ্ছেন। কেনইবা আশায় বুক বাঁধবো না? অরিত্র'র কাছে শুনেছি ওদের বাড়ির ঠাকুরঘরে রাধাকৃষ্ণের

পিতলের বিগ্রহ আছে, আমার শাশুড়ি প্রতিদিন সেই বিগ্রহ স্নান করিয়ে পূজা করেন; যে কৃষ্ণ মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে ইরাবানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, অবিবাহিত পরকীয়া সঙ্গিনীসহ তাঁকে পূজা করেন আমার শাশুড়ি; এরপরও আশাবাদী না হওয়াটা তো আমার অন্যায়! শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরের দেয়ালে শিবের ছবি থাকে, যে শিব মোহিনীরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন; আমার শাশুড়ি রোজ সেই শিবকে প্রণাম করেন, ধূপ-সন্ধ্যা দেন। এরপরও আমি কি ক'রে অবিশ্বাস করবো যে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন না? অবিশ্বাস করা মানে তো ধার্মিক গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করা!

তাই আমি বিশ্বাস ক'রে, স্বপ্ন দেখে, আশায় বুক বেঁধে সুসংবাদ শোনার অপেক্ষায় রইলাম। বিশ্বাস করলাম যে অরিত্র ওর বাবা-মা'র কাছ থেকে আমার জন্য এক নতুন পৃথিবী নিয়ে আসবে, যে পৃথিবীতে আমি নতুন ক'রে বাঁচতে পারবো। কিন্তু আমার সকল বিশ্বাস-স্বপ্ন-আশা মিথ্যে প্রমাণ ক'রে, দেবতা এবং দেবতার অবতারের সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি অরিত্রকে ফেরালেন শূন্য হাতে! তারা অরিত্রকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আমাদের এই সম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নয়, এটা পাপ; নারী-পুরুষের সম্পর্কই চিরন্তন! হায়, যারা দেবতায় বিশ্বাস করেন, দেবতার পূজা করেন; অথচ সেই দেবতার সম্পর্ক তাদের কাছে পাপ!

সমাজ-সম্মানের কথা ভেবেই আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাদের সম্পর্ক মেনে নেন নি। সে-ই যে ম্লান মুখে বাড়ি থেকে এলো অরিত্র, আর কখনো বাড়ি যায় নি। আমারই মতো ওর জন্যও বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনেরই রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, মূলোৎপাটিত হয়ে আমরা কেবল দু'জন দু'জনার হয়ে বেঁচে আছি।

বৃষ্টিটা আবার বেড়েছে। এখন কতো রাত কে জানে, ভোর হতে বোধ হয় বেশি দেরি নেই। অথচ ঘুম আসছেই না চোখে। ক্ষুধা অনুভূত হচ্ছে। উঠে ডাইনিংয়ে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা চমচম প্লেটে নিয়ে আবার এসে চেয়ারে বসেছি, আসবার সময় দেখিলাম অরিত্র যেভাবে পাশ ফিরে শুয়েছিল এখনো সেভাবেই আছে।

আমাদের সম্পর্কের বয়স বারো বছর, দশ বছর হলো আমরা একসঙ্গে থাকছি। দশ বছর পর হঠাৎ মনে হচ্ছে যে আজ আমাদের বাসর রাত। এই দশ বছরে যতো রাত আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি প্রত্যেকটা রাতই সুখের ছিল, কিন্তু আজকে উপচে পড়া সুখের কারণ আমি লিঙ্গ রূপান্তর করার পর আজই প্রথম আমাদের শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। আমার এতোদিনের সাধ পূরণ হয়েছে। এখন আমি কেবল চৈত্তিকভাবে নয়, দৈহিকভাবেও নারী। আজ পুরোপুরি সার্থক হয়েছে আমার জীবন; আহা, সুখের নারী জীবন!

চমচমটা খেয়ে প্লেটটা ডাইনিংয়ে রেখে জল পান ক'রে আবার এসে বসেছি। কিছুক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এসে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর আমাকে অতিক্রম ক'রে রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বেশ কায়দা ক'রে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছে নক্ষত্র! এরপর ধরেছে গ্রিল, হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁয়ে এখন ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে। বৃষ্টির ছাটে ওর গা ভিজে যাচ্ছে দেখে আমি ওকে জোর ক'রে কোলে নিই। আবার নেমে যেতে চাইলে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কপালে-গালে চুমু খেয়ে আদর করাতে এখন আর নামতে চাইছে না, আমার কানের কাছের একগোছা চুল নিয়ে খেলছে। খেলতে খেলতে নিজেই চঞ্চল হাতে আমার স্তন উন্মুক্ত করার চেষ্টা করছে। ক্ষিধে পেয়েছে ওর, ক্ষিধে পেলে এমন করে! মুখে স্তনবৃন্ত পুড়ে দিতেই শান্ত হয়েছে, দু-হাতে স্তন ধ'রে চু চু শব্দে স্তন পান করছে, আর আমি মাতৃস্নেহে ওকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে বিপুল সুখে তাকিয়ে আছি বৃষ্টির দিকে!

নক্ষত্র, আমাদের একমাত্র সন্তান! আমার গর্ভজাত নয়, অরিত্র'র ঔরসজাতও নয়; নক্ষত্র আমাদের দু'জনের মনোজাত সন্তান! আমরা দু'জন ছাড়া ওকে কেউ দেখতে পায় না। আমরা ওকে খাওয়াই, পরাই, ঘুম পাড়াই, ওর সঙ্গে খেলা করি, দুষ্টুমি করি! সেই কবে আমাদের মনে ওর জন্ম হয়েছে, বছর সাতেক তো হবেই, কিন্তু এখনো ও হামগুড়ি দিয়ে হাঁটে আমাদের মনের অন্দরে। বোধ হয় আমরা যতোদিন বেঁচে থাকবো আমাদের মনোজাত সন্তান নক্ষত্র ততোদিন হামাগুড়ি দিয়েই হাঁটবে। তারপর আমাদের দু'জনের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে নক্ষত্রের গল্প; অথবা শেষ হবে না, আমাদেরই মতো কোনো দম্পতির মনোজগতে হয়তো অন্য নামে থাকবে নক্ষত্র। থাকুক নক্ষত্র, অনন্তকাল নক্ষত্র বেঁচে থেকে সঙ্গ দিক আমাদের মতো দম্পতির মনে, এই সঙ্গটুকু বড় মধুর। নক্ষত্রকে নিয়ে আমরা দারুণ সুখে আছি। আমরা যেভাবে নক্ষত্রকে আদর করি, একজন আরেকজনের কোল থেকে ওকে কেড়ে নিই, ঘুম পাড়াই; এসব বাইরের কেউ দেখলে নির্ঘাত আমাদেরকে পাগল বলবে! কিন্তু এই পাগলামিটুকু নিয়ে সত্যিই আমরা সুখে আছি; আমাদের দুঃখ কেবল একটাই, আমরা শিকড়চ্যুত। এছাড়া আমাদের আর কোনো দুঃখ নেই।

অরিত্র এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে, 'তুমি না ঘুমিয়ে এখানে ব'সে আছো?'
আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আস্তে ক'রে বলি, 'চুপ, নক্ষত্র ঘুমোচ্ছে!'
'তুমি ওকেও জাগিয়ে রেখেছো?'
'ঘুমোচ্ছিল না যে!'
'দাও আমার কোলে দাও।'
আমি অরিত্র'র দিকে এগিয়ে দিই নক্ষত্রকে, কোলে নেবার পর ও বলে, 'চলো, তুমিও শুতে যাবে।'
'আমার না ঘুম আসছে না।'
'দুশ্চিন্তা করছো?'
'না, এমনদিনে কেউ দুশ্চিন্তা করে!'

'তাহলে?'
'আমার ভাল লাগছে, ভীষণ ভাল লাগছে; ভাললাগার আতিশয্যে ঘুমই আসছে না!'
অরিত্র মৃদু হেসে আমার কাঁধে হাত রাখে, 'চলো, নক্ষত্রকে ঘুম পড়িয়ে আমরা একসঙ্গে ভাললাগা উপভোগ করি!'
আমরা ঘরে এসেছি। অরিত্র আলতোভাবে বিছানার এককোনে বালিশ রেখে নক্ষত্রকে শুইয়ে দিয়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমিও শুয়ে পড়েছি, নক্ষত্রকে ঘুম পাড়িয়ে অরিত্র'র হাত এখন আমার তলপেট স্পর্শ করেছে।
'নক্ষত্র এখনো ভাল মতো ঘুমোয়নি!'
আমার মুখের ওপর অরিত্র'র মুখ, 'ঘুমিয়েছে!'
ওর চুলে আমার হাত, 'না, ঘুমোয়নি!'
আমার ঠোঁটে ওর আঙুল, 'আমাদের সন্তান বড় বুদ্ধিমান, বাবা-মা এখন জেগে থাকবে বুঝেই ও ঘুমিয়েছে!'

আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট। নক্ষত্র আমাদের মনোজগতে ঘুমিয়েছে, জেগে আছি আমরা, জেগেছে আমাদের দুটো শরীর। বাইরে বৃষ্টি, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকের আলো ঝলকাচ্ছে জানালার পর্দায়। ভিজছে প্রকৃতি; আর আমরাও ভিজছি একে অন্যের ভালবাসায়, প্রেমে-কামে!

## সমাপ্ত

আখ্যান শেষ। কিন্তু আমি জানি, এই আখ্যান এখানেই শেষ নয়। এই আখ্যান, শাশ্বতীদির আত্মজৈবনিক আখ্যান; তার জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, যন্ত্রণা-বঞ্চনার আখ্যান। প্রতিদিন এই আখ্যানের ব্যাপ্তি বাড়ছে। শাশ্বতীদি গত বছর ভারতে গিয়ে সেক্স চেঞ্জ করেছে; এখন সে কেবল চৈত্তিকভাবেই নয়, দৈহিকভাবেও নারী। আমার দেখা বহু দম্পতির মধ্যে সবচেয়ে সুখী দম্পতি শাশ্বতীদি আর পরাগদা। তারপরও আমাদের চারপাশের অনেক মানুষ শাশ্বতীদি আর পরাগদার সম্পর্কের স্বীকৃতি দিতে চায় না, রাষ্ট্রীয়ভাবেও তাদের সম্পর্ক স্বীকৃত নয়; এই অশিক্ষা মানুষের, এই দৈন্যতা রাষ্ট্রের। কারো স্বীকৃতির অপেক্ষায় থেমে নেই তাদের জীবন, জীবন চলছে জীবনের নিয়মে। মহাকালের নিরিখে এই জীবন খুবই ছোট, ছোট এই জীবনে দুটো মানুষ একে অন্যকে ভালবেসেছে, কাছে এসেছে, নিজেদের মতো ক'রে উপভোগ করছে জীবনটা; এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা বা প্রকৃতিবিরুদ্ধতা নেই। তাদের প্রেম-ভালবাসা, কামনা-বাসনা; প্রকৃতির মতোই চিরন্তন সত্য।



আধো ঘুম আধো জাগরণে উপলব্ধি করি বাস ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে; চোখ খুলে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছুড়ে দিতেই দেখি ঘন সবুজ গাছপালা, আদুরে আলো-ছায়াময় শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি। অরণ্যের ভেতর দিয়ে মৃত অ্যানাকোন্ডার মতো একে-বেঁকে প'ড়ে আছে কালো পিচের রাস্তা, আর বড় আকৃতির পিঁপড়ার মতো তার গা বেয়ে চলেছে বাসটি। বান্দরবান শহরের খুব কাছেই চ'লে এসেছি আমরা, সাত-আট মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব বাসস্ট্যান্ডে। আমার পাশের সিটে ঘুমে অচেতন আবির, ওকে জাগিয়ে দিই। সামনের সিটে শাশ্বতীদি আর পরাগদা; ওরা আগেই জেগেছে, তাকিয়ে আছে জানালার বাইরের সবুজে। বাসের যাত্রীরা একে একে জেগে ওঠে। পিছন দিকের কেউ একজন মোবাইলে গান চালায়–'লাল পাহাড়ের দেছে যা, রাঙামাটির দেছে যা'।

আমাদের সঙ্গে আফজাল ভাইয়ের আসার কথা থাকলেও আরশাদ ফকিরের আখড়ায় জঙ্গি হামলার কারণে আসা হয় নি তার। আফজাল ভাই এখনো মেহেরপুরে। দুঃসময়ে মর্মাহত গুরু এবং আহত গুরু-ভাইদের পাশে আরো কিছুদিন থাকতে চায় সে। আমরাও তাকে আসার জন্য জোর করি নি। ওখানকার আহত বাউলদের পাশে তার থাকা দরকার। আফজাল ভাই এমনই, সে যতো না নিজের জন্য বাঁচে, তার চেয়ে বেশি বাঁচে মানুষের জন্য।

বাস থেকে নেমে ইজিবাইকে চেপে লামা বাসস্ট্যান্ডে যাই আমরা, এখান থেকেই ছাড়বে কৈক্ষংঝিরিগামী বাস। বাসের টিকিট কাটার পর টয়লেট সেরে, ফ্রেশ হয়ে নাস্তা ক'রে নিই। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সিট পূর্ণ হ'লে হেলপারের ইশারায় আমরা বাসে গিয়ে উঠি, গজরাতে গজরাতে পাহাড়ী পথে চলতে শুরু করে বাস। শুরু হয় রোমাঞ্চকর যাত্রা; কোথাও উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষা রাস্তা, কোথাও রাস্তার পাশে আদিবাসী গ্রাম, অদূরে সাঙ্গু নদী, কোথাওবা রাস্তার দু-পাশে কয়েক'শ ফুট নিচু খাদ। রাস্তার বাঁকগুলো ঘোরার সময় বা কোথাও খারাপ রাস্তার কারণে বাস যখন কাত হয়, তখন নিচের দিকে তাকালে বুকের ভেতরে শিরশির ক'রে একটা বেতাল হাওয়া ব'য়ে যায়! তবে বুকের বেতাল হাওয়ায় বেশি মনোযোগ না দিয়ে পাহাড়ের কোল-বুক-পিঠ জড়িয়ে থাকা দুধের নদীর মতো সাদা মেঘমালা উপভোগ করাই শ্রেয়, মনোযোগ দিতে গেলেই যাত্রাপথের আনন্দ মিইয়ে যায়! কোথাও কোথাও রাস্তার ওপর দিয়েই ধীরলয়ে উড়ছে শিমুল তুলোর মতো কিংবা তার চেয়েও পাতলা মেঘ; ঘাতকের মতো মেঘের গোছালো সংসার এলোমেলো করে, মেঘের বুক চিঁড়ে ধাবিত হয় বাস। বাসের খোলা জানালা দিয়ে বিচ্ছিন্ন মেঘ ঢুকে পড়ায় আমাদেরও হয় মেঘের সাথে আলিঙ্গন, মধুর চুমোচুমি!

ভাললাগায় বিভোর হয়ে একসময় পৌঁছে যাই কৈক্ষংঝিরি বাসস্ট্যান্ডে, বাস থেকে নেমে সাঙ্গু নদীর ঢাল বেয়ে হেঁটে গিয়ে ঘাটে যাত্রীর অপেক্ষায় থাকা ট্রলারে উঠি। মাঝারি আকৃতির ট্রলার; আমরা চারজন ব্যতিত আরোহী আরও পাঁচজন পর্যটক, বাকিরা স্থানীয় আদিবাসী। ট্রলার স্টার্ট ক'রে ঘাট ছাড়ার আগ মুহূর্তে একজন বৃদ্ধা দূর থেকে হাত দিয়ে ইশারা করেন তাকে তুলে নেবার জন্য, অপেক্ষা করে চালক; দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে বৃদ্ধা উঠতেই ঘাট ছাড়ে ট্রলার। বৃদ্ধা পিঠের টুকরিটা সামনে রেখে পাটাতনে বসেন। আমি তাকিয়ে থাকি তার দিকে; ঊর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ আর নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি, পায়ে বার্মিজ স্যান্ডেল, মাথার কাঁচা-পাকা চুল পিছনদিকে খোঁপা করা, মুখে কালো রঙের পাইপ, আয়েশ ক'রে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছাড়ছেন। ট্রলারে এতোগুলো পুরুষ রয়েছে, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, নদীপারের দিকে তাকিয়ে আপন মনে পাইপ টানছেন। মনে মনে এই বৃদ্ধার সঙ্গে আমার দাদীর তুলনা করতে গিয়ে নিজেকে কেমন বোকা মনে হয়! এই বৃদ্ধা হয়তো লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু লেখাপড়া জানা অনেক বাঙালী নারীর চেয়েও তিনি অধিক স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিত্ববান। অধিকাংশ বাঙালী-ই বেশ গর্বের সঙ্গে বলে যে আমরা বাঙালীরা আদিবাসীদের চেয়ে অধিক শিক্ষিত-সভ্য-আধুনিক! কিন্তু সেইসব তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত-সভ্য অনেক পুরুষই আজও নারীদেরকে গৃহবন্দী ক'রে রাখতে পছন্দ করে, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-ওলামাদের কথা বাদই দিলাম! অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী নারীকেই পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক নিপীড়ন সইতে হয়। আমরা তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষেরা আজও নারীকে যে সম্মান দিতে পারি নি, অনেক বাঙালীর ভাষায় বন্য-জংলি আদিবাসীরা তাদের নারীদেরকে বাঙালীদের চেয়ে অধিক সম্মান দিয়েছে। অনেক আদিবাসী সমাজ-ই মাতৃতান্ত্রিক। আমাদের তথাকথিত সভ্যতা-আধুনিকতা বন্য

আদিবাসীদের সামনে মাথা হেঁট ক'রে থাকে লজ্জায়; আমরা অনেকেই হয়তো তা বুঝি এবং স্বীকার করি, আর অধিকাংশ মানুষই বুঝি না বা বুঝেও স্বীকার করতে চাই না!

বৃদ্ধার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি দৃষ্টি এবং মন দিই সাঙ্গুর দু-পারের সবুজ প্রকৃতিতে। সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে জনপদ, দৃষ্টিনন্দন ঘর-বাড়ি। কোনো কোনো বাড়ি কিংবা পথের মুখ থেকে শান বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি নেমে এসেছে সাঙ্গুর বুকে; ঘাটে স্নান অথবা কর্মরত নারী-পুরুষ, হুটোপুটিতে ব্যস্ত কিশোর-কিশোরী আর উদোম শিশুরা। কোথাও জুমচাষে ব্যস্ত কৃষক, কোথাওবা আশার ঝাঁপি খুলে নদীতে বড়শি ফেলে ঝিম মেরে ব'সে আছে কোনো যুবক কিংবা বৃদ্ধ। জীবনে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাসহ অনেক বড় বড় নদী দেখেছি, নৌ-ভ্রমণ করেছি; সে-সব নদী এবং নদীপারেরও আলাদা মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য আছে; কিন্তু সাঙ্গুর সৌন্দর্য আর দু-পারের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দৃষ্টিতে অধিক মায়াঞ্জন বুলায় এবং মনে অধিক প্রশান্তি এনে দেয়! আমি আগে একবার বান্দরবান থেকে ট্রলারে চ'ড়ে আট ঘণ্টায় থানচিতে গিয়েছি। কিন্তু সাঙ্গু আর দু-পারের মানুষ-প্রকৃতি কখনোই আমাকে ক্লান্ত করে নি, বরং উজ্জীবিত করেছে। ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনে শাশ্বতীদির দিকে তাকিয়ে দেখি তার ক্যামেরা একের পর এক বুকে ধারণ করছে নদীপারের নয়ন জুড়োনো দৃশ্য, আমাদেরকেও।

রুমাবাজার পৌঁছে প্রথমেই একটা আদিবাসী হোটেলে ঢুকি। ওদেরকে ফ্রেশ হয়ে খাবারের অর্ডার দিতে ব'লে আমি যাই গাইডের খোঁজে। খাওয়ার পর গেলে গাইড পাব না তা নয়, আজ ঈদের পূর্বদিন হওয়ায় পর্যটকের খুব বেশি চাপ নেই। পর্যটকের চাপ বাড়বে ঈদের পরদিন থেকে। তারপরও না খেয়েই যাই এজন্য যে যদি আমাদের পূর্ব পরিচিত নরখেলেইম দাদাকে পাই, তো ভাল হয়। গলি পেরিয়ে এগোতেই আমাকে দেখে কয়েকজন গাইড এগিয়ে আসে, এদের মধ্যে একজন আমার পূর্ব-পরিচিত শফিকুল। শফিকুল সালাম দিয়ে বলে, 'ভাই আমারে চিনছেন?'
আমি সালামের জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বলি, 'হুম।'
'ভাই গাইড লাগবো?'
'হুম।'
'আমি যাইতাম।'
'আবার! তোমারে তো ভাই ঘাড়ে ক'রে আনতে পারবো না!'
শফিকুলের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা না ক'রে একজন আদিবাসী গাইডের কাছে জিজ্ঞাসা করি, 'নরখেলেইমদাকে কোথায় পাব বলতে পারেন?'
'নরখেলেইম? ওই সামনের গলিতে একটা পানের দোকান, ওকানে দেকিছি একটু আগে।'
'থ্যাঙ্ক ইউ।' আমি পা বাড়াই।

শফিকুলকে নিয়ে একবার আমাদের চরম শিক্ষা হয়েছে! মহা অলস, হেঁটে আমাদের চেয়েও পিছনে পড়ে। সে-বার কেওক্রাডাং থেকে জাদিপাই যাব, দুপুর গড়িয়ে গেছে, গিয়ে আবার

ফিরতে হবে। তো সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা জাদিপাই থেকে ফিরে একবারে ফ্রেস হয়ে ভাত খাব। ও জানায় ভাত না খেয়ে এক পা-ও যেতে পারবে না। ও ভাত খায় আর আমরা ব'সে ওর জন্য অপেক্ষা করি। ফেরার পথে জানায়, 'ভাত না খাইলে আমারে ঘাড়ে ক'রে নেওয়া লাগতো আপনাগো।' খাওয়ার ব্যাপারটি আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি নি, বেচারার ক্ষুধা পেলে তো থাবেই। কিন্তু সমস্যা হলো ও একে তো অলস তার ওপর একটুও আন্তরিকতা নেই। লাঠি কিংবা প্রয়োজনীয় কিছু দরকার হ'লে ওকে কয়েকবার অনুরোধ করতে হতো, সব কাজে ওর অনীহা। ভাবখানা এমন যে আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই তো তোমাদের পরম সৌভাগ্য! ফেরার সময় আবার চাঁদের গাড়ির ভাড়া নিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছিল। এরপরই আমরা সিদ্ধান্ত নিই আর কোনোদিন বাঙালী গাইড নেব না। সব বাঙালী গাইডই যে অপেশাদার তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর অপেশাদার আচরণ দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত-বিরক্ত; ফলে উত্তম বিকল্প যেহেতু আছে, ঝুঁকি এড়ানোই শ্রেয়। যথাস্থানে নরখেলেইমদা'কে পেয়ে যাই। আমাকে দেখেই একগাল হেসে এগিয়ে আসে, 'বালো আচেন দাদা?'
'হ্যাঁ, তুমি কেমন আছো নরখেলেইমদা?'
'বালো।'
'জাদিপাই যাব, তুমি ফ্রি আছো তো?'
'হা ফ্রি আচি। কিন্তু জাদিপাই তো যাইতে দেবে না।'
'কেন?'
'নিরাপত্তার কারণে আর্মি ওদিকে যাইতে দিচ্চে না।'

ইস্, কতো আগ্রহ নিয়ে এসেছি যে জাদিপাই যাব! যদিও এর আগে বর্ষায় ভরা যৌবনবতী অপূর্ব সুন্দরী জাদিপাই ঝর্ণাকে দেখেছি, অবগাহন করেছি স্বচ্ছ জলে। তবু আফসোস হচ্ছে, কেননা জাদিপাই ঝর্ণার সৌন্দর্য এমন মনোমুগ্ধকর যে সেখানে হাজারবার যেতেও আমি রাজি আছি! কিন্তু আমার নিজের চেয়েও বেশি আফসোস হচ্ছে পরাগদা আর শাশ্বতীদির জন্য, ওরা কখনো জাদিপাই যায় নি, ওরা বগালেকের পরে আর যায় নি। খুব আশা ক'রে এসেছে জাদিপাই যাবার জন্য।

নরখেলেইমদাকে নিয়ে হোটেলে ফিরি, ওরা ফ্রেশ হয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে। নরখেলেইমদাকে দেখে ওরাও খুব খুশি হয়, কিন্তু খুশিতে খানিকটা ভাটা পড়ে যখন শোনে যে জাদিপাই যাওয়া যাবে না। হাত-মুখ ধুয়ে এসে আমি আর নরখেলেইমদাও ব'সে পড়ি টেবিলে। অর্ডার মতো টেবিলে আসে ভাত, আলু ভর্তা, শুটকি ভর্তা, ডাল আর মুরগির মাংস।

হোটেলটা খুব পরিচ্ছন্ন, আদিবাসীদের হোটেল। গাইডের ক্ষেত্রে যেমনি আমরা বাঙালী গাইড বর্জন করেছি, তেমনি পাহাড়ে এসে সর্বক্ষেত্রেই আমরা বাঙালীদের চেয়ে

পাহাড়ীদের প্রাধান্য দেই। বলা যায় বাঙালী হয়েও পাহাড়ে এসে আমরা বাঙালীদের সংস্পর্শ যতোটা সম্ভব এড়িয়ে চলি। এর কারণ আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা। বান্দরবানে একবার একটা বাঙালী হোটেলে খেতে ব'সে ঝোলের ভেতর তেলাপোকা পেয়েছিলাম। একবার থানচিতে পৌঁছেছিলাম বড় অবেলায়, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের একটা বাঙালী হোটেলে খেতে হয়েছিল। ভীষণ নোংরা হোটেল; থালা-গ্লাস, জগ, টেবিল সমস্ত নোংরা। নোংরা পরিবেশের কারণে পেট পুরে খেতেও পারি নি, রাতেরবেলা এক আদিবাসী হোটেলে খেয়েছিলাম তৃপ্তি ক'রে। আরেকবার বান্দরবানের এক বাঙালী হোটেলে রুটির মধ্যে বেশ বড় একটা চুল পেয়েছিলাম। চুল না হয়ে বাল হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না; কেননা বাঙালী হোটেলের অধিকাংশ ময়রা আটা মাখা, গোল্লা বানানো আর বেলনার ফাঁকে ফাঁকেই অণ্ডকোষ কি পাছা চুলকায়; হাত না ধুয়ে ওভাবেই পুনরায় কাজ শুরু করে! বাঙালী হোটেলের অপরিচ্ছন্নতার নমুনা ঢাকাসহ সারাদেশের অলি-গলিতে পাওয়া যায়।

পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণে, এইসব বাঙালীরা এখানে সেটেলার নামে পরিচিত। পাহাড়ী আদিবাসীদের শান্তিময় জীবনে এই সেটেলাররা দাবানলস্বরূপ! ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ে এই দাবানল ঢুকানো শুরু করে। বরিশাল-নোয়াখালিসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিপুল সংখ্যক মানুষকে লোভ-লালসা দেখিয়ে পাহাড়ে আনা হয়, তারপর জোরপূর্বক আদিবাসীদের বাড়ি-জমি দখল ক'রে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রেশনও দেওয়া হয়। স্বৈরশাসক এরশাদও বিপুল সংখ্যক সেটেলার পুনর্বাসন করে পাহাড়ে। এই সেটেলারদের অনেকেই ছিল নদীভাঙন কবলিত চরাঞ্চলের অপরাধপ্রবণ মানুষ–চোর-ডাকাত, ধর্ষক, জেলখাটা কয়েদি। পাহাড়ে সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত আছে এবং দাবানলস্বরূপ এই সেটেলারা সহজ-সরল আদিবাসীদের জীবনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে ভূমি দখল, খুন, ধর্ষণসহ নানারকম নিপীড়নের মাধ্যমে; আর সেটেলারদের মাথায় বটগাছের মতো সুরক্ষিত ছায়া দিয়ে রেখেছে আমাদের সেনাবাহিনী!

অনেকবারের পাহাড়ী অভিযানে, আদিবাসীদের জীবনযাপন অবলোকন ক'রে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বাঙালীদের চেয়ে আদিবাসীরা অধিক সৎ, সভ্য, এবং পরিচ্ছন্ন জাতি। আমি যখন এই কথাগুলো আমার সহপাঠীদের কাছে বলি, প্রায় সবাই তখন রেগে যায়; বলে–'যা, তুই একটা খাসিয়া-খুসিয়া বিয়ে ক'রে পাহাড়েই থাক গিয়ে!'

অথচ আমি অযৌক্তিক বা মিথ্যা কিছু বলি নি। প্রতিনিয়ত বাঙালীদের অসভ্য-বর্বরোচিত আক্রমণ-আচরণের শিকার হচ্ছে আদিবাসীরা। আমাদের শহরগুলোর রাস্তাঘাটের দিকে, নদী-নালার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বাঙালীরা কতোটা নোংরা। আমাদের সমতলের হাজার হাজার বাঙালী গ্রাম ঘুরেও আদিবাসীদের গ্রামের মতো পরিচ্ছন্ন গ্রাম খুঁজে

পাওয়া যাবে না। বরং আদিবাসীদের এই গ্রামগুলো যতোটুকু নোংরা করার আমরা বাঙালীরা ঘুরতে এসে করি; যত্রতত্র চকলেট, চিপস, সিগারেটের প্যাকেট, কলার খোসা ইত্যাদি ফেলি; আর ওরা সে-সব পরিষ্কার করে। আদিবাসীদের বেশিরভাগ ঘর কিংবা দোকানের সামনেই ময়লার ঝুড়ি থাকে, তারপরও বাঙালী পর্যটকরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে পরিবেশ নোংরা করে। আর যে পথ দিয়ে পর্যটকরা হেঁটে যায়, পথের মাঝে নানান রকম পণ্যের মোড়ক ফেলতে ফেলতে যায়। বাঙালীর এই নোংরা স্বভাবের প্রমাণ কেবল পাহাড় নয়, খোদ ঢাকা শহরেই মেলে, জায়গায় জায়গায় ডাস্টবঙ থাক সত্ত্বে তার আশে-পাশেই ময়লা ফেলে মানুষ।

আদিবাসীরা অনেক সৎ; যত্রতত্র জিনিষ ফেলে রাখলেও ওরা কখনো কারো জিনিসে হাত দেয় না। এতোবার পাহাড়ে এসেছি কিন্তু কোনোদিন আমাদের কোনো জিনিস হারায় নি, শুধু একবার আমার একটা টি-শার্ট ছাড়া। আর এই টি-শার্টটাও কোনো আদিবাসী চুরি করে নি, চুরি করেছে শহর থেকে অবকাশ যাপনে আসা তথাকথিত সভ্য কোনো বাঙালী পর্যটক। এক বিকেলে ঘাটের কাছে প্যান্ট আর টি-শার্ট রেখে বগা লেকে গোসল করছি, সেখানে আরো পনের-বিশজন বাঙালী পর্যটক, কেউ গোসল করছে কেউবা গোসল সেরে উঠেছে, কোনো আদিবাসী নেই। ট্র্যাকিংয়ের ক্লান্তি বগা লেকে ধুয়ে ফুরফুরে দেহ-মনে ওপরে উঠেই দেখি আমার টি-শার্ট হাওয়া! ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আর বাঙালী তীর্থে কি পর্যটনে গেলেও চুরি করে!

খেতে খেতে আমাদের পাশের টেবিলে বসা চৌদ্দ-পনের বছর বয়সী এক আদিবাসী কিশোরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। ছেলেটা বাঁ-হাতি, বাঁ-হাত দিয়ে যত্ন ক'রে ভাত মেখে খাচ্ছে। কোনো ছন্দপতন নেই, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, একদম সহজাত। অথচ মুহাম্মদ বলেছে ডানহাতে খেতে। যে জন্মগত বাঁ-হাতি, সে ডানহাতে খাবে কী করে! একজন বাঁ-হাতিকে ডান হাত দিয়ে খেতে বলা কিংবা জোর ক'রে ডান হাত দিয়ে খেতে শেখানো তো প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। দেশ যে-দিকে এগোচ্ছে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাঁ-হাত দিয়ে খাবার জন্য বাঁ-হাতিদেরও চাপাতির কোপ খেতে হতে পারে!

কেবল খাওয়া নয়, মুহাম্মদ সব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে বলেছে। যে কারণে দেশের প্রচলিত আইনে রাস্তার বাঁ-দিক দিয়ে চলার নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ হুজুর আর বোরকাওয়ালী রাস্তা বা ফুটপাতের ডানদিক দিয়ে হাঁটে। হুজুর আর বোরকাওয়ালীদের সঙ্গে প্রায়ই আমার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হয়, বিপরীত দিক থেকে এদেরকে রাস্তার ডানদিক দিয়ে আসতে দেখলে আমিও আমার বাঁ-দিক দিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অনড় থাকি। আমার হাঁটার ধরন দেখে অধিকাংশই মুহাম্মদের আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয়; আবার অনেকে আশা করে যে আমি তাদেরকে সাইড দেব, কিন্তু সাইড দেওয়া দূরে থাক আমি তাদের মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে যাই তাদের চোখে আমার বিরক্তিমাখা চোখদুটো রেখে! বাধ্য হয়ে তারাই সাইড দেয়। আমি বিজয়ীর আনন্দে চলতে শুরু করি।

খাওয়ার পর ট্র্যাকিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের স্যান্ডেল কিনি সবাই। চারটে ব্যাগ দুটো করি, মানে চারজনের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দুটোয় ঢুকিয়ে নিই আর বাকি জিনিস অন্য দুটোয় ঢুকিয়ে নরখেলেইমদার পরিচিত এক দোকানে রেখে দিই। তারপর থানায় এবং আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে নাম এন্ট্রি ক'রে উঠে পড়ি চাঁদের গাড়িতে, আমরা ছাড়াও স্থানীয় আরো তিনজন ওঠে।

চাঁদের গাড়ির যাত্রা ভীষণ রোমাঞ্চকর, মাঝে মাঝে মনে হয় রোলার কোস্টারে চড়েছি; কখনো ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতেই থাকে, আবার কখনো ষাট-সত্তর ডিগ্রি খাড়া ঢাল বেয়ে ওপর দিকে ওঠে! অতিরিক্ত খাড়া ঢালগুলো উঠার সময় পিছন দিকে তাকালে মনে হয় এই বুঝি গাড়ি উল্টে যাবে! ঢালগুলো উঠার সময় মাঝে মাঝে আমরা সবাই সমস্বরে 'ও...' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠি, শাশ্বতীদি একেকবার আমাদের একেকজনের হাত নয়তো হাঁটু খাঁমচে ধরে। ধার্মিকেরা বলে প্রাণের মালিক আল্লাহ্ বা ভগবান, আমি বলি যতোদিন বাঁচবো ততোদিন প্রাণের মালিক আমি; কিন্তু এই পাহাড়ী পথে প্রাণের মালিক চাঁদের গাড়ির চালক এতে কোনো সন্দেহ নেই! একটু এদিক-ওদিক হলেই এক-দেড়শো ফুট নিচের গাছপালায় কি পাথরে আছড়ে পড়বো। তবে এ পথের চালকেরা খুবই দক্ষ।

পথের পাশের একটা পাড়ায় স্থানীয় একজন নেমে যায়, এখানেই তার বাড়ি। ছোট্ট পাড়াটি পেরোলেই আবার জনশূন্য পাহাড়ী পথ। একের পর এক পাহাড় অতিক্রম ক'রে সবুজ অরণ্যের ভেতর দিয়ে চাঁদের গাড়ি এগিয়ে চলে সামনের দিকে। রাস্তার বাঁকে একটা জায়গা খুব খারাপ, ড্রাইভার আমাদের নামিয়ে দিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে জায়গাটা পার হয়। এই ফাঁকে জলবিয়োগের জন্য আমি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। অরণ্যের ঝোঁপঝাড়-লতাগুল্মের দারুণ একটা বিশুদ্ধ গন্ধ এসে লাগে নাকে, লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বুকের হাপর ভ'রে ফেলি বিশুদ্ধ বাতাসে। আমার দেখাদেখি আবির আর পরাগদাও মূত্র বিসর্জনে দাঁড়িয়ে যায়। এক লাইনে তিনজনকে দাঁড়াতে দেখে দূরে দাঁড়ানো শাশ্বতীদি দুষ্টুমি ক'রে বলে, 'দাঁড়া, ছবি তুলবো!'

আমাদের ছবি আর তোলে না, এই অবসরে সে তুলতে থাকে প্রকৃতির ছবি। জলবিয়োগ সেরে আবার গিয়ে উঠি গাড়িতে। শৈরাতং পাড়ার কাছাকাছি এসে ঢাল বেয়ে নামার সময় পরাগদা নরখেলেইমদাকে বলে, 'দাদা, ড্রাইভারকে বলো আমরা এই পাড়ায় একটু থেমে চা খেয়ে যাই।'

কথামতো শৈরাতং পাড়ার চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। নেমে সবাই বিস্কুট আর কলা খাই, পাহাড়ী কলা দারুণ সুস্বাদু, তার ওপর ফরমালিনমুক্ত। খেয়ে ফেলি হালি খানেক। তারপর চা-টা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাই শৈরাতং পাড়ার ভেতরের দিকে, দারুণ পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর পাড়াটা। রাস্তার পাশের দোকান আর কয়েকটি ঘর মাটিলগ্ন হলেও, পাড়ার ভেতরের দিকের ঘরগুলো বাঁশ আর কাঠের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে, মাটি থেকে চার-পাঁচ ফুট উঁচুতে। কাঠের মেঝে, বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া, চালে ছন। দুটো মুরগী আর একটা মোরগ মাটিতে কিছু খুঁটে খাচ্ছিল, আগন্তুক দেখে ঘরের কোনে স'রে যায় ওরা। ঘরের সামনে দুটো শূকর নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ে ব্যস্ত, আগন্তুক দেখে ভীত কিংবা রাগত নয় তারা। দু'জন লোক পিঠে দুটো ভারি বস্তা ব'য়ে নিচের দিক থেকে ওপর দিকে উঠছে। নারীরা নিজেদের মতো কাজ করছে, বাচ্চারা আপনমনে খেলছে। আমাদের বাঙালীদের মতো এরা অতি কৌতুহলী নয়; বাঙালীরা নিজেদের গ্রামে অপরিচিত কাউকে দেখলে নাম, ঠিকানা, কার বাড়িতে এসেছে ইত্যাদির পরও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে অযাচিত প্রশ্ন করতেও ছাড়ে না; অনধিকার চর্চা বাঙালীর মজ্জাগত! কিন্তু এরা তা নয়, এরা নিজেদের মতো কাজ করে, পর্যটকদের প্রতি বিশেষ কৌতুহল নেই, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়, ছবি তুলতে চাইলে একটু দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকায় কিংবা হাসে।

আকাশে মেঘের অবস্থা এখন-তখন, ড্রাইভারের তাড়া পেয়ে আবার এসে গাড়িতে উঠি। রুমাবাজার থেকে যখন চাঁদের গাড়িতে উঠি, তখনো আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, ছিল ঝলমলে রোদ্দুর। এটুকু আসতে আসতেই রূপ বদলে গেছে আকাশের, বৃষ্টি যে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দু-পাশে ঋষির মতো মৌনী-ধ্যানি পাহাড়, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমাট মেঘ। হঠাৎ হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে এক-দু'জন মানুষ চোখে পড়ে, কলা কি ভুট্টা সংগ্রহে ব্যস্ত তারা। বংশ পরম্পরায় এদের জীবন একইভাবে একই ধারায় ব'য়ে চলেছে। এরা পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করে না, এরা বিশ্বাস করে এই ধরিত্রীমাতা তাদের খাওয়ায় তাই তার কোনো ক্ষতি করা উচিত নয়; নদী তাদের প্রাণ বাঁচায়, তাতে আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। এরা বায়ু দূষণ কিংবা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়, পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব না ঘটলেও এদের কিছু আসতো-যেতো না। যুগের পর যুগ এরা পাহাড়কে দিয়েছে ঘাম আর পাহাড় এদের হাতে তুলে দিয়েছে আহার, তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে এরা। কিন্তু তারপরও পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষের ডেকে আনা বিপর্যয় থেকে প্রকৃতির এই শান্ত-স্নিগ্ধ-সরল জীবনগুলি রেহাই পাবে না! একটা সুউচ্চ পাথুরে পাহাড়ের পাদদেশে পথের বাঁকে এসে গাড়ি থামে। পথ সামনে আরো এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা ওদিক দিয়ে যাব না, ওদিক দিয়ে গেলে খাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকটা পথ উঠতে হয়। পরিশ্রম হয় খুব, আবার ঝুঁকিপূর্ণও। একবার ও পথে গিয়েছিলাম, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল। তাই এখান থেকে আমরা বাঁ-দিক দিয়ে নেমে অদূরের ঝিরিপথ দিয়ে যাব, ঝিরিপথ চ'লে গেছে বগালেকের কাছ দিয়ে; ওখান থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে অল্প একটু পথ।

আমরা গাড়ি থেকে নামি। ব্যাগ একটা আমার কাঁধে, আরেকটা আবিরের। নরখেলেইমদা ঝাড় থেকে পাঁচটা চিকন বাঁশের লাঠি কেটে এনে চারটে আমাদের হাতে দেয়, আরেকটা রাখে নিজের হাতে। তারপর রাস্তা থেকে নেমে সরু পথ ধ'রে আগে আগে হাঁটতে শুরু করে সে, আমরা পিছে পিছে; সকলের পিছনে আমি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হ'লে পরাগদা আবিরের কাছে জানতে চায়, 'পলিথিনগুলো ব্যাগে ঢুকিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।' জানায় আবির।

ঝিরিতে নামতে নামতেই বৃষ্টির বালিকা ফোঁটাগুলো হঠাৎ-ই যেন কৈশোর টপকে যুবতী হয়ে যায়। আবির চটজলদি ব্যাগ থেকে পলিথিন বের করলে দেখা যায় বড় পলিথিনগুলো আছে কিন্তু ছোটগুলো নেই, নিশ্চয় রেখে আসা ব্যাগেই রয়ে গেছে। ছোট পলিথিনগুলো এনেছিলাম মাথায় বেঁধে বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেতে। পরাগদা সুযোগ পেয়ে আবিরকে খোঁচা মারে, 'ভাগ্যিস প্রিয়তি আসে নি, নইলে তো তুই ও বেচারিকেও রুমাবাজারে ভুলে রেখে আসতি!'

অগত্যা একটা বড় পলিথিনের ভেতর সবার মোবাইল-মানিব্যাগ আর আমার ক্যামেরাটা রেখে ঢুকিয়ে ফেলি ব্যাগের মধ্যে। বাইরে থাকে কেবল শাশ্বতীদির ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা। এরপর বড় দুটো পলিথিনের মধ্যে ব্যাগ দুটো ঢুকিয়ে কায়দা ক'রে কাঁধে নিই, যাতে ভেতরের জামা-কাপড় ভিজে না যায়। আমরা এই কাজটুকু করতে করতেই দেখি ঝিরির উজান থেকে নেমে আসা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেছে, ছোট ছোট পাথরগুলো চোখের সামনে জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। নরখেলেইমদাকে অগ্রবর্তী ক'রে আমরা হাঁটতে শুরু করি। গা ছেড়ে তুমুল বৃষ্টি নামে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আমাদের সমতলের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। দেখতে দেখতে হাঁটুজল হয়ে যায়, আমরা আগে লাঠি ফেলে তারপর সাবধানে পা ফেলে হাঁটি। পাথুরে পথ; ছোট, বড়, মাঝারি নানান মাপের পাথর; কোনো কোনোটার দৈর্ঘ্য মানুষ সমান, চওড়াও অনেক; কোনোটা গোলাকার, কোনোটা বর্গাকার। জলের নিচের ছোট কিংবা মাঝারি পাথর দেখতে পাই না, কেবল লাঠি দিয়ে অনুভব ক'রে এগোই; এর মধ্যে প'ড়ে গেলেই বিপদ।

জল এখন কোথাও হাঁটু কোথাওবা উরু সমান! ঝিরি যেন পাহাড়ের যোনি; কামুক জল পাহাড়ের গলা, বুক, পেট বেয়ে খুঁজে নিয়েছে এই গুপ্তদ্বার; বিপুল সুখে আর উচ্ছ্বাসে ধেয়ে আসছে সামনে থেকে! শাশ্বতীদি এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই তার ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা দিয়ে প্রকৃতি এবং আমাদের ছবি তোলে মাঝে মাঝে। আমি ছবি তোলার সময় ক্যামেরায় এক ঝলক তাকিয়ে পরক্ষণেই দৃষ্টি রাখি নিচের দিকে, একটু অমনোযোগি হয়ে পা পিছলে পড়লেই মাথা ফাটবে না হাঁটুর বাটি ছুটে যাবে তার ঠিক কী! ভাবতে না ভাবতেই পা পিছলে পড়ে যায় আবির। দ্রুত ওর কাছে যাই সবাই। ওকে টেনে তুলি, জলের ওপর পড়েছে, কোনো ধারালো পাথর ছিল না ওখানে, তাই রক্ষা। যখন দেখি ওর বিশেষ কিছু হয়

নি, তখন আবার হাঁটতে হাঁটতে ওকে নিয়ে আমরা রসিকতা শুরু করি আমরা। পরাগদা ওর কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'কিরে, বিচি গলে নাই তো!'

'খুব মজা নিচ্ছো না, একবার পড়লে বুঝবা গলে কি না গলে!'

শাশ্বতীদি পরাগদার কথা শুনতে পায় নি, কিন্তু আবিরের কথা শুনে হয়তো কিছুটা অনুমান করেছে। না বোঝার ভান ক'রে সে-ও যোগ দেয় রসিকতায়, 'এই তোরা কী গলার কথা বলছিসরে!'

শাশ্বতীদির রসিকতা ধরতে পেরে আবির বলে, 'তুমিও ওদের সাথে যোগ দিচ্ছো না! দাও, সুযোগ পেয়েছো! তবে সময় আমারও আসবে সামনে, তোমাই জামাইয়ের জায়গা মতো একটা জোঁক যদি এবার আমি না লাগায়ে দিছি, তাইলে আমার ঠাকুরদার নাম পাল্টায়ে দিও!'

পরাগদা জোঁক দেখলে ভীষণ ভয় পায়। তার প্যান্টের পকেটে একটা গুলের কৌটা আর পলিথিনে লবণ আছে। ঝিরিতে নামার আগে লবণ আর গুল মিশিয়ে হাতে-পায়ে দিয়েছে। তার এই জোঁকভীতি নিয়েও আমরা খুব রসিকতা করি। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘোরার কথা শুনলে এক পা উঁচিয়ে থাকে, অথচ জোঁক দেখলে ভয় পায়! আবিরের মুখে জোঁকের কথা শুনে আপসে আসে সে, 'ভাই, তুই আমার বড় আদরের ছোট ভাই, আমরা একই সরকারী দলের লোক, আমি না হয় সামান্য একটু রসিকতা করেছি, তাই ব'লে তুই আমার গায়ে জোঁক দিবি? এতে তো বিরোধী দল খুশি হবে, হাততালি দেবে!'

বিরোধী দল মানে আমি আর শাশ্বতীদি। যেকোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে শাশ্বতীদির মতের মিল বেশি, আর আবিরের সঙ্গে পরাগদার। অধিকাংশ বিষয়েই আমি আর শাশ্বতীদি একাট্টা থাকি, তুমুল তর্ক-বিতর্ক করি ওদের সঙ্গে। ওরা সরকারী দল এই জন্য যে আমাদের ট্যুরের টাকা-পয়সা সব আবিরের কাছে থাকে, সব খরচ ওর হাত দিয়েই হয়। এজন্য আমরা ওদের বলি সরকারী দল, আর ওরা আমাদেরকে বলে বিরোধী দল।

চারিদিকে এখন বৃষ্টি আর ঝিরির উজান থেকে আসা তীব্র জলস্রোতের শব্দ। মেঘ-বৃষ্টির কারণে এমনিতেই আলো কম, তার ওপর মাথার ওপর ঘন গাছপালা, জায়গা বিশেষে গাছপালার ঘনত্ব এতোই বেশি যে মনে হয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সতর্কতার সাথে উরু সমান পানি ভেঙে আর একের পর এক পাথর ডিঙানোর ফাঁকে গল্প-কথা আর হাসি-ঠাট্টা করতে করতে এক সময় দারুণ রোমাঞ্চকর ঝিরিপথ ছেড়ে উঠি আমরা, ঝিরি চ'লে গেছে আরো ওপরের দিকে, কিন্তু আমাদের এখন ডানদিকের একটা খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে হবে বগাকাইন হ্রদ কিংবা সংক্ষেপে বগা হ্রদ বা বগালেকের পাড়ে। ঝিরির পাড়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বোতলের অবশিষ্ট জলটুকু এক ঢোক ক'রে সকলে

পান করি। পানীয় জল শেষ, এমনিতে ঝিরির জল পান করা যায়, কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড় ধুয়ে নামা জলে মাটি মিশে ঘোলা হয়ে গেছে। আমরা সবাই ভীষণ পরিশ্রান্ত, হাঁটু কাঁপতে থাকে, একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শীত লাগে। মনে হয় এখনই যদি একটা উষ্ণ বিছানায় কাঁথা গায়ে দিয়ে একটু গড়িয়ে নিতে পারতাম! পাহাড়ী অভিযান এমনই, একনাগাড়ে চলতে চলতে ক্লান্তি আসে, ঝিমুনি আসে, তারপর উঠে গা ঝাড়া দিয়ে আবার চলতে হয়। আসলে না চ'লে তো উপায় নেই, পাহাড়ী অরণ্যে না আছে আরামদায়ক গাড়ি না আছে গড়িয়ে নেবার জন্য জায়গায় জায়গায় উষ্ণ নরম বিছানা! ফলে অলস মানুষও এখানে এলে কর্মঠ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত মাঝে মাঝে পাহাড়ে ট্র্যাকিং করা। পাহাড় মানুষকে যেমনি উদারতা শেখায়, তেমনি শেখায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই-সংগ্রাম করতে।

বৃষ্টিস্নাত পিচ্ছিল খাড়া পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করতে করতে অবশেষে আমরা বগালেকের পাড়ে উঠে বুক ভ'রে নিশ্বাস নিই। এখন আর বৃষ্টি নেই, রোদও নেই; আকাশ বেশ পরিষ্কার। চায়ের দোকানের ধোঁয়া ওঠা গরম জলের কেটলি দেখে পরাগদা দোকানের চাঙায় ব'সে বলে, 'আগে চা খেয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা করি, তারপর নিচে নামবো।'

নিচে বলতে খুব বেশি নিচে নয়; লেকের পাড়ের ঢাল দিয়ে একটুখানি এগোলেই কিছুটা সমতল জায়গা, সেখানে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো কাঠের ঘর, ঘরগুলো পর্যটকদের থাকার জন্য। কাঁধের ব্যাগ নামাই চাঙায়। খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে আসায় হাঁটু কাঁপে, তৃষ্ণায় কাতর বুক। এক জগ জল পাঁচজনে শেষ ক'রে ফেলি। তারপর পা ছড়িয়ে বসি চাঙায়। বসামাত্র কোমরে দারুণ আরাম অনুভূত হয়। দোকানদারের বাড়িয়ে দেওয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মুখের কাছে ধরতেই চায়ের ধোঁয়া যেন ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভেজা মুখের থমথমে মাংসপিণ্ডে উষ্ণ আদর বুলিয়ে দেয়! গরম রং চা মুখে আর পেটে পড়তেই শরীরটা চনমনিয়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে চাগাড় দিয়ে ওঠে ক্ষিধেটাও। রোমাঞ্চকর পথের ধকলে আর অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগে এতোক্ষণ ক্ষিধের কথা মনেই ছিল না! নরখেলেইমদা তার চা দ্রুত শেষ ক'রে বলে, 'আপনারা চা খায়ে আসেন, আমি গিয়ে ঘর ঠিক করি আর খাবার কথা বলি।'
'ঠিক আছে যাও।' সায় দেয় পরাগদা।

কিছুক্ষণ পর চায়ের বিল মিটিয়ে আমরাও উঠে নিচের দিকে পা বাড়াই। নরখেলেইমদা আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করে একটা কাঠের দোতলায়, আর খাওয়ার ব্যবস্থা অন্য এক জায়গায়। সে আমাদের ব্যাগ দুটো রেখে আসে দোতলায়, তারপর আমরা তার সাথে যাই পাশের আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে। একজন আর্মি চেয়ারে ব'সে আছে, তার সামনের টেবিলে একটা মোটা খাতা আর কলম; আর অন্য তিনজন আর্মি ব'সে আছে পাশের বেঞ্চে, বেড়ায় ঠেস দিয়ে রাখা তাদের বন্দুক। চারজন আর্মি-ই বাঙালী। আমরা একে একে নাম

এন্ট্রি করি আর এর ফাঁকে ফাঁকে চলে আর্মিদের সঙ্গে গল্প; আর্মিদের প্রশ্ন আর আমাদের উত্তর, আবার আমাদের প্রশ্ন আর আর্মিদের আন্তরিক উত্তর। একজনের বাড়ি আবিরদের উপজেলায়, তিনি আবিরের বাবাকে চেনেন।

আমার কয়েকবারের পাহাড়ী অভিযানে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে পাহাড়ের বাঙালী আর্মি এবং পুলিশ বাঙালীদের সঙ্গে খুবই আন্তরিক ব্যবহার করে। যেচে কথা বলে আর কথা একবার শুরু করলে শেষ করতে চায় না। বছর কয়েক আগে এই বগা লেকেই একবার স্নানাহার সেরে সন্ধ্যা নামার আগে নাম এন্ট্রি করতে এসেছিলাম, কয়েকজন আর্মি কথা শুরু ক'রে আর শেষ-ই করতে চাইছিলো না। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে আর মশা কামড়াতে শুরু করে, তখন অডোমাস মাখার দোহাই দিয়ে উঠতে চাইলে একজন আর্মি পকেট থেকে নতুন অডোমাস বের ক'রে দিয়ে মেখে নিতে বলে। ফেরত দিতে গেলে বলে, 'রেখে দিন আপনাদের কাছে, আমাদের অনেক আছে।'

আর একবার থানচির পুলিশ আমাদেরকে একগাদা পেয়ারা দিয়েছিল খাওয়ার জন্য। ঝুড়ি ভরা পেয়ারা, কতো আর খাবে তারা, আঁজলা ভ'রে ভ'রে দিয়েছিল আমাদের একেকজনের তোয়ালে আর গামছায়! জীবনে অমন আন্তরিক পুলিশ দেখি নি।

পাহাড়ের বাঙালী আর্মি আর পুলিশের এই আন্তরিকতার বড় কারণ হলো–দিনের পর দিন পরিবার, বন্ধু-স্বজন ছেড়ে এরা অরণ্যে প'ড়ে থাকে; নিজেরা ছাড়া কথা বলার মানুষ তেমন পায় না। একঘেয়ে হয়ে ওঠে এদের জীবন, অরণ্যের নৈঃশব্দ যেন এদের গলা টিপে মারে! একজন আর্মি বলেছিল, 'ভাই, সখ ক'রে কেউ এই জায়গায় বেড়াতে আসে! পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে কি যে মজা পান আপনারা!' এই বাক্য এমনি এমনি বলে নি সে, বলেছিল দিনের পর দিন একঘেয়ে জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতায়। আমরা যেমনি শহরের যান্ত্রিক জীবনে একঘেয়ে হয়ে উঠলে অবকাশ যাপনের জন্য সমুদ্রে-অরণ্যে ছুটি, তেমনি একনাগাড়ে থাকার ফলে এই বিজন অরণ্যও এদের কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। মুক্তি পাবার জন্য ছটফট ক'রে এরা। কথা বলার জন্য বুকের ভেতরটা আঁকু-পাঁকু করে, কথা বলার মানুষ পেলে ছাড়তে চায় না।

তবে যে আন্তরিকতাটুকু এরা আমাদের দেখায়, সেটুকু পাহাড়ীদের প্রতি দেখালেই আমরা বেশি খুশি হই। কেননা অধিকাংশ বাঙালী স্বীকার করতে না চাইলেও আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমাদের আর্মিরা পাহাড়ী আদিবাসীদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। সামান্য কারণে আদিবাসীদের মারধর করা, প্রয়োজনো-অপ্রয়োজনে তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা, আদিবাসী নারীদেরকে ধর্ষণ করাসহ অনেক অভিযোগ আমাদের সেনাদের বিরুদ্ধে; যার কোনোটাই ভিত্তিহীন নয়।

আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট ক'রে ব্যাগ থেকে শুকনো কাপড় নিয়ে গোসলের উদ্দেশে যাই বগালেকের ঘাটে। ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা গাছের বাকলহীন ডালে জামা-কাপড় রেখে আমরা নেমে পড়ি লেকের স্বচ্ছ জলে। আবির আর আমি কিছুদূর সাঁতরে গিয়ে আবার ফিরে আসি। ভয় লাগে আমার। একে তো জলজ উদ্ভিদে পা জড়িয়ে যায়, তার ওপর এখানে নাকি অনেক বড় বড় মাছ আছে; এই ভরা যৌবনে মাছের খাবার হতে চাই না!

বগালেকের জল এই সময়ে দারুণ স্বচ্ছ থাকায় অনেকটা গভীরের মাছও দৃষ্টিগোচর হয়। গভীরতা আনুমানিক ১৫০ ফুট, বিস্তৃতি ১৫ একর জায়গায়। আশপাশের গাছপালার ছায়া পড়েছে এখন লেকের কোনার দিকে, আর মাঝখানে আকাশ এবং মেঘের প্রতিবিম্ব। বগালেক নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে লোকগাঁথা চালু আছে যে–অনেককাল আগে চোঙা আকৃতির পাহাড়ের গুহায় এক অদ্ভুত প্রাণি বাস করতো, লোকে সেই অদ্ভুতদর্শন প্রাণিকে বগা নামে ডাকতো। বম ভাষার বগা শব্দের অর্থ ড্রাগন। পাহাড়ের পাদদেশে বাস করতো আদিবাসীরা, তারা বগাকে সন্তুষ্ট রাখতে নানা ধরনের জীবজন্তু ছেড়ে আসতো গুহার মুখে। হঠাৎ করেই আদিবাসীদের গ্রাম থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হারিয়ে যেতে শুরু করে। সকলের সন্দেহের তীর বগার দিকে। এক রাতে গ্রামের সাহসী মানুষেরা মশাল জ্বালিয়ে লাঠি, তীর-ধনুক, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বগার গুহায় গিয়ে তাকে আক্রমণ করে, মানুষের হাতে প্রহৃত বগা পালানোর জন্য চেষ্টা করলে তারা বগার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুনে পুড়ে বগা তো মরেই সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভেঙে খান খান হয় পাহাড় আর জন্ম নেয় এই হ্রদ, তখন থেকেই এই হ্রদের নাম বগাকাইন হ্রদ বা বগা হ্রদ কিংবা বগালেক।

লোকগাঁথা লোকগাঁথাই, বংশ পরম্পরায় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত লোকগাঁথায় যৌক্তিক তত্ত্ব কিংবা সত্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে কখনো কখনো লোকগাঁথার মধ্যে সত্যের একটি সুতো পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা লেকটি সম্ভবত মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ অথবা মহাশূন্য থেকে বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হ'লে সত্যের সুতোর মতো লোকগাঁথার আগুনের ব্যাপারটাই শুধু সত্য, বাকিসব মানুষের কল্পনা। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হবার সম্ভাবনাই বেশি, লেকের তলদেশে উষ্ণ জলের একটি প্রস্রবণ রয়েছে, এপ্রিল-মে মাসে প্রস্রবণ থেকে উষ্ণ পানি বের হবার সময় লেকের জলের রঙ বদলে ঘোলাটে হয়ে যায়।

হৃদয় স্তব্ধ করা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝির কোরাস, অরণ্যের নাম না জানা পাখির সুর। সামনে বগালেকের নিস্তরঙ্গ জলরাশি। মাথার ওপর বহুদূরে জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র। মনে হচ্ছে আমি যেন ওই দূর নক্ষত্রজগতের অসংখ্য নক্ষত্রের ভেতর থেকে টুপ ক'রে খসে পড়েছি এখানে, মনে হচ্ছে ভিন্ন এক জগতে এসে পড়েছি হঠাৎ! মনে হচ্ছে এই জগতে কেউ নেই, আমি একা!

আজ চানরাত, কাল ঈদ। একারণেই আমরা ছাড়া আর মাত্র কয়েকজন পর্যটক আছে এখানে; কাল থেকেই হয়তোবা পর্যটক বাড়তে শুরু করবে। পর্যটক বেশি থাকলে এতোটা সুনসান থাকে না, এদিক-সেদিক দিয়ে পর্যটকরা হাঁটাচলা করে, মদ্যপান ক'রে জোরে জোরে কথা বলে, গান গায়, কোথাও আগুন জ্বালিয়ে বারবিকিউ করে হই-হুল্লোর করতে করতে। তখন বগালেকের আসল সৌন্ধর্য আর হৃদয় হিম করা নীরবতা উপভোগ করা যায় না এখনকার মতো।

আবেগাক্রান্ত আমি; এমনিতেই আমি আবেগী মানুষ, তার ওপর পেটে তিন পেগ পড়ায় আবেগ উথলে ওঠে। তিন পেগ পেটে চালান করেই আমি লেকের পাড়ের মরা গাছটার ওপর এসে বসি একা একা সময় কাটাবো ব'লে, নিজের মুখোমুখি হবো ব'লে। পরাগদা, শাশ্বতী আর আবির এখানো ঘরে ব'সে পান করছে। আমি সখের পানশৌণ্ড, ন'মাসে-ছ'মাসে একবার পান করি। পান করলেই খুব আবেগাক্রান্ত হই আর শায়লাকে মনে পড়ে। চিৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে করে, অথচ আমি নীরবে কাঁদি! বাইরে থেকে দেখে অনেকেই আমাকে অরসিক অবেগশূন্য মানুষ মনে করে। আমার সাথে যারা গভীরভাবে মেশে কেবল তারাই পড়তে পারে আমার হৃদয়টা। আমাকে গভীরভাবে জানে পরাগদা, শাশ্বতীদি আর আবির।

এক বছর হলো, শায়লার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভেঙে গেছে। আমার অপরাধ? আমি নাস্তিক! আমাদের সম্পর্ক হবার আগে থেকেই আমি নাস্তিক, শায়লা তা জানতো। কিন্তু তখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে ওর কোনো অসুবিধা হয় নি। ও নাকি ভেবেছিল নাস্তিকতা আমার পাগলামি, এক সময় আমার মাথা থেকে নাস্তিকতার ভূত চ'লে যাবে; মুখে মুখে নাস্তিকতার কথা বললেও ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনেই ওকে বিয়ে করবো। কিন্তু যখন একের পর এক ব্লগার খুন হতে থাকে, তখন থেকেই ও আমাকে লেখালেখি বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। কিন্তু যখন দ্যাখে যে নাস্তিকতা কেবল আমার মুখের বুলি নয়, আমি হৃদয়েও ধারণ করি। ধারণ করি অসাম্প্রদায়িক-মানবিক চেতনা, তখনই ঘুরে দাঁড়ায় ও। ১৪৪ ধারা জারি করে আমার ওপর যে আমি যদি নাস্তিকতার পথ ছেড়ে ধর্মের পথে না ফিরি তাহলে ও আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। আমি ওকে বলি, 'আমরা কোর্টে রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করবো। বিয়ের পর তুমি ধর্ম পালন করলে আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে ধর্ম পালনের জন্য চাপাচাপি করতে পারবে না।'

কিন্তু ও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, ওর বাবা-মা নাকি নাস্তিক জামাইকে মেনে নেবে না। আমিও ওর শর্ত মানতে পারি নি। আমি ওকে ভালবাসি, ভীষণ ভালবাসি, ওর জন্য আমি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত; কিন্তু কখনোই আমি আমার আদর্শ, বিশ্বাস, নৈতিকতা, সত্তা বিসর্জন দিতে পারবো না। কারো জন্যই পারবো না, প্রয়োজনে পৃথিবীতে একা বাঁচবো। ও আমাকে নাস্তিকতা ত্যাগ করতে বলেছিল, ভবিষ্যতে বিয়ের পর নিজের সুবিধার জন্য ও যে

আমার বাবা-মাকেও ত্যাগ করতে বলবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়! আমি আমার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাজানো ধার্মিক হতে পারবো না। পারিওনি; তাই দু'জনের পথ বদলে গেছে। ও হয়তো সহজেই ভুলে গেছে যে দু'বছর আগে এই বগালেকেই আমরা কী দারুণ সময় কাটিয়েছি, একে অপরকে জড়িয়ে ধ'রে ব'সে থেকেছি বাকি পৃথিবী ভুলে! ও হয়তো ভুলে গেছে যে রুমা বাজারের একটা হোটেলে আমরা প্রথম রাত্রিযাপন করেছি, শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছি। গত মার্চে ওর বাগদান হয়েছে এক প্রবাসী ছেলের সঙ্গে। ও হয়তো অনেক কিছুই ভুলে গেছে, আমিও ভুলতে চাই; কিন্তু পারি না। বার বার অশরীরি শায়লা আমার কাছে আসে; যখন যে কল্পনা করি; তার মধ্যেই ও ঢুকে পড়ে। আমি হয়তো ওকে ভুলতে পারবো না কোনোদিন, দূর থেকে সারাটা জীবনই ওকে ভালবেসে যাব!

আমার একলা মগ্ন চৈতন্যের ঘোর কাটে শাশ্বতীদির উচ্চস্বরের ডাকে, 'সবুজ...সবুজ...।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দোতলার দিকে দৃষ্টি ছুড়ে দিই। দূর থেকে শাশ্বতীদিকে ভালভাবে দেখতে না পেলেও ঘরের আলোর একফালি চুইয়ে তার পিঠের দিকে পড়ায় অনুমান করতে পারি যে ওটাই শাশ্বতীদি। সাড়া দিই, 'আমি এখানে দিদি।'
'কী করছিস?'
'এমনি ব'সে আছি।'
'আমি আসছি।'
শাশ্বতীদি এসে বসে আমার পাশে, 'এই তুই একা একা এখানে এসে ব'সে আছিস, কাছেই জল, যদি প'ড়ে যেতি।'
'ধুর, তুমি আমাকে অতো মাতাল ভাবো! আমি মাত্র তিন পেগ খেয়েছি।'
'এখানে মশা কামড়াচ্ছে না রে?'
'না, অডোমাস মেখেছি ভাল মতো। ওরা কী করছে?'
'ওরা এখন দার্শনিক বনে গেছে!'

পেটে মদ পড়লেই পরাগদা দার্শনিক বনে যায়, অনর্গল জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে থাকে; কম যায় না আবিরও। আমিও আগে মদ খেয়ে বেশি কথা বলতাম, কিন্তু শায়লা ছেড়ে যাবার পর থেকে মদ খেলেই ওর কথা মনে পড়ে, ওর কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এক কথা আর কতোবার ব'লে বিরক্ত করবো ওদের? তাই দু-জনের বিগত দিনের স্মৃতির সরোবরে ডুব দিয়ে আমি চুপ ক'রে থাকি। শায়লার বিষয়ে শাশ্বতীদি এবং পরাগদা সবই জানে; আর আবির তো জানেই, ও-ই তো আমাদের প্রেমের দূত। এখন কেন জানি না শায়লার কথা বলতে ইচ্ছে করছে শাশ্বতীদিকে, হয়তো আগে বলেছি এসব কথা, তারপরও আবার বলতে ইচ্ছে করছে। শায়লার প্রসঙ্গ তুলতে যাব তার আগেই শাশ্বতীদি বলে, 'তোকে বলবো বলবো ক'রে আর বলা হয় নি, আমি না একটা কাণ্ড ক'রে ফেলেছি।'

অগত্যা নিজের কথাটা চেপে রেখে বলি, 'কী কাণ্ড?'
'আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি তনয়ের কাছে।'
'কবে পাঠিয়েছ?'
'তনয় আজকে বাড়ি গেছে, নিশ্চয় এতোক্ষণে চিঠি পৌঁছে দিয়েছে ওর মামা-মামির কাছে।'
'পরাগদা জানে?'
'না। তুই বলিস না ওকে। আগে দেখি কী রেজাল্ট আসে, তারপর বলবো। হাতে লেখা দীর্ঘ চিঠির ছবি তুলে রেখেছি মোবাইলে।'
শাশ্বতীদি চিঠির প্রথম পাতাটা বের ক'রে মোবাইল এগিয়ে দেয় আমার দিকে, 'প'ড়ে দ্যাখ, পরপর আছে পাতাগুলো।'
আমি মোবাইল হাতে নিয়ে চোখ রাখি স্ক্রীনে–

মা-বাবা,
আমার প্রণাম ও ভালবাসা নিও। পুলককে আমার স্নেহাশীষ জানিও। তোমাদেরকে আমি তুমি করেই বলি, কেননা তোমরা তো আমার দূরের মানুষ নও; আমার জন্মদাতা-জন্মদাত্রীর মতো তোমরাও এখন আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসার মানুষ, আপনজন। আপনজনকে আমার আপনি বলতে ইচ্ছে করে না, তাই তোমাদেরকে তুমি করেই বলি।

মা-বাবা, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয় ভাল আছো; পরাগকে তোমরা দূরে সরিয়ে দিলেও এখনো তো তোমাদের সামনে পুলক আছে, পুলক এখন তোমাদের চোখের মণি, তোমাদের ভবিষ্যত। অবন্তীদি আছে, জামাইবাবু আছে, ফুটফুটে দুটো নাতি-নাতনিও আছে তোমাদের। তনয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পুলকের জন্য সু-পাত্রী খুঁজছো। সু-পাত্রী নিশ্চয় পেয়ে যাবে, নিশ্চয় পুলকের বউ হবে তোমাদের মনের মতো বউ। তোমরা ভালই আছো, ভাল থাকো তাই-ই চাই। মা, আমরা ভাল নেই; বাবা, আমাদেরও ভাল থাকতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কী ক'রে ভাল থাকবো বলো? গত এক দশক আমি আমার বাবা-মাকে দেখি না, আর পরাগ তোমাদেরকে দ্যাখে না পাঁচ বছর। বাবা-মা থাকতেও আমরা মাকে মা, বাবাকে বাবা ব'লে ডাকতে পারি না। মানুষ একজীবনে কতো বছর বাঁচে বলো, সত্তর-আশি-নব্বই কিংবা একশো বছর? এই ছোট্ট জীবনে বাবা-মাকে পায় আরো অল্প সময়ের জন্য; আর এই অল্প সময় থেকে যদি রাগারাগি কিংবা মান-অভিমানে আরো পাঁচ-দশ বছর চ'লে যায়, তবে আর থাকেটা কী বলো? আমরা বড় দূর্ভাগা!

এই দ্যাখো না, ঈদের ছুটিতে বেশিরভাগ মানুষ শিকড়ের টানে কেউ বাড়ি যাচ্ছে, কেউবা যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। আর আমরা দু'জন? আমরা না যেতে পারছি বাবার বাড়ি, না যেতে পারছি শ্বশুরবাড়ি। ভাইবোন-আত্মীয়-স্বজন থেকেও এখন আমাদের না আছে কোনো ভাইবোন, না আত্মীয়-স্বজন। ব্যতিক্রম কেবল তনয়, ও-ই মাঝে মাঝে বাসায় আসে, বৌদি ব'লে ডেকে আমার প্রাণ জুড়ায়। এজন্য ওকে গঞ্জনাও সইতে হয়। আমি এবার পরাগকে বলেছিলাম,

'চলো আমরা গিয়ে বাড়ি উঠি, বাবা-মা নিশ্চয় আমাদেরকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবে না!' কিন্তু জানো তো, তোমাদের বড় অভিমানী ছেলে, একদিন দূর ক'রে দিয়েছিলে, তাই না ডাকলে আর ফিরে যাবে না কোনোদিন; কেবল তোমাদের জন্য কষ্ট পাবে আর চোখের জল ফেলবে। জানো মা, ও মাঝে মাঝেই ঘুমের মাঝে তোমাকে স্বপ্নে দেখে 'মা' ব'লে চিৎকার ক'রে ওঠে। আমি হয়তো তখন জেগে থাকি কিংবা ওর চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি স্বপ্ন দেখার পর ও বাচ্চা ছেলের মতো হু হু ক'রে কাঁদছে। ওর কান্না আমাকেও ছোঁয়, আমরা দু'জন দু'জনকে ছুঁয়ে বিছানায় ব'সে কাঁদি।

মা-বাবা, তোমাদের কাছে এবং আমার বাবা-মা'র কাছে আমরা দু'জনই অপরাধী। তোমাদের ভাষায় পরাগের অপরাধ, ও একটা ছেলের সঙ্গে সংসার করছে, তাও আবার মুসলমান ছেলে; আর আমার বাবা-মায়ের ভাষায় আমার অপরাধ, আমি ছেলে হয়ে নিজেকে মেয়ে পরিচয় দিয়ে একটা ছেলের সঙ্গে সংসার করছি। তার ওপর আবার আমরা বিয়েই করি নি!

মা, এটা কি নিন্দনীয় কিছু? বাবা, এটা কি আমাদের অপরাধ? তোমাদের ছেলে আর আমি না হয় কোনো প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী নই, নাস্তিক; কিন্তু তোমরা তো ধর্মে বিশ্বাস করো, পৌরাণিক দেবদেবীদের কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তাদেরকে পূজা করো। আমাদের দু'জনের মিলন যদি অপরাধ হয় তবে বহুকাল আগেই তোমাদের অনেক দেবদেবী এবং দেবতুল্য মানুষেরা সেই অপরাধে অপরাধী। তাহলে আমাদের মতো তোমরা তাদেরকে কেন বর্জন করছো না; কেন তাদেরকে মন্দিরে স্থান দিয়ে ফুল-মালা-চন্দন পরিয়ে, নিজেরা ব্রত থেকে ঘটা ক'রে পূজা করছো? পরাগের মুখে শুনেছি, তোমরা বছরে একবার বাড়িতে নারায়ণ পূজা করো; নারায়ণের অন্য নাম বিষ্ণু। বাবা-মা, দেবতা এবং অসুরদের সমুদ্রমন্থনের গল্প তোমরা নিশ্চয় জানো, সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত পাওয়া গেলে সেই অমৃত নিয়ে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে দন্দ্ব বাধে, আর দন্দ্ব নিরসনে স্বয়ং বিষ্ণু মোহিনী মায়ায় স্ত্রী-রূপ ধারণ ক'রে দানবদের কাছ থেকে অমৃত নিয়ে দেবতাদের পান করিয়েছিলেন। মা, আমি শুনেছি তুমি শিব পূজা করো। জানো নিশ্চয় মহিষাসুরের বোন মহিষীকে বধ করার জন্য বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করেছিলেন, আর শিব এবং মোহিনীরূপী বিষ্ণুর মিলনের ফলে জন্ম হয়েছিল অয়প্পানের। মা, পরাগ যদি অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে শিবও তো সমান অপরাধী; আমি যদি পাপী হয়ে থাকি, তাহলে বিষ্ণুও সমান তো পাপী। কিন্তু তোমরা সেই শিব-বিষ্ণুকে পূজা করছো, অথচ নিজেদের গর্ভজাত-ঔরসজাত সন্তান আর তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ! তোমাদের বিশ্বাস মতে যদি ধ'রে নিই যে পরকাল আছে, তাহলে পরকালে গিয়ে ভগবান শিব আর বিষ্ণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের সন্তানকে ত্যাগ করার প্রশ্নে কী জবাব দেবে তোমরা?

বাবা-মা, তোমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে রূপান্তরকামিতার গল্প অনেক আছে, আছে তাদের বিয়ে এবং সংসার করার গল্পও; সেখানে এই বিয়েকে কেউ পাপ বলে নি, স্বাভাবিক বিয়ে বলেই গণ্য করেছে। যদিও আমি আর তোমাদের ছেলে প্রথাগত নিয়েমে বিয়ে করি নি; কিন্তু এই যে আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছি, কাছে এসেছি, একসঙ্গে জীবন-যাপন করছি; এটাই আমাদের কাছে বিয়ে। শুধু আমাদের কাছে কেন, হিন্দুধর্ম মতেও এটা বিয়ে। তোমাদের নিশ্চয় মহাভারতের দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার কথা মনে আছে। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত হয়ে কন্ব মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন; কন্ব আশ্রমে ছিলেন না, ছিলেন তার কন্যা শকুন্তলা। শকুন্তলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা দুষ্মন্ত তাকে তাঁর ভার্যা হবার অনুরোধ জানালে শকুন্তলা তার পিতার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলেন। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত তাকে ধর্মানুসারে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করার কথা বলেন; যে বিয়েতে কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না, কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না, পাত্র-পাত্রী নিজেরাই নিজেদেরকে পছন্দ ক'রে একে অন্যের কাছে সমর্পণ করেন। রাজা দুষ্মন্ত আর শকুন্তলাও গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে একে-অন্যের সংস্পর্শে আসেন। তারপর রাজা চ'লে যাবার পর কন্ব মুনি আশ্রমে ফিরে এলে লজ্জিত-বিব্রত শকুন্তলা পিতার কাছে গেলেন না, কন্যার এই সংকুচিত ভাব লক্ষ্য ক'রে কন্ব মুনি দিব্যদৃষ্টিতে সব জানতে পারেন এবং প্রীত হয়ে কন্যাকে জানান যে সে কোনো পাপ করে নি, নির্জনে বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম পুরুষের সকামা স্ত্রীর সঙ্গে যে মিলন তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে, এটাই শ্রেষ্ঠ বিবাহ।

শুধু কী দুষ্মন্ত আর শকুন্তলাই গান্ধর্ব বিবাহ করেন? না, আরো উদাহরণ আছে–মহাভারতের শান্তনু-গঙ্গাকে, অর্জুন উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে, ভীম হিড়িম্বাকে এবং ইক্ষ্বাকু বংশের পরীক্ষিত সুশোভনাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন।

বাবা, আর্যরা ভারতে আসার আগে হাজার-হাজার বছর ধ'রে আমাদের অনার্য সমাজে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন মন্ত্রপাঠ করা ব্রাহ্ম বিবাহ অনার্য সমাজে প্রচলিত ছিল না। আমরা তো আমাদের সেইসব পূর্বপুরুষদেরই উত্তরসুরি, আমরা তো তাদেরকেই অনুসরণ করেছি। এবার তোমরাই বলো, আমরা কি কোনো অপরাধ করেছি? আমরা তো ধর্মানুসারেই একজন আরেকজনের কাছে এসেছি, ভালবেসেছি, গান্ধর্ব বিবাহ করেছি।

আজকাল চারদিকে তাকালেই দেখতে পাই যে অনেক নারী-পুরুষ নিজেরা পছন্দ ক'রে অথবা পরিবারের পছন্দ মতে বেশ ঘটা ক'রে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, শত শত কি হাজার মানুষকে খাইয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে জৌলুস ছড়িয়ে বিয়ে করে; তোমাদের ভাষায় এই সম্পর্ক চিরন্তন, স্বাভাবিক, মঙ্গলজনক। কিন্তু কিছুদিন বাদেই অনেকেরই ডিভোর্স হয়, আবার তারা বিয়ে করে একইভাবে। এভাবে কেউ কেউ চার-পাঁচটি বিয়েও করে। আর তোমাদের ভাষায় আমাদের সম্পর্ক চিরন্তন না হলেও, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিয়ে না করেও, একে-অন্যের সঙ্গে আমরা বারো বছর কাটিয়ে দিয়েছি। আমাদের এই বারো বছরের

প্রেম-ভালবাসা, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ; এ কী সত্য নয় মা? এ কী চিরন্তন নয় বাবা?

আমি জানি যে আমাদের জন্য সমাজের মানুষের কাছে তোমাদের মাথা হেঁট হয়েছে, তোমাদের হয়তো অনেক তীক্ষ্ণ কথা শুনতে হয়েছে; নিশ্চয় এখানো মানুষ তোমাদেরকে বিব্রত করে। কিন্তু যে সমাজ অন্ধ, সেই সমাজের মানুষের কাছে তোমরা কেন মাথা হেঁট করে থাকবে? যে সমাজ কূপমণ্ডুক, সেই সমাজের মানুষের কথা তোমরা কেন গায়ে মাখবে? আমাদেরকে তোমরা বুকে নাইবা ঠাঁই দিলে, কিন্তু তোমরা মানুষের মাঝে মাথা উঁচু ক'রে বাঁচো। তোমরা যেমনি কোনো অপরাধ করো নি, তেমনি অপরাধ করি নি আমরাও। কেউ ফোঁড়ন কাটতে এলে তাকে শুনিয়ে দাও তারই ঘরের ঠাকুরের আসনে বসা বিষ্ণুর মোহিনী রূপের গল্প, বিষ্ণু আর শিবের মিলনের গল্প, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প, অর্জন-উলুপী কিংবা চিত্রাঙ্গদার বৃত্তান্ত। দেখবে নিতান্ত বর্বর হলেও জিভ গোটাতে বাধ্য হবে।

বাবা, তনয়ের কাছে শুনেছি তোমার ডায়াবেটিসের কথা। কিন্তু তুমি নাকি চুরি ক'রে মিষ্টি খাও? বাড়িতে মা এখন মিষ্টি রাখে না ব'লে তুমি নাকি বাজারে গিয়ে অনাথ ঘোষের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে খাও? প্লিজ বাবা, একটু নিয়ম ক'রে চ'লো; সকাল-বিকাল একটু হেঁটো। পলকের জন্য মেয়ে খুঁজছো, নাতি-নাতনির মুখ দেখে যেতে হবে না!

মা, তুমিও নাকি অনিয়ম করো, নিজের শরীরের প্রতি ঠিক মতো যত্ন নাও না? প্লিজ মা, তোমরা দু'জনেই একটু নিয়ম ক'রে চ'লো। এই পৃথিবীতে তোমাদের থাকতে হবে আরো অনেকদিন, পৃথিবীর আরো অনেক পরিবর্তন তোমাদের দেখে যেতে হবে।

মা-বাবা, আমার ভীষণ ইচ্ছে করে তোমাদের আদর-স্নেহ পেতে, ইচ্ছে করে নিজে হাতে রান্না ক'রে তোমাদেরকে খাওয়াতে, তোমাদের সাথে তোমাদের ছায়ায় থাকতে ইচ্ছে করে। জানি না আমার এই ইচ্ছে কোনোদিন পূরণ হবে কিনা, কিন্তু স্বপ্ন দেখতে তো দোষ নেই, তাই স্বপ্ন দেখি যে অভিমান ভুলে তোমরা আমাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছো। সেই দিনের অপেক্ষায় আছি আমি। ভাল থাকো মা, ভাল থাকো বাবা; আনন্দে থাকো।

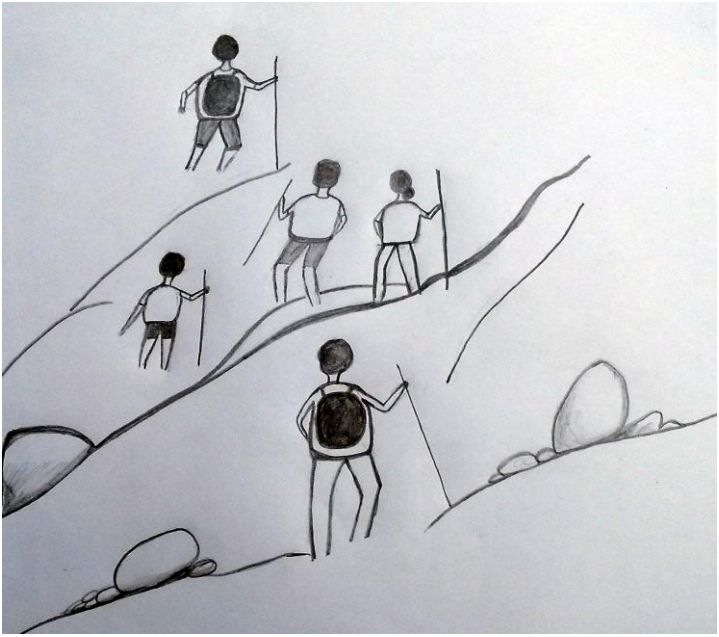
ইতি
তোমাদের বৌমা
শাশ্বতী

চিঠি পড়া শেষ হ'লে আমি মোবাইলটা নিচের দিকে ধরি যাতে আলো আমার মুখে না পড়ে, শাশ্বতীদি আমার মুখের অভিব্যক্তি পড়তে না পারে। এমনিতেই শায়লার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা ভীষণ দূর্বল হয়ে পড়েছে, তার ওপর এই চিঠি প'ড়ে আমার ভেতরটা কেদে

ওঠে, চোখ ভিজে যায়। শাশ্বতীদি আর পরাগদার বাবা-মা ওদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার বাবা-মা আমাকে দূরে ঠেলে দেয় নি; আমি তাদের কাছেই থাকি। একই বাড়িতে থাকি, খাই, ঘুমাই; তবু মনে হয় তারা আমার থেকে অনেক দূরে থাকে, যে দূরত্ব পরিমাপ করা সম্ভব নয়, কেবল অনুভব করা সম্ভব; আমার বাবা-মাকে আমি আমার মতো ক'রে পাই না, যেভাবে আগে পেতাম। দু-দিনের পৃথিবীতে মানুষের সংকটের শেষ নেই; সংকটের বিবিধ রূপ; বিবিধ রঙ!

চিঠি প'ড়ে আমি স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকি, হৃদয় ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে এই চিঠি পড়ার পরও কি কোনো বাবা-মা পারে তার সন্তান আর সন্তানসম বৌমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে? যদি পারে তবে পাষণ্ড সেই বাবা-মা!

আমার নীরবতার অবসরে নৈঃশব্দ অন্ধকারে শাশ্বতীদি হঠাৎ গেয়ে ওঠে–
'নীড় ছোট ক্ষতি নেই
আকাশ তো বড়
এ মন বলাকা মোর অজানার আহ্বানে
চঞ্চল মাখা মেলে ধরো...'



ঘুম ভাঙে নরখেলেই্মদার ডাকে। চোখ মেলে দেখি খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে মেঘ! ওরা তিনজন এখনো ঘুমাচ্ছে। আমি গায়ের কম্বল সরিয়ে উঠে দরজা খুলতেই নরখেলেই্মদা বলে, 'দাদা রেডি হন, একনই রওনা করি।'

আমি ওদেরকে জাগিয়ে ব্রাশ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াই। সাদা মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো বগালেক। পুরু মেঘের কারণে অল্প দূরের জিনিসও ঝাপসা দেখাচ্ছে, আর বেশি দূরে তো মেঘ ছাড়া অন্য কিছু দেখাই যাচ্ছে না। বেশ শীত অনুভূত হচ্ছে। সমতলে এখন গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত, আর এখানে কাল সারারাত ঘুমিয়েছি কম্বল গায়ে দিয়ে!

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নামতেই চোখে পড়ে বিরাট এক মাকড়সার জাল, মাঝখানে মাকড়সা; এতো বড় মাকড়সা আগে কখনো দেখি নি। মেঘে ভিজে গেছে জাল, সুতো থেকে মুক্তার মতো ঝুলছে জল। ঘর থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এসে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে কয়েকটা ছবি তুলি। মাকড়সাকে খুব বেশি বিরক্ত না ক'রে ক্যামেরা যথাস্থানে রেখে নিচে নেমে যাই। ব্রাশ ক'রে প্রাতঃকৃত্য সারতে টয়লেটে ঢুকি, বেরিয়ে দেখি চারদিক পরিষ্কার, দূরের গাছপালাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; আসলে ডাকাত বাতাস বগালেকের শরীর থেকে খুলে নিয়ে গেছে মেঘের আবরণ! সকালবেলার বগালেক আমাদের মিরপুরের এক পাগলীর মতো; এই শরীরে কাপড় আর একাগাদা ছেঁড়া ন্যাতা তো কিছুক্ষণ পরই সম্পূর্ণ নগ্ন!

ফ্রেশ হয়ে নাস্তা ক'রে যাত্রা শুরু করি কেওক্রাডাংয়ের পথে। ঘরটা আবার বুকিং দিয়ে রাখি, আজ আর কাল কেওক্রাডাং কাটিয়ে পরশু রাত আবার এখানে থাকবো, তার পরদিন বান্দরবান গিয়ে ধরবো ফেরার বাস। বগালেক থেকে কেওক্রাডাং তিনঘন্টার পথ। আমাদের কোনো তাড়া নেই, আজ আর কাল বরাদ্দ কেওক্রাডাংয়ের জন্য; সুতরাং ধীরে-সুস্থে কাছে-দূরের পাহাড়, গাছপালা আর মেঘপুঞ্জ দেখতে দেখতে যেতে চাই।

কোথাও গাঢ় সবুজ পাহাড়, আবার কোথাও হালকা সবুজ। অরণ্যের বুকের গন্ধ নিতে নিতে আমরা অসমতল পথ চলি আর মাঝে মাঝে ছবি তুলি। যতো ওপরে উঠি ততো বিমোহিত হই মেঘ-পাহাড়ের সঙ্গম দেখে; কোথাও পাহাড়ের উরুর মাঝখানে চিৎ-উপুড় হয়ে আছে ললিত মেঘ, কোথাওবা পাহাড়ের কপালে-মুখে চুমু খেয়ে লালাস্রাব রেখে বা চুলে বিলি কেটে চ'লে যাচ্ছে লাস্যময়ী মেঘ।

পথশ্রমে ভিজে যায় গায়ের গেঞ্জি, সবার মাথা-মুখ ঘেমে দরদর ক'রে ঘাম ঝরে। গলা শুকিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে কয়েক ঢোক জল খেয়ে আবার পথ চলতে শুরু করি। এভাবে কয়েকদিন হাঁটলে শরীরের বাড়তি চর্বি ঝ'রে যাবে। আমরা কেউ-ই অবশ্য মোটা নই; আমার আর শাশ্বতীদির স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, আবিরের শরীরে মাংসের কিছুটা ঘাটতি আছে, শুধু পরাগদার ভুড়িটা সামান্য সামনে ঝুঁকেছে। নরখেলেইমদার কথা আর কী বলবো! মাঝারি আকৃতির পিটানো শরীর, কোথাও বাড়তি চর্বি নেই। থাকবে কী করে? তার তো দিন কাটে এভাবে পাহাড়ে হেঁটে হেঁটেই! এই যে আমাদের নিয়ে এসেছে, ফিরে গিয়ে যদি আবার পর্যটক পায় তো সঙ্গে সঙ্গেই চ'লে আসবে; শরীরে চর্বি জমানোর মতো অবসর বেশি নেই তার। গাইডবৃত্তির উপার্জনেই সংসার চালাতে হয় তাকে।

মাঝপথে পর্যটকদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য একখানা বেড়াহীন টিনের দো-চালা ঘর, বসার জন্য তিনদিকে চাঙা পাতা। হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে পড়ি সবাই। আমাদের পায়ের নিচে এবং পাহাড়ের ঢালে ছড়ানো-ছিটানো কলার খোসা, চকলেট-চিপসের মোড়ক, সিগারেটের প্যাকেট ইত্যাদি। এসব আমাদের মহান বাঙালীদের কীর্তি! পাহাড়ে বেড়াতে এলে পণ্যের মোড়ক, প্লাস্টিক প্রভৃতি ব্যাগে জমিয়ে রেখে পরে নির্দিষ্ট ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হয় যাতে পাহাড়ের পরিবেশ নষ্ট না হয়; কিন্তু সেই বোধ অধিকাংশ বাঙালী পর্যটকের নেই। এদের অন্তরে মাধুর্য নেই, তাই পাহাড় কিংবা সমতলের সৌন্দর্য ম্লান করতে এদের একটুও বাধে না!

আমাদেরই বয়সী এক যুবক একটা গাধা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বগালেকের দিকে। নরখেলেইমদার কাছ থেকে জানতে পারি ও রুমাবাজার যাচ্ছে। রুমাবাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিভিন্ন পাড়ার দোকানে বিক্রি ক'রে ছেলেটি।

যাত্রাবিরতি শেষে উঠে পড়ি আমরা। রোদ উঠলেও মেঘের কড়া শাসনে তা তেমন তীব্র নয়। পাহাড়চূড়ায় এই রোদ তো এই ছায়া, আলো-ছায়ার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে নয়ন-প্রাণের ক্ষুধা মিটাতে মিটাতে পৌঁছই দার্জিলিংপাড়া। ছবির মতো সুন্দর পাড়াটি। পাড়ার দোকান থেকে কলা-বিস্কুট খেয়ে, চা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি পাড়াটা। গাছপালা-মানুষ থেকে শুরু ক'রে মুরগি-কুকুর সবকিছুর ছবি ধারণ করে শাশ্বতীদির ক্যামেরা। আমিও মাঝে মাঝে ক্লিক করি। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা চার্চের সামনে এসে দাঁড়াই; চার্চের বেড়া বাঁশের চাটাইয়ের, ছাউনি টিনের। ছাউনির বাটামের সাথে বাঁধা একটা মাইক। কোনো লোকজন নেই, দরজায় তালা দেওয়া। এই চার্চ ওয়ালারা মুসলমানদের মতো তরবারি ব্যবহার করে নি। এরা মিষ্টি কথায় প্রলোভন দেখিয়ে আর মাথায় হাত বুলিয়ে বহু আদিবাসীকে ধর্মান্তরিত করেছে। নষ্ট করেছে আদিসবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের অর্থমন্ত্রী আবিরের তাড়া খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করি কেওক্রাডাংয়ের পথে।

দার্জিলিং পাড়া অতিক্রম ক'রে কিছুটা নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে হয়। পথ কোথাও কোথাও একেবারেই সরু, দু-পাশের অরণ্যের লতা-পাতা আর লম্বা ঘাস ঝুলে আছে পথের ওপর, গায়ে-পায়ে ঘষা লাগছে। পথ ভাল নয়, কালকে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় কোথাও কোথাও জল জমে আছে, লোকজনের চলাচলে কাদাও হয়েছে। কিন্তু এখন আর কোনো কিছুতেই 'কুছ পরোয়া নেহি' আমাদের! কেবল পরাগদার জোঁকের ভয় আছে। এছাড়া আমাদের সবারই যেন জল-কাদা, রোদ-বৃষ্টির কষ্ট আর সাপ-জোঁকের ভয় লুপ্ত হয়েছে! যন্ত্রের মতো শরীর চলছে তো চলছেই, যেন এভাবেই পাড়ি দিতে পারবো আরো অনেক পথ! সবার পিছনে হাঁটছে আবির, আবিরের আগে আমি, আমার আগে পরাগদা, শাশ্বতী, নরখেলেইমদা। কিছুদূর এগিয়ে একটু ফাঁকা মতো জায়গায় এসে সবাইকে অর্ধগোলাকৃতি হয়ে দাঁড়াতে বলি। আমার লাঠিটা আবিরের হাতে দিয়ে দুইহাত তুলে এপিঠ-ওপিঠ দেখিয়ে বলি, 'আমার হাতে কিছু আছে?'
আবির বলে, 'কী বলবি সোজা কথায় বল না ব্যাটা।'
'আরে অধৈর্য্য হোসনে, জাদু দ্যাখাবো।'
লম্বা আকৃতির একটা সবুজ পাতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে বলি, 'দ্যাখো, আমার হাতে একটা সবুজ পাতা। এখন আমি এই পাতাটিকে প্রাণ দিয়ে একটা প্রাণিতে রূপান্তর করবো!'
শাশ্বতীদি বলে, 'যাঃ, ফাজলামি করিস না, হাঁট।'
'আরে দাঁড়াও, দ্যাখোই না!'
সবাই তাকিয়ে আমার হাতের দিকে। আমি একটু মিথ্যে তুকতাকের অভিনয় করি, মুঠো করা হাত মুখের সামনে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফুঁ দিয়ে দ্রুত পরাগদার লাঠির মাথার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলি, 'এই দ্যাখো!'
সবাই পরাগদার লাঠির মাথার দিকে ঘাপটি মেরে থাকা প্রায় দুই দেড় সাইজের সবুজ জোঁকের দিকে তাকায়, পরাগদা দেখামাত্র হাতের লাঠি ছুড়ে ফেলে দিয়ে 'ওরে ভোদা' বলেই ভোঁ-দৌড়!

পরাগদার কাণ্ড দেখে আমাদের হাসি যেন থামেই না! শাশ্বতীদি হাসতে হাসতে পারলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে! নরখেলেইমদা জোঁকটা ফেলে দিয়ে লাঠিটা হাতে নেয় পরাগদাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। পরাগদা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে, 'দাদা, ওই লাঠি ফেলে দাও, আমি আবার নতুন লাঠি নেব!'

পরাগদা দার্জিলিং পাড়ায় যেখানে লাঠিটা রেখে চা খেয়েছে, হয়তো সেখান থেকেই জোঁকটা উঠে পড়েছে তার লাঠিতে; অথবা হাঁটার সময় পথের দিকে ঝুঁকে থাকা গাছের পাতা থেকে কোনোভাবে জড়িয়ে ধরেছে। 'ওরে ড্যাশ' ব'লে পরাগদাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে করতে অবশেষে আমরা পৌঁছাই কেওক্রডাংয়ের চূড়ায়।

গোসল করার সময় আরেক কাণ্ড! গোসল করতে হয় নিচে নেমে এসে ক্ষেতের হাতাইল দিয়ে হেঁটে গিয়ে জংলা মতো জায়গার একটা গর্ত থেকে মগ ভ'রে জল তুলে। খালি চোখেই দেখা যায় যে জলের ভেতর কিছু ছিঁনেজোঁক কিলবিল করে, আশপাশের ঘাসের ডগায় থাকা ছিঁনেজোঁক শুঁড় বাড়িয়ে দেয়, সুযোগ পেলেই তেনারা পায়ে উঠে পড়েন! পরাগদা ওখানে নামামাত্র জোঁক দেখে চিৎকার ক'রে লাফিয়ে হাতাইলের ওপর গিয়ে ওঠে। আমি আর আবির দুষ্টুমি ক'রে বলি, 'ওরে ড্যাশ, ওরে ড্যাশ!'

কোনোভাবেই সে এখানকার জলে গোসল করবে না। শেষে শাশ্বতীদি বালতি ভ'রে জল নিয়ে তাকে গোসল করাতে চাইলে রাজি হয়। অগত্যা আমি আর আবির বালতি ভ'রে জল নিয়ে দিলে সেই জল ভাল মতো চেক ক'রে শাশ্বতীদি মগ ভ'রে ভ'রে তার দামড়া সোয়ামীকে গোল করায়!

রাতে কম্বল গায়ে জড়িয়ে কাঠের ছোট্ট ঘরের বারান্দার চেয়ারে ব'সে আছি আমরা চারজন, কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমরা কথা বলবো কী? কথা তো বলছে প্রকৃতি, নাচছে, গাইছে! আমরা দর্শক, রীতিমতো বাকরুদ্ধ প্রকৃতির সাবলীল নৃত্যনাট্য দেখে! আদিবাসী নারী যেমনি মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত গহনায় সাজে, তেমনি পাহাড়ও সেজেছে মেঘের গহনায়; পরেছে মেঘের ঘাঘরা, বুকে মেঘের কাঁচুলি! দিগন্তে আকাশ ছড়াচ্ছে আলোর রোশনাই; মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে বদলে যাচ্ছে আকাশের রঙ, ঝলসে উঠছে মেঘ, যেনবা আকাশ চমকে চমকে মুঠোয় মুঠোয় উড়িয়ে দিচ্ছে দোলের বর্ণিল আবির! দুরন্ত দলছুট বালকের মতো কিছু মেঘ আমাদের ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। মনে হচ্ছে আকাশ কতো কাছে! আমরা যেমনি বিদ্যুৎ চমক, মেঘ আর আকাশের এই বর্ণিল রূপ দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছি, তেমনি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পৃথিবী এমনিভাবে আরো কতো বিচিত্র রূপ ধারণ করে, আমরা তার কতোটুকুই বা দেখতে পাই! ঠিক এই সময়েই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে হয়তো কতো বিস্ময়কর নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি হচ্ছে, যা হয়তো কেবল পশু-পাখিরাই অবলোকন করতে পারছে; হয়তো কোনোদিন মানুষের পাড়া-ই পড়ে নি সেখানে!

অন্ধকার রাত্রে আশশেওড়া গাছে কিছু জোনাকি বসলে যেমন লাগে, অনেক নিচে দূরের রুমাবাজার, দার্জিলিংপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামকেও এখান থেকে ঠিক তেমন লাগছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের প্রাচুর্য এবং এই সময়ের অনুভূতি শতবার শতভাবে ভাষায় ব্যক্ত করলেও কিছু অব্যক্ত-ই থেকে যাবে, যা কেবল অনুরণিত হবে হৃদয়ে। নিবিড় নৈঃশব্দে শাশ্বতীদি হঠাৎ গেয়ে উঠে–

'মেঘ রাঙানো পদ্ম আকাশ
দিগন্তে কতো রঙ ছড়ায়
তোমার বাঁশি আমার প্রাণে
মৌমাছিদের সুর ঝরায়।
ভালবাসার স্বপ্ন আনে
অলির প্রাণে ফুলবাহার
সাদা মেঘের পাখায় পাখায়
উধাও হলো মন আমার...

অনেকরাতে ঘুমালেও পরাগদা ব্যতিত আমরা বেশ সকালেই উঠে পড়ি। প্রাতঃকৃত্য সেরে নাস্তা ক'রে চা হাতে নিয়ে বাঁধানো লম্বা সিঁড়ি বেয়ে উঠি কেওক্রাডাং চূড়ায়। এই সিঁড়ির পাদদেশেই লালমুন থন লালার উঠোন লাগোয়া বাড়ি আর পর্যটকদের থাকার ঘর। শীতল পরিবেশে সকালের অল্প আলোয় চূড়ার চারপাশের পাহাড়গুলো যেন চোখে আদর বুলিয়ে দেয়! এই আলোয় ছবি ভাল হবে, আবির নিচে নামে ক্যামেরা আনতে। ফিরে আসে পরাগদাকে নিয়ে। সকালটা ছবি তুলে আর পাকা ছাউনির নিচে ব'সে হাসি-ঠাট্টা-আড্ডায় কাটাই। তারপর নিচে নেমে নরখেলেইমদার সঙ্গে রওনা হই পাসিংপাড়ার উদ্দেশে। খুব বেশি দূরে নয়, অল্পক্ষণেই পৌঁছে যাই পাসিংপাড়ায়। অসম্ভব সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন এই পাড়াটি; লম্বা আকৃতির; দু-পাশে জঙ্গলময় খাদ আর সবুজ পাহাড়ের পর পাহাড়। পাসিংপাড়া মেঘের স্বর্গরাজ্য, এখান থেকে সবচেয়ে ভালভাবে উপভোগ করা যায় মেঘ। দূরন্ত কিশোরের মতো এদিক-সেদিক দিয়ে ছুটে যায় মেঘ, আপনা-আপনিই গায়ে এসে পড়ে।
এ পাড়ার বাসিন্দারা মুরং সম্প্রদায়ের, পঞ্চাশটির মতো পরিবার বাস করে, জুম চাষ-ই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। আমরা এ বাড়ির-ওবাড়ির সামনে দাঁড়াই, স্থানীয়দের সঙ্গে গল্প করি, ছবি তুলি, আবার পথ চলি।

পাড়ার একদম চূড়ায় উঠে এনজিও পরিচালিত একটি স্কুলের কাছে এসে থামি, এপাড়া তো বটেই আশপাশের বেশকিছু পাড়ার ছেলেমেয়েরাও এই স্কুলে পড়ে। এখন অবশ্য ঈদের ছুটি। শিক্ষকদের কক্ষ বন্ধ থাকলেও ক্লাসরুমগুলোর দরজা খোলা। স্থানীয় একজনের অনুমতি নিয়ে দুটো বেঞ্চ বাইরে বের ক'রে এনে বসি আমরা। সামান্য দূরে ছোট্ট একটা দোকান, নরখেলেইমদা দোকানদারের সঙ্গে গালগল্প করছে, অর্থমন্ত্রী আবির গলা চড়িয়ে তাকে চায়ের কথা বলে, তারপর নিজেই উঠে যায় চায়ের সঙ্গে কি ধরনের টা পাওয়া যায়

তা দেখতে। একটু পর দু'জনে আমাদের জন্য নিয়ে আসে চা আর শুকনো খটখটে বিস্কুট। অবশ্য এখানে এই শুকনো খটখটে বিস্কুটই অমৃত'র মতো লাগে!

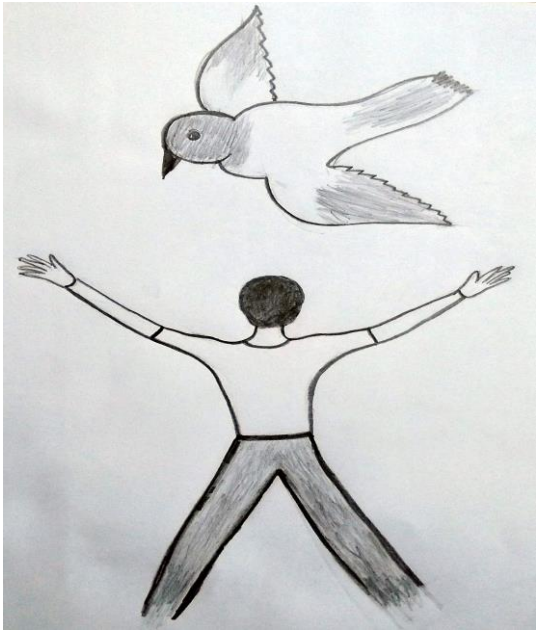
এপাড়ার মানুষ মুরগি পোষে। বেশ তাগড়া দুটো মোরগের লোভনীয় গতর দেখিয়ে চোখের সামনে দিয়ে তিড়িং-বিড়িং করা দেখে পরাগদা নরখেলেইমদাকে বলে, 'দাদা, মোরগ কী বিক্রি করবে এরা?'
'করবে, তবে দাম একটু বেশি হবে।'
'তা হোক, দ্যাখো, একটা মোরগ পাও কিনা; রাতে বারবিকিউ করবো।'
নরখেলেইমদা চ'লে যায় মোরগ কিনতে।

পাসিংপাড়ার চারপাশের সৌন্দর্য, মেঘের মণিপুরি মুদ্রা আর বিশুদ্ধ বাতাস উপভোগ করতে করতে চলে আমাদের আড্ডা, কবিতা আবৃত্তি আর গান। সময় যে কী ক'রে ব'য়ে যায় তা বুঝতেই পারি না!
হঠাৎ একটু তালভঙ্গ হয় পরাগদার মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠায়। পরাগদা পকেট থেকে মোবাইল বের ক'রে স্ক্রীনে দৃষ্টি বুলিয়েই বিস্ময়ে তাকায় শাশ্বতীদির দিকে, তারপর আবার মোবাইলের স্ক্রীনে।
শাশ্বতীদি বলে, 'কে?'
'মা।'
'ধরো।'
ফোন ধ'রে পরাগদা, 'মা...।'

চিঠি পাঠানোর পর থেকেই হয়তো শাশ্বতীদি মনের কোনে একটু হলেও আশা জিইয়ে রাখে এমন কিছুর কথা ভেবে, তাই পাঁচ বছর পর মায়ের ফোন আসায় পরাগদার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলেও শাশ্বতীদির বুকের কল্লোলিত আনন্দ উছলে পড়ে মুখে!

পরাগদা ফোন ধ'রে থাকে কানে; সে কিছু বলে না, শুধু শোনে। আমরা তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে। শাশ্বতীদির চিঠির কথা জানা থাকায় আমার ভেতরেও প্রবল উত্তেজনা আর কৌতুহল। পরাগদার চোখ ছলছল করে, বলে, 'কেঁদো না মা প্লিজ, আসবো, বান্দরবান থেকে ফিরে আমরা আসবো।...নাও কথা বলো।'

পরাগদা মোবাইল বাড়িয়ে দেয় শাশ্বতীদির দিকে।



কেওক্রাডাংয়ে আমাদের দ্বিতীয় রাত। আবছা অন্ধকারে আমি কেওক্রাডাংয়ের চূড়ায় একা দাঁড়িয়ে। ওরা সবাই নিচে। আমিও নিচে নেমেছিলাম; কিন্তু এই উন্মুক্ত আকাশ, আকাশের বুকে জ্বলতে থাকা অজস্র নক্ষত্র, মেঘের বজ্রনাট্য আর অপুষ্ট-অনুজ্জ্বল হলেও পৃথিবীর সবেধন চন্দ্রমণি রেখে ছাদের নিচে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। তাই আবার ওপরে উঠে এসেছি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার এখন ইচ্ছে করছে মেঘ হয়ে ভেসে যাই আকাশে!

দিনটা দারুণ কেটেছে, জীবনের সেরা একটি দিন। একটা তাগড়া মোরগ কিনেছিলাম পাসিংপাড়া থেকে, লালমুন থন লালার বাড়ি থেকে মসলাপাতি আর জ্বালানি কাঠ নিয়ে সন্ধ্যার পর সেটাকে বারবিকিউ করেছিল পরাগদা আর নরখেলেইমদা। আমরা কেবল ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বাবুর মতো খেয়েছি, সঙ্গে হুইস্কি। বেশ নেশা ধরেছে আমার, গুনগুন ক'রে গান গাইছি মাঝে মাঝে কিন্তু কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে ঘাসের ওপর শুয়ে ঐ দূর আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু তাহলে হয়তো রাশি রাশি নক্ষত্র দেখতে দেখতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়বো, আর সারারাত রাশি রাশি জোঁক এসে শরীরের সব রক্ত খেয়ে আমাকে ছিবড়ে ক'রে রেখে দেবে! তাকিয়ে আছি অসীম আকাশের দিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩১৯৬ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্রগুলোকে অনেক বড় মনে হচ্ছে। মোবাইলে খবড় জড়লধং এর প্যান ফ্লুট ছেড়ে দিই। Juan Leonardo Santillia

Rojas, ইকুয়েডরের তরুণ শিল্পী; আমার ভীষণ প্রিয়। দিনে-রাতে যখনই Rojas এর Der ensame Hirte, El condor pasa কিংবা circle of life শুনি; আমার হাত দুটো অসংখ্য পালকসমৃদ্ধ ডানা হয়ে যায়, মানুষ থেকে আমি হয়ে যাই হলদে পাখি। এই এখন যেমন হলদে পাখি হয়ে উড়ছি, উড়ছি তো উড়ছি-ই! আমার উড়ানযাত্রা থামছে না; আমি উড়ে বেড়াচ্ছি চৈনিক, এশিরিয়া, ব্যাবিলন, সুমেরীয়, মিশরীয়, হিব্রু, গ্রীক, রোমান, ইনকা সভ্যতার ওপর দিয়ে। অনেক নদী-সমুদ্র-পাহাড় পেরিয়ে ইনকা সভ্যতার মাচুপিচু নগরের ভূমি স্পর্শ করতেই আমি মানুষ হয়ে যাই আর দেখা পাই অনেক মানুষের। প্রাণোচ্ছল, সংগীত-নৃত্যপিপাসু মানুষের নগর মাচুপিচু। মানুষ হাঁটছে, মনের আনন্দে গান গাইছে, নাচছে! আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি আর হাঁটছি, হঠাৎ একটা পানশালার এক অচেনা নারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার অতিথি হই। জাদুকরী তার কথা, প্রাণ জুড়ানো তার গানের গলা। তার সুরেলা গলার গানে আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটে! তারপর তার বাড়িয়ে দেওয়া সুস্বাদু লামার মাংস খেতে খেতে চিচার পাত্রে চুমুক দিই। আহা, অমৃত! পাত্র শূন্য ক'রে আরেকপাত্র চিচার অনুরোধ জানাতেই আমি তার দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যাই! কোথায় অচেনা নারী? এতো শায়লা!

মাচুপিচু থেকে দুম ক'রে আমি ফিরে আসি কেওক্রাডাং চূড়ায়! শায়লা, শায়লা, শায়লা! যেন আমার এক মনোরোগের নাম শায়লা! ভুলে থাকতে চাই কিন্তু বারবার আসে, ওকে ভুলে থাকতে অন্য নারীকে কল্পনা করি, কিন্তু সেই অন্য নারী একসময় হয়ে যায় শায়লা!

খবড় জড়লধং এর সুরে ভাসতে ভাসতে তাকিয়ে আছি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। জীবনে এতোসব অপ্রাপ্তি, এতো অবহেলা, বঞ্চনা, ঘৃণা; তবু ঐ আকাশ, নক্ষত্র ও চারিপাশের এই সুন্দর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যখনই মনে হয় একদিন আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না আর এসব কিছুই দেখবো না; তখন ভেতরটা হুহু ক'রে ওঠে, শীতের শেষের বাতাসের মতো হাহাকার করে বুকের ভেতর! নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে জীবনানন্দের পংক্তি–

'কোথাও চলিয়া যাব একদিন–তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কত কাল জানিব না আমি...'

কোথায় যাব? ম'রে যাব। এই পৃথিবীর বাতাসে মিশে যাবে আমার বুকের শেষ বাতাসটুকু, এই পৃথিবীর মাটিতে মিশে যাবে আমার দেহ। চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাব আমি। আমিও পৃথিবীতে থাকবো না, শায়লাও থাকবে না। দুঃখ শুধু এই আমরা কেউ কাউকে পাব না!

প্রাণ প্রাচুর্যে শোভিত সত্যিকারের ছায়াময়-মায়াময় জঙ্গল ছেড়ে পাঁচদিন পর সকালবেলায় পা রাখি ধাতু-কংক্রিটের নিষ্ঠুর জঙ্গলে! সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি, তা বোঝার উপায় আছে এই শহরে! তবে চারদিক পরিষ্কার, সংখ্যায় কম হলেও বাস-রিক্স চলতে শুরু করেছে, একটু একটু ক'রে বাড়ছে ব্যস্ততা। সাতসকালেই ভ্যাবসা গরমে গা ঘামতে শুরু করে, মনে হয় এ কোন চুলোয় এসে পড়লাম! বান্দরবানের সঙ্গে আমার নাড়ির টান নেই, সেখানে নেই কোনো রক্তের সম্পর্কের স্বজন-প্রিয়জন; তবু প্রত্যেকবার বান্দরবান থেকে ফিরে আসার সময় প্রেয়সীকে ছেড়ে আসার মতোই মন কেমন করে, ফিরে আসার পরও হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে বান্দরবানের বিপুল বৃক্ষরাজি, বিস্তীর্ণ সবুজ পাহাড়, বর্ষার খরস্রোতা সাঙ্গু নদী, বিস্ময় জাগানো ঝিরিপথ, অপার মেঘসমুদ্র আর প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সহজ-সরল মানুষ; সবকিছু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে! এই মন কেমন করা ভাবটা বেশ কয়েকদিন থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাসার সামনে এসে রিক্স থামলে মন চাইলেও শরীর চায় না রিক্স থেকে নামি, সারা শরীর ব্যথা। প্রত্যেকবারই বান্দরবান থেকে ফেরার সময় কিছুক্ষণ একভাবে ব'সে থাকার পর মনে হয় হাঁটু, কোমর, কনুইসহ শরীরের ভাঁজগুলো লক হয়ে গেছে! জোর ক'রে সোজা করতে গেলে কষ্ট হয়। শরীরের এই ব্যথা থাকে বেশ কয়েকদিন। ব্যথা উপেক্ষা ক'রে রিক্স থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে পা বাড়াই গেটের দিকে। এখন ব্যাগ থেকে চাবি বের ক'রে তালাটা খুলতেও যেমনি আলস্য তেমনি কষ্ট। এরশাদুলকে ডাকতে গিয়ে থেমে যাই ওর ঘরের দরজায় তালা দেখে, বোধ হয় বাড়িতে ঈদ করতে গেছে। অগত্যা নিজেই ব্যাগ থেকে চাবিটা বের ক'রে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার তালা লাগিয়ে দিই। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ উঠতে বেশ ধকল যায় হাঁটু আর কোমরের ওপর দিয়ে। দরজার সামনে গিয়ে কলিংবেল বাজাই। পায়ে এখনো রুমাবাজার থেকে কেনা নেই প্লাস্টিকের স্যান্ডেলটাই রয়েছে। দরজা খোলেন বাবা, আমি কাঁধের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে স্যান্ডেল খুলে সবে ঘরের ভেতরে এক পা এগিয়েছি অমনি বাবা আমার বাম গালে ঠাস ক'রে এক চড় কষে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'তোর মোবাইল বন্ধ কেন?'

আমি হতবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাই, ফোন ক'রে আমাকে পায় নি ব'লে এমন জোরালো থাপ্পড়! পর মুহূর্তেই বাবা দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অবোধ শিশুর মতো কেঁদে ওঠেন! কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে বুক থেকে ছাড়িয়ে আমার কপালে-গালে পাগলের মতো চুমু খেয়ে আবারও বুকে জড়িয়ে ধরেন! আমি বাবার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে আছি, মা ছুটে এসে বাবাসহ আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকেন; আমার মাথার চুলে আদর বুলান।

ঘটনার আকর্ষিকতায় আমি হতভম্ব! হচ্ছেটা কী, বাবার হাতের কড়া চড় খেয়ে পরক্ষণেই আবার বাবা-মা উভয়ের বাঁধভাঙা আদরে আর চোখের পানিতে সিক্ত হই! আমি

ঘটনা কিছুই বুঝতে পারি না। বাবা-মা কি এমন কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন যে আমি ম'রে গেছি? কিংবা বান্দরবানে কি বাস দূর্ঘটনায় পর্যটক মারা গেছে, আর বাবা-মা আমাকে ফোনে না পেয়ে ধ'রে নিয়েছেন যে ওই দূর্ঘটনায় আমার কিছু হয়েছে? ঘটনা যাই-ই হোক আমি নিশ্চিত তারা আমাকে বারবার ফোন করেছেন আর ফোন বন্ধ পেয়ে উত্তরোত্তর তাদের টেনশন বেড়েছে। বান্দরবানে কোনো দূর্ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে খবর জানি না, এই পাঁচদিন বাকি পৃথিবীর কোনো খবরই আমি নিই নি। নৌ-পথে রুমাবাজার যাবার সময়ই আমি ফোনের ইনকামিং কল বন্ধ রেখেছি, বান্দরবান এসে ফেরার বাসে উঠেও ইনকামিং কল চালু করার কথা মনে নেই।

ঘটনা জানার কৌতুহলের চেয়ে আমার মন ভাললাগায় বুদ হয়ে থাকে বাবা-মায়ের আদরে। কতোদিন আমি এভাবে বাবা-মায়ের আদর পাই না, কতোদিন আমি বাবা-মায়ের গায়ের চেনা গন্ধ এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারি না, কতোদিন বাবার বুকে মাথা রাখি না, কতোদিন আমার চুলগুলো মায়ের হাতের স্পর্শ পায় না! এক বাড়িতে থেকেও বিগত চার বছর আমি তাদের কাছে দূরের মানুষ হয়ে আছি, আমি আর তাদের কাছে আগের মতো আদুরে আবদার করতে পারি না, দুষ্টমি করতে পারি না, তাদের অনাদরে এই চার বছরে আমি যেন বড় বেশি পরিণত আর কিছুটা রুক্ষও হয়ে গেছি! চার বছর পর আজ তাদের আকর্ষিক অপ্রত্যাশিত স্নেহ-ভালবাসা, আদর, গন্ধ-স্পর্শ পেয়ে আমার চোখে জলে এসে গেছে। চার বছর বঞ্চিত থাকার পর আজ সুযোগ পেয়ে আমিও তাদেরকে আঁকড়ে ধরি, যেমনি আগে ধরতাম। দু'জনই আমাকে জড়িয়ে ধরায় আমার ব্যথাময় শরীরে আরো ব্যথা লাগে, লাগুক ব্যথা, আমার হাড়-গোড় চুরমার হয়ে যাক; তবু আমি বাবা-মাকে ছাড়বো না, চার বছর পর আমি আবার আমার সেই আগের বাবা-মাকে ফিরে পেয়েছি!

এই অনাকাঙ্খিত ভালবাসায় ভিজতে ভিজতে হঠাৎ আমি বেশ বিব্রতবোধ করি বাবার কথা শুনে, 'ভুল বুঝে তোরে আমরা অনেক বকাঝকা করছি, তোর ওপর অনেক অন্যায় আচরণ করছি, তুই সেসব মনে রাখিসনে বাবা।'

বাবা আমায় ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু তার ডানহাত আমার বাম কাঁধে, আর আমার ডানহাত মায়ের কাঁধে। আমি চোখের জল মুছে বাবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'কী বলছো বাবা এসব? কী হয়েছে বলতো?'

ছোট আপু আগেই এসে দাঁড়িয়েছে ডাইনিংয়ে, দাদী দরজার কাছে এসে বলেন, 'পোলাডা আইলো জান্নি কইরা, ওরে বইতে না দিয়া খাড়া করাইয়া রাখছো তোমরা।'

এবার আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে বলি, 'মা, কী হয়েছে বলো না?'

'যা, আগে গোসল কইরা খাইয়া-দাইয়া নে, পরে শুনিস।'

'না, আগে বলো কী হয়েছে? প্লিজ। বাবা বলো না?'

আমার মাথায় হাত রেখে বাবা বলেন, 'ফাহাদ আর নেই!'

ফাহাদ আর নেই! মানে ফাহাদ মারা গেছে? আমার চাচার একমাত্র ছেলে, ধর্মের প্রতি অনাস্থা আর লেখালেখির কারণে ও আমার ওপর বিরক্ত হলেও আমি ওকে আপন ভাইয়ের মতোই স্নেহ করি; অথচ বাবা বলছেন ফাহাদ আর নেই! মা আমার বুকে মাথা রেখে আমাকে আবার জড়িয়ে ধরেন। আমার পা কাঁপছে, তবু ডানহাতে মাকে জাপটে ধ'রে বাবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'কীভাবে হলো বাবা?'

'পরশুদিন রাতে, র‍্যাবের গুলিতে!'

'মানে! ও না চিল্লায় গেছে?'

'ও চিল্লায় যায় নি, জঙ্গিদের দলে ভিড়েছিল। র‍্যাব অভিযান চালিয়েছে ওদের আস্তানায়।'

আমি হাঁ হয়ে যাই শুনে! যদিও এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়; কেননা খুব ছোটবেলা থেকেই আমাদের মতো ধর্মান্ধ পরিবারের সন্তানদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায় ধর্মীয় অনুশাসন, যারা খুব ছোট থেকেই অমুসলিমদের কাফের-বিধর্মী ভাবে আর তাদেরকে ঘৃনা করতে শেখে, একটু বড় হ'লে কোরান-হাদিস প'ড়ে যারা জানতে পারে যে মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করা এবং বিধর্মীদেরকে হত্যা করা ফরজ, জিহাদের সময় প্রাণ গেলে বেহেশত নিশ্চিত; ফলে আমাদের মতো পরিবারের সন্তানদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক, যেখানে জঙ্গিদের ফলন এখন বাম্পার, প্রচার-প্রচারণাও ব্যাপক!

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চাচার মুখ; যিনি আমাদের পরিবারের ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটি কঠোরভাবে আগলে রেখেছেন, লালন-পালন করেছেন, বিস্তারলাভ করতে প্রয়োজনীয় সার-ওষুধ দিয়েছেন; আর তারই ধারাবাহিকতায় তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। জানি না এতে তিনি ব্যথিত নাকি গর্বিত; ব্যথিত হ'লে দেখতে এখন কেমন লাগছে একজন অসহায় পিতার মুখ, আর গর্বিত হলেই বা কেমন দেখতে লাগছে একজন পাষণ্ড পিতার মুখ!

মা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কবে কীভাবে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার জন্য অনুশোচনা করছে–রোজার মাসে আমাকে নিজহাতে খেতে না দিয়ে কষ্ট দিয়েছে, আমার একার জন্য ভাল কিছু রান্না ক'রে দেন নি; এইসব। ফাহাদ নিজের জীবন দিয়ে আমার বাবা-মায়ের চোখের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে গেছে, বাবা-মায়ের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাওয়া আমাকে পুনরায় তাদের হৃদয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে। চার বছর আগে আমজাদ ওসামা থেকে যে সবুজ সমতলের পুনর্জন্ম হয়েছিল, বাবা-মায়ের ভালবাসায় আজ সেই পুনর্জন্মের স্বীকৃতি মিললো। জন্মান্তরবাদের চক্র মৃত্যুর পরে নয়, এই মানব জীবনেই বারবার আবর্তিত হয়; প্রচেষ্টা থাকলে ভুলভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে মানুষ একজীবনেই বারবার জন্মাতে পারে। বিজ্ঞানের আলোয়

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এখন সময় পুনর্জন্মের। আর বাবা-মায়ের স্বীকৃতি পেলে যে কোনো সন্তানের পুনর্জন্ম অধিকতর সুন্দর আর শান্তিময় হয়ে উঠতে পারে। আজকের বাবা-মা তারুণ্যের পুনর্জন্মকে স্বীকৃতি দিলে আগামীর বাবা-মা অনেক কাল আগে আরব মরুভূমিতে সৃষ্ট–সৃজন, মনন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা তথা মানব ধ্বংসকারী রক্তলোলুপ মরুঝড় 'সাইমুম'কে রুখবেই, তাদের সন্তানকে সাইমুম থেকে রক্ষা করবেই। সেদিন কেবল বিচ্ছিন্নভাবে একজন-দু'জনের নয়, পুনর্জন্ম হবে গোটা জাতির। মৃত্যুর পর জনমে জনমে কাল্পনিক জন্মান্তর নয়, পৃথিবীর শান্তির জন্য একজীবনেই সত্য হোক জন্মান্তরবাদ।

## সমাপ্ত



**সাইমুম**'র মতো একটি উপন্যাস লেখা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো ভাষার লেখকের জন্যই একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কেননা পৃথিবীতে এখন প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান, এদের অস্তিত্ব এবং প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মুসলমানরা যেখানে তাদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনাই সহ্য করতে পারে না, সেখানে রূঢ়-কঠিন সত্য যে তারা সহ্য করবে না সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

তারপরও *উজান কৌরাগ* সাইমুম কেন লিখলেন? লিখলেন বিবেকের তাড়নায়; গত চৌদ্দশো বছর ধ'রে আল্লাহ্ ও ইসলামের নামে মানবজাতির ওপর মুসলমানদের অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

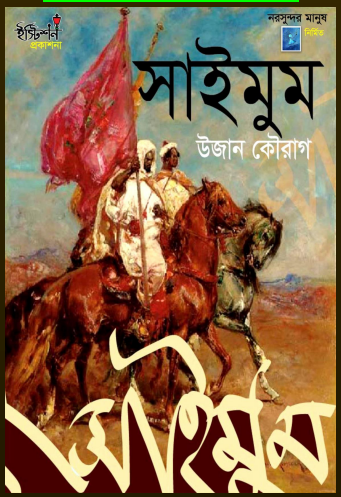
এখন হয়তো অনেকেই তাকে ঘৃণা করবে, গালমন্দ করবে, কেউ কেউ অমানুষও বলতে পারে; তাতে কি যায়-আসে! কেননা তিনি অকপটভাবে সত্য বলার জন্য নিজেকে ভালবাসতে পেরেছেন!

আমরা আশাবাদী হতেই পারি, এই অকপটভাবে সত্য বলে নিজেকে ভালবাসার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের মাঝেই বিকশিত হবে!


**একটি ইস্টিশন ইবুক**
www.istishon.com



**সংগ্রহ করুন আজই**




**ইস্টিশন ইবুক ওয়েব থেকে!**